

Digitized by srujanika@gmail.com

অ্যাডর্ন প্রকাশনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ উপদেষ্টা সম্পাদক
মাহবুব উল্লাহ সম্পাদিত
মহান একুশে সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ : বাংলাভাষা স্মারক

মনসুর মুসা
বানান : বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ

মর্তজা বশীর
মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে
বাংলার হাবশী সুলতান ও তৎকালীন সমাজ

সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্তি বড়ুয়া
জাতক সন্দর্শন
প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

সাইমন জাকারিয়া
অবর্ণাগবণ
সমকালীন বাংলা ভাষায় প্রাচীন চর্যাপদের রূপান্তরিত গীতবাণী

সাইমন জাকারিয়া ও নাজমীন মর্তুজা
বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস

মহাবংস
খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে পালি ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক পুঁথিকাব্য
অনু: দিলীপ কুমার বড়ুয়া ও মৈত্রী তালুকদার

Monsur Musa
Bengali as a Second Language
বাঙলা আনন্দ পাঠ
A Short Integrated Course of Written and
Spoken Bengali for Special Students

দিলীপ কুমার বড়ুয়া
বৌদ্ধ ভাষ্য : পালি অট্টকথা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত



দুনিয়ার পাঠক এক হও!

আমারবই কম
amarboi.com

বাঙালি জ্যোতিষ প্রথম চিত্ত-সম্পদ চর্যাপদ; এমন স্নিগ্ধ পুরাশৈলীর পদ-সাহিত্য বিশ্বের রত্নাগারের প্রায় শীর্ষস্থানে সংরক্ষণযোগ্য। চর্যাপদ বৌদ্ধ বজ্রযানি সিদ্ধাচার্যদের সাধন সংগীত, সম্পূর্ণ রূপক ভঙ্গিতে এবং তন্ত্রের মন্ত্র হিসেবে ধর্মশিক্ষার্থীদের জন্য রচিত। উদ্দেশ্য যা-ই থাক, সূর্যরশ্মি পতিত কেন্দ্রবিন্দু যেমন আলো স্পর্শ করে, চারদিকেও তার জ্যোতি ও আভা বাদ যায় না। ঠিক তেমনি তান্ত্রিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেও চর্যাপদের সম্মোহনীয় পদ্যশ্রীর রূপস্পর্শে আকুলিত হয় না এমন কেউই নেই, সেখানেই চর্যাপদের কৃতিত্ব। কবিতা যে উদ্দেশ্যে লেখা হোক না কেন, যদি তা হয় হৃদয় নিঃসৃত শিল্পানুরাগে জারিত তবে কবিতা কবিতাই। বৌদ্ধ গান চর্যাপদ তাই আমাদের সেই উৎকৃষ্ট সুরভিত কবিতা এবং আশ্বাদনের বিষয়।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। সেখানে রাজকীয় পরিবেশে সমাদরে তা গৃহীত হয়েছিল হয়তো-বা বাংলার বৌদ্ধ জীবন-মননে তার ঠাঁই ছিল না বলে। তাই মাজা-ঘষার দরুন বঙ্গীয় রূপ-লাবণ্য কিছুটা ছিন্ন বা ফিকে হয়ে গেলেও পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আশ্রয় চেষ্টায় চর্যাপদে বাংলার প্রাচীনত্ব যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত এবং বাংলার আদি সাহিত্যভাষার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বর্তমান সমীক্ষায় সেই উদ্দেশ্য সামঞ্জস্য রেখেও চর্যাপদের কবিতায় যে জগৎ এবং জীবনের অনুপম তান্ত্রিক সৌন্দর্য সম্ভার লুকিয়ে তা উদ্ধার করার প্রয়াস রয়েছে।



শামসুল আলম সাঈদ, জন্ম ১৯৪০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষে শান্তিনিকেতন থেকে পিএইচ ডি অর্জন। অধ্যাপনা শেষে বর্তমানে অবসর জীবনে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত।

প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ

উপন্যাসে মূল্যবোধ ও জীবনবোধ, ওমর খৈয়াম কাব্য ও দর্শন, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও আত্মোৎসর্গ, একুশের বাঙালি জীবন, প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধ, চট্টগ্রামের মানব সম্পদ, পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, হাফিজ ও বিস্ময়কর দিওয়ান।

উপন্যাস : মমতাজ বিসর্গ, নিত্য অরণ্য কাম্য, লাল জড়ুলে বেঁচে, ঠিকানা একান্তর, হাওয়া মঞ্জী হাওয়া।

প্রচ্ছদ : সাইম রানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

4 stage of ananda from page 158

prothamannda

paramannda

biramananda

sahajananda

8 marge at page 169

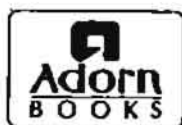
lalona , rasona , abodhuti ==page 200

চর্যা পদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা

9 ti brahman lakhan at page 200

চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা

শামসুল আলম সাজিদ



অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

উৎসর্গ

বাঙালির অতীত গৌরব সন্ধানীদের

সূচিপত্র

চিত্রসূচি	ix
ভূমিকা	xi
চর্যাপদ পরিচয়	১৩
লিপি ও চিত্র	২৭
চর্যাপদ	২৯
চর্যা-১	লুই পা ২৯
চর্যা-২	কুকুরী পা ----- ৩৫
চর্যা-৩	বিরুআ পা ৪০
চর্যা-৪	গুত্তরী পা ৪৪
চর্যা-৫	চাটিল পা ৪৯
চর্যা-৬	ভুসুকু পা ৫২
চর্যা-৭	কাহু পা (কৃষ্ণপাদানাম বা কৃষ্ণবজ্রপাদানাম) ৫৭
চর্যা-৮	কামলি পা ৬১
চর্যা-৯	কাহু পা ----- ৬৫
চর্যা-১০	কাহু পা ^১ ৬৮
চর্যা-১১	কাহু পা ^২ ----- ৭৪
চর্যা-১২	কাহু পা ৭৯
চর্যা-১৩	কাহু পা ৮২
চর্যা-১৪	ডোষী পা ৮৬
চর্যা-১৫	শান্তি পা ===== ৯১
চর্যা-১৬	মহিআ পা ^১ ৯৫
চর্যা-১৭	বীণা পা ^১ ৯৯
চর্যা-১৮	কাহু পা ----- ১০৪
চর্যা-১৯	কাহু পা ১০৮
চর্যা-২০	কুকুরী পা -----0=0=0=0=0000----- ১১১
চর্যা-২১	ভুসুকু পা ১১৬
চর্যা-২২	সরহ পা ১১৯
চর্যা-২৩	ভুসুকু পা ১২৩
চর্যা-২৬	শান্তি পা ===== ১২৬
চর্যা-২৭	ভুসুকু পা ১২৯

total poem 4

চর্যা-২৮	শবর পা	১৩২
চর্যা-২৯	লুই পা	১৩৮
চর্যা-৩০	ভুসুকু পা	১৪১
চর্যা-৩১	আজদেব পা	১৪৪
চর্যা-৩২	সরহ পা	১৪৮
চর্যা-৩৩	ঢেঞ্চণ পা	১৫১
চর্যা-৩৪	দারিক পা	১৫৬
চর্যা-৩৫	ভাদে পা	১৬০
চর্যা-৩৬	কাহু পা	১৬৩
চর্যা-৩৭	তাড়ক পা	১৬৭
চর্যা-৩৮	সরহ পা	১৭১
চর্যা-৩৯	সরহ পা	১৭৪
চর্যা-৪০	কাহু পা	১৭৭
চর্যা-৪১	ভুসুকু পা	১৮০
চর্যা-৪২	কাহু পা	১৮৪
চর্যা-৪৩	ভুসুকু পা	১৮৬
চর্যা-৪৪	কঙ্কন পা	১৮৯
চর্যা-৪৫	কাহু পা	১৯২
চর্যা-৪৬	জয়নন্দী পা	১৯৪
চর্যা-৪৭	ধাম পা	১৯৮
চর্যা-৪৮	কুকুরি পা	২০১
চর্যা-৪৯	ভুসুকু পা	২০২
চর্যা-৫০	সবর পা	২০৬
চর্যাপদ চরিত্র		২১০
চর্যাপদের বৌদ্ধ সাহিত্য ও তাত্ত্বিক চরিত্র		২১৬
চর্যাপদের সমাজ চরিত্র		২২৫
চর্যাপদের আধ্যাত্মিক ও লোকায়ত চরিত্র		২৩৮
চর্যাপদ বাঙালি সংস্কৃতির উৎস		২৪৬
চর্যাপদের শিল্প ও সাহিত্য চরিত্র		২৫২
পরিশিষ্ট		২৫৭
শব্দ নির্ঘণ্ট		২৫৯
ব্যক্তি ও বিষয় নির্ঘণ্ট		২৭৭
সহায়ক গ্রন্থাবলী		২৭৯

চিত্রসূচি

প্রেট ১	: মুই পা	৩৩
প্রেট ২	: কুকুরী পা	৩৯
প্রেট ৩	: বিরুআ পা	৪৩
প্রেট ৪	: ভুসুকু পা	৫৬
প্রেট ৫	: কাহু পা	৬০
প্রেট ৬	: কামলি পা	৬৪
প্রেট ৭	: ডোম্বী পা	৯০
প্রেট ৮	: শান্তি পা	৯৪
প্রেট ৯	: বীণা পা	১০৩
প্রেট ১০	: সরহ পা	১২২
প্রেট ১১	: শবর পা	১৩৭
প্রেট ১২	: আজদেব পা	১৪৭
প্রেট ১৩	: দারিঅ পা	১৫৯
প্রেট ১৪	: ভাদে পা	১৬২
প্রেট ১৫	: কঙ্কন পা	১৯১
প্রেট ১৬	: ধাম পা	২০১

ভূমিকা

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম প্রাণস্পন্দন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একশত বছর আগে নেপালের রাজদরবার থেকে একে বের করে এনে বিশ্ব দরবারে হাজির করার পরপরই পূর্ব ভারতীয় অন্যান্য ভাষা দাবি করল যে এটাই আসলে তাদের সকলের পূর্বকার সঠিক প্রাণ। কিন্তু ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেসব দাবি নাকচ করে বললেন, এটা বাংলার। সঠিক এবং তাই সত্য কথা।

এত বলবীৰ্য সম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্য কীর্তি বঙ্গ জননী হাজার বছর আগে প্রসব করেছিল, তবে জননীর কোল ছেড়ে কী অভিমানে তা অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তার কারণ এখনও নির্ণীত হয় নি এবং মাঝখানে বঙ্গ সাহিত্য ভাষার গ্রন্থিসূত্র এতটাই ছিন্ন হয়েছিল যে একমাত্র মাঠে ঘাটে অনাদরে থাকা বাউলরা কেবল একতারে যেটুকু পারে ধরে রেখেছিল, নইলে চর্যাপদকে বাংলা বলার কথা নয়। তাছাড়াও চর্যা যে রকম পদ সাহিত্যের ঐতিহ্য পদাবলী তার চর্চাও তাই বলে দিচ্ছে। কিন্তু চর্যা রচয়িতা শিক্ষাচার্যরা কিন্তু একে পদ বলেন নি, এ পদগুলো কেবল চর্যা নামে অভিহিত, যা সিদ্ধাদের মন্ত্রধ্বনি বা সাধন সংগীত। বৌদ্ধ বজ্রযানি তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যরা আপন আপন গুহ্য আচারের নিমিত্ত এ চর্যা ব্যবহার করতেন আগম নিগম রূপে, সাধারণের জন্য নয়। টীকাকার মুন্সিও তাই চর্যার ভাষাকে প্রাকৃত-সাক্ষ্য ভাষা বলেছেন অর্থাৎ একটা আশ্চর্য মরমি ভাষা, যা সাধারণের বোধগম্য নয়। তাই বোধগ্রহীদের জন্য টীকা নির্মাণ করেন। এ রকম চর্যা বাংলা বৌদ্ধ বিহারগুলোতে কিংবা অন্যত্র ‘লোকজ্ঞান-লোকভাসের’ নিমিত্ত নৃত্য গীত দ্বারা তাল লয় সহকারে গীত হত। বাংলার বুক থেকে বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হবার পর এ অমর সম্পদও অন্যত্র অপসারিত হয়েছে, অবশেষে হিমালয়ের ভেতরে গিয়ে যতটা সম্ভব অস্তিত্ব রক্ষা করেছে।

চর্যার ভেতরে বঙ্গ নামের উল্লেখ থাকলেও ভাষার নাম তখনও বঙ্গ হয়ে ওঠে নি, অথবা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ সবকে মিলে তৎকালে বঙ্গই বলা হত, এ সমগ্র অঞ্চলের ভাষাটাই ছিল পূর্বা প্রাকৃত বা চর্যার ভাষা, বর্তমান বাংলাভাষায় মূলরোম অন্য ভাষাগুলো তা থেকে গাঁড় পেয়েছে। এ ভাষাতে দেড় হাজার কি তারও আগে এ রকম চর্যা রচিত হত বলে অনুমান করা যায়। হাজার হাজার আগাছা চর্যা সৃষ্টির পর এ চর্যার মত মহীৰুহ উৎপন্ন হয়েছে, যা হঠাৎ করে এ অঞ্চলে জেগে ওঠে নি। টীকাকারের মন্তব্যে ধরা পড়ে যে এ সব হাজার হাজার চর্যা সংগ্রহের পর তার থেকে নির্বাচিত একশতটি চর্যার একটি সংকলন হয়েছিল, তার ভেতর থেকে মুনিদত্ত মাত্র একানুটি, পরে একটি ‘ব্যাক্য্য নাস্তি’ বলে বাদ দিয়ে পঞ্চাশটির নির্মল টীকা প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীদের জন্য, সেই টীকাযুক্ত চর্যাগ্রন্থের নাম হল চর্যাগীতিকোষবৃন্তি যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন এবং এ ‘চর্যাচর্যাচয়’ কে তিনি নামকরণ করেন ‘চর্যাচর্যাবিশিষ্ট’,

প্রকৃতপক্ষে এর নাম 'আশ্চর্য্য-চর্যাচয়'। 'আশ্চর্য্য'-মরমি ভাষা ও কথার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ শাস্ত্রী চর্যার ভাষাকে সাক্ষ্য বা আলো আধারি ভাষা বলেছেন, যা ঠিক নয়। মুনিদত্তের টীকা অনুসরণে চর্যার ভাষাকে দুর্বোধ্য বলার অবকাশ নেই।

চর্যাপদ বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একে এখন আর মন্ত্র বা সাধন সংগীত বলে একপেশে আচরণ দিয়ে বিচার করার প্রয়োজন নেই, এখন নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান প্রসারিত হয়েছে, চর্যার শব্দ ও ভাষার অর্থভেদ করার মত চিন্তা চেতনা যুক্তি ও যুক্ত মননের উদয় হয়েছে যা নিয়ে অনুধাবন করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে চর্যাপদ বাংলা কবিতার এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং এর ভাব ব্যঞ্জনা শব্দ অনুষ্ঙ্গ আধুনিক কবিতাকেও অতিক্রম করার শক্তি রাখে। সেই সময়ের চর্যা রচয়িতা এ সকল সিদ্ধাচার্য বা রাজপুত্র কী অমোঘ ভঙ্গিতে এ বাণী সমিধ উচ্চারণ করে গেছেন ভাবতে অবাক লাগে, যার গোপন গন্ধের চারিদিকে বাঙালি চিরদিন অবশ্য ঘুরে বেড়াবে।

চর্যাগীতি আমাদের অহংকার, বাংলা গানের প্রথম ঘরানা তো এখানেই। এ মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণ করতেন ঈশ্বরের মত শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধাচার্যরা। তাঁরা তাকে মার্গ সংগীত বা সাধন সংগীত হিসেবে চর্চা করতেন। বাংলা গানের এই নামের ঈশ্বরদের গুণ এমনই যে তাঁরা একাধারে বাণী রচনা করতেন, সুর সংযোজন করতেন, রাগ তাল নির্ণয় করতেন এবং অবশেষে নিজের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরে প্রকাশ করতেন, সেই একই ধারায় বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের বৈভব থেকে শুরু করে এই সেদিন পর্যন্ত রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত বাংলা সংগীত সম্ভারে জমা পড়েছে। এ রকম সৃষ্টিকে কেউ 'গানবাঁধা' সাধনা বলেছেন। তাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজস্ব ঘরানা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর পর থেকে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী আলাদা-আলাদা ভাবে তাদের প্রতিভার বিস্তার করে থাকে, তাই আধুনিক মনকে আর মার্গ সংগীত বলা যাচ্ছে না। লোক-সংগীতের মত ব্যাপারটা এর জন্য অটোম্যাটিক রূপকারদের কাজ হিসেবেই থেকে যাচ্ছে, আগের 'মার্গ' গৌরব অর্জন এরা করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় চর্যাগীতি হল বাংলা গানের বা বাণীর মাতৃস্তন্য, যা পান করে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ও বাঙালির জীবনবোধ বর্ধিত হয়েছে।

চর্যাপদ নিয়ে দীর্ঘদিন দানাপানি ছেড়ে মাঠে প্রান্তরে মগ্ন থেকে কবিতা হিসেবে এগুলোকে আশ্বাদন করতে গিয়ে অতি বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে যাঁরা এ শব্দ ভাষানুষ্ঙ্গ ও বাণীর রূপকার ছিলেন, মনে হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরই ছিলেন, তা না হলে আধুনিক কাব্যগুণের ব্যাপারগুলো কী করে তাঁরা জানতে পারলেন? তবে মাঝখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুনিদত্ত যে এর জন্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চেপে কাব্যরস পিপাসাকে আলগা করে দিয়েছেন একথা ভুলে যেতে হবে। অথচ তিনিই চর্যাপদকে নবজীবন দান করেছেন। বর্তমান গ্রন্থচর্চায় আধুনিক পাঠক হয়তো এ দায়িত্বটা উদ্ধার করতে পারেন, তবু তা সন্দেহ নিশ্চিদ্র নয়। মনে করছি এ জন্য যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানুষ জঙ্গিবাদের জন্য ধর্মদায় মোচন করছে, গির্জায় মঠে মন্দিরে এসতেমায় চক্ষু উলটিয়ে পরকালে নিমজ্জিত থাকছে তাই সিদ্ধাচার্যদের এ বুদ্ধ নাটক আকাঙ্ক্ষা তাঁদের গগন বিস্তারিত সত্য নয় কে বলতে পারে? এ মহাশক্তি বলেই তো চর্যাশক্তি উৎসারিত হয়েছে। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস যে নেওয়ারি দুর্বোধ্য লিপি থেকে জননীর প্রথম জাতককে কেমন করে উদ্ধার করলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী? এ সব কিছু ঈশ্বরের কাজ—এমনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। আর এ বিশ্বাসাপুত হয়ে এ গ্রন্থ রচনা আর পাঠকই তার দায় মোচন করতে পারেন।

চর্যাপদ পরিচয়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২) ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবার থেকে একটি 'আশ্চর্য' পুঁথি আবিষ্কার করেন, তার নাম চর্যাচর্যাবিনিচয়। যদিও ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে পুঁথিটি প্রকাশ করেন, তাতে চারটি পুঁথি ছিল, আশ্চর্যচর্যাচয় টীকা-সমেত নাম চর্যাগীতিকোষবৃত্তি, সরহ পাদের (শরহ বজ্র-শাস্ত্রী) দোহাকোষ, কাহু পাদের (কৃষ্ণাচার্য্য পাদ-শাস্ত্রী) দোহাকোষ এবং ডাকার্বব। এদের কোনোটিই 'পদ' বলে পুঁথির কোথাও উল্লেখ ছিল না। পদ কথাটি সংযোজন করেন শাস্ত্রী। তিনি তাকে 'চর্যাচর্য্য-বিনিচয়' বললেও আসলে তার নাম 'আশ্চর্য্য-চর্যাচয়'। আশ্চর্য মরমি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। টীকাকার মুনিদত্ত তাকে প্রাকৃত ভাষায় রচিত বলেছেন এবং বলেছেন সেই ভাষা 'সাক্য ভাষা'। সাক্য ভাষাকে সঙ্ক্যা বচন বা সঙ্ক্যাসংকেত বলা হলেও শাস্ত্রী বলেন আলো আঁধারি ভাষা, খানিক বোঝা যায়, খানিক বোঝা যায় না। সে কথা ঠিক নয়। সুকুমার সেন ব্যাখ্যা করেন শব্দটি ধৈ বা ধা ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ শব্দটিত করা। যে ভাষায় বা শব্দে অতীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করে অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হয়ে উঠতে হয় (সম্+ধৈ), অথবা যার শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম্+ধা) তাই হল সাক্য ভাষা, নিগূঢ় অর্থ বহন করে এমন ভাষা, তাই সাক্য ভাষা কারও ব্যবহারিক মাতৃভাষা নয়।

'চর্যা' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত কথা হল 'গমনশীল'। তান্ত্রিকদের শিক্ষা হচ্ছে আগম নিগম-আগম হল গুরু থেকে গ্রহণ করে শিষ্য তা আত্মস্থ হয়ে সিদ্ধ হলেন, পরে শিষ্য তা তাঁর শিষ্যদের দান করেন, সেটা হল নিগম। এ গুরু শিষ্য পরম্পরায় মন্ত্রজ্ঞান পরিচালিত কিংবা শিষ্যরা যা বিভিন্ন স্থানে প্রকটিত করে কিংবা প্রচার করে গেয়ে থাকে সে রকম গীতকে চর্যা বলা হয়েছে। চর্যা রচয়িতারাও এমন কথা বলেছেন। আইসন চর্যা কুকুরী পাঁও গাইডু—এরূপ চর্যা কুকুরী পা গাইলেন। তা হলে স্পষ্ট যে চর্যা মূলত গীত। আর গীত হতে হলে তার জন্য পদ বা কথা অবশ্যই থাকতে হবে। ভারতের নাট্যসূত্রে পদ বিষয়ে বিচিত্র বর্ণনা রয়েছে। পদ অর্থ বাক্য ও সংগীত 'তৎপদং দ্বিবিধংসুতম'—যা পদ তার দুই অবস্থান—বাক্য ও সংগীত। কিন্তু প্রায় সব পদই ধর্মসংগীত, বুদ্ধদেবের বাণী 'ধর্মপদ', তাই চর্যাকে চর্যাপদ বলে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

পুঁথিটি প্রকাশিত হবার পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ মূল্য দিয়ে গবেষণা করে ১৯২৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধি লাভ করেন। এতে তিনি

অন্য তিনটি পুঁথিকে বিবেচনা করে তাই কেবল 'আশ্চর্য্য-চর্য্যচয়' বা চর্যাপদকে প্রাচীন বাংলা বলে দাবি করেন। তাতে শাস্ত্রীর মত প্রতিষ্ঠিত হল। স্যার গিয়ার্সন, জুল ব্লক প্রমুখও এ দাবির প্রতি সায়্য দেন। পরে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফরাসি ভাষায় গবেষণা করে ১৯২৮ সালে পি-এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এ মত আরও দৃঢ় করেন। কিন্তু হিন্দি মৈথিলি, অহমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার পণ্ডিতরা চর্যাগীতিকে তাদের নিজস্ব ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে দাবি করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাকে পূর্বা হিন্দি বলে মত প্রতিষ্ঠা করতে চান।

এটা সত্যি যে চর্যাপদ রচিত হবার সময় বাংলা ভাষার রূপ সুস্পষ্ট ছিল না, তেমনি দাবিকৃত অন্যান্য ভাষারও রূপ স্পষ্ট ছিল না, তাতে করে বলা যায় এ সকল ভাষার উৎসের সঙ্গে চর্যাপদের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তা হলে সে সময়ের ভাষারূপ, অন্ততপক্ষে সাহিত্য ভাষা রূপ না হলেও এ সমস্ত অঞ্চলের একটা সাধারণ মানসমৃদ্ধ ভাষারূপ হচ্ছে চর্যার ভাষা। এখন যেমন বাংলা ভাষার 'চলিত রূপ' বা Standard Colloquial Language সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি ধারণা করা যায় যে চর্যার ভাষাও হল সেই 'চলিত' রূপ। যেখানে বিদ্বৎসমাজ বিশেষভাবে বিচরণ করবেন সেই ভাষাকে চর্যা রচনার জন্য গ্রাহ্য করা হয়েছে। নালন্দা থেকে মহাস্থানগড়-ময়নামতি এ অঞ্চলে বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। তাই এ অঞ্চলের ভাষার প্রভাব অগ্রাহ্য করা যায় না।

চর্যার রচয়িতা বা সিদ্ধাচার্যদের যে নাম পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় তাঁরা ছিলেন নিম্নবর্ণের লোক, যা বঙ্গাল অথবা দক্ষিণ হিসেবে তৎকালে চিহ্নিত। যদিও পদকর্তারা বিভিন্ন বিষয়ে বড় পণ্ডিত বা পারঙ্গম ছিলেন এবং তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন রাজকুল বা কুলীন বংশজাত কিন্তু পদ রচনার ভণিতায় নিখিন কাপালিক অথবা সেই জাতীয় অস্মৃত নাম গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এঁদের দীক্ষাগুরুদের অধিকাংশকেই তান্ত্রিক যোগী সিদ্ধাচার্য ডাকিনী বলা হয়েছে। কেন তাঁরা ছদ্মপরিচয় এবং নিম্নবর্ণের আচরণে উৎসাহী ছিলেন সে বিষয়ে অনেকে অনুমান করেন, তাঁরা তত্ত্বকথা প্রচার করতেন সাধারণত নিম্নবর্ণের লোকদের হিত কামনায়, এঁরা অনেকেই সংস্কৃতির পীঠস্থান মগধের অধিবাসী হলেও পূর্বা প্রাকৃত ও মাগধি অপভ্রংশ চর্চা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তাঁদের অনেকেই যেমন চর্যা রচনা করেছেন তেমনি দোঁহাও; সিদ্ধাচার্য কাহ্ন পা কর্ণাটকের লোক হয়েও এ ভাষায় চর্যা ও দোঁহা রচনা করেছেন। সূক্ষ্ম বিচারে চর্যার ভাষাকে পূর্ব মাগধি অপভ্রংশ এবং অবহট্ট ঘোঁষা বাংলা বলতে হবে, চর্যাকাররা লোকজ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রাচীন বাংলা ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন।

এ চর্যাগীতিগুলো মন্ত্র হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছিল। আনুমানিক অষ্টম শতক থেকে এ চর্যার 'বিচরণ' শুরু। সে সময় থেকে বৌদ্ধধর্মে তত্ত্বযানের সূত্রপাত হয়। এর আগে হীনযান ও মহাযান মতপার্থক্য হয়ে বৌদ্ধধর্ম কঠিন ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। যে কোনও ধর্মের মূল মতের গভীরে পরবর্তীকালে গূঢ় চেতনার অভ্যুদয় ঘটে, যেমন ইসলাম ধর্মের ভেতর সুফীদের গূঢ় ভাব চেতনার ধর্মীয় মত, তেমনি হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক মত, বৌদ্ধদের এই তান্ত্রিক মতগুলোর ভেতর রয়েছে কালচক্রযান, বজ্রযান এবং সহজযান। এ চর্যাপদ রচয়িতারা বজ্রযান আচার্য; বজ্র হচ্ছে শূন্যতা—শূন্যনিরামণি। বজ্রযান মতে বোধিচিহ্ন

বজ্রস্বভাব সম্পন্ন হলে সাধনার ক্ষেত্রে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। বোধিচিন্তা বা পরিশুদ্ধ বোধিচিন্তা হল বুদ্ধের গুণসম্পন্ন বা বুদ্ধত্ব অবলম্বন করার শামিল, তা করুণাসম্পন্ন, পারমার্থিক অর্থে চিন্তার বুদ্ধত্ব লাভ। তাই বজ্রের মত কঠোর কঠিন স্থির সাধনা দ্বারা তা সম্ভবপর হয়। এ কারণে সহজ কথায় এর ধারণা দেয়া যায় না, ইংগিত বা গুহ্য ভাব পদ্ধতির পরিভাষা তৈরি করার জন্য চর্যা রচনা করা হয়েছে। তাদের সঠিক অর্থ উদ্ধার অতিশয় দুরূহ, তবে এ সাধনার বিশুদ্ধ মন্ত্র-মুদ্রা আর মণ্ডল স্থাপনের দ্বারা তা সম্ভবপর হয়। তা থেকে প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করে চরম সিদ্ধি বা সত্যজ্ঞান লাভ করাই হল সাধনার উদ্দেশ্য।

সংসারের জীব যতক্ষণ পঞ্চ স্কন্ধ বা দেহের পঞ্চ অবস্থা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম ধ্বংস না হচ্ছে ততদিন অবধি জীবের পুনর্জন্ম দুঃখ কষ্ট বা ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই। তবে পঞ্চ স্কন্ধকে বাদ দিয়ে তো সাধনা করা যায় না, এদের শক্তি দিয়ে তা করতে হবে, তাই তাদের সাধনার ক্ষেত্রের নাম হচ্ছে—বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত ও রত্ন। লৌকিক অর্থে তাদের নাম ডোষী, নটী, রজকিনী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী। আসলে এরা শূন্যরূপ বুদ্ধশক্তি। সাধক তথাগতের দীক্ষায় সাধনা শক্তির দ্বারা কুল পেয়ে কুলীন এবং তারপর পরমার্থ লাভ করে নির্বাণে চলে যায়।

সে যাই হোক, চর্যাগীতি আবিষ্কারের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় নব আর্যভাষা, যাকে পূর্ব প্রাকৃত বলা হয়েছে তার মূল সম্বন্ধে জানা গেল। মূল হল প্রাচীন বঙ্গভাষা। আর এতে করে শুধু বাংলা নয়, প্রাকৃত ভাষার অন্যান্য উপ-বিবর্তনের ইতিহাসও স্পষ্ট হল। মূল চর্যাগীতিকোষবৃত্তি হচ্ছে চর্যাপদ ও মুনিদত্তের টীকা সংবলিত পুঁথি; এই টীকার আশ্রয়ে চর্যাপদের পাঠ নির্ণয় অর্থপ্রকাশ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার সহায়ক হয়েছে। তবে মুনিদত্ত যেহেতু এ গীতগুলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থে আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাই তাদের জীবনাশ্রিত রূপ যতটা পাওয়ার কথা ততটা পায়নি। চর্যাপদ রচিত হবার অনেক পরে সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের ধর্মীয় চেতনা নিয়ে টীকা নির্ণয় করে থাকবেন। তাঁর টীকার ভাষা অর্বাচীন সংস্কৃত, যাকে 'হাইব্রিড সংস্ক্রিট' বলা হয়। সে কারণে টীকার ভাষার অর্থগম্য ও খুব সহজসাধ্য নয়। মুনিদত্ত চর্যার ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা ও সাক্ষ্য ভাষা বলেছেন। চর্যায় বঙ্গ বা বঙ্গাল নাম থাকলেও তখন হয়তো ভাষার নাম বঙ্গ হয়ে ওঠে-নি। আমাদের ধারণা প্রাচীন বঙ্গভাষায় এ চর্যাপদ রচিত হলেও বঙ্গলিপিতে তাদের পাওয়া যায় নি। অর্বাচীন নেওয়ারি লিপিতে তালপত্রে লিখিত এবং গ্রথিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বিভিন্ন লিপিকারে হাত বদলে হয়তো বা এমন হয়েছে। এবং আরও ধারণা করা যায় যে চর্যাকার সিদ্ধাচার্যরা হয়তো বা মূল বঙ্গলিপিতেই লিখেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে এ দেশ থেকে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সে গীতগুলোর আন্বেদন ও তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা গ্রহণ করা থেকে বিরত বঙ্গবাসীদের আগ্রহশূন্যতার কারণে এ দশা হয়েছে। ফলে মূললিপি পাঠ ও অনুশীলনসহ সবকিছু মূল অঞ্চলে বিলুপ্ত হয়েছে। অতঃপর যে অঞ্চলে এদের চর্চা ও আদর ছিল সেখানকার লিপিতে তারা শেষ অবধি আশ্রিত হল এবং কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ তাতে প্রভাবান্বিত হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। সে কারণে প্রাপ্ত চর্যাপদের মূল পাঠের বিবর্তনরূপ সৃষ্টি হয়েছে অথবা মূল পাঠ থেকে অনুলিপি করতে গিয়ে লিপিকরদের মনোপছন্দের শব্দ ও ভাবমিশ্রিত করে দেওয়া বৈচিত্র্য

নয়। গীতিগুলো নেওয়ারি লিপিতে পাওয়ার আরও একটা কারণ হতে পারে যে সম্ভবত সে সময় বাংলা অহমিয়া মৈথিলি ওড়িয়া ভাষা এই লিপিতে লিখিত হত, নেওয়ারি দেবনাগরি লিপিরই বিবর্তন রূপ, বাংলা লিপি ওদের নাগরিলিপির বিবর্তন রূপ। সর্বপ্রাচীন বাংলা লিপিতে যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি দুটির বর্ণলিপির তুলনামূলক বিচারে বর্ণলিপির একটা সাজুয়া এবং বিবর্তন সম্বন্ধেও ধারণা করা যেতে পারে।

দুই.

পুঁথিতে প্রাপ্ত ছেচল্লিশটি পূর্ণ গীত, একটি খণ্ডিত, তার ভেতর আটত্রিশটি দশ পংক্তির, পাঁচটি চৌদ্দ পংক্তির, দুটি বার পংক্তির, একটি আট পংক্তির, খণ্ডিত পদটি ছয় পংক্তির, বাকি তিনটি গীত পাওয়া যায়নি, তাদের টীকাও পাওয়া যায়নি। সব মিলে পঞ্চাশটি গীত ছিল যার টীকা মুনিদত্ত প্রকাশ করেছেন, বাকি পঞ্চাশটির করেন নি, অথচ তাদের সম্বন্ধে ইংগিত দিয়েছেন। চর্যাগীতিকোষবৃত্তি গ্রন্থের সমাপ্তিতে বলা হয়েছে 'বুদ্ধগণ কর্তৃক আহৃত এবং নির্বাচিত একশত গীতের একটি কোষগ্রন্থ রচনা সংকলন করা হয়েছে, তার ভেতর থেকে শিষ্যদের বোধার্থে এবং সাধারণের জ্ঞানার্থে মুনিদত্ত কর্তৃক এই একশত গীতের অর্ধেক বা পঞ্চাশটির ব্যাখ্যার্থ নিম্নলিখিত টীকা প্রকটিত হল।' এ থেকে জানতে পারা গেল যে সিদ্ধাচার্যরা হয়তো বা অসংখ্য চর্যাগীতি রচনা করে থাকবেন, তার ভেতর থেকে বিজ্ঞজনেরা একশতটি চর্যা নির্বাচিত করে একটি কোষগ্রন্থ বা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সে সংকলনের অর্ধেক বা পঞ্চাশটিতে মুনিদত্ত শিক্ষার্থীদের নিমিত্ত ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করেন। দুই এই পঞ্চাশটি নিয়ে চর্যাগীতিকোষবৃত্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু নেপাল রাজদরবারে যত্নসহকারে রক্ষিত অবস্থায় এর নাম হয়েছে 'চর্যাচর্যাটীকা'। এ থেকে অনুমান করা যায় একশত চর্যাপদের যে সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিল তার নাম চর্যাচয় বা চর্যাশয় অথবা আশ্চর্যাচর্যাচয়। চর্যাগীতিকোষবৃত্তি তার চাইতে আলাদা।

চর্যাগীতিকোষবৃত্তিতে প্রাপ্ত পঞ্চাশটি পদের মধ্যে সিদ্ধাচার্য কাহু পা-এর পদ রয়েছে ১৩, ভুসুকু পা ৮, সরহ পা ৪, কুস্কুরী পা ৩, শবর পা ২, লুই পা ২, ধাম পা, জয়নন্দী পা, কঙ্কন পা, বিরুআ পা, গুওরী পা, চাটিল পা, কঙ্কলাধর পা, ডোম্বী পা, মহীধর পা, বীণা পা, আজদেব পা, ঢেণন পা, দারিক পা, ভাদে পা, তাড়ক পা এবং শান্তি পা'র ১টি করে পদ রয়েছে। টীকায় সিদ্ধাচার্যদের পূর্ণ নাম রয়েছে। যেমন—কাহু পা—কৃষ্ণাচার্য পাদা বা কৃষ্ণবজ্রাচার্য পাদানং ইত্যাদি।

মূল সংকলনের একশতটি চর্যার বাকি পঞ্চাশটি চর্যার রূপ কী ছিল এবং রচয়িতারা বা কে কে ছিলেন তা জানা যায়নি। ধারণা করা যায় উল্লিখিত সিদ্ধাচার্য কবির ছাড়াও টীকায় উল্লিখিত নাগার্জুন পা, হেবজ্র পা, চর্যা পা, দউড়ী পা, রতীবজ্র পা, বিরুপাক্ষ পা, মীননাথ পা, তিলো পা প্রমুখের রচিত চর্যা সংকলনে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু টীকায় তাঁদের রচিত সম্পূর্ণ চর্যার উদ্ধৃতি নেই। অন্যান্য ব্যাখ্যার সাথে কেবল প্রাসঙ্গিক অংশ, বিক্ষিপ্ত কোনও পংক্তি বা মাত্র এক বা দুই শব্দের ইংগিতে সেসব চর্যার চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে।

যেমন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহ্ন পা

১. এহু সে দুধরণ ধরণিধরসম বিষম উত্তারণ পাবই ।
ভণই কাহ্ন দুল্লভ্যাদূরবগাহ কো মণে পরিভাবই॥
২. লোঅ গবর সমুবহই হউ পর মথে পবীণ ।
কোডিঅ মঝে একু জই হোই নিরঞ্জন লীণ॥
৩. এহু সো গিরিবর কহিঅ মই এহু সে মহাসুহ ঠাব ।
একুর অহণি মহু সহজখণ্ড লব্ভই মহাসুহ জাব॥
৪. জহি মণ পবণ গঅণ দুআরে দিঢ়তাল বিদিজ্জই ।
জই ত সুঘোর অন্ধারে মণি দিব হো কিজ্জই॥
জিনণরঅন উআরে জই অম্বর চুপ্পই ।
ভণই কহ্ন ভব ভুঞ্জন্তে নিক্বাণ বিসিসসই॥
৫. এবংকার বীঅলই কুসুমিঅ অরবিন্দ ।
হো মহুঅররপং সুরঅবীর জিংঘই মঅরন্দ॥
ভণই কাহ্ন মণ কহবি ণ ফিটই ।
নিচল পবণ ঘরণি ঘরে বটুই॥
৬. জো সংবেঅন মণ রঅণ অহরহ সহজ ফরংগে
সো পরজানই ধর্মগই অণুকিমু নঅ কহুই॥
৭. একু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত ।
নিঅ ঘরণী লই কেলি করন্ত॥
নঅঘরে ঘরণী জাব ণ মজ্জই
তাব কী পঞ্চবাণু বিহরিজ্জই—দোহা
৮. জেঁ বুঝিঅ অবিরল সহজ ক্ষণু ।
৯. পহ বহন্তে নিঅমর বান্ধনে ।
১০. সহ একু পব অচ্ছিত হিং ফুড় কাহ্ন পরজাণই ।
বহু সকাপম পটই গুণই বট কিম্পি ণ জানই॥
১১. বরগিরিকন্দর গুহির জণ্ড সঅল চিত্তুই ।
বিমল সলিল সোস জাইঅ কালগ্নি পই টই॥

সরহ পা

১. সুগ্ন করুণ জো পুণু জোছণ বেন বিকসই ।
নো ভবনো নিক্বাণে থক্কাই॥
অহবা কেবল করুণা ভাবই ।
জন্মসহস্রে মোকখ ণ পাবই ॥
২. জহি মণ পবণ ণ সঞ্চরই রবিশশি নাহি পবেশ ।
তহি বট চীঅ বিসাম করু সরহে কহিউবেস ॥
৩. কো পত্তিজ্জই কসু কহমি অজ্জ কত্তাই অ আউ ।
পিঅদংসণে হলে ণ টেলসি সংসাসযড জাউ ॥
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~~~~~

৪. কুলিশ সরোরুহ সংজোএ জোইনি ।
মণ পবন মহাসুহ হোই
খণে আনন্দ ভেঅত গহ লখ লখ হীন তহি পরিমানহা ।
৫. ঘরনিঞে পরবিস খজ্জই ।
৬. ঘরবিতো খজ্জই সঙ্গি রজ্জই ॥
ণ ঠো রাঅ বিরাঅনি ।
অকুল ণদ্বী চিত্তা ভট্টী জোইণী
সো পতিদাস ।
৭. গংভীর অই উআণস উপরণো অপ্যাণ ।
সহজানন্দ চউজ্জহ লুণিঅ সংবেঅণ জান ॥
৮. জং দিচ চিঅ বিলোঅ ।
টাউ পবণে সমরস হোহী ॥
ইন্দি ষঅ অউআ সন্ধিঅ ।
অন্নে কিসমে সংবোহি ॥
৯. ঘর আছন্তে মা জাঙ্গ বনে ।
১০. গ তং বাএ গুরু কহই ।
১১. ইন্দিঅ জতু বিলীঅ গই...
১২. চিঙে শশরমিত...
১৩. চিত্তাচিত্ত পরিহর
১৪. অহো গটে ... মত্ত গ তত্ত গ
১৫. অঙ্গে পছেমি
১৬. ন তং বাএ গুরু কহই
১৭. মহামায়া দেবী
১৮. মর মর
১৯. জথে তথেবি
২০. যামই

মীননাথ পা

কহংতি গুরু পরমার্থের বাট ।
কর্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট ॥
কমল বিকসিল কহিহ গ জমরা ।
কমল মধু পিবিবি ধোকে গ ভমরা ॥

তিলো পা

সসং বেঅন তণ্ডফল তিলোপাএ ভণত্তি ।
জো মন গোঅর গোইয়া সো পরমথে ন হোত্তি ॥

চর্যা পা

খালত পড়িলে কাপুৰ নাশউ (নাশয়ে)
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউড়ী পা

এতে পঞ্চ যংন্তি মোহতটিনীপারমিত
অদূরে দূরে বে

নাম না জানা

১. ভব ভুঞ্জই গ বাস সই রে অপূব বিণাণা ।
জেব বিলোঅর বান্ধন বিজোইর মেলা গা ॥
২. ঘটমণ ঘুমা খড়দতি বোহঅ ।
অক্ষি বুঝিআ মাগ চালী ॥
৩. জিন জলমঝেঁ চন্দ স হি নোস ।
৪. ঘুমই গরুণহ ভক্ষণে

মুনিদত্তের টীকায় উল্লিখিত অন্যান্য চর্যাকারের নাম, রতীবজ্র পা, শ্রী সমাজ পা, নাগাজ্জুন পা, শ্রী হেবজ্র পা, চাগম পা, হেরুক পা, চর্যা পা, দড়তী পা, সুতক পা, বিরুপাক্ষ পা, মীননাথ পা, দবড়ী পা, ধোকড়ী পা, ইউড়ী পা, তিলো পা, অদয় বজ্র পা, লীলা পা, স্থগণ পা, মৈত্রী পা ইত্যাদি, শাস্ত্রী উল্লিখিত পুরু ভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান পা, মাতৃচেট পা, বৈরোচন পা, নাড় পণ্ডিত পা, মহাসুখতা বজ্র পা ।

সুনীতিকুমার দৌহাকে বাংলায় রাখেন না যদিও শাস্ত্রী দৌহা ও ডাকার্নব হাজার বছরের পুরান বাংলা বলেছেন ।

তিন

চর্যাপদের এই সাড়ে ছেচল্লিশটি গীত এবং টীকায় প্রাপ্ত চর্যার শব্দসম্ভার হল ২২০০টির কাছাকাছি, অবশ্য একই শব্দের একাধিক ব্যবহারের হিসেব বাদ দিলে অন্ততপক্ষে ১৬৬০টি । এই শব্দগুলো তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, তৎসম, তদ্ভব, দেশি-বিদেশি । হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শ্রেণীকরণ হল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা । তিনি এদের ৩০% সংস্কৃত, ২৫% প্রাকৃত, বাকি ৬০% ভাগ বাংলা ধরেছেন, কিন্তু অনেকের মতে সংস্কৃত ১০%, সংস্কৃতজ ৮৬% এবং বাকি ২% অন্যান্য । সংস্কৃত শব্দ যেমন—অঙ্গ, অঙ্ক, কমল, করুণা, সরোবর, হরিণী ইত্যাদি ।

সংস্কৃতজ শব্দ—অকিলেসেঁ (অক্রেশে), অধরাতি (অধরাত্রি), কবড়ী (কপর্দক), কাপুর (কপূর), চউকোড়ি (চতুষ্কোটি) ইত্যাদি ।

অন্যান্য শব্দ—আলাজালা, আলো, এড়িএউ, করন্ত ইত্যাদি । কিছু শব্দের সঠিক অর্থ পাওয়া যায়নি, আবার চর্যার বানান ও উচ্চারণে স্বরধ্বনির ব্যবহারে শৈথিল্য রয়েছে, হ্রস্বের প্রবণতা, তবে দীর্ঘস্বরের প্রবণতাও আছে । যেমন—হরিণ-হরিণী, আবার গ জানী—এখানে ‘গ’ এবং দীর্ঘস্বর । লইঅ, লইআ, কিন্তু সুন-শুন, সসি-শশি দেখা যায় ।

যুগ্মস্বর ও যুক্তবর্ণ দেখা যায়—চউদিস, চৌসঠাঠি; গইরামণি-নৈরামনি ।

অন্তঃস্থ য এবং অন্তঃ ব অ স্বরে, যেমন—কাঅ (কায়), ভাঅ (ভাবে), ত্রিঅন (ত্রিভুবন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ ধ্বনির লোপ, যেমন—গঅন (গগন), বিআর (বিচার)। সমীভবন বেশি, যেমন—সুজ্জ (সূর্য), পুণ্ণ (পুণ্য)। যুগ্ম ব্যঞ্জনের বর্ণ লোপ, যেমন—অট (অষ্ট), সুন (শূন্য), বুধ (বুদ্ধ)। মহাপ্রাণ বর্ণ অনেক সময় ঘোষ হ বলে ব্যবহৃত। সুখ (সুহ) দাহিণ (দক্ষিণ), মেহ (মেঘ); ক্ষ বর্ণ ছ বর্ণে ব্যবহৃত, ছুধ (ক্ষুধ), ছার (ক্ষার); স্বরভক্তি যথেষ্ট পরিমাণে, যেমন—পরাণ (প্রাণ), ভখঅ (ভক্ষণ করে), রঅণ (রত্ন); অনুস্বারের জন্য চন্দ্রবিন্দু, মাঁস (মাংস), ও এর জন্যও চন্দ্রবিন্দু, সাঁকমত-সাক্ষমত।

বিভক্তিয়ুক্ত এবং বিভক্তিহীন বিশেষ্য পদ দেখা যায়, ঠাকুরক (ঠাকুরকে), তিঅদাএ (ত্রিধাতুতে), বিভক্তিহীন—সুহ (সুখ) অ; সাস (উ)। একবচন দ্বিবচন বহুবচনে বিভক্তির ব্যবহার নেই, উঞ্চা উঞ্চা পাবত। লিঙ্গের ব্যবহার রয়েছে, সবরী বালা, নিসি আন্ধারি, নিঘিন কাহু (বিশেষ্য পুং বিশেষণ পুং)। কারকের ক্ষেত্রে কর্তৃ—লুই ভণই, কর্ম করণ সম্বন্ধে অধিকরণে বিভক্তিহীন, তবে উল্লেখযোগ্য বিভক্তি—এ, ঐ, ই, ক, কে, কু, র, এর, রা, রে, এরে, রৈ, রি, এরী, তো, তে, এতে, হি, হ, হুঁ। ব্যবহার—এ, এ

কর্তৃ—কুঞ্জিরে খায়; কর্মে—সুনে অহারিউ, করণে—কুঠারৈঁ ছিজঅ, অধিকরণে—ডোষী ঘরে লাগেলি।

ক কে—

কর্মে—ঠাকুরক, ছান্দক বান্ধ।

র, রা, রে, এরে ইত্যাদি—

কর্মে, তোহোরে, সম্বন্ধে, হাড়েরি হাড়ে।

ত, তে, এতে ইত্যাদি, অপদানৈ—তরঙ্গতৈঁ, মাঙ্গত।

হুঁ, হি, হিঁ, হু ইত্যাদি

অপাদানে—খেপহুঁ, খলহিঁ

সম্বোধন—হ্যালো, আলো, বপা, লো, রৈঁ ইত্যাদি

বাহিরি রৈঁ।

সর্বনামে কারক বিভক্তির ব্যবহার

ব্যক্তি—তে, তিনি, তে, তিনি;

নির্দেশক—‘এ’ বন চ্ছাড়ী;

সংযোজক—সো করউ;

উত্তম পুরুষের রূপ—

কর্তা—হাঁউ, মো, আশ্বে, আসহে;

মধ্যম—তু, তঁই, তো, তুক্ষে;

প্রথম পুরুষ—স, সে, সো, তে

উত্তম

মধ্যম

প্রথম

কর্ম—মই, মোত্র, ম

তোএ, তুক্ষে

ত, তা, সো

করণ—মোত্র, মোহে, মো

তো, তঁই

তই, তঁই

সম্বন্ধ—মো, মোহোর, মোর

তো, তোর, তোহোরি

তা, তাহের, তসু

অধিকরণ—মোহে

তোহি, তঁহি

তহি, তঁহি

প্রশ্নবোধক সর্বনাম—

কর্তা—কে, কেহো, কোই, কিম্পি

কাহি, কিম্পি, কো, কি, কা কীম

সম্বন্ধ—কাহি, কাহেরি

অধিকরণে—কহি, কাসু, কা

পারস্পরিক—জিম জিম তিম তিম

ক্রিয়া—ও ডি বি এল অনুসারে ১৫০০ ধাতুরূপের প্রচলন রয়েছে, তবে বাংলা ধাতুরূপ ২৩০ ধরা যায়। যেমন—অহ (থাকা), কর, কহ, চড়, যা, গ (গম) ইত্যাদি।

ক্রিয়ার কাল—

বর্তমান—উত্তম-ম, মি (এক), হ, অহ (বহ)। মধ্যম-সি, লী (স্ত্রী) এক; হ, হ (বহ)।

প্রথম ই অ অই (এক), ত্তি (বহ)

অতীত—উত্তম-ইল, ইলি

মধ্যম—ইলে, এসি প্রথম—ইল, ইলা

ভবিষ্যৎ—উত্তম-ইব, খাইব,

মধ্যম—হোইব প্রথম—লোড়িব

অসমাপিকা—ই ইআ, কে, বা, অন্তে, ইবে, যেমন—দুলি, দেখইআ, অচ্ছন্তে

বাংলা তিন প্রকার ক্রিয়ার ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়, নির্দেশক—কাতা তরুণবর;

অনুজ্ঞা—মহাসুহ পরিমাণ; সংযোজক—জিম জিম ক্রিয়া... ... তিম তিম তথতা।

বাংলা বাচ্যের দৃষ্টান্ত, কর্তৃ—সসুরা নিদ গোছ, কর্ম—চঞ্চল চিএ; ভাববাচ্যে—জৈণ তুটঅ, অবনা গমণা।

হৃদ বিচার

হৃদ বিচারে চর্যাপদে হৃদ শিখিলে, তবে উচ্চারণ ও গঠন রীতির একটা পরিচয় মিলে। গীত রীতির মত চর্যায় জাতি বা মাত্রাবৃত্ত হৃদ কলামাত্রিক, পরিমাপ এক কলা; রুদ্ধদল দুই কলা।

কাহেরী ঘিনি মেলি অচ্ছ কীস

বেড়িল ডাক প ড়অ চৌ দীস

ষোল মাত্রার সমিল, প্রতি চার মাত্রায় লঘুগতি; অনেক সময় দুটি পর্ব মিলিত হয়ে—

দিড় করিঅ মহা সুহ পরিমা গ

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জা গ

দুই পংক্তিতে প্রথম আট মাত্রার বিন্যাস।

ষোল মাত্রার পাদাকুলক—

দুলি দুহি পিটা ধরণ গ জাই

রুখে র তেত্তলি কুষ্ঠীরে খা অ

চর্যাপদ ছত্রিশটি পাদাকুলক ছন্দে রচিত, একটি বারমাত্রা যেমন—

সুনে সুন মিলিএ জবেঁ

সম্মল ধাম উইআ তবেঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকি দশটিতে দোঁহা অথবা অন্যছন্দ রয়েছে, গীতগুলো সমিল পদ্ধতিতে রচিত। তবে সাড়ে ছেচল্লিশটির আটত্রিশটি দশ পংক্তির, দুটি বার পংক্তির ও দুটি আট পংক্তির, বাকিগুলো চৌদ্দ পংক্তির। খণ্ডিত গীতটি ছয় পংক্তির পাওয়া গেছে। প্রত্যেক গীতের দ্বিপংক্তি শ্লোকের শেষে ধ্রু বা ধ্রুপদ রয়েছে। গীতগুলো কোন রাগে গীত তার নির্দেশ রয়েছে শিরোভাগে, রাগগুলো হল—অরু, কামোদ, কহুগুঞ্জরী, গউড়, গবড়া, গুড্ডরী, দেবক্রী, দেশাখ, ধনসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাবী, বলাড্ডী, ভৈরবী, মল্লরী, মালসী, মালসীগবুড়া, রামক্রী, শবরী। কতকগুলো রাগ এখনও জনপ্রিয় রয়েছে।

চর্যার চরিত্র

চর্যাগীতিতে যেসব বিষয় ও স্থানের নাম পাওয়া গেছে তা আমাদের প্রায় পরিচিত, তবে সিদ্ধাচার্যরা তাত্ত্বিক আদর্শে এ গীত রচনা করেছেন বলে মরমি বোধ, ইংগিত ও সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার বেশি। ধর্মীয় বোধ ও বিষয়—যেমন মহাসুহ বা নির্বাণ লাভের নানা উপায় তাত্ত্বিক আচারে বর্ণিত। দেহ ও মনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে মহামুদ্রা ইত্যাদি যৌগিক প্রক্রিয়া 'সাক্ষ্য ভাষা'তে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—আলিকালি = শ্বাসপ্রশ্বাস; বৈশাখী = ইড়াপিঙ্গলানাড়ী, গঙ্গা = যমুনা-গ্রাহ্য গ্রাহক; শূন্যকরণা = গ্রাহ্যগ্রাহক; নৌকা = মহাসুখকায়; মুষা = চিত্তপবন, শবর শবরী = জ্ঞান ও শূন্য; হরিণা = ইন্দ্রিয়-চিত্ত ও নৈরাশ্রা; ডোম্বী : গুক্রনাড়ী, শূন্য = জ্ঞানমুদ্রা ইত্যাদি।

চর্যায় কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনের ছবি রয়েছে। নদীতীরে বসতি বলে নৌকা চালনা, নৌকার হাল, লগি, গলুই, পলি, গুণ, নোঙর, বৈঠা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা গ্রামের কেন্দ্রে আর নিম্নবর্ণের ডোম চঙাল শবর ইত্যাদি গ্রামের প্রান্তে বাস করত। মাঝি, তাঁতি, ধুনুরী, হরিণ শিকারি, কাঠুরে, ডালাকুলা তৈরি ইত্যাদির কথা আছে। স্ত্রীলোকরা যারা অন্তজ-নৃত্য গীত মদ তৈরি করত।

বারাঙ্গনাপনাও জীবিকার উপায় ছিল। যাদের সম্পদ সোনাদানা ছিল তাদের চোর ডাকাতির ভয় ছিল। যুবতী স্ত্রী নিয়ে নদীপথে গমনকালে দস্যুরা লুট করে নিয়ে যেত। গয়নার ভেতর নূপুর, কঙ্কন, মুক্তাহার, কুন্তল, কানেট দর্পণ ইত্যাদির ব্যবহারের কথা আছে। কর্পূরের সুবাস, তাম্বুলের ব্যবহার বিলাসও ছিল। সে যুগে বিয়েতে ধুমধাম দুন্দুভি অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র, মাদল বীণা তারযন্ত্রের ব্যবহারও দেখা গিয়েছে। বিয়েতে যৌতুক ছিল, ত্রিতল বাড়ি থেকে কুড়েঘরের বর্ণনা আছে, গাই, বলদ, হাতি, পোষা জন্তু ছাড়াও সিংহ, হরিণ, শিয়াল, খরগোসের উল্লেখ আছে, নদীতে কুমীর ছিল মনে হয়, পাখির ভেতর কাক কোকিল, ময়ূরের নাম দেখা যায়। শস্যক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব ছিল, কার্পাস ফুল বা কার্পাস থেকে সুতো ও বস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। মেয়েদের সতীত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হত, মদ্যপান ও মস্ততার প্রভাব ছিল। গঙ্গা যমুনা নদীর নাম। পদ্মাকে একটি খাল বলা হয়েছে, গীতগুলো পড়লে নদীমাতৃক বাংলা কিংবা পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে পড়ে।

চার

চর্যাপদের ভাষা বাংলা, না অন্য ভাষা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন এতে কোনও সন্দেহ নেই, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কারের পর দীর্ঘদিন ধরে তা নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরে প্রমাণ করেন যে এগুলো প্রাচীন বাংলাতে লিখিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত *ওড়িবিলা* গ্রন্থে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে ১৯২৬ সালে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে এগুলো প্রাচীন বঙ্গভাষাতেই রচিত এবং অন্যান্য ভাষার প্রাচীন রূপ প্রতীয়মান হবার কারণ চর্যাপদ রচিত হবার কালে ঐসব ভাষার উৎস এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদ বিষয়ে ফরাসি ভাষায় গবেষণা করে ১৯২৮ সালে ডিগ্রি লাভ করেন। তাতে করে গীতগুলোর একটি পাঠান্তর দেখা দেয়। এরপর প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তি ভিন্সু শাস্ত্রীর মিলিত প্রয়াসে চর্যাগীতির তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে আর একটি পাঠ দেখা দেয়। এর ভেতর হারানো গীতগুলোর অনুবাদসহ একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর পর সুকুমার সেন এক জাপানি অনুবাদের ভিত্তিতে গীতগুলোর প্রায় তিনুধর্মী পাঠান্তরসহ ১৯৬৬ সালে এক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অহমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের দাবি

ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা ১৯৮১ সালে আসামের আদিযুগের সাহিত্য হিসেবে চর্যাপদের নাম উল্লেখ করেন। কয়েকজন সিদ্ধাচার্যকে আসামের বৌদ্ধসাধক বলে দাবি করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা তৎকালে আসামেই হতো বেশি। ড. পরীক্ষিত হাজরা ১৯৭৩ সালে চর্যাপদ বিষয়ে একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সবগুলো চর্যাই আসামের কামরূপ কেন্দ্রিক বলে দাবি করেন।

ওড়িয়াতে চর্যাপদ

ড. খগেন্দ্র মহাপাত্র চর্যাগীতিকা নামে ১৯৬৫ সালে একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি সম্পূর্ণভাবে এ গীতগুলো ওড়িয়া ভাষায় রচিত বলেন নি, কিছু গীতে ওড়িয়া প্রাধান্য বলেছেন। তবে ১৯৭৯ সালে *প্রভু ওড়িয়া* নামে আর একটি ব্যাকরণধর্মী গবেষণা-গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে এগুলো প্রাচীন ওড়িয়ারই সম্পত্তি। এরপর ড. করুণাকর করের 'আশ্চর্য চর্যাচর্য' নামে একটি ডি লিট গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে এগুলো প্রাচীন ওড়িয়াতে রচিত। মূলত ওড়িয়া সাহিত্যের সকল ইতিহাস লেখক চর্যাপদকে সে সাহিত্য ও ভাষার আদিরূপ বলে থাকেন।

মৈথিলিতে চর্যাপদ

মৈথিলি ভাষাতে চর্যাচর্য রচিত হয়েছে—এটা চর্যাপদ আবিষ্কার হবার আগে ও পরে সকলের ধারণা ছিল। এমনকি নেপালি লিপিকররা এ ধারণা নিয়ে শত শত বছর ধরে চর্যাপদের পুঁথি তালপত্রে খোদাই করেছেন। এ ধরনের লিপিকর বংশপরম্পরা এ কাজ করেছিল। তবে এ সম্বন্ধে কোনও গবেষণা পুস্তক রচিত হয়নি। ড. জয়কান্ত মিশ্র মৈথিলি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~www.amarboi.com~

সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ১৯৪৯ সালে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন চর্যাপদ মৈথিলি ভাষারই প্রাচীন সম্পদ এবং বাঙালি গবেষক ও গ্রন্থকারদের এই স্বেচ্ছাচারি দাবিকে হাস্যাস্পদ দাবি বলে মন্তব্য করেন।

হিন্দিতে চর্যাপদ

হিন্দিতে চর্যাপদের আলোচনা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ বিষয়ে একাধিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যেগুলো নিতান্ত আবেগ কিংবা অযৌক্তিকভাবে রচনা করা হয়নি। বিহার বা মগধই ছিল চর্যাকারদের বিচরণ ক্ষেত্র এবং বৌদ্ধ শাসনের পীঠভূমি। নালন্দাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানীগুণীরা এখানে অবস্থান করে তাঁদের সুকৃতি ও প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বাংলার গৌরব অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত চর্যাও হালে পাওয়া গেছে। তিনি অবশ্য চর্যার যুগের নন, পরবর্তী কালের ছিলেন এবং তিব্বতে তাদের সর্বশ্রেম ধর্মগুরু হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৪৫ সালে হিন্দি কাব্যধারা গ্রন্থে অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের রচিত এ চর্যাপদ স্পষ্টভাবে হিন্দি ভাষাতে রচিত বলে দাবি করেন, তবে সিদ্ধাচার্যদের ভেতর লুই, সরহ, বিরুপা, দারিক প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে দোঁহাকোষ নামে আর একটি গ্রন্থে কাহু ও সরহের বৈদিককোষের পুঁথির বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের রচিত চর্যাকে একই পর্যায়ে আনেন করেন। ১৯৪৫ সালে ধর্মবীর ভারতী সিদ্ধসাহিত্য বা চর্যাগীতের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তিনি স্পষ্ট দাবি করেন চর্যাপদ প্রাচীন হিন্দি ভাষাতে রচিত।

চর্যাগীতি নিয়ে কোনও কোনও ইয়োরোপীয় পণ্ডিত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তার ভেতর *Per Kvaerne, An Anthology of Buddhist Tantric Songs : A Study of Caryagiti* নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে চর্যার রূপকল্প, তিব্বতি অনুবাদ এবং মুনিদত্তের ব্যাখ্যার সারগর্ভ আলোচনা করেছেন, কিন্তু চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষাতে রচিত একথা বলেন নি।

বিশ্বভাষায় চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলার আদি এমনই এক বিশেষ সম্পদ, যাকে শিল্পতরু বলা যেতে পারে। যার মূল, শাখা-প্রশাখা এবং ফলাদি বিশ্বের উর্বর ভূমিতে উগ্ধ হয়ে সম্পদ সৃষ্টি করেছে। সে সব বিশিষ্ট অঞ্চলের ধর্মীয় অভিব্যক্তির উৎসও হয়েছে। ক্রমশ বিশেষজ্ঞ মহল এ বিষয়ে অনুভব করেছেন যে, চর্যা এক ধরনের শক্তি, গুরুর মত যার মরমিবোধ বা আধ্যাত্মিকতা এবং তাত্ত্বিক আদর্শ কেবল ভারতীয় ভূমির ধর্মের আশ্রয় মূল চেতনার সঙ্গে জড়িত নয়, ভারতের বাইরেও এর প্রভাব ছড়িয়েছে। তা বৌদ্ধ ধর্মীয় চিন্তা ও দর্শন, আদর্শ ও জীবনবোধ লোকমানসের তরীতে সওদা বয়ে নিয়েছে। যে যে দেশে চর্যা সমাদৃত হয়েছে সে দেশের ভাষা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চর্যার তাত্ত্বিকতা বা ধর্মীয় প্রেরণা উজ্জীবিত হয়েছে। ভারতের বাইরে তিব্বতে চর্যা মহান গুরু আসন পেয়েছে। তিব্বতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

কেন, চীন, জাপান, মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় উপলব্ধির সঙ্গে চর্যার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। সেসব দেশে চর্যাপদ শুধু তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে নয়, ভাষাতে অনূদিত হয়ে ব্যাপক আত্মদিত হয়েছে। তিব্বতি ও জাপানি ভাষায় অনূদিত চর্যাপদ আমাদের হাতের কাছে রয়েছে। সম্প্রতি মোঙ্গলীয় ভাষায় অনূদিত চর্যাপদও আবিষ্কৃত হয়েছে। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও তিব্বতি তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক Per Kvaerne ১৯৭৭ সালে *An Anthology of Buddhist Tantric Songs : A Study of Caryagiti* নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর চর্যাপদ সম্বন্ধে অনেক চমকিত তথ্য বেরিয়ে আসে। বৌদ্ধ শ্রমণাচার্যরা যারা চীনে জাপানে বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চর্যাপদ গিয়েছে অনেক পরে। সেসব দেশের বিশেষজ্ঞমহল যখন আকরভূমি ভারতবর্ষে আসেন এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় আদর্শগুলো নিয়ে যান, অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও তাঁদের আমন্ত্রণে সেসব দেশে গিয়েছেন, ক্রমান্বয়ে চর্যাপদও গিয়েছে। মোঙ্গলিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়ায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা হয়েছিল, ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ধরনের পুঁথির অনুবাদ ব্যাপকভাবে এ সব ভাষাতে হয়েছে। মোঙ্গলীয় বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি অবশ্য তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম, কারণ ১০৭৮ সালে এক তিব্বতি লামা আশঙ্কিত হয়ে মোঙ্গল রাজ আলউৎস খানের আগ্রহে এই দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের দেশে যান এবং বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। সেসময় সমগ্র মোঙ্গলিয়ায় রাজনির্দেশে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়। এর পর মোঙ্গলীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতে গিয়ে ধর্মতত্ত্বের যাবতীয় সামগ্রী স্বদেশে নিয়ে আসেন। তিব্বতি অনুবাদের চর্যাপদ তৎসঙ্গে ছিল। ক্রমে মোঙ্গলীয় ভাষায় চর্যাপদ অনূদিত হয়। সম্ভবত একই চর্যাপদের কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ সূচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয় ও গীতাঞ্জলির উৎসাহে কোরিয়ানরা খুবই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং অনুভব করেন যে বাঙালির এ পদ মাধুর্য ও গাম্ভীর্য তারা বহু বছর থেকেই আপন ভাষাতে পেয়েছেন। চর্যাপদের কোরিয়ান অনুবাদের সঙ্গে গীতাঞ্জলির অনুবাদ তারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে আত্মদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন কোরিয়ায় যান তখন তাঁকে আন্তরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তখন তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন কোরিয়ার জন্য একটা গান রচনা করে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, বর্তমানে কোরিয়ার জাতীয় সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথের রচিত সেই গান। পৃথিবীর কোনও কবির রচনা তিনটি দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে, এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এখানে বাঙালি অতীশ দীপঙ্করের নাম উল্লেখ্য। ঐ বাঙালি মনীষী তিব্বতে এখনও বুদ্ধের পরের আসন অধিকার করে আছেন—মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি সমাদৃত। তাছাড়া চর্যাপদের সঙ্গে তাঁর রচিত চর্যাও তিব্বতে পরম আদরে গৃহীত হয়।

ইরানে চর্যার স্বীকৃতি

ইসলামের সুফীবাদের উৎস ইরান। ইসলাম ইরানে প্রবিষ্ট হবার পরপর সেমেটিক আদর্শ অনেকটা বদলে ইরানে সুফীবাদের ইসলাম প্রাধান্য পায়। সুফী মতবাদকে ইসলামের তান্ত্রিক মতবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। এমন ভাবার জন্য ঐতিহাসিক কারণ যাই থাক, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শূন্যবাদের প্রতিক্রিয়া ইসলাম ধর্মে মিশে গিয়ে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ইরানে দুইভাবে এ মতবাদ প্রবেশ করেছে। এক, আবু রায়হান আল বেরুনি একাদশ শতকের আগে ভারতে এসে ভারতজ্ঞান আহরণ করে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ভারততত্ত্ব বা আল মাকলিল আল হিন্দ-এ বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে করে বৌদ্ধ শ্রমণ জীবন আদর্শ ও সাধনা—যা সুফীরা অনুকরণ করেন, বিশেষভাবে মুসলমান জীবনের ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল।

দ্বিতীয়, বৌদ্ধ প্রভাব ইরানের পূর্বাঞ্চলে ও আফগানিস্তানে ব্যাপক ছিল। এখনও বুদ্ধের বিশাল মূর্তিসমূহ পর্বতের গায়ে খোদিত রয়েছে। এ পূর্বাঞ্চলে সুফীবাদের প্রসারও ছিল প্রাথমিক দিকে ব্যাপক। অনুভব করা যায়, বৌদ্ধ শ্রমণ আদর্শ তাদের পূর্বপুরুষদের আচরিত জীবনবোধ থেকে সংক্রামিত হয়েছে।

জার্মান পণ্ডিত ভন হামার প্রমাণ করেছেন সুফীবাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপক আলখিল্লা পরিধান এবং খানকায় অবস্থান বৌদ্ধ শ্রমণদের চীবর ধারণ এবং সংঘ জীবনের সঙ্গে মিলে যায়। ৪৪ নং চর্যায়—

সুণে সুণে মিলিআ জবৈঁ

সঅল ধাম উইআ তবৈঁ

ইত্যাদি অনেক পদের চিন্তার সঙ্গে সুফী চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

লিপি ও চিত্র

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিকোষবৃত্তি নামক তালপাতার পুঁথিটি বর্তমানে কাঠমণ্ডু 'ন্যাশনাল আরকাইভস অব নেপাল' গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। পুঁথির সর্বশেষ পত্রাঙ্ক ৬৯। মলাট হিসেবে পৃথক কোনও পত্র ছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন আবিষ্কার করেন তার পূর্বে ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬ এবং ৭০ সংখ্যক পত্র হারানো গিয়েছে। মুনিদত্তের টীকা সংবলিত ৬৪টি পত্র রয়েছে, তাতে সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাপদ পাওয়া গেছে।

এই তালপত্রগুলো আকারে লম্বা ১২^৩/_৪ ইঞ্চি এবং চওড়া ১^১/_৪ ইঞ্চি। লিপিকর পত্রের দুদিকেই লিখেছেন, প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটি করে পংক্তি। মাঝের তিন পংক্তিতে প্রায় মাঝামাঝি অংশে এক ইঞ্চি ফাঁক দেওয়া আছে, সেখানে একটি ছিদ্র করে পত্রগুলো সুতো দিয়ে বাঁধার ব্যবস্থা রয়েছে। খুব সুচারুভাবে রক্ষিত হলেও এত বছরের মাজাঘষার জন্য কিছু অংশ নষ্ট হয়েছে। মনে হয় সমগ্র পুঁথির পৃষ্ঠা একই হস্তাক্ষরে (নেওয়ারি অক্ষরে লিখিত)। উজ্জ্বল কালো কালি ব্যবহার করা হয়েছে, কোনও মোটা ধাতব নিবের কলমে লিখিত, অক্ষর খুব যত্নের সঙ্গে সাজানো। চর্যাগীতি একশটি সংকলিত ছিল টীকাকার উল্লেখ করেছেন, তার ভেতর পঞ্চাশটি চর্যার টীকা সংবলিত এই ৬৯ কিংবা ৭০টি পত্র, তার ভেতর থেকে খুব সাবধানে সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যার লিপি নেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও অসাবধানে হয়তো কিছু চর্যার অংশ সামান্য না হয়ে টীকার অংশ চিত্রে এসে যেতে পারে।

তুলনামূলক লিপি বিবর্তনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি সংশ্লিষ্ট করা হল। এই লিপি অবশ্যই বাংলা অক্ষরে লিখিত সর্বাপেক্ষা পুরাতন। কিন্তু চর্যাপদের বাংলা অক্ষরে পাওয়া লিপির বর্তমানে এ নেওয়ারি লিপিতে পাওয়া চর্যাপদ আবিষ্কার হবার ফলে আমাদের ধারণা দৃঢ় হল যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আগে অবশ্যই বাংলা লিপির পুঁথিপত্র লিখিত হয়েছিল।

চর্যাগীতি রচয়িতা সিদ্ধাচার্যরা চৌরাশি সিদ্ধাচার্যদের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে, তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তালিকায় চর্যার সিদ্ধাচার্যদের অনেকের নাম পাওয়া যায়। ভুটানের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রজ্ঞাপারমিতায় রক্ষিত সিদ্ধাচার্যদের কাল্পনিক ছবি রয়েছে। এ ছবিগুলির রেখা ও বিন্যাস কিংবা অভিব্যক্তি অতি প্রাচীন অনুমিত হয় না। অজস্র বৌদ্ধ চিত্রের সঙ্গে এর সামঞ্জস্যের অভাব অনুভূত হয়। তবু বিভিন্ন সিদ্ধাচার্যের স্কেচ বা রেখা অঙ্কনের কৌশলে চর্যার মূল চিত্রার সংযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে।

মহাপুরুষ বা আচার্যদের শিরোস্তাসন বা ফারুহার যুক্ত চিত্র থেকে অনুমান করা যায় সিদ্ধাচার্যদের জন্য তা ব্যবহার করা হয়েছে; যাদের পেছনে ফারুহার নেই তাঁদের জন্য কী?

সিদ্ধাচার্যদের হস্ত মুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রার ব্যাখ্যা রয়েছে, রয়েছে পটভূমির তত্ত্ব যা চর্চার বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল মুক্ত।

AMARBOI.COM

১৯৭৬
১৯৭৭
১৯৭৮

১৯৭৯

চর্যাপদ

138 no page will show another poem by lui pa, 29 no poem

চর্যা-১ রাগ পটমঞ্জরী লুই পা

১৩৮ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চর্যাপদটি লুই পা রচিত। এটি পটমঞ্জরী রাগের।
১৩৮ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চর্যাপদটি লুই পা রচিত। এটি পটমঞ্জরী রাগের।
১৩৮ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চর্যাপদটি লুই পা রচিত। এটি পটমঞ্জরী রাগের।
১৩৮ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চর্যাপদটি লুই পা রচিত। এটি পটমঞ্জরী রাগের।

কাআ তরুবর পঞ্চ^১ বি ডাল ।
চঞ্চল চীএ পইঠো^২ কাল ॥ধ্রু॥
দিট^৩ করিঅ মহাসুহ পরিমাণ ।
লুই^৪ ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ধ্রু॥
সকল সমাহিঅ^৫ কাহি^৬ করিঅই ।
সুখ দুখেথে^৭ নিচিত মরিঅই^৮ ॥ধ্রু॥
এরিএউ^৯ ছান্দক^{১০} বান্ধ করণ^{১১} পাটের^{১২} আস ।
সুনুপাখ^{১৩} ভিড়ি^{১৪} লালুর আস ॥ধ্রু॥
ভণই লুই আমহে^{১৫} দিঠা^{১৬}
ধমন^{১৭} চমন বোনা^{১৮} বইঠা^{১৯} ॥ধ্রু॥

পাঠান্তর

১. পাঞ্চ। ২. পইঠা বা পইবঠা। ৩. দিট। ৪. লুই। ৫. সমাহিহি। ৬. কাহ। ৭. দুখেতে।
৮. মরিঅই। ৯. ছড়িঅই। ১০. ছান্দ। ১১. করণ। ১২. কপাটের। ১৩. সুনু পকখ।
১৪. ভিতি। ১৫. ঝানে। ১৬. দিইঠা। ১৭. ধবন। ১৮. বইন।

পাঠান্তর এসেছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধানত, প্রবোধ বাগচী-শান্তি ভিক্ষু ও সুকুমার সেন অনুকরণে কদাচ। ভিন্ন ভিন্নভাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করে ভারাক্রান্ত করা থেকে সংযত থাকা গেল।

শব্দার্থ ও টীকা

কাআ—শরীর, কায়া। কাআ তরুবর—কায়া রূপ তরু। পঞ্চবি—পাঁচটি। চীএ—চিতে;
চিতে—চিএ, চীএ। চঞ্চলচিত্ত—বৌদ্ধধর্মে চিত্ত চাঞ্চল্য হচ্ছে ভোগাকাজ্জ্বার কারণ, যা
বিনষ্টকারি, পইঠো—প্রবিশ্ট, পবিষা—পইঠো। কাল—শত্রু, ধ্বংসকারি, মৃত্যুদূত,
যেমন—কালসাপ। দিট—দৃঢ়। করিঅ—করে। মহাসুহ—মহাসুখ, বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকে

মহাসুখ বলা হচ্ছে; জন্মান্তরের কারণে বারবার ভব সংসারে এসে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, নির্বাণের কারণে জীবনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি, তাতে মহাসুখ বা বিলীন হয়ে যাওয়া।

ভগ্নই—ভগ্নে, রচনা করে; প্রাচীন কবির কবিতার শেষে বা যে কোনও ছন্দে নিজের নাম উল্লেখ করার সময় এ শব্দ ব্যবহার করতেন। গুরু—মন্ত্রগুরু, শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু, আচার্য। পুচ্ছিঅ—জিজ্ঞাসা করে; পুচ্ছিআ—সং-পুচ্ছ, হি. পুচ্ছ। জান—জেনে নাও। সমাহিঅ—সমাধি, চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক স্বরূপে অবস্থিতি, গভীর তনুয়তা। কাহি—কী করে, কী কী ভাবে; হি., কাহে। করিঅই—করে, করা যায়, করা হয়। দুঃখে—“” যুক্ত হওয়াতে অধিকরণ বা করণকারক, নিশ্চিত—নিশ্চিত। মরিআই—মারা পড়ে, মরে যায়। এড়িএই—এড়িয়ে। ছান্দক—ছন্দের, ছন্দা ক, চিত্তের বিভিন্ন প্রকার বাসনা, একটা আশা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হলে অন্য আশা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া, ছন্দে ছন্দে যে বাসনা। বন্ধ—বন্ধ। ছান্দক বন্ধ—ছন্দ (বাসনা) দিয়ে বন্ধ। করণক—করণ+ক, ইন্দ্রিয়গুলোর, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উৎপাত বা অনুভূতি। পাটের-পরিপাটের, পরিতৃপ্তির। আস—আশা। এড়ি—এউ... আস—মনের বাসনা ও শরীরের ইন্দ্রিয়জ পরিতৃপ্তির আশা ত্যাগ কর। সুনপাখ-শূন্যপাখা—বা শূন্যপক্ষে; শূন্যপক্ষ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মীয় শূন্যমার্গ, নির্বাণের পর বিলীন হয়ে যাওয়া, আর তাকে বলা হচ্ছে মহাসুখ। ভিড়ি—ভিড়ে, সুনপাখ ভিড়ি—শূন্যপক্ষে ভিড়ে যাও, শূন্যতার জন্য মনোনিবেশ কর। লাহ—লহ, নাও। পাস—পাশে, সঙ্গে বা সঙ্গ। অমহে—আমি। সানে—ইশারা দিয়ে সংজ্ঞায়, তেজস্বিতার দ্বারা (ছুরি বটিতে শান দেওয়া)। দিঠা—দিয়েছি। ধমন চমন—চন্দ্রসূর্য, সাংকেতিক অর্থ হল পুরুষবীর্য ও নারীর রজ; তাত্ত্বিকমতে শরীরের ক্ষিতিতে অবস্থান করে, বেনি—দুই, পাণ্ডি—পিঁড়ি। বইঠা—বসেছি, হি—বইট। ধমন চমন... বইঠা—চন্দ্রসূর্য বা দেহের বৃদ্ধিক্ষয় অথবা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে পিঁড়ি করে বসেছি, ললনা রসনা ইত্যাদি নাড়ি ধ্যানযোগে বসেছি।

আধুনিক বাংলা

কায়া তরু তার পাঁচটি ডাল।
চঞ্চল চিত্তে প্রবেশিল কাল॥
দৃঢ় কর মহাসুখ পরিমাণ।
লুই বলেন গুরুকে ডেকে জান॥
সবই সমাধি হয় কী কী করে?
সুখ দুঃখে নিশ্চিতভাবে মরে।
ছন্দের বন্ধন এ শরীর পাটের আশা এড়িয়ে।
শূন্য পক্ষে তার পাশে যাওরে ভিড়ে॥
লুই বলেন আমি দেখি তা শান দিয়ে।
ধমন চমন দুই পিঁড়িতে নিজে বসিয়ে॥

গদ্যে রূপান্তর

দেহ হল তরুর মত, তার পাঁচটি ডাল অথবা পঞ্চ কন্ধের সমন্বয়ে গঠিত এ দেহ। এ দেহের ভেতর ভ্রূই রয়েছে চঞ্চল চিত্ত, যা তাকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু মহাসুখের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণে বা মহাসুখ লাভের জন্য দেহকে সুদৃঢ় করতে হবে। লুই বলছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে সেটা জেনে নাও। দেখ, কেমন করে সবরকম সমাধি হয়, সুখ দুঃখে নিশ্চিতভাবে মরে অর্থাৎ সুখ দুঃখ অতিক্রম করে। দেহের ছন্দের বন্ধন বা বাসনার ক্রমাগত উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি আশা এড়িয়ে শূন্য পক্ষকে ভিত্তি করে তার সমীপে নীত হও। লুই বলছেন, আমি দেহকে প্রদীপ্ত করে চন্দ্রসূর্য বা ধমন চমন নামক দুই পিঁড়িতে বসে দেখেছি তা।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

পঞ্চ স্কন্ধ ষড়্ ইন্দ্রিয় ধাবত বিষয় গ্রাহ্য গ্রাহক গ্রহণ উপলক্ষে শাখাপল্লবযুক্ত কায়াতরু নানা দুষ্টে আবিল। কাল সংবৃতি বোধিচিন্তা মৃগাঙ্ক শোষণার্থে প্রবিষ্ট যেন বিমল সলিল শোষণের জন্য কালাগ্নি প্রবেশ করে। যোগিবর সময় সংকেত দ্রব্য অপহরণে সদগুরু প্রজ্ঞা জ্ঞান অভিষেক দ্বারা দৃঢ় হয়ে মহাসুখ চতুর্থ আনন্দ পরিমাণ হয়েছেন। লুইকে জিজ্ঞাসা করে এ তত্ত্ব বা সর্বধর্মাবলম্বন রূপ সহজানন্দ সুখ অহর্নিশ কী তা জেনে নাও। দশকুশল পরিহার ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক নিবিষ্ট ভগবতে অভেদ তপস্যা সমাধিতে থাক। যাতে মহারাগ সুখ রহিত দুষ্কর পোষণ ক্রিয়া চিন্তা বিক্ষিপ্ত ধ্বংস করে সিদ্ধি লাভ হয়। পশ্চাৎছন্দ বন্ধ করণ শূন্যতা পক্ষে নৈরাশ্র্য ধর্মপাশে সীত হয়ে আলিঙ্গন কর। আদি সিদ্ধাচার্য লুই পা তাই বলছেন আমি সিদ্ধাচার্য লুই মনোবিজ্ঞান বিষয় ইন্দ্রিয়বলয় থেকে দূরে ধ্যানে বসে বলছি ধবন শশীলীন চরণ বৃষ্টি শুদ্ধি কালাভাস স্বীয় অহংকারে উপবিষ্ট হয়েছি।

সমীক্ষা

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ পদ্ধতি দেহতাত্ত্বিক ভাবসাধনা। কতকটা তা হলেও এটি বৌদ্ধতাত্ত্বিক সাধন মন্ত্র। বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চ স্কন্ধ যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমতুল সে বিষয়ে ইংগিত রয়েছে। তবে সব সাধনা দেহ দিয়েই হয়ে থাকে কারণ দেহের ভেতরেই রয়েছে সব কিছু—ইন্দ্রিয়, চৈত্য, প্রাণ ও বোধি। তরুর ভেতর যেমন ফুল ফলপাতা পল্লব শাখা-প্রশাখা, দেহের ভেতর রয়েছে আত্মা, পাঁচ ইন্দ্রিয় বা পঞ্চ স্কন্ধ। কামনা-বাসনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলে কারণ বাসনার তাড়ায় মানুষ সবরকম অপকর্মে লিপ্ত হয়, আশার ছলনে ভুলে বিপথে পরিচালিত হয়। আবার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য দেহকে অপচিত করে দেয়। ফলে মানুষ এই দুর্ভোগ নিয়ে মরে। পুনরায় কর্মফলের পরিণামে বাসনার তাগিদে দেহ আবার জন্ম নেয়, আবার বেঁচে থাকে আবার দুর্ভোগ পেতে থাকে। এ দুঃখ কষ্ট জরা দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক তথ্য ও সত্য জেনে নিয়ে এ দেহকে ছেদন করে পরে তাকে শূন্য করতে হবে। কীভাবে তা হবে মন্ত্রদাতা লুই বলে দিচ্ছেন, ধমন চমনরূপ ক্ষয়বৃদ্ধি নামক আসনে বসে ধ্যান করে জেনে নিতে হবে এবং দেহ ঐসব মলমুক্ত হলে নির্বাণ সুখ অনিবার্য।

মানব জীবন ও মানব দেহের সঙ্গে পদকর্তা লুই দেহকে তুলনা করে একটা সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। মানব দেহের সঙ্গে একমাত্র বৃক্ষের তুলনা চলে। বৃক্ষের যেমন ডালা-পালা পাতা ফুল ফল এবং বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, মানব জীবনেরও তাই।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যাকার বৃক্ষের সঙ্গে মানবদেহ ও জীবনের তুলনা করে জীবনদর্শনের সুস্পষ্ট তাৎপর্য উদ্ধার করে দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্যরা যেহেতু ধর্মমত ও মন্ত্র দিয়ে লোকশিক্ষার উপায় ও অবলম্বন করে থাকেন ধর্মের আচার অনুযায়ী দেহের ভেতর যে সমস্যা তার একদিক কেবল দৃষ্টিপাতে রাখেন, দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ আকাজক্ষা কামনা বাসনা জরা মৃত্যু; তার পরও তাঁরা দেহের ভেতর অতৃপ্তি অনুধাবন করেন এবং বলেন, এক জীবনে তার শেষ নেই, বার বার জন্মগ্রহণ করে এ দুর্ভোগ পোহাতে হবে; তাই দুর্ভোগের কারণ এ বৃক্ষকে নিধন করতে পারলেই সমস্যার পরিত্রাণ। তবে এক কোপে গাছ কাটা যায়। এক কোপে দেহও কাটা যায়, তাতে গাছের ও দেহের মৃত্যু হবে, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। গাছ থেকে ফুলপাতা ইত্যাদি হয়তো নিঃশেষ হবে কিন্তু দেহ থেকে হবে না, কারণ দেহের ভেতর রয়েছে আত্মা, রয়েছে ইন্দ্রিয়াদির অতৃপ্তিজনিত সমস্যা, তাহলে দেহ তাতে নিঃশেষ হয় না। তাহলে কী রকম দেহ ছেদন চাই? এ রকম দেহ ছেদন বা মৃত্যু চাই যে মৃত্যুর পর আর দেহ জাগবে না দুঃখ যন্ত্রণা কামনা বাসনার মুখ চেয়ে, পঞ্চ স্কন্ধ হবে বিলুপ্ত। এই শূন্যতার মহাসুখ, তাতেই নির্বাণ লাভ হবে, আর কখনও পৃথিবীতে এসে বাস করতে হবে না।

কিন্তু দেহের অন্যদিকও রয়েছে যা চর্যাকার উদ্দেশ্য করেন নি, দেহ ছেদনবিহীন সাফল্য, এটা নির্মাণ সাফল্যের বিপরীত। জীবন সাফল্য তাকে বলা যেতে পারে এমন কি ধর্মের গতির ভেতরও হতে পারে, পঞ্চ স্কন্ধের ছাড়াই সার্থক জীবন কী হতে পারে না? যে বোধির প্রভাবে বুদ্ধ মানব জীবনের সার্থকতার নির্দেশ পান সেটাই তো মানবকল্যাণ। তাই দেহকে কি মানবকল্যাণে নিয়োজিত রাখা যায় না? রবীন্দ্রনাথ একখানে বলেছেন, আমার খুব মনে পড়ে আমি কোনও এক সময় গাছ হয়ে জন্মেছিলাম। প্রভাত বায়ু যখন গাছের পত্রপল্লবের মর্মর ধ্বনি তোলে, বৃক্ষকে ফুলে ফলে শোভিত করে তখন আমার দেহের সমীরণের শিহরণ অথবা নিজের ভেতর এর প্রতিফলন অনুভব করি। তাই এই কবিতার একটা নান্দনিক ও দার্শনিক দিক হচ্ছে, গাছের চরিত্রের সঙ্গে মানুষের চরিত্রের মিল, আধুনিক চেতনায় তাই বলা যায়, গাছকে ছেদন নয়, বরং গাছের বৃদ্ধি ও পরিতৃপ্তিই মহৎ জীবনের উদ্দেশ্য, এই যুক্তি ধারণা কিন্তু বিপরীত পক্ষে হলেও এই কবিতার ভেতর তা উঁকি দিচ্ছে। বৃক্ষ মানুষের প্রতিবেশী, বৃক্ষ জগতের ভারসাম্য টিকিয়ে রেখেছে। মানুষ বৃক্ষের কাছে ধারে, বৃক্ষই সকল প্রাণের উৎস, সকলের আহার যোগায়। চর্যাকার কোন পিঁড়িতে বসে এই জীবন ও বৃক্ষের ছবি দেখছেন? তিনি উদ্ধারণ করেছেন, ধমন ও চমন; ক্ষয় ও বৃদ্ধি অথবা জীবনের উত্তি, কারণ পুংবীর্য ও নারী রজের মিলন আসনে বসে তা দেখছেন। জীবনের প্রথমে উত্তি, বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির চূড়ান্তে ক্ষয়ের শুরু, সর্বশেষে জরা এবং মৃত্যু। এই নিয়মকে তো ভঙ্গ করার উপায় নেই, এর কোন অবস্থায় ছেদন সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এমনই সুসংবদ্ধ নিয়ম, সিদ্ধাচার্যরা কেন ভাঙতে চান? তাঁরা তো মানবকল্যাণ ও জীবন মঙ্গলের চেতনায় আবদ্ধ হয়ে ধর্ম সাধনা করেন, তন্ময় চৈতন্য লাভ করেন বা তাঁরা সমাধিস্থ হন। জীবনের মঙ্গল নিহিত আছে জীবনের দুর্ভোগ সমস্যাগুলো এড়িয়ে যেতে পারলেই কেবল। জীবন সমস্যা দেখে কেউ কি উটের মত ঝড়ের সময় বালিরাশির ভেতর মুখ ডুবিয়ে ঝড়কে এড়িয়ে যাওয়া মনে করেছেন? সে কল্পনা আজ বলব, ধর্মের মঙ্গল আর জীবনের মঙ্গল সব সময় এক নয়। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

জীবনে সত্যও সব সময় একই নিয়মে ভাত হয় না। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ ছিল সত্যের উপলব্ধি অথবা যে বৃক্ষ ছেদনের জন্য সিদ্ধাচার্য বাণী উচ্চারণ করেছেন হয়তো বা সে সময়ের জন্য তা ছিল সত্য। কিন্তু বর্তমানে সত্যের আদর্শ অনুরূপ হতে পারে না। জীবনের বিকাশই হল এখন সত্য।

যে সত্যের অনুষ্ঠানে ধর্মের নিয়মে ইন্দ্রিয়ের বিনাশের কথা উচ্চারিত, সে ইন্দ্রিয় হচ্ছে জীবশক্তির মূলাধার। ইন্দ্রিয় যদি ভুল পথে পরিচালিত হয় তবে তা মানব জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। সে ইন্দ্রিয় মহৎ কার্যে নিয়োগ করতে হবে। আণবিক শক্তির ধ্বংসকারী দিকটার জন্য সবাই আতঙ্কিত, কিন্তু এর হিতকারী শক্তির দ্বারা জগতের মহৎ মহৎ ক্রিয়াকাণ্ড ও উন্নয়ন সম্ভব, সে দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, বিদ্যুত স্পর্শ জীবন হানিকর, তাই বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিলে বিশ্ব অন্ধকারে ডুবে যাবে। তাহলে যে ইন্দ্রিয় অনুভূতি একসময় কল্যাণ বিনাশী সে সত্য এখন আর নেই, এখন সত্যের অন্বেষণে সঠিক ইন্দ্রিয় শক্তির মঙ্গলময় যোগানই জীবনের মহাসুখের কারণ।



প্রেট ১ : লুই পা

লুই পা

সিদ্ধাচার্যদের ভেতর খুব সম্ভব লুই পা-ই প্রথম চর্যাপদ রচয়িতা। যোগতন্ত্রের নানা গ্রন্থে লুই পা'র উল্লেখ দেখা যায়, চর্যাকার লুই পা'র সঙ্গে অন্য কোন লুই পা'র মিল নাও থাকতে পারে অর্থাৎ চর্যাকার লুই ব্যবহৃত অন্য লুইয়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে লুই পা'র অপব নাম মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। অনেক পণ্ডিতের মতে এই লুই পা হলেন দুনিয়ার প্রাচীন এক হুণ্ড! ~~~~~

আদি সিদ্ধাচার্য (বর্ণন রত্নাকর)। মীননাথ নেপাল-বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত এবং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস-স্বীকৃত। আদি সিদ্ধা লুই এবং নাথপন্থীদের আদিনাথের বা মীননাথের অভিনুতা নিয়ে নানা মতপার্থক্য, নানা প্রশ্ন ও গবেষণা রয়েছে। চর্যার টীকা 'পরদর্শন' উক্তিযে রয়েছে, যা ২১ নং চর্যার সঙ্গে অর্থাৎ ভূসুকু পা রচিত নিসি অঙ্কারী মুসা অচারা, বা

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।

কর্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট।

কমল বিকসিল কহিহ গ জমরা।

কমল মধু পিবিবি ধোকই গ ভমরা। — মীননাথের উক্তি।

মুনিদত্ত টীকায় চর্যাকার লুই পা'র প্রতি প্রণতি এভাবে জানিয়েছেন যে,

দীনজন সমুদ্রকরণ কামোহি সিদ্ধাচার্য শ্রীলুইপাদং প্রণবিপ্রেরিতাবতারগাইং

তাতেও মনে হয় লুই পা সকল সিদ্ধাচার্যের গুরু। তিনি বাংলার রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, এটা ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি, লুই পাকে গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী বলা হয়েছে, তা যদি হয় মীননাথের সঙ্গে তার মিল নেই, মীননাথের বাড়ি দক্ষিণবঙ্গে আর তিনি ছিলেন গৌরক্ষনাথের গুরু। তবে অনেকে ধারণা করেন চর্যাকার লুই ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর বেঁচে ছিলেন। অবশ্য হিন্দিভাষীরা লুই পাকে মগধ বা বিহারের অধিবাসী বলে দাবি করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তার ভেতর 'তত্ত্বস্বভাব দোহাকোষ', 'অভিসময় বিভঙ্গ', 'বুদ্ধোদর-ভগবদ-অভিসময়', 'গীতসর্বস্ব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

138 page, 29 no poem

চর্যাপদের ভেতর তাঁর দুটি পদ পাওয়া গেছে, ১ম ও ৩৪তম পদ। এই দুই পদের ভাষা ও লক্ষ্যবস্তু প্রায় এক হলেও ভাববস্তু আলাদা। মনে হয় প্রথম পদ রচনার সময় তিনি যৌবন উত্তীর্ণ করেন নি, অথবা যৌবনের শেষ প্রান্তে, তবে ৩৪ নং পদে জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর অনীহা রয়েছে, হয়তো বা তা তাঁর শেষ বয়সের রচনা হতে পারে, তাই অনেকটা নিরাসক্ত বোধের দ্বারা ভারমুক্ত।

চর্যা-২
রাগ গবড়া
কুকুরী পা

total 3 poems by
the writer

দুলি^১ দুহি পিঠা^২ ধরণ ৭ জাই^৩ ।
 রুথের তেত্তলি^৪ কুমহীরে^৫ খাই ॥
 আঙ্গন^৬ ঘরণ^৭ সুন ভো বিআতী^৮ ।
 কানেট^৯ চোরী^{১০} নিল অধরাতি ॥
 সসুরা^{১১} নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ^{১২} ।
 কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ^{১৩} ॥
 দিবসই^{১৪} বহুড়ী কাউই^{১৫} ডর ভাঅ ।
 রাতি ভইলে কামরু জাএ ॥
 অইসন^{১৬} চর্যা কুকুরী পাত্র গাইড় এ^{১৭} ॥
 কোড়ি মাঝে^{১৮} একু^{১৯} হি অহি সমাই^{২০} ॥

পাঠান্তর

১. দুড়ি। ২. পীড়া। ৩. জাঅ। ৪. তিক্তি। ৫. কুষ্ঠীরে। ৬. অঙ্গন। ৭. ঘরয়ন। ৮. তো
বিআতী। ৯. কানট। ১০. সৌর্য। ১১. সুসুরা। ১২. জাগই। ১৩. মাগই।
১৪. দিবসহি। ১৫. কাড়ই। ১৬. অইসনী। ১৭. গাইল। ১৮. মঝে।
১৯. একুড়ি অহি। ২০. সমাইল, সমাইড।

শব্দার্থ ও টীকা

দুলি—কচ্ছপ, অপরিণত বোধিচিহ্ন। দুহি—দোহন করে (দুধ হচ্ছে বোধিচিহ্ন)।
পিটা—পাত্র, দেহের ভেতর ৩৬টি পীঠ ও নাড়ি নক্ষত্র, অবিদ্যা পীঠ। ধরণ ন জাই—ধরে
রাখা যাচ্ছে না। রুখের—বৃক্ষের, গাছের; বৃক্ষ>রকুখ>রুখ; রুখ হচ্ছে দেহ, পঞ্চ ক্লদ।
তেন্তুলি—তেঁতুল, বাসনা কামনা। কুমহীরে—কুমিরে, ইন্দ্রিয়াদি। আগ্নন—আঙিনা,
বোধিচিহ্নের ক্ষেত্র। ঘরপণ—ঘর সংসার। সুন—শূন্য, মহাসুখ। বিআতী—বিবাহিত স্ত্রী,
যে স্ত্রী বিয়ায় অথবা সন্তান প্রসব করে; অবধূতী। আগ্নন... বিআতী—আগ্নিনায় ঘর
সংসার আর শূন্য স্ত্রী (স্ত্রী নেই); এখানে রূপকার্থে ঘর সংসার যা তাতে শূন্য রূপ অবধূতী
রয়েছে, অর্থাৎ শূন্য নিরামণিকে স্ত্রী করে আঙিনায় ঘরসংসার পাতা হয়েছে।
কার্নেট—কর্ণভূষণ, কাণের অলংকার রূপকার্থে বধিরতা। চৌরী—চুরি গেল, চোর নিয়ে
গেল; প্রজ্ঞানন্দ চোর। অধরাতী—অর্ধেক রাতে। সসুরা—শ্বশুর; ভব সংসার ধারণকারী,
নিদ—নিদ্রা। বহুড়ী—বধু; পরিণতচিহ্ন। জাগঅ—জাগে। কা গই—তা গেল কোথা॥
মাগই—মাগে, খুঁজবে। দিবসই—দিবসে; চেতনা। কাউই—কাকের, কাককে; লৌকিক
নিন্দা। ভাঅ—ভীত। ভুইল—হলে। কামরু—কামরূপ, কামের দ্বারা রূপায়িত হতে,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

কামে আসক্ত হতে; নির্বাণে। আইসন—এইরূপ। গাইড—গাইল। কোড়ি—কোটি।
হিঅহি—হৃদয়; হৃদয়>হিঅতেড়>হিঅ, হিয়া। সমাইড—সমাইল, সামায়, প্রবেশ করে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

কচ্ছপ দুয়ে পায়ে ধরা না যায়।
গাছের তেঁতুল সবই কুমিরে খায়।
প্রাঙ্গণে ঘর সংসার স্ত্রী অবধূতী।
কানফুল চোরে নিল অর্ধরাতি।
শ্বশুর নিদ্রা গেলেও বউটি জাগে।
কানফুল চোরে নিল কোথা খোঁজ গো।
দিবসে বউটি তো কাককে ডরায়।
রাত হলে সে বউ কাম পেতে যায়।
এরূপ চর্যা কুকুরী পা গাইলে।
কোটির ভেতর একটি কেউ কী বুঝলে?।

গদ্যে রূপান্তর

কচ্ছপ দোহন করে ভাঁড়ে ধরা যাচ্ছে না, গাছের তেঁতুল সব কুমিরেই খেল। আঙিনা হল ঘর, শূন্য হল স্ত্রী। আধরাতে চোরে তার কানফুল নিয়ে গেল। শ্বশুর ঘুমিয়ে থাকলেও বধু জেগে থাকে। কানফুল যে চোরে নিয়ে গেল তা সে কোথায় গিয়ে খুঁজবে? দিনের বেলায় বউটি কাককে ভয় পায় অথচ রাত হলেই কাম সুখের সন্ধানে যায়। এমন চর্যাপদ কুকুরী পা গাইল যা কোটির ভেতর একজনও বুঝতে পারল কি পারল না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

অপরিণত বোধিচিন্তা দোহন করে অবিদ্যা পীঠে বা দেহের ভেতর ৩৬টি পীঠে ধরে রাখা যাচ্ছে না। পঞ্চ স্কন্ধ বা ইন্দ্রিয়াদি সকল কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনাশ করে দিচ্ছে। বোধিচিন্তার যে স্থান উন্মুক্ত, তাতে অবধূতীকে রাখা হয়েছে বা শূন্য নিরামণিকে স্ত্রী করে আঙিনায় ঘর সংসার পাতা হয়েছে। প্রজ্ঞানন্দ চোর অবচেতন অবস্থায় কানের ভ্রমণ অর্থাৎ বোধগম্যতা চুরি করে নিয়ে গেল। ভব সংসার ধারণকারী কর্তা বা শ্বশুর তখন নিদ্রায় নিমজ্জিত অথচ পরিণতচিন্তা জাগরুক। সেই যে বোধগম্যতা বা কানফুল চুরি গেল তা কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? চেতনায়ুক্ত বা দিবসে পরিণত চিন্তা বা বউ লোকনিন্দা বা কাককে ভয় পায় অথচ নির্বাণ বা কামে আসক্ত হলে রাত বা দুঃসাধ্য অন্ধকার পথেও তা পাওয়ার জন্য নির্গত হয়। এরূপ চর্যাগান কুকুরী পা গাইলে কি কোটি জনের ভেতর একজনও বুঝতে পারে?

সমীক্ষা

যে ব্যক্তি নিরেট তার কাছে জ্ঞান বা সম্পদ কেউ আশা করে না, সে অন্যের কাছে ধারে, সবসময় অন্যের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে কিংবা আড়াল করে রাখে। এ কথা পরিহাসচ্ছলে বলা হয় যে সে রকম ব্যক্তি জ্ঞান বা সম্পদ এমন ভাবে বিলাচ্ছে যে অন্যরা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা নিয়ে কুলোতে পারছে না আর সহজ আনন্দ যদি তার কাছে উদয় হয় তবে তো হতেই পারে, তবে অপরিণত চেতনার ভেতর সহজে জ্ঞান প্রবেশ করে না। তেমনি হতে পারে কুমিরে তেঁতুল খাওয়া প্রসঙ্গ। কুমিরে কখনও তেঁতুল খেতে পারে না, জলে বাস করেও কুমির হিংস্র; মানুষ পর্যন্ত গিলে খায়, যদিও রূপকার্থে এখানে তেঁতুল হল কামনা বাসনা, এটা কুমিরের খাদ্য নয়। আর তেঁতুল এত টক যে, সেটা মানুষের পক্ষেও বেশি খাওয়া উচিত নয়; অথচ এ অসম্ভব সম্ভব করেছে কে? অবধূতী বা নির্বাণ লাভ করা খুবই কষ্টকর, তাও কুমিরে তেঁতুল খাওয়ার সমতুল, সেটা যদি কুমিরে গিলে খেতে পারে খাবেই তো, কারণ বোধিচিন্তকে মনে করা হয়েছে কুমির, সে-ই কেবল পারে নির্বাণ খেতে বা নির্বাণ লাভ করতে। জীবনে কামনা বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়েছে যে সে-ই তো বোধিচিন্তের অধিকারী, তা হলে তার তো ভালো কিছু সংসার নেই, ঘর সংসার নেই, সে অবধূতী বা নির্বাণকে জীবনে বেঁধেছে, অর্থাৎ নির্বাণকে তার স্ত্রী করেছে। সে জন্য তার আঙিনা হল ঘর, লাজ লজ্জা বলতে কিছু নেই, লৌকিকতার ভয় নেই। এ কারণে সহজ আনন্দ বা প্রজ্ঞানন্দ চোর সহজে তার সংসারে প্রবেশ করতে পারে। আধরাতে এসে ঢুকে তার স্ত্রীর কর্ণভূষণ বা বোধগম্যতা চুরি করে নিয়ে যায় অথবা এমনও হতে পারে যে এ কর্ণভূষণ চুরি হল বধিরত্বের মোচন, তাতে করে তার ইন্দ্রিয় প্রবেশপথে কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে গেল। স্বপ্নরূপ কর্তা বা ভবনষ্টারের অধিকারী কিংবা আপন দেহ তখন থাকে ঘুমিয়ে, মণিকোঠায় জাগরূক থাকে বধু; তবে কীভাবে এ চুরি গেল কেউ জানল না, খোঁজও পেল না। নিঃশব্দে বস্তুর অন্ধকারে এ কাজটি হয়ে গেল যার। যদি জিজ্ঞাসা কর যে বউটি তো জেগেছিল, কর্ণভূষণও তো তার ছিল সে তো জানে। কিন্তু তার দুর্বল্য তো সবাই জানে, কারণ লোকনিন্দায় সে দিনের বেলায় অর্থাৎ চেতনে থাকলেও কিছু করতে পারে না, কারণ সে কাককে ডরায়, কাক হল অবিদ্যার দূত। চেতনে সে বধু ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করতে পারে না, অবচেতনে করে, অর্থাৎ নির্বাণ লাভের জন্য নির্গত যখন হয় তখন অবিদ্যার অন্ধকার তার কাছে কিছু না।

নির্বাণ লাভ করার জন্য যে দুঃসহ কর্মাদি সম্পাদন করতে হবে তাই হল সহজ আনন্দ লাভের উপায়। নানা পদ্ধতি, তত্ত্ব, আচার এবং নিষ্ঠায় তা লাভ করা যায়। আধরাতে যদি মন জেগে থাকে তা ঘটতে পারে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে মন ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে, তাই এ সাবধানতা। গুরু কুক্কুরী পা এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, এ মন্ত্রের প্রভাবে কোটি অপরিণত বোধিচিন্ত থেকে একটি চিন্ত এই সহজানন্দে পুলকিত হবে।

যিশু বলেছেন সুচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যদি উট প্রবেশ করতে পারে তবে ভোগী সম্পদশালীরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। তাই ধর্মপথ খুব কঠিন এবং দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পূর্ণ। দুঃখ ভোগ না করে কেউ পবিত্র আত্মায় উন্নীত হতে পারে না। যে জীবনে কোনও দিন দুঃখ ব্যথা পেল না, সে পেল কী? সে একটা অপদার্থ নিরেট জীব জগতের জন্য, জগতের বোঝা সে। অন্যের দুঃখ দিয়ে তৈরি সুসম্পদটা কেবল ভোগ করে সে নিরেট। প্রতিদিন সুস্বাদু আহার খাচ্ছে সে, ক্ষুধা কী জিনিস সে জীবনে কোনওদিন বোধেনি, ধর্মের নিয়মে পুষ্ট্যক ধর্ম তাই রাজ্য বা উপবাসের নির্দেশ আছে।

বৌদ্ধ দর্শন হল জীবনের সুস্থ আচার পালন। জীবনকে জানতে হলে ব্যথা বেদনা বা ভোগ উপলব্ধির উৎস জানতে হবে। ভোগ বা অবিদ্যার আশ্রয়ে জীবনের পরিণতি দুঃখ জরা মৃত্যুরূপ গ্রানি, তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে নির্বাণ লাভই একমাত্র উপায়। নির্বাণের পথ গগনের মত শূন্য হলেও আসলে তা খুবই সংকীর্ণ এবং কষ্টকর। এ জন্য দেহে নিয়োজিত স্থূল অনুভূতিগুলোকে বিনাশ করতে হবে।

কুকুরী পা বলেছেন নির্বাণ এত সূক্ষ্ম যে কোটি জনের ভেতর একজনের হৃদয়ে তা প্রবেশ করে। তিনি রূপক ও লোকচেতনা বোধ থেকে এর মর্ম আহরণ করেছেন। প্রচুর বিলাসের ভেতর বাস করে জীবনকে দেখা যায় না, কিন্তু সামান্য গৃহপরিচারিকা যখন বলল, বাবু বেলা যায়। তখন লালাবাবুর চিন্তে এ সামান্য উক্তি বিশাল শক্তি নিয়ে প্রবেশ করল। কিসের বেলা? কার বেলা? কোথায় যায়? লالا বাবুর ভোগতৃষ্ণা দিবানিদ্রা রইল দূরে সরে। 'কানের চোরে নিল কা গই মাগঅ'—বধিরত্ব খুলে নিয়ে গেল যে? এখন খোঁজ কোথায় তোমার কানফুল।

রূপকার্থে এ চর্যাটি অন্যান্য চর্যা থেকে একটু আলাদা। বলতে গেলে এর প্রতিশব্দ, রূপকল্প সবই ব্যঙ্গার্থ, তাই এটি একটি কবিতার ভেতর কবিতা। চর্যাকাররা সর্বত্র দেহকে দুশমন ভেবে তাকে ছেদন করতে বলে গেছেন। এখানে তেমন ছেদনের তীক্ষ্ণতা নেই। তবে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে কুকুরী পা দেহের ভেতরই নির্বাণ অবলোকন করেছেন। দেহকে বাদ দিয়ে কোনও নির্বাণ নেই। দেহ যতদিন কচ্ছপের মত গুটিয়ে খোলার ভেতর থাকে দুধ দিতে পারে বাগটিক তেঁতুল (প্রচণ্ড দুঃখ) খায়নি, কামাসক্ত বউয়ের মত কামরূপ যেত (লক্ষ্য কামের বিষয় স্বামীকে বলা হয়নি, স্বামীকে ফাঁকি দিলে কী পরিণতি হয় তাও বলা হয়নি) তখন তার স্বরূপ কী? আর যখন কানফুল হারিয়ে সে পরবর্তীকালে তালাশ করছে কী? পেয়ে গেল নির্বাণের পথ, কোটিজন যা পায়নি সে কেবল পেল একা। সশরীরে সে নির্বাণ লাভ করেছে।

এ কবিতার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ এত জীবন্ত এবং লোকগ্রাহ্য যে কবিতার দুর্বোধাতা সত্ত্বেও এটা যে অতি উপভোগ্য কবিতা, আর শেষ উক্তির ব্যঙ্গার্থক প্রতিবেদন তাকে আরও মনোরম করে দিচ্ছে। কোটি জনের ভেতর একজন যদি বুঝতে পারে, সে একজন মহৎ হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে। মনে হয় কবি জানেন যে বুঝবে সবাই অথবা সময় হলে বুঝবে, কিন্তু তখন করার সময় কিছু থাকবে না, বেলা যায়। তবু সবাই কী তা করতে পারে? ইচ্ছা তো আছে মনে একটা তাজমহল নির্মাণ করার, কিন্তু কে পারে? বিদ্যাপতি তাই বলেছেন, 'লাখে না মিলে এক'।

এ পদটিতে তৎকালীন জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অশান্তির চিত্র হয়ে উঠে এসেছে। অসামান্য কাব্যসুতির তাগিদে কবি কোনও অবিশ্বস্ত গৃহবধূর কথা বলেছেন, যাকে স্বস্তুর পাহারা দিচ্ছে অথচ রাতে সে অভীষ্ট জনের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। এই যে চুরি এবং কানফুল রূপ জীবন চুরি অনেকটা যেন স্বাভাবিক ছিল, অথবা জনজীবন দুঃখকষ্টে আচ্ছন্ন ছিল। বধূর লোক দেখানো লজ্জা আর রাতের নির্লজ্জতার স্বরূপ—এ দুঃখময় কন্টকাকীর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি, এটাই তো নির্বাণ আর এটাই এ কবিতার প্রাণবন্ত হয়েছে।



প্রেট ২ : কুকুরী পা

কুকুরী পা

৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর কুকুরী পা জীবিত ছিলেন, তখন রাজা দেবপাল রাজত্ব করতেন। এটা ঠিক যে কবির এ নাম ছদ্মনাম অথবা তাত্ত্বিক নাম, মনে হয় তিনি উচ্চ মর্যাদার কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, নিতান্ত তাত্ত্বিকতার আকর্ষণে কাব্যসৃষ্টির কারণে তিনি এ নাম ব্যবহার করেন। শহীদুল্লার মতে ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে কুকুরী পা চর্যা রচনা করেন। তিনি ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন আর সেটা হয়তো তাঁর জীবনের শেষভাগে। কারণ ধর্মপাল ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুকুরী পা বাংলার উত্তরখণ্ডের অধিবাসী হতে পারেন। কিন্তু হিন্দি ভাষীরা যথারীতি তাঁকে কপিলাবস্তু বা বুদ্ধের জন্মস্থান বা নেপালের লোক বলেছেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ভেতর *যোগভাবানো প্রদেশ* এবং *সুবপরিচ্ছেদ* অন্যতম। মনে হয় কুকুরী পা কোনও কুলীন বংশোদ্ভূত, তাঁর চর্যার ভাষা সেটা প্রমাণ করে।

only 1 poem by biruya pa

এক সে শুভিনী^১ দুই ঘরে সাক্ষাৎ^২ ।
 চীঅন^৩ বাকলঅ^৪ বাক্সী বাক্সঅ^৫ ॥
 সহজে থির করি বাক্সী সাক্ষ^৬ ।
 জে^৭ অজরামর হোই দিট^৮ কাক্ষ^৯ ॥
 দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ^{১০} ।
 আইল গরাহক^{১১} আপনে বহিআ ॥
 চউশধী ঘড়িয়ে দেত^{১২} পসরা ।
 পইঠেল গরাহক নাহি নিসরা ॥
 এক ঘড়ুলী^{১৩} সরুই নাল ।
 ভণ্ডি বিবু^{১৪} থির করি চাল ॥

১. শোণ্ডিনী, শোণ্ডিনি, শুণ্ডিনি। ২. মাছ, মাছ। ৩. চিকন ৪. বন্ধল। ৫. সাক্কে, বাক্কে।
৬. জেঁ। ৭. দিট। ৮. কাক্কে। ৯. দেখিয়া। ১০. গাহক। ১১. দেল, দেউ, দেটা। ১২.
ফড়লী, ঘরলি, সড়লি।

শুভিনী—মদ প্রস্তুতকারিণী এবং মদ বিক্রেতা নারী, সং-শৌভিক; গুঁড়ি+নী; যারা মদ প্রস্তুত করে তারাই সাধারণত মদ বিক্রয় করে; প্রাচীন কালে নারীরা গুঁড়িখানায় মদ বিক্রয় করত এবং মদ পরিবেশন করত; প্রাচীন বাংলার এ চিত্র থেকে বোঝা যায় এখানেও মদপানের কমতি ছিল না। প্রাচীন সেমেটিক অঞ্চলে মেয়েরা মদ পরিবেশন করত, পারস্য ও আরবে তাদের বলা হত সাকি; এমনকি ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত আছে বেহেশতে সাকি মদ্য পরিবেশন করবে; চর্যাকার এখানে রূপক অর্থে তাকে ব্যবহার করেছেন, রূপকার্থে শূঁড়িনি হলেন নৈরাশ্র্য না নিরামণি।

সাক্ষাএ—টোকে, প্রবেশ করে, বিশেষ উদ্দেশ্যে টোকে, অশালীন উদ্দেশ্যে টোকার কারণে শব্দটি এখন গ্রাম্যতা পেয়ে গেছে; সং-সন্ধি থেকে সাক্ষায়; সে থেকে সিঁদ ; চুরির উদ্দেশ্যে ‘সিঁদ’ বা গর্ত করে টোকে। চিঅন—চিকন, সরু। বাকলঅ—বকুল, গাছের ছাল। বারুণী—মদ, রূপকার্থে বোধি। বাকঅ—বাঁধে। বারুণী বাকঅ—মদ প্রস্তুত করে; বিশেষ প্রয়োগ—গান বাঁধে, দল বাঁধে, মদ বাঁধে, এখানে চিন্তকে বাঁধবার জন্য যে বোধি। থির—স্থির (স্থির)। সহজে সাক্ষ—এই মদ প্রবেশ করলে সহজানন্দ দ্বারা চিত্ত স্থির

হয়, বোধিচিহ্ন লাভ হয়। অজরামর—অজর অমর। হোই—হয়। দিঢ়—দৃঢ়। কাক্ক—ক্কক্ক, কাঁধ। দিঢ় কাক্ক—দৃঢ় ক্কক্কযুক্ত, বলবান। দশমি—দশম। দুয়ারত—দুয়ারে। দশম দ্বার, মুনিদত্তের টীকায়—বৈরোচন দ্বারোপি মহারাগ সুখপ্রমোদ চিহ্নং দৃষ্টা—গন্ধর্ব্বসত্ত্বোহি স্বয়মেবাগত্য তেন দ্বারেন—মানব শরীরের নয় দ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ ‘বৈরোচনদ্বার’। ধর্মকায় বুদ্ধকে অনেক সময় ‘বৈরোচন বুদ্ধ’ বলা হয়ে থাকে, পরমার্থ সত্য, বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভের দ্বারকে এখানে বৈরোচন দ্বার বলা হয়েছে। দেখইআ—দেখিয়া, দেখায়। দশমি... দেখইআ—দশম দ্বারের চিহ্ন দেখে। দশম দ্বার—তান্ত্রিক মতে অতিরিক্ত এই দ্বার হল সকল দ্বার রুদ্ধ করার পর গভীর আত্মস্থতার ফলে খোলে বা দ্বার যা দিয়ে প্রবল বলশালী হওয়া যায়। গ্রাহক—গ্রাহক, রূপকার্থে বোধিচিহ্ন লাভের জন্য যারা আগমন করে। আপনে—আপনা থেকে। বহিআ—বেয়ে। চউশট্টি—চৌষট্টি; দেহের চৌষট্টি পীঠস্থান। ঘড়িয়ে—ঘড়াতে। চউশট্টি ঘড়ির—চৌষট্টি পীঠের প্রত্যেক গড়াবে। দেত—দেওয়া হয়েছে। পসরা—সওদা, রূপকার্থে জরামৃত্যুর অভ্যাস; টীকায়—‘বন্ধনং কৃত্বা যেনাভ্যাসবিশেষনা-হজরামরত্বং দৃঢ় ক্কক্কং লভসে তৎকরু’। পইঠেল—প্রবিষ্ট হয়েছে এমন, পইঠ+এখন। নিসারা—নিঃসরণ নেই যাতে, বের হতে পারে না। ঘড়লি—ঘটি। সরুই—সূক্ষ্ম। নাল—নাল। চাল—চালিত কর।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

এক সে শুড়িনি ঢোকে দুই ঘরে।
চিকন বাকলে মদ্য চোলাই করে॥
সহজে স্থিত করে মদের সে পান।
অজর অমর হয় দৃঢ় বলবান॥
দশম দুয়ারের চিহ্ন দেখে।
গ্রাহক এল আপনা থেকে॥
চৌষট্টি ঘটে দেওয়া পসরা।
প্রবিষ্ট গ্রাহক নিঃসরণ হারা॥
একটি ঘটির সরু নাল।
বলেন বিরুআ স্থির করে ঢাল॥

গদ্যে রূপান্তর

এক শুড়িনি দুই ঘরে প্রবেশ করে চিকন নল বা কল দিয়ে মদ্য চোলাই করে। সহজ স্থির হয়ে মদ্য পান কর যেন অমর অজর দৃঢ় ক্কক্ক যুক্ত হতে পার। দশমি দুয়ারের সংকেত দেখে গ্রাহক আপনা থেকে মদ পান করতে চলে আসে। চৌষট্টি গড়ায় মদ ঢেলে বিক্রয় করা হল। যে গ্রাহক ঢুকল তার আর বেরুবার পথ থাকে না। সরু নল দিয়ে ঘটির ভেতর মদ ঢালা হচ্ছে, বিরুআ বললেন, ঠিক এভাবে চালিত কর।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

নৈরাশ্র রমণী মানুষের জন্য ও মৃত্যু এ দুই ঘরে প্রবেশ করে খুব সূক্ষ্মভাবে বোধিচিহ্ন অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। সহজানন্দ অনুভব করে স্থির হয়ে বোধিচিহ্ন ধারণ করতে পারলে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

অমর অজর এবং দৃঢ় ঋক্ষযুক্ত বলবান হতে পার। দশম দুয়ার বা বৈরোচন দ্বার দিয়ে নির্বাণের চিহ্ন দেখে বোধিচিন্ত প্রত্যাশীরা আপনা থেকে তাতে প্রবেশ করে। চৌষটি পীঠস্থানে বোধিচিন্তের স্বাধিষ্ঠান হলে তার নিঃসরণ আর হয় না। খুব সূক্ষ্মভাবে এ বোধিচিন্ত প্রবেশ করে, চর্যাকার বিরুতা তাই বলেন, ঠিক এভাবে তা চালিত কর।

সমীক্ষা

গুড়িনির রূপকে কবি বলছেন, নিরামণি হলেন মদ্য পরিবেশনকারিণী। তিনি মদ্য চোলাই ও বিক্রয় করে থাকেন। মানুষের জীবনমদ্যের দায়িত্ব তাঁর। তিনি এমনভাবে সুনিপুণ সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে মদ্য চোলাই করেন এবং খুব সূক্ষ্মভাবে মানব শরীরে তা অনুপ্রবেশ করিয়ে দেন, সে মদ্য আর কিছু নয় বোধিচিন্ত। বোধিচিন্ত আধুনিক কালে নানাভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে, কেবল প্রজ্ঞা এবং চেতনাই যদি তাই হয়, তাহলে তা লাভ করার সৌভাগ্য কয় জনের হয়? অথচ যিনি তা লাভ করেন খুব সরল সহজভাবে তাকে তিনি পান করান। মানবজীবনকে দু'দুয়ারের ভেতর আবদ্ধ করা হয়েছে, জন্ম ও মৃত্যু। জন্ম যোনি দিয়ে পৃথিবীতে আসা আর মৃত্যুর দ্বার দিয়ে বিদায় নেওয়া, বোধিচিন্তের সৌভাগ্য যদি কোনও জীবনে ঘটে তাকে তবে সর্বশেষ মৃত্যু বা নির্বাণ হল তার সে দ্বার।

বলা হচ্ছে নিরামণি এ দুই ঘরে বাস করে বোধিচিন্ত বা মদ্য পরিবেশন করেন, মদ্য পান করলে স্থির সহজ আনন্দ লাভ হয়, চিন্তের চাকল্য আর থাকে না। ইন্দ্রিয় অনুভূতি আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্ত থেকে দূরীভূত হয়, অমর অজর বলবান বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হয়। এ বোধিচিন্ত দেহে কীভাবে প্রবেশ করে? সাধারণ মদ্য মুখে পান করতে হয়, কিন্তু এ শরীরের কোনও রক্তপথ দিয়ে নয়, সয়টি রক্তপথের অতিরিক্ত দশম রক্ত দিয়ে যাকে বৌদ্ধ দর্শনে বৈরোচন দ্বার বলা হচ্ছে সে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, অর্থাৎ বুদ্ধ যেভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন ঠিক সেভাবে।

তত্ত্বগুরু বিরুতা বলছেন, গুড়িনি বড়ই চমৎকার কারণ তিনি দশমী দুয়ারের চিহ্ন দিয়ে রাখেন, যারা বোধিচিন্ত প্রত্যাশী তারা সে চিহ্ন দেখে তার গুড়িখানায় প্রবেশ করে আর এখানে একবার প্রবেশ করলে আর বের হতে পারে না। এ কথাই অর্থ হল একবার নির্বাণ লাভ হলে আবার মানব জন্মে ফিরে আসতে হবে না, মহাসুখ লাভের ফলে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

তাত্ত্বিকমতে মানব শরীরের নবদ্বার—দু'কান, দু'চোখ, দু'নাসা, মুখ, গুহ্য ও লিঙ্গদ্বার। কিন্তু ব্রহ্মারক্ত হল অতিরিক্ত দশম দ্বার। সুফী মতেও দশ দুয়ার—দশম দুয়ার দিয়ে প্রেম প্রবেশ করে, তার বাইরেও আর খিড়কি দ্বার-কামনা বাসনার প্রতীক তার দুয়ার। সে মনের দ্বারের মাধ্যমে সর্বস্ব চুরি যাবে। খিড়কি দুয়ার সাধারণত বাড়ির পেছনের দরজা, চঞ্চল মন কামনা বাসনার যে দ্বার দিয়ে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সেটা হল আরও অতিরিক্ত একটি দ্বার। বৌদ্ধমতে সংবৃত্ত বোধিচিন্ত ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভাবের ওপর অতন্ত্র পাহারা রূপে বিদ্যমান।

দশ লাইনের এই কবিতাটির শব্দ নির্বাচন ও রূপকল্প ব্যঞ্জনা অপূর্ব। মদ্যপানের পরিবেশনের যে ছবি, মদ চোলাই পদ্ধতি এবং গ্রাহককে আকর্ষণ করার কৌশল সব মিলিয়ে কবি যে ভাষা ও ভাষানুশঙ্গ প্রয়োগ করেছেন অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশের এটি দুনিয়ার পাঠক এক ইত্ত! ~ www.amarbol.com ~

একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। বৌদ্ধধর্ম ভগবানে বিশ্বাস নেই, নইলে বলা যেত ভক্ত ও ভগবানের ভেতর যে সংযোগ ও মিলন রক্ষাকারী এমন বক্তব্য চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতার সামিল।

এ কবিতার ভেতর বাঙালি সমাজের তৎকালীন জীবনচিত্র গাঢ়ভাবে অঙ্কিত। মদ্যপান শুধু নয়, এ অঞ্চলটা ছিল মদ্য ব্যবসার কেন্দ্র। সাধারণত এ অঞ্চলে গুড় থেকে মদ্য প্রস্তুত হত এবং এখান থেকে অন্যান্য অঞ্চলে চালান যেত বলে এ অঞ্চলটার নাম গৌড়। নারীদের মদ্য পরিবেশনার অবস্থা থেকে মনে হয় এখানকার সমাজ অগ্রগতি ন্যূন ছিল না। অবশ্য মদ্য সেবীদের আসক্ত করার জন্য মদের সঙ্গে নারী ফাউ নেশাও ছিল বটে। এটা ব্যবসায়িক বুদ্ধি। এখানে শুড়িনি দুই ঘরে থাকার ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, শুড়িনি এক ঘরে মদ্য পরিবেশন করে অন্য ঘরে আনন্দ পরিবেশন করে। তবে তৎকালেও মদ্যপান নিন্দার্হ ছিল মনে হয়, কারণ মদ খাওয়ার উদ্দেশ্যে চোরের মত সাক্ষাতে হত।



প্রেট ৩ : বিরুআ পা

বিরুআ পা

দেব পালের রাজত্বকালে বিরুআ পা জীবিত ছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি এ চর্যা রচনা করে থাকবেন। তাঁর জন্মস্থানের নাম বলা হয়েছে ত্রিউর। ত্রিউর বর্তমানের ত্রিপুরা। ত্রিপুরার আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে মদ চোলাই করে থাকে।

বিরুআ পা অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর ভেতর অমৃতসিদ্ধি, দোহাকোষ, সুনিশ্চবত তত্ত্বোপদেশ, বিরুআবজ্র গীতিকা, চণ্ডালিকা দোহাকোষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা-৪

রাগ অরু

গুণরী পা

only 1 poem by guguri pa

১. তিঅড়া-নারীর জঘন মণ্ডল, ত্রিবৃত্তা; ত্রিভুজাকৃতির রমণীর যোনি; এই শব্দ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কেউ একে মেঘলা বলেছেন; রূপকার্থে ললনা রসনা অবধূতী এ তিন; 'ললনারসনা অবধূতিকানাড্যং ত্রিনাড্যং'। চাপী-চেপে। জৌইনি-যোগিনী; টীকায়-'নিরাভাষীকৃত্য সৈব পরিশুদ্ধাবধূতিকা নিরাভায়া যোগিনা' রূপকার্থে পরিশুদ্ধা অবধূতিকা নৈরাভায়া যোগিনী। অঙ্কমালী-অঙ্কে যে আসন দেয়, আলিঙ্গন, কোলে নেয় যে; মুনিদত্ত-'বিচিত্রাদি লক্ষণযোগেনানন্দ্যাদিক্রমং দদাতি'-অর্থাৎ বিচিত্র লক্ষণ যোগে আনন্দ ক্রমান্বয়ে যে দেয়; রূপকার্থে নির্বাণের আনন্দ। কমল কুলিশা-পদ্মবজ্র, যৌনাঙ্গ-পুরুষাঙ্গ; কমলকে নারীর যোনি আর কুলিশা হচ্ছে বজ্র। ঘাটে-ঘেঁটে, সংযোগ ঘুটে' আনন্দোসন্দেহো'। বিআলী-বিকাল; চিরায়ত বৈকালিক মহামুদ্রা, 'বিকালি মিতি কালরহিতাং মহামুদ্রাং সিদ্ধিং সাক্ষাৎ কুরু' অর্থাৎ বৈকালিক মহামুদ্রার দ্বারা সিদ্ধিকর। খনহি-ক্ষণকালও, রূপকার্থে সুদূর। জীবমি-বাঁচি না। কমলরস-পদ্মমধু; কমল রস পানে পরমার্থ বোধিচিন্তের সঞ্চার হয়, টীকায়-'উষী-কমল মধুমদন, মরমার্থ বোধিচিন্তং'। পীবমি-পান করি। খেপহঁ-ক্ষিপন করি, সঞ্চালিত করি। লেপন-লিপ্ত বা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

তিঅড়া^১ চাপী জৌইনি দে^২ অঙ্কমালী^৩।কমল কুলিশা ঘাটে^৪ করহু বিআলী^৫ ॥৬॥জৌইনি তই বিণু খনহি^৬ গ জীবমি।তো মুহ চুষী^৭ কমলরস পীবমি^৮ ॥৭॥খেপহঁ^৯ জৌইনি লেপন^{১০} জায়^{১১}।মণি কুলে^{১২} বহিআ^{১৩} উড়িআনে^{১৪} সমায়^{১৫} ॥৮॥সাসু ঘরে ঘালি^{১৬} কোঞ্চা তাল^{১৭}।চান্দসুজ বেনি^{১৮} পখা^{১৯} ফাল ॥৯॥ভগই গুগুরী অহমে^{২০} কুন্দরে^{২১} বীরা।নরঅ নারী মাঝে^{২২} উভিল চীরা^{২৩} ॥১০॥

পাঠান্তর

১. তিঅড়া, তিয়ড়া। ২. দেই। ৩. অঙ্কবালী, অঙ্কপালী। ৪. ঘাট। ৫. বিয়ালী। ৬. খনহি। ৭. চুষি। ৮. পিবমি। ৯. খেপহ। ১০. লেপণ। ১১. জাই। ১২. মনিমূলে। ১৩. বহিউআ। ১৪. উড়িআনে। ১৫. সমাঅ, সমাই, ১৬. ঘালী। ১৭. তালি। ১৮. বেন্নি। ১৯. পাখা। ২০. অমহে। ২১. কুন্দরে। ২২. মাঝে। ২৩. চিরা।

শব্দার্থ ও টীকা

তিঅড়া-নারীর জঘন মণ্ডল, ত্রিবৃত্তা; ত্রিভুজাকৃতির রমণীর যোনি; এই শব্দ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কেউ একে মেঘলা বলেছেন; রূপকার্থে ললনা রসনা অবধূতী এ তিন; 'ললনারসনা অবধূতিকানাড্যং ত্রিনাড্যং'। চাপী-চেপে। জৌইনি-যোগিনী; টীকায়-'নিরাভাষীকৃত্য সৈব পরিশুদ্ধাবধূতিকা নিরাভায়া যোগিনা' রূপকার্থে পরিশুদ্ধা অবধূতিকা নৈরাভায়া যোগিনী। অঙ্কমালী-অঙ্কে যে আসন দেয়, আলিঙ্গন, কোলে নেয় যে; মুনিদত্ত-'বিচিত্রাদি লক্ষণযোগেনানন্দ্যাদিক্রমং দদাতি'-অর্থাৎ বিচিত্র লক্ষণ যোগে আনন্দ ক্রমান্বয়ে যে দেয়; রূপকার্থে নির্বাণের আনন্দ। কমল কুলিশা-পদ্মবজ্র, যৌনাঙ্গ-পুরুষাঙ্গ; কমলকে নারীর যোনি আর কুলিশা হচ্ছে বজ্র। ঘাটে-ঘেঁটে, সংযোগ ঘুটে' আনন্দোসন্দেহো'। বিআলী-বিকাল; চিরায়ত বৈকালিক মহামুদ্রা, 'বিকালি মিতি কালরহিতাং মহামুদ্রাং সিদ্ধিং সাক্ষাৎ কুরু' অর্থাৎ বৈকালিক মহামুদ্রার দ্বারা সিদ্ধিকর। খনহি-ক্ষণকালও, রূপকার্থে সুদূর। জীবমি-বাঁচি না। কমলরস-পদ্মমধু; কমল রস পানে পরমার্থ বোধিচিন্তের সঞ্চার হয়, টীকায়-'উষী-কমল মধুমদন, মরমার্থ বোধিচিন্তং'। পীবমি-পান করি। খেপহঁ-ক্ষিপন করি, সঞ্চালিত করি। লেপন-লিপ্ত বা

লেপা; মোহ মলিনতা দিয়ে মুখ লিগু, টীকায়—‘মণিমূলে’ মোহ মলাবলিগুভর্তীহি’। মণি মূলে—মণি কুণ্ডলে; তন্ত্র সাধনার দেহগত বিশেষ পর্যায়ে। বহিআ—প্রবাহিত হওয়া। ওড়িআনে—উড়িয়ে আনে। সাসু—শ্বাশুড়ি, শ্বাস, টীকায়—শ্বাসমাগারং। ঘালি—সংযোগ স্থাপন করা, ঘায়েল। কোঞ্চতাল—তালাচাবি, কঞ্চিকা ও তালক, রূপকার্থে—শ্বাস রুদ্ধ করণ, ‘কুম্বিক্ষেতি তাল সংপুটীকরণে মণিমূলদ্বার নিরোধং’ অর্থাৎ মণিমূলের দ্বার নিরোধপূর্বক যে সংযোগ। পথা—পক্ষ। ফাল—ফলক; গাছ চিরার সময় ফাল ব্যবহৃত হয়। চান্দ... ফাল—চন্দ্রসূর্য দুই পক্ষকে ফলক হিসেবে ব্যবহৃত হল। কুন্দুরে—রতিক্রিয়াতে, রূপকার্থে অবধূতিকার সঙ্গে মিলন-বা নির্বাণ। বীরা—বীর। উভিল—তুলে ধর। চীরা—চির।

আধুনিক বাংলার রূপান্তর

জঘন চেপে যোগিনী দে আলিঙ্গন।
পদ্মবজ্র ঘেঁটে করি বৈকালিক রমণ।।
যোগিনী তোকে ছেড়ে ক্ষণকালও বাঁচিনে।
তোর মুখ চুমে যেন কমলরস পানে।।
ক্ষিপ্ত না হলে লিগু হওয়া তো যায় না।
মণিকুণ্ডল বেয়ে ওড়া সুখের প্রবেশও হয় না।।
শ্বাশুড়িকে ঘরে বেঁধে তালাচাবি দিয়ে।
চন্দ্র সূর্য দুই পক্ষ কীলক হিসেবে।।
গুপ্তরী বলে আমি রতিকর্মে বীর।
নরনারীর মাঝে উড়ে পতাকাটি চির।।

গদ্যে রূপান্তর

ত্রিকোণ যোনি চেপে যোগিনী আলিঙ্গন দাও। তোমার পদ্মরূপ যোনি আমার বজ্ররূপ পুরুষাঙ্গ ঘৃষ্ট করে এসো বৈকালিক রমণক্রিয়া সম্পাদন করি। যোগিনী তোমাকে ছাড়া ক্ষণকালও বাঁচি না। তোমার মুখ চুম্বন করে কমল রস পান করি। উৎক্ষিপ্ত না হলে লিগু হওয়া যায় না। মণিকুণ্ডল বেয়ে ওড়া সুখ না হলে প্রবেশও হয় না। শ্বাশুড়িকে ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে চন্দ্রসূর্য, দুই পক্ষকে কীলক হিসেবে ব্যবহার করব। গুপ্তরী পা বলেন, আমি তো রতিকর্মে বীর, নরনারীর মাঝে আমি উড়িয়ে দিলাম এই পতাকা।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

ললনা বসনা অবধূতী এ তিন নাড়ি সংঘবদ্ধ করে নৈরাশ্রা যোগিনীকে বিচিত্র লক্ষণ যোগে নির্বাণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হব। কমল কুলিশ নামক আসন ঘৃষ্ট করে বৈকালিক চিরায়ত মুহাম্মদার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করব। নৈরাশ্রা যোগিনীকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না, তার কমল রস রূপ পরমার্থ যোনিচিহ্ন পান করে সহজানন্দ উপভোগ করব। এ রকম ক্ষিপ্ত হলে সহজানন্দ লাভের জন্য উদ্দীপ্ত হওয়া যায়। মণিমূলের অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার এ বিশেষ পর্যায়ে না পৌঁছে শূন্য লাভের জন্য উড়ে নির্বাণে প্রবেশ করা যায় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরোধক চন্দ্র সূর্য নামক ধ্যানের বিশেষ অবস্থানে পৌঁছে যেতে হবে। তাই গুপ্তরী দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা বলছেন, পরমার্থ যোনিচিন্তা অনুকূলের সাধনায় যিনি বীর তিনি নরনারীর ভেতর চিরদিনের জন্য আদর্শ।

সমীক্ষা

বৌদ্ধধর্মে ইন্দ্রিয় আসক্তি তথা নরনারীর মিথুন বা রমণ ক্রিয়াকে ধর্মীয় আচরণে স্থান দেয়নি, বলা যায় অনেকটা টাবু হিসেবে ধরা হয়েছে। সে কারণে নারী হল অবিদ্যা, মার বা সকল অনিষ্টের মূল। কিন্তু এ পদ পড়লে মনে হয় কবি গুণ্ডরী পা হলেন ধর্মদ্রোহী। অবশ্য বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা মূল ধর্ম থেকে বিদ্রোহ করে সরে এসেছে। তাই গুণ্ডরীর পক্ষে রমণ ক্রিয়ার বাখানি (রূপকার্থে না গিয়ে সাধারণ অর্থে) সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চর্যাকাররা সর্বদা রূপকার্থে ভাষা, শব্দ বা অনুশঙ্গ প্রয়োগ করেছেন, তান্ত্রিকদের যে ধর্ম এ ধর্মানুসারে সিদ্ধি বা নির্বাণের জন্য তাঁদের এই সাধন সংগীত। তাঁরা সাধারণের জন্য কিছু বলেন নি। তবু লোকচরিত্র ও লোকশিক্ষা ছিল তাঁদের সাধনার মূল আদর্শ। লোক-চরিত্র ভিত্তি করে এ ধর্মোপলব্ধিকে সহজ ও জীবনমুখি করার এ পদ্ধতি সে যুগে এমনি ছিল।

মিথুন তত্ত্ব অবশ্য হিন্দুধর্মের মূল সাধনার সঙ্গে যুক্ত। ধর্মার্থকামমোক্ষ, কাম উত্তীর্ণ না হয়ে ধর্ম ও মোক্ষ অর্জন হয় না, তাই মনে হয় সিদ্ধাচার্যরা হিন্দুধর্মের এ প্রক্রিয়ার প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। এমনি উপমহাদেশীয় অন্য সকল ধর্মের বিদ্রোহী শাখায় মিথুন কিংবা ভোগ উৎসমুখী হয়েছিল, এমনকি ইসলাম ধর্মের যেটি সুফী মতবাদ : তার ভেতর সুরাসাকির এস্তার আসক্তি আছে যা শরিফ বিরোধী। যাই হোক, বৌদ্ধদের মূল ধর্মের শিক্ষা নির্বাণ লাভ, তান্ত্রিকরাও তাই চেয়েছেন। এই নির্বাণ তত্ত্বের সঙ্গে নরনারীর যৌন মিলনকে এখানে এমনভাবে লোকগ্রাহ্য অথচ রূপক ধরা হয়েছে তা সত্য ও অসত্যের মাঝখানে কল্পনায় বুজিয়েছে। সত্য এইজন্য যে সিদ্ধাচার্যরা কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আর অসত্য এই যে অনেকে তান্ত্রিক আদর্শে বা গোপনে বামাচারী সহজিয়া ছিলেন। নির্বাণের জন্যই সবকিছু করা সম্ভব। তাই নির্বাণ রূপ যোগিনীকে লাভ করতে হলে তার সঙ্গে মিলনের উপায় হিসেবে একরূপ সাধন মার্গীয় আচরণ সৃষ্টি করতেই হবে, যা সাধারণ নরনারী করে থাকে। নারীকে (নৈরাশ্রা) আলিঙ্গন দিয়ে, তার মুখ চুম্বন করে কমল রস পান করে সাধারণ মানুষ সে সুখ পায়, তা যেন মহাসুখ তুল্য হয়। লোক-ধারণা ও লোকশিক্ষার ভেতর তা এ ভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে নির্বাণ রূপ মহাসুখ এমন কী? তাকে বলা হচ্ছে, জগতের জীবন যন্ত্রণার কারণ ইন্দ্রিয়াদির উৎপাত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আবিলতা দ্বারা মৃত্যুর এই দুঃসহ অধীনতা থেকে মুক্তি। চিত্ত চাক্ষুশ মুক্ত পরমার্থ বোধিচিন্তা লাভ হয়ে গেলে কোনও অবিদ্যা দেহে প্রভাব ফেলতে পারে না, স্থির নির্বিকল্প চিত্ত নির্বাণ নিশ্চিত করে। এই হল চর্যাকার গুণ্ডরী পা রচিত এ চর্যার মূল কথা।

কিন্তু তাঁর কথার সঙ্গে একমত হতে পারা যায় না তাঁর উচ্চারিত কথা ও প্রসঙ্গ থেকে। তিনি যদিও কতকগুলো চিত্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাণের কৌশল ও পন্থার বর্ণনা দিয়েছেন, যোগিনী রূপ নির্বাণকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার ভেতর মিশে যেতে চেয়েছেন, শাঙড়ি রূপ মিলন প্রতিবন্ধকতাকে দৃঢ়ভাবে তালাচাষি মেরে আবদ্ধ করে অর্থাৎ চিত্ত দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঞ্চল্যজাত ইন্দ্রিয়াদির নিরোধক পদ্ধতির অবলম্বন করেছেন, এ রূপ রতি সম্পাদন করতে পারলে নরনারী সমাজে চিরকালীন বীর বলেছেন।

মনে হয় টীকাকারদের এ চর্যা বিশ্লেষণের সময় দৃষ্টিভ্রান্তি অন্ত ছিল না, সব রূপক ভেদ করে চরম লৌকিক সত্য ক্রমাগত বেরুচ্ছিল। তাঁদের ধর্মীয় সুচিতামার্গী তত্ত্ব আর কুলোতে পারা যাচ্ছিল না। অনেক শব্দকে বিশ্লেষণ থেকে খারিজ করা হয়েছে। মুনিদত্ত যৌনতার কাছাকাছি কোনও শব্দকে তাঁর টীকায় রাখেন নি। অথচ সকল টীকা ভাষ্য আগম নিগম (শিব ভবানি বা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর, এখানে মুনিদত্ত কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্ন পার প্রসঙ্গ দিয়েছেন বার বার) পুরাণ ইত্যাদি সম্পৃক্ত। এ চর্যার প্রথম দুই লাইনে অনেকে মুষড়িয়ে পড়েছেন বা এড়িয়ে গেছেন। প্রথম শব্দ তিঅড্ডা বা তিঅড়া, সহজ কথায় এটা হল নারীর যোনির মানচিত্র। রূপকার্থে ধরা হয়েছে ললনা রসনা অবধূতিকা এ তিন নাড়ি। তাহলেও মূল মানচিত্র থেকে এ ছবি হারিয়ে যাচ্ছে না, তার পর বলা হচ্ছে যোগিনী হলেন নৈরাশ্রা যোগিনী তা হলেও তো নারী, তারও তিঅড্ডা মানচিত্র রয়েছে। তিন নাড়ির সংযোগে হয় তান্ত্রিকমতে যৌন কর্ম, আর যারা এ যৌন কর্মে লিপ্ত হয় তারা তান্ত্রিক কাপালিক। সে কথার উল্লেখ নেই।

তিব্বতি ভাষ্যে বলা হয়েছে 'স্তম্ভ' তিন স্তম্ভ বা ত্রিশ্রবণ (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) তাতে আরও ঘোলাটে হয়ে গেছে। যদি বিকাল ধরে কমল কুলিশ ঘৃষ্টে রতিক্রিয়া, তাহলে তো মিটে গেল। কিন্তু সহজানন্দ কি তাই? চিরকালীন বিকেলে অর্থাৎ পরমার্থ সত্য লাভের শেষে কমল রস পান বিষয়ে বিপত্তি; গুরু শিষ্যদ্বারা চর্চিত আদর্শ কালিঙ্গর সময়ে যা পান করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এখানে শাস্ত্রকারেরা পরাজিত।

রূপকভাবে কিন্তু ধর্মোক্তিতে যা বলা হোক না কেন, এখানে অবশ্যই জীবনের কথা সরিয়ে রাখা হয়েছে। শাস্ত্রকারদের সমস্ত আচ্ছাদন উপড়ে বেরিয়ে এসেছে জীবনের কথা, মানবের চিরকালের সুন্দর কথা। এর ভেতর যত অনুভূতি ও মানবিক চেতনা সিগুরেলার বাক্স ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে আগুন উঁকি দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক শব্দে আর ভাবানুশঙ্গে।

নরনারী প্রেম অনুভূতি তাড়িত হয়ে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হয়। যে প্রেম দেহের দাবি মেটাতে পারে না তা সম্পূর্ণ প্রেম হতে পারে না। এমনকি ধর্মীয় অনুভূতি যতই থাক না প্রেম আলগা হয়ে থাকে। এখানে যোগিনীকে যুবতী এবং রমণ ক্রিয়া পারদর্শিনী রূপে দেখানো হয়েছে। যদি এ যোগিনীকে বৃদ্ধা কিংবা কুৎসিত করে দেওয়া হত তাহলে ধর্মীয় অনুভূতিও বিলুপ্ত হত। তাহলে সেখানে ধর্মীয় আচরণের চাইতে মানবিক আচরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুরত ক্রিয়ার সমস্ত কলাকৌশল, দয়িতাকে আলিঙ্গন, সুরত ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া, প্রিয়ার মুখ চুম্বন করে কমল রস পান করা, সুরত ক্রিয়া কালে উন্মত্ত হওয়া (ওড়িআনে), ওকে ছাড়া বাঁচতে না চাওয়া এবং ওকে নিয়ে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এ সবই তাই। এ দিকে শান্তি বা যারা মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা কোনও প্রকারে মিলন ঠেকিয়ে রাখে তাদের প্রসঙ্গও এর সঙ্গে যুক্ত। চন্দ্র-সূর্য কিংবা নিজের ক্ষয় বৃদ্ধির কথা ভুলে গিয়ে এমনই রমণ করতে কার না আকাঙ্ক্ষা জাগে বা কে অভিপ্রেত না হয়? ধর্মীয় প্রথা বলে এ সব প্রসঙ্গকে আবিলতা মত্ত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণভাবে যদি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~~~~~ www.amarbol.com ~~~~~

উচ্চারণ করা হয়, দুরন্ত যুবতীকে বোরখা পরানো হয়েছে ঠিকই তবে তার যৌবন উদ্ভিন্নতা ঢাকা যায়নি।

আধুনিক কবিতার প্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গকে অশ্লীল বলা যাবে কী যাবে না প্রশ্ন থাকে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস কিংবা ভারতচন্দ্রের কবিতা এখন আর অশ্লীল নয়, যদিও ধর্মের খোলস সেসব স্থানে কম নয়। ভাষ্য ও বর্ণনা ভঙ্গির গৌরবে এ চর্যাপদ ওদের চাইতেও উৎকর্ষ লাভ করেছে, কবি যখন বলেন,

জোইনি তঁই বিনু খণহি ন জীবমি।

তো মুহ চুখি কমল রস পীবমি॥

চিরায়ত প্রেমের সোপানে পা রেখে এ কবিতা সুরম্য সৌধে এবং চিরায়ত কালের ভবনে স্থান পেয়ে গেছে। প্রেমিকাকে এর চাইতে আর কী মধুর ভাষায় সম্বোধন করা যায়? এ যেন প্রত্যেকটি শব্দ তাজমহলের পাথরের চাইতেও মূল্যবান। কী অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও বর্ণ বিন্যাস। চিরদিনের প্রেমের যে দাবি—দাও দাও একটি চুখন, তা এখানে রাখা হয়েছে। বাইবেলের সোলমনের গান অংশে তোমার ওষ্ঠের ভেতর ওষ্ঠ চেপে চুখন দাও—যেন সে কথা সমস্ত জগতের সমস্ত প্রেমের আদর্শ চেতনার দৃষ্টান্ত খুলে গেল। বাংলা কবিতায় চর্যাপদ বা চর্যাগান হয়তো বা সৃষ্টির সময় থেকে অপরিসীম ছিল, লোকসমক্ষে তা অবগুষ্ঠন খুলে আসার সুযোগ পায়নি, তাই ছিল অপরিচিত বিশ্বসমাজেও। এখন দিনের আলোকে তা এসেছে কিন্তু এখনও বিশ্বসমাজে তাকে খুলে ধরার ক্ষমতা আমাদের সীমিত। নইলে প্রাচীনতম এ কবিতার এ দুটি লাইনই বাংলা ভাষাকে বিশ্ব ভাষায় উন্নত করার ইংগিত পাওয়া যায়।

এ পদ্ধতিকে প্রেমের কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন ও মিথুন দৃশ্যের অনেক অবতারণা রয়েছে, কিন্তু এ কবিতায় সমকক্ষ তারা দাবি করতে পারে না। কি ভাব, কি ভাষা, কি রূপকল্প, কি বর্ণনা এবং শেষ সিদ্ধান্ত, ‘এটাই তো নরনারীর জীবনের একমাত্র পতাকা’—এ রকম একটি কথা একজন মহৎ শিল্পী না হলে এমন করে কেউ বলতে পারে না।

প্রেমের দাবি তৎকালে যে পুরস্কৃত কিংবা স্বীকৃত ছিল না, এ কবিতার ভেতর আমরা অনুভব করি। শাস্ত্রিকে তালা চাবি মেরে বেঁধে রাখার কথা বলা হয়েছে, বলেছে প্রেমিকা। বর্তমান কালে প্রেমের শত্রু হল—শাস্ত্রি নামে সমাজ। কেউ যদি চারটি বিয়ে করে এবং পরে স্ত্রীদের ওপর ধর্ষণ অত্যাচার নির্যাতন চলায়, এমনকি ওদের কাউকেও লাথি দিয়ে মেরেও ফেলে তাহলেও কেউ মুখ ফুটে কোনও কথা উচ্চারণ করে না। কিন্তু কেউ যদি একটি প্রেম করে, তবে শত মুখে তার নিন্দা এবং তার প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে। ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্র সেই প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে শতবার আপত্তি করতে পারে। এমনই অবস্থা তখনও ছিল, কিন্তু শাস্ত্রিকে ঠেকিয়ে প্রেমিক তার প্রেমকে উদ্ধার করেছে, তার ক্ষয় বৃদ্ধি তাতে যাই হোক না কেন তার জন্য পরোয়া নেই। প্রেমিক প্রেমের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই এ কবিতাকে বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব সম্পদ বলা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণরী পা

গুণরী পা'র বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায়নি, তাঁর রচিত কোনও গ্রন্থও পাওয়া যায়নি। মনে হয় অন্য সিদ্ধাচার্যরা যেমন জ্ঞানী-গুণী ছিলেন তিনি হয়তো তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন শুদ্ধ কবি। তত্ত্বের চাইতে চিত্ত উন্মোচন অনুভূতিই ছিল তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ। তবে একটি সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে তিনি রাজা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৯-৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) বর্তমান ছিলেন। তিনি বঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু হিন্দিভাষী পণ্ডিতবর্গ তাঁকে তাদের অঞ্চলের লোক বলেছেন। তিনি ভিসু নগর (বিহার) অঞ্চলে বাস করতেন।

চর্যা-৫

রাগ গুজরী

only 1 poem by this poet

চাটিল পা

ভবনই গহন^১ গভীর বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল^২ মাঝে ন থাহী ॥১॥
ধামার্থে চাটিল সাক্ষম^৩ গরই^৪।
পারগামী লোহ নিভর^৫ ছরই ॥২॥
ফাড়িঅ^৬ মোহতর^৭ পাটি^৮ জোড়িঅ।
আদআদিটি^৯ টাঙ্গি^{১০} নিবাণে কোড়িঅ^{১১} ॥৩॥
সাক্ষমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহী।
নিয়ডী^{১২} বোহি দূর মা^{১৩} জাহী ॥৪॥
জই তুমহে লোহ হে হোইব পারগামী।
পচ্ছতু^{১৪} চাটিল অনুত্তর^{১৫} সামী^{১৬} ॥৫॥

পাঠান্তর

১. গাহন। ২. নিখিল। ৩. সাঁকো। ৪. গরই, গটই। ৫. নীভর। ৬. ফাড়িঅ। ৭. পাটি।
৮. অদআদিটি, অদস দিট। ৯. টাঙ্গি। ১০. কোহিঅ। ১১. নিয়ডি. নিয়ডী। ১২. মা উহ্য।
১৩. পুচ্ছহ, পুচ্ছ। ১৪. অনুত্তর বোধি। ১৫. সামী উহ্য।

শব্দার্থ ও টীকা

ভবনই—ভবনদী, রূপকার্থে 'ললনা রসনাদ্যাভাস ত্রয়ং পারাকার'। গহন—গভীর।
গভীর—সুদূর, 'নদীসঙ্কায় বোধ' সঙ্ক্যাকালীন নিস্তব্ধতা। দুআন্তে—দুপ্রান্তে, দুই কিনারে,
রূপকার্থে বাম দক্ষিণ। চিখিল—কাদা, কাদা ও জল, রূপকার্থে প্রকৃতি দোষপঙ্ক লিপ্ত।
থাহী—ঠাই, থই। ধামার্থে—ধর্মার্থে, স্বলক্ষণ ধারণা ধর্ম। সাক্ষম—সাঁকো, রূপকার্থে,
সংবৃতি পরমার্থ। গাটই—গড়ল। পারগামী—পারাপারের জন্য নিয়ত সংসার সমুদ্রপার।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

লোহ—লোক, রূপকার্থে—করুণাভাবে জন্য সহস্রে মোক্ষ যারা পায় না। নিভর—নির্ভয়ে। তরই—তরিয়ে যায়। ফাড়িঅ—ফেড়ে, চিরে। মোহতরু—মোহসর্বস্বতরু; রূপকার্থে—সংবৃত্তিবোধিচিন্তাবৃক্ষ। পাটি—পাটি, মাদুর। জোড়িঅ—জোড়া লাগান, 'বৃক্ষং পাটয়িত্বা তস্যবিষয় গ্রহং খণ্ডয়িত্বা সততা লোকং পাটকেন্তসহ একত্রীকরণ ঘটয়তি' অর্থাৎ সে বৃক্ষকে চিরে খণ্ড খণ্ড করে একত্রিত করে পাটি বানানো হয়। আদ আদিটি—অদ্বয়কে দৃঢ় করে। টাঙ্গী—লম্বিত করে, লটকানো, অর্থাৎ বোধিচিন্তাকে লম্বিত করে। কোড়িঅ—কোড়া হাল, কশা। দাহিন বাম—ডানবাম, পুরীষাদি প্রবাহিত নদীয় দু'তীর। নিয়ডিড—নিকট। বোহি—বোধি। জাহী—যেও। অনুত্তর—উত্তম আর কিছু নেই এমন, না উত্তর। সামী—স্বামী, ধর্মস্বামী, সিদ্ধাচার্য।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়।

অথই পঙ্কিল মাঝে প্রান্তদ্বয়॥

ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো গড়ে।

পারগামী জনের নির্ভয়ে পারাপারে॥

মোহতরু চিরে পাটি জুড়ে ঠেসে।

অদ্বয় দৃঢ়টানা নির্বাণে কষে॥

সাঁকোতে চড়লে ডান বাম না হে।

নিকটে বোধি তো দূরে না পৌঁছে॥

তোমরা যে লোক পারগামী হবে।

জিজ্ঞাসিও শ্রেষ্ঠ ধর্মী চাটিলে তবে॥

গদ্যে রূপান্তর

ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়ে যাচ্ছে, তার দু'প্রান্তে পঙ্ক, মাঝখানে অথই পানি। ধর্মের জন্য চাটিল তার ওপর সাঁকো নির্মাণ করলেন। পারগামী লোক যেন নির্ভয়ে পার হতে পারে। মোহতরু চিরে চিরে পাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে, দৃঢ় করে অদ্বয় টানা নির্বাণে কষে দেওয়া হল। সাঁকোতে চড়লে ডান বাম হলে যেয়ো না, নিকটে বোধি রয়েছে দূরে যেয়ো না। তোমরা যারা পারগামী হবে চাটিলকে জিজ্ঞাসা করে নিও কারণ তিনি এ পারাপারের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

ললনা রসনাদি এড়িয়ে ভবনদী পারাপার হতে হবে। এ নদী গহন গম্ভীর বেগে চলছে, ভয়ানক প্রকৃতিদোষ মূত্র পুরীষাদি এতে প্রবাহিত, পারাপারের বাম দক্ষিণে প্রকৃতিদোষ পঙ্কানুলিঙ্গ মধ্যে বালযোগিনী অবধূতিকা। স্বলক্ষণ ধারণার পারগামী লোকদের জন্য ধর্মার্থে চাটিল এ নদীর ওপরে সংবৃত্তি পরমার্থরূপ সাঁকো নির্মাণ করলেন যেন তারা নির্ভয়ে পার হতে পারে। মোহতরু বা সংবৃত্ত বোধিচিন্তা তরু ছেদন ও পাটি করে তা দিয়ে এ সাঁকোর জোড়া দেওয়া হয়েছে। বোধিচিন্তাকে দৃঢ়ভাবে নির্বাণের সঙ্গে টানা দেওয়া হয়েছে। বাম দক্ষিণ দিকের লোক হলে নিকটে বোধি দেখে লোক পারগামী হয়। চাটিলকে

জিজ্ঞাসা করলেই পারগামী হওয়ার তত্ত্ব ও উপায় জানিয়ে দেওয়া হবে, কারণ তিনি হলেন সিদ্ধাচার্য গুরু।

সমীক্ষা

ভবনদী কথাটির ভেতর গভীর ধর্মার্থ বিরাজ করছে। ভবনদী মানে কাল্পনিক জগতের এমন একটা নদী যা অতিক্রম করে এ জীবন পার করে নিতে হবে। নদীর রূপকে দুর্গম পারাপার, খুব গভীর, উত্তাল তরঙ্গ ঝড় ঝাপটা ঝঞ্ঝায় উৎক্ষিপ্ত, সর্বোপরি ক্ষুরধার জল প্রবাহ। প্রত্যেক ধর্মে এ ভবনদীর বর্ণনা দেখা যায়। মুসলমানদের পুলসিরাত পার হতে হবে, তবে পুলসিরাতের নিচে যে ভয়ঙ্কর জলধারা রয়েছে তার রূপকে এ ভবনদী মনে করা যেতে পারে। গুরুর কৃপায় ভবনদী পার হওয়া যায়। নজরুলের ‘খেয়াপারের তরণী’ কবিতায় এ তরণীতে পুণ্যবানদের কাগুরী নির্ভয়ে নদী পার করলেন।

দুঃখ যন্ত্রণা অবিদ্যা মূত্র পুরীষ পূর্ণ মোহের স্রোতধারার ওপর অনুত্তর স্বামী চাটিল একটি সাঁকো নির্মাণ করে দিয়েছেন। এ সাঁকো ধর্মার্থে, যাঁরা ধর্ম পালন করছেন কিংবা করবেন তাঁরা এ সাঁকো দিয়ে নির্ভয়ে পারগামী হবেন। ভীষণ তরঙ্গ ক্ষুদ্র ভয়ঙ্কর জলরাশি সবকিছু গ্রাস করতে চাইলেও ধর্মের নিয়মশ্রিত সাঁকোবোদি বোধিচিন্তা নির্ভয়ে পার হয়ে যাবে, কারণ তারা অদ্বয় দ্বারা অভিবিক্ত। অদ্বয় ঘিরে তারা মোহতরু ছেদন করে ফেলেছেন, আর এ তরু চিরে চিরে পাটি বানিয়েছেন, সে পাটি দিয়ে সাঁকোর জোড়া লাগানো হয়েছে, পাটিতে কোনও চিন্তা চাপ্তা লিপ্ত নেই। সম্পূর্ণ সংবৃত্ত বোধিচিন্তা। দৃঢ় করে বোধিচিন্তা দিয়ে নির্বাণের সঙ্গে টানা দেওয়া হয়েছে, তাই অন্য কোথাও সরে ছিটকে যাবার উপায় নেই। সাবধানতা দেওয়া হচ্ছে, এ সাঁকোতে উঠলে যেন ডান বাম কোনও দিকে কেউ হেলে না যায়, চিন্তেবিক্ষিপ্ততা যেন থাকে। বোধি তাল্লাশ করলে দূরে যেতে হবে না, নিকটেই রয়েছে, নিজের ভেতর। যারা ভবনদী পার হতে চায় তারা যেন শ্রেষ্ঠ স্বামী সিদ্ধাচার্য চাটিলকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। তিনিই সঠিকভাবে এ তত্ত্ব বাতলে দেবেন।

জগতের জীবনও তো নদীর মত, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত; নানা দুষ্কর্মের তরঙ্গ। জীবনের দু’তীর—জন্ম ও মৃত্যু, মাঝখানে এ নদী জলকর্দমে লিপ্ত, ধর্মমতে কর্মস্থল হেতু এ ভব সমুদ্রের পরিণাম। সংকর্মের ফলে ‘ভবনদী’ যেমন পার হওয়া যায় নির্ভয়ে, তেমনি সং জীবন যাপনের কল্যাণে জগতের জীবনও সুস্থ ও সুন্দরভাবে কাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ কবিতার পরিবেশ ও রূপকল্প বাংলার ভূপ্রকৃতি ও জনজীবনের প্রতিভূ। নদীপথে আমাদের সবসময় পারাপার করতে হয় (এখন অবশ্য নদীগুলোর ওপর প্রায় পুল নির্মিত হয়েছে) এ সব নদীর কোনও কোনও স্থানে সাঁকো প্রাত্যহিক দৃশ্য। তৎকালে বাঁশবেত এবং কাঠ চিরে সাঁকো নির্মিত হত, তাই এ দৃশ্যবোধ থেকে কবিতার ভাববস্তু সংগৃহীত হয়েছে। চাটিলের সাঁকো নির্মাণ আদর্শ বিশ্বয়কর, উভয়ার্থে, প্রকৌশল মতে যেসব পাটি পাটি জোড়া এবং টানা দেওয়া, ধর্মচিন্তায় মোহতরু ছেদন করে ‘অদ্বয়’, আবার এ অদ্বয় টানা হল শক্ত ভিত নির্বাণের সঙ্গে। অন্যত্র সিদ্ধাচার্যরা বলেন, দেহকে শূন্য বা বিলীন করে নির্বাণে নীত করতে হবে। কিন্তু চাটিল বলেন, নির্বাণ তো দূরে নয়, নিকটে, নিজের ভেতর। দেহের ভেতর নির্বাণের আসন, এ আসন তৈরি হবে দেহকে ফালি ফালি করে, এ দেহ দিয়েই শেষ অবধি নির্বাণে পার হতে হবে।

পাটি বানানোর দৃশ্যটাও লক্ষ্যার্থক, 'পাটি' এক প্রকার জলজ বৃক্ষ ফেড়ে তার বেত চিরে খুব কৌশলে বানাতে হয়, সে পাটি-গাছের ভেতরে একেজো ফাঁপা শোলার মত থাকে, যাকে দেহের মলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কামলা 'মল' বের করে, বেত খুর চেঁছে নেয়, খুব চিকন করে বেত উঠিয়ে 'শীতল পাটি', তাতে গুয়ে যে 'মহাসুখ'। পরিমাণ আরাম; আর নির্বাণের জন্য দেহকে এরূপ শাসন ও আরাম দিতে হবে। সেজন্য এ পদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ কবিতার আচরণ পেয়ে পরবর্তীকালে বাউল সাধকরা তাঁদের সাধন সাঁকো নির্মাণ করেছেন, দেহতত্ত্বযোগীরা এ কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দেহতত্ত্ব সাধনার মূল চেতনা এ পদে পাওয়া যাচ্ছে। এ পদের শিক্ষামূল্য নূন নয়, জীবনকে ভবনদীর সঙ্গে তুলনা, দেহ চিরে ফালি এবং পরে সাঁকো তৈরি, পাটি নির্মাণ; সাঁকো দিয়ে পার হওয়ার দৃশ্য সবই পারিপার্শ্বিক জীবন অনুভূতির অঙ্গ।

চাটিল পা

চাটিল পা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেউ কেউ তাঁকে দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী মনে করেন। খুব সম্ভবত তিনি ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় জীবিত থাকবেন।

চর্যা-৬
রাগ পামিঞ্জরী
তাল কামরা

total 8 poem by
Vusuku pa

কামরা পামিঞ্জরী রাগ পামিঞ্জরী তাল কামরা
কামরা পামিঞ্জরী রাগ পামিঞ্জরী তাল কামরা
কামরা পামিঞ্জরী রাগ পামিঞ্জরী তাল কামরা
কামরা পামিঞ্জরী রাগ পামিঞ্জরী তাল কামরা

কাহেরি^১ ঘিনি^২ মেলি আছ হ^৩ কীস।

বেড়িল^৪ হাক পড়অ^৫ চৌদীস ॥

আপনা^৬ মাংসে^৭ হরিণা বৈরী।

খনহ^৮ গ ছাড়অ^৯ ভুসুকু^{১০} অহেরি^{১১} ॥

তিন গ চুপই^{১২} হরিণা^{১৩} পিবই গ পানী।

হরিণা হরিণির নিলঅ গ জানী ॥

হরিণী বোলঅ হরিণা সুগ হরিআ তো^{১৪}।

এ বন চ্ছড়ী^{১৫} হোহ ভাস্তো ॥

তরঙ্গত^{১৬} হরিণার খুর গ দীসঅ^{১৭}।

ভুসুকু ভণই মূঢ়া^{১৮} হিঅহি গ পইসই^{১৯} ॥

poem 6 at 52 page --1

poem 21 at 116-----2

poem 23 at 123-----3

poem 27 at 129-----4

poem 30 at 141-----5

poem 41 at 180-----6

poem 43 at 186-----7

poem 49 at 202 -----8

পাঠান্তর

১. কাহের, কাহের, কাহেরে। ২. ঘেণি। ৩. আছুই। ৪. বেঠিল, বেটিল। ৫. পড়ই। ৬. অঙ্গন। ৭. মাংসে, মাংসে। ৮. খনহ। ৯. ছাড়ই। ১০. ভুক। ১১. হেরি, ভুকঅ হেরী।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. ছুবই. ছুপই, খণ্ডই। ১৩. উহ্য। ১৪. হরিণা তো, হরিণী সুন তো। ১৫. ছাড়ী.
ছাড়ী। ১৬. তরসন্তে, তরসন্ত। ১৭. দীসই। ১৮. মূঢ়। ১৯. পইসই।

শব্দার্থ ও টীকা

কাহেরি—কাকে। ঘিনি—গ্রহণ করে। আছুহুঁ—আছ। কীস—কিসে, কিসের জন্য।
বেঢ়িল—ঘিরে, বেড় দিয়ে। হাক—হাঁক; মুণিদন্ত—‘অনাদি কাল মাদারা
সংপ্রজন্যদোষেন—মৃত্যুমারবিষা বেষ্টিত সন মারমারতি হাঁকং সম চিত্তহরিণেন শ্রুতং’।
পড়অ—পড়েছে। চৌদীস—চতুর্দিকে, চারদিকে। আপনা—আপন। হরিণা—হরিণ, নিজের
চিত্তরূপ হরিণ। বৈরী—শত্রু, রূপকার্থে—অনাদিকাল থেকে নিজের দোষে মৃত্যুদ্বারা
আক্রান্ত জীবন ও মৃত্যু। খনহ—ক্ষণমাত্র, এতটুকু সময়। ভুসুকু—কবির নাম, নাম থেকে
বাঙালির পরিচয়, ভুসি বা ভুসা অর্থে; কালো, চামাভুসা। অহেরি—শিকারি, রূপকার্থে—
স্বয়ং কৃতবিদ্যা মাৎসর্য দোষে চিত্ততারল্য। তিন—তৃণ, ঘাস। ণ ছুপই—স্পর্শ করে না;
স্পর্শ>ছোপ>ছুপই>ছুঁই। পিবই—পান করা। পানী—পানি, খাঁটি বাংলা শব্দ, জল
সংস্কৃত শব্দ। তিন ণ জানী... মৃগ তৃণ বা পানি পান করে না; হরিণির নিবাসও জানে না,
রূপকার্থে বিশিষ্য বিচারস্বরূপে। মুদ—‘তয়োচ্চিত্তপবনয়োন্নিলায় নিবাস ইন্দ্রিয়দ্বারেন
নাচগম্যতে’। নিলঅ—নিলয়, নিবাস। সুন—শুন। হরিণা তো—হরিণি তুমি; হারিনী
আ>হরিআ, আদর অর্থে আ। ছাড়ী—ছেড়ে। ছেড়ি, কোথাও। ভাস্তো—ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি।
কল্লে চর্চার বিভ্রান্তিতে বিকল্প উপাচার গ্রহণ গ্রহণে দূর হওয়া, দূরে যাও। তরসতে—
ঢেউ এ ঢেউএ, হরিণের দৌড়ানো বা লাফানো যে তরঙ্গ, তা যেন সামনে পিছের ঢেউ
তরঙ্গের মত; পাঠান্তরে তরসন্তে অর্থে পইস, ভয়ে ছুটে যাওয়া। দীসঅ—দেখা যাওয়া,
দৃষ্ট>দীসঅ। মূঢ়া—বোকা। হিআই—হৃদয়ে, বুদ্ধিতে। পইসই—প্রবেশ করে,
রূপকার্থে—সহজজ্ঞান, মুদ—সহজ জ্ঞানাবরোধেন যোগিনস্তস্য স্বচিত্তহরিণস্যাবাদি
বিকল্পনুকল্পয়তি’।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

কাকে নিয়ে কাকে ছেড়ে আছ কিসে?
চারদিক বেড়িয়ে হাঁক পড়েছে এসে॥
আপন মাংসে হরিণ বৈরী।
একটু ছাড়ে না ভুসুকু শিকারী॥
ছোঁয় না তৃণ পিয়ে না পানি।
হরিণ জানে না হরিণীর বাস খানি॥
হরিণী ডাকে ও হরিণ শুন তো।
এ বন ছেড়ে দূরে কোথা যাও তো॥
দৌড়ে তরঙ্গে হরিণের খুর দেখা যায় না।
ভুসুকু বলে মূঢ় হৃদয়ে এ কথা যায় না॥

গদ্যে রূপান্তর

কাকে নিয়ে আর কাকে ছেড়ে বসে আছ আর কিসের জন্য? চারদিক ঘিরে তো হাঁক
পড়েছে ধরার জন্য। হরিণ তার নিজের মাংসের জন্যই শত্রু। ভুসুকু শিকারী একটুকুও
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়ে না। তৃণ খায় না হরিণ পানিও পান করে না। হরিণ হরিণীর নিবাস কোথায় তাও জানে না। হরিণী হরিণকে ডেকে বলল ও হরিণ তুমি আমার কথা শোন, এ বন ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাও। দৌড়ে তরঙ্গ তুলে হরিণ পালিয়ে যায় তখন তার খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, মৃঢ় হৃদয়ে এ কথা প্রবেশ করে না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

অনাদিকাল ধরে বিভিন্ন প্রজন্ম দোরে মৃত্যু মার বিভীষিকা বেষ্টিত মার মার হাঁক নিজের হরিণ চিন্তে শোনা যাচ্ছে। তাই এখন গুরু চরণ ধুলির প্রভাববিমুক্ত ধর্ম উপলব্ধি তথা গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবে কাকে নিয়ে মুক্ত স্থিত হতে পারে? এবং স্বয়ং কৃতবিদ্য মাৎস্যর্য দোষে চাঞ্চল্যপূর্ণ চিন্ত হরিণ সর্বদা বৈরীবদ্ধ। চিন্ত হরিণ যেহেতু ভুসুকু সদগুরু বচন বাণে প্রহৃত তাই বাহ্যত মৃগ তৃণ ছেদন নির্বর পান করে না। বিশিষ্ট বিচার স্বরূপে তার চিন্তপবন উন্মিলন নিবাসের ইন্দ্রিয় দ্বারে গমন করতে পারে না। বিষপান সমতুল্য হরণ হরিণীরূপ নৈরাশ্রা জ্ঞানমুদ্রা ভাবক অভ্যাস দ্বারা আকর্ষণ করে বলছে, ওহে চিন্ত হরিণ, এই কায়্য বনে কায়্য গ্রহণ পরিত্যাগ করে মহাসুখ কমল বনে যাও। সহজ অবরোধের যোগী স্বচিন্ত হরিণ তাই ধাবমান। ভুসুকু সিদ্ধাচার্য বলছেন মৃঢ় হৃদয় কিঞ্চিৎ উন্মিলন হয় না।

সমীক্ষা

এ পদ্যটি শিকার দৃশ্যের অনবদ্য কবিতা। প্রাচীন কালে ব্যাধগণ জাল ফেলে কিংবা বনের চতুর্দিকে বেড়ি দিয়ে হরিণ শিকার করত। এখানে রূপক হিসেবে বলা হচ্ছে। যেদিন এ পৃথিবী বা ভবসংসার নামক বনে আমি হরিণ নামক হরিণটির আগমন বা জন্ম হল ঠিক সেদিন থেকে আমাকে ঘিরে রয়েছে এসব ব্যাধ। পৃথিবীর আলো-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা অথবা চার দিকের পার্শ্বাশ্রয়িক মায়া নামক শত্রুরা আমাকে শিকার করার জন্য জাল পেতে আছে। শিকার করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে আমার চেহারা সমেত লুফিয়ে ফেলবে সে সব পায়তারা করছে, সে সব অভিসন্ধি অথবা জাল বেড়ি দিয়ে হাঁক ডাক দিচ্ছে। প্রাচীন কালের ধারণা যে, গ্রহদোষে মানুষের বিপদাপদ হয়ে থাকে, মৃত্যু হয়। তাকে বলে ফাঁড়া, কোনও কোনও ধর্মের বিশ্বাসেও এ ধারণাটি ছিল। বৌদ্ধ দর্শনে কর্মফলের কারণে অনুরূপ গ্রহদোষ এবং মার আচ্ছন্ন আক্রমণ প্রতিনিয়ত দেহের ওপর চলছে। ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত চিন্ত হরিণ তার লোভনীয় মাংস নিয়ে কোথাও তাই লুকোতে পারে না। কিন্তু গুরু চরণের কৃপা প্রভাবে ধর্মোপলব্ধি এবং সদগুরু সিদ্ধাচার্য ভুসুকুর বচন বাণে সমস্ত গ্রহদোষ মুক্ত হয়। চিন্তহরিণ সদা চঞ্চল, তার চাঞ্চল্য কিছুতে যায় না, গুরুর বচন বাণে কেবল তার স্থিতি আসে।

মানুষের মনের চাঞ্চল্য তদরূপ, জানে না যে কখন দুঃখ যন্ত্রণা জরা মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, কাল বা মৃত্যু তো অবধারিত, কিন্তু এ মৃত্যু তো বাঁচার মৃত্যু নয়, এ মৃত্যুর পর যে আবার জন্মলাভ করতে হবে। তার থেকে বাঁচার উপায় কী? এ বনে বাস করলে তার থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই। মৃত্যু হলেও আবার জন্ম, আবার দুঃখ-যন্ত্রণা, একমাত্র নিষ্কৃতি হল নির্বাণ। নির্বাণই কেবল চিন্তহরিণকে রক্ষা করতে পারে।

নির্বাণকে সিদ্ধাচার্য রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, কোথাও ডোষী, কোথাও নিরামগি, কোথাও নৈরাশ্রা শরবী, এখানে হরিণী হিসেবে এসেছে। যেহেতু নির্বাণ হচ্ছে একমাত্র দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

লক্ষ্য, একমাত্র প্রিয়; তাকে প্রেমিকা বা নারীর রূপকে ধরা হয়েছে, কারণ তান্ত্রিকরা বামাচারী, নারীই তাদের সাধনবস্তু। তাই চিত্তহরিণের প্রিয় বস্তু হচ্ছে হরিণী, হরিণকে শিকার করতে যারা জাল পেতেছে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হরিণ তার প্রেমিকার সহায়তা প্রার্থনা করল। কিন্তু দুঃখ যে প্রেমিকা নিজের অবস্থান তাকে জানায় নি, আগে জানালে হরিণীর অবস্থানে গিয়ে সে লুকিয়ে থাকতে পারত। এখন হরিণী তাকে বলল, এ বনরূপ কায়া ছেড়ে তুমি পালিয়ে যাও এবং আমার কাছে চলে এসো। হরিণ তার প্রেমিকার তত্ত্ব বুঝতে পারল এবং অচিরাৎ দৌড়ে পালিয়ে কাল গ্রহদোষ থেকে বাঁচল, এমন ভাবে দৌড় সে দিল যে হরিণের মায়াময় তরঙ্গায়িত দেহে আবেগ তুলল এবং তাতে তার খুর একটুও দেখা গেল না। খুরের রূপক হচ্ছে, খুর দ্বারা মাটির ওপর ঠাঁই নেওয়া। খুর দেখা না পাওয়ার ভেতর আরও তত্ত্ব রয়েছে, খুর দিয়ে সে অবিদ্যাকে আঁকড়ে থাকে, বা তা ভর করে থাকে। যখন নির্বাণের দিকে ধাবিত হয় অবিদ্যা ভয়ে পালিয়ে যায়, তাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু কোনও মূর্খ এ কথা বুঝতে পারবে না যদি না বোধিচিহ্ন তাতে সৃষ্টি না হবে, ভুসুকু তাই এ কথা বলছেন। মূর্খ হৃদয় বলতে সিদ্ধাচার্য বলতে চেয়েছেন জাগতিক সুখভোগকারী মদমোহ মাৎসর্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হৃদয়। সে হৃদয় ছেড়ে অবিদ্যা ভয়শূন্য মহাসুখ নির্বাণে উদ্ধারণকারী।

পদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চাইতে জীবন অনুভূতি ও চিরায়ত মানব নিয়তির রূপ ব্যাপকভাবে আত্মাদিত। মানব জীবন চিরন্তন স্রষ্টার আকর, প্রকৃতির বা নিয়তির ক্রীড়নক হিসেবে মানুষ এ ধরাপৃষ্ঠে বিরাজ করছে, নিজের বলতে তার কিছু নেই। অদৃষ্ট বা অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে রঙ্গমঞ্চে সে পুতুল নাচ সাজ করার পর বাস্তববন্দি হয়ে থাকে। সে তাই হরিণ—ভয়ভীতি এবং শিকারীর লক্ষ্যবস্তু। এ থেকে তার নিস্তার নেই। চাইলেও মানুষ তার এ অদৃষ্টকে পরিবর্তন করতে পারে না। তাই কবির উক্তি ‘কাহেরি ঘিনি মেলি আচ্ছহু কীস’—কাকে নিয়ে কাকে ছেড়ে আছ কিসে? এই চিরন্তন নৈরাশ্য নিয়ন্ত্রণ মানব আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে এসেছে। ‘কিসের জন্য আমি, কার জন্য আমি? কাকে নিয়ে আছি, কেন আমার জন্ম, কেন আমার মৃত্যু? এ কথার জন্য দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, বিজ্ঞান সমস্ত জ্ঞান নিয়োজিত। এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। অথচ কেউ এ রহস্যের কুল কিনারা পায়নি, অথবা আসলে এর কোনও রহস্যই নেই। অন্যান্য জীবজন্তু গাছপালা প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ তো তার বাড়া কিছু নয়। কিন্তু অন্যকে যেমন ধ্বংস ও আক্রমণ করে মানুষকেও করে, কিন্তু মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি মেধা যাকে বোধি বলা যেতে পারে, তা দিয়ে তা অনুভব করতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, তার থেকে নিষ্কৃতির উপায় তালাশ করতে পারে। এখানে সদগুরু ভুসুকু পথ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, নির্বাণরূপ হরিণীর আশ্রয় গ্রহণ করতে, সেটাও একটা পন্থামাত্র; তবে যত মত তত পথ। জীবনদ্রষ্টা কবির কয়েকটি উক্তি এখানে উল্লেখ্য, ‘আপনা মাংসে হরিণী বৈরী। তরঙ্গতে হরিণার খুর গ দীসঅ’। প্রথমে পচনশীল মাংস অর্থাৎ ক্ষণিকের মানব জীবন অথচ তাকে ঘিরে শিকারীর আনাগোনার শেষ নেই। মাংস পচনশীল হলেও টাটকা মাংস সুস্বাদু; জীবন বসন্ত সুদৃশ্য কিন্তু ক্ষণিকের, সেটাই অমূল্য। সে জিনিসের জন্য লোভ তো থাকবে সকলের। এ সত্য মাত্র কয়টি শব্দে কবি উদ্ধার করে দিলেন। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরঙ্গতে হরিণীর খুর দেখা যায় না—এটি একটি আধুনিক কবিতার লাইন, ধাবমান বা গতিশীল বস্তুর এমন বর্ণনা প্রাচীন কাব্যে খুবই দুর্লভ। হরিণের দেহের ভঙ্গির সঙ্গে জলতরঙ্গের এই উপমা খুবই সাদৃশ্য নিখুঁত রসানুভূতি ও আত্মতৃপ্তির স্বাক্ষর। কবি-ব্যক্তিত্ব এই একটি কথাতে সম্যক প্রকাশ পেয়েছে। জীবনচিত্রের অন্য একটি প্রসঙ্গ এখানে রয়েছে, মানুষ দুচ্ছিত্তা এবং বিপদগ্রস্ত হলে নারীর কোমল আশ্রয়, সুস্থ বিবেচনা ও সুবুদ্ধির প্রভাবে নিরাপদ থাকতে পারে; তাই তার একমাত্র উপায়। এ কথা কবি পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন হরিণী হরিণকে দিয়েছে।



প্রেট ৪ : ভুসুকু পা

ভুসুকু পা

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ) কবি জীবিত ছিলেন, এই পদটি ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত বলে অনুমান করেন। হিন্দিভাষীরা তাকে বিহারের লোক বলেছেন, সম্ভবত তিনি নালন্দার শিক্ষক ছিলেন। তবে তিনি বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন তার একটি প্রমাণ রয়েছে 'আজ ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী' তাছাড়া তিনি পদ্মানদী ও বাংলার পরিবেশের বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন পদে। মনে হয় ভুসুকু কবির ছদ্মনাম, 'চাষাভুসা'—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একথা লুকিয়ে তিনি এ নাম রাখতে পারেন। এটি সত্যি যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর প্রায় সকলেই পিতামাতার দেওয়া নাম পরিবর্তন করে নতুন নামে পরিচিত হন। তাও হতে পারে। ভুসুকুর রচনাবলীর ভেতর 'সহজ গীতি' ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তে গেলা—যে যে এল সে সে গেল, টীকায়—‘যে যে ভাব উৎপন্নান্তে তে ভাববিলয়ঙ্গতায়।’ অবনাবামন—আসা যাওয়া, উদ্ভবের কারণে বিনাশ, উৎপাতজনিত উদ্ভব বা অহংকারের কারণে বিনাশ; মানুষের জন্য একটা অহংকার বটে, জন্মেই সে চিৎকার করে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে পরে দম্ব করে বলে পৃথিবীটা আমার, সেহেতু বিনাশ। বিষণ্ণ—বিষণ্ণ মন। নিঅড়ি—নিকটে। জিনউর—জিনপুর, জয় করা চিত্ত, চেতনাপুর, বোধি। বটুই—বটে, বর্তে আছে। মো হিঅহি—আমার হৃদয়ে। পইসই—প্রবেশ করল।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

আলিনা কালিনা পথ রুদ্ধ হল।
তা দেখে কাহুর মন ক্ষুব্ধ হল।
কাহু কোথা গিয়ে করবে বাস?
যা সব মনোগোচর সব যে উদাস।
যে তিন তারা সে তিনই ভিন্ন।
বলেন কাহু ভব বন বিচ্ছিন্ন।
যারা যারা এল সব তারা গেল।
এ আনাগোনাতে কাহু বিমনা হল।
কাহুর নিকটে জিনপুর দেখলেই বটে।
বলেন কাহু আমার হৃদয়ে মোকে না মোটে।

গদ্যে রূপান্তর

ভীতিকর কাল লক্ষণ আলিনা লোকজ্ঞান এবং কালিনা লোকভাস দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। কাহু তা দেখে ব্যথিতমনা হলেন। তাহলে কাহু কোথায় গিয়ে বাস করবেন? যেসব স্থান মনের গোচরে আবির্ভূত সেখানে যেতে অনীহা। যে তিন বর্গ—কায়, মন ও বোধি সে তিন তো ভিন্ন ভিন্ন, কাহু তাই বললেন এ ভবসংসারের বিনাশ হল। যারা যারা এসেছিল তারা সব গেল, এ আনাগোনা দেখে কাহুর মন বিষণ্ণ হল। কাহুর নিকটে যে জিনপুর আছে তা তো দেখা যাচ্ছে, কাহু বলছেন আমার হৃদয়ে তা প্রবেশ করতে পারে না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

আলিনা লোকজ্ঞান কালিনা লোকভাস একত্রিভূত অবধূতীর পথ সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করা হল। সদগুরু প্রসাদ প্রাপ্ত প্রকৃতি পরিসুদ্ধা অবধূতিকার এ রূপ দেখে কাহু বিশেষভাবে মনোক্ষুব্ধ হলেন। ভাবলেন, তাহলে বাহ্য ব্যাপকরূপে সুখের ব্যাপ্তি করুণা কোথায় বাস করছে, তাকে কীভাবে পাবেন? সে কারণে করণীয় তন্ময়তা যোগে মনোগোচর মনেন্দ্রিয়বোধ প্রাধান্য অবস্থায় ধর্মে উদাসীন হলেন। বাহ্যে স্বর্গমর্ত রসাতল মাধ্যমে আত্মায় কায়বাকচিৎ দিবারাত্র সন্ধ্যা যোগতত্ত্ববোধে অনন্য মহাসুখ ব্যাপকভাবে ভেদ উপলব্ধি লক্ষণমুক্ত কাহু বললেন ভবক্ষণ ছিন্ন হল। যে যে ভাব উৎপন্ন সে ভাব বিনাশ হল। স্বয়ং মাহাত্ম্য বোধে কাহু পঞ্চক্রম অনুপূর্ব পুনরায় জিনপুর অতীব মহাসুখ পরম সন্নিকটে দেখলেন তথাপি তা চিত্তে প্রবিষ্ট হয় না।

সমীক্ষা

এই পদটি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক মন্ত্রপূত অর্থাৎ সাংকেতিক আচরণে আকৃষ্ট। তাই এর সরল করণীয় ব্যাখ্যা চলে না। টীকাকারদের টীকায় ও সংশয় ও মনপ্রসূত তত্ত্ব কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রীয় উদ্ধারণ যে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে, তাতেও সবটা স্পষ্ট নয়। সিদ্ধাচার্যদের সাংকেতিক শব্দ ও আচরণের প্রতি তাঁরা কতটা আমাদের কাছে পরিচিত বোঝা যায় না। যেমন আলিএ কালিএ এবং 'তে তিনি' এ ধরনের বাক্যাংশ স্মৃতিশ্রুতি আগম পুরাণ অভিধানে তা বিশিষ্টার্থক অর্থে প্রকাশিত নয়। তিব্বতি অনুবাদে আরও জটিলতা দেখা দিয়েছে, তাদের ভাষা ও মতামতের নিয়মের অনুবাদ হওয়ায় চর্যাচরিত্র আরও সংকটাপন্ন হয়েছে। পণ্ডিতদের এই বিতর্কিত মতের অনুকূলে একটা গূঢ়ার্থ প্রশমন দেখা দিলেও এখন তা পরিষ্কার নয়। টীকাকার এর ভাষা প্রাকৃত সাক্ষ্য ভাষা উচ্চারণ করে বিভ্রান্তি আরও ছড়িয়েছেন। সিদ্ধাচার্যরা এর অনুকূলে বলেছেন 'মৃঢ় হৃদয়ে' এ কথা অনুধাবন করা যাবে না।

তবু এ চর্যার চরিত্রে যেটুকু অভিজ্ঞান স্পষ্ট হয়েছে তাই এখানে বলার প্রয়াস আছে যে দুটো শব্দে ইংগিতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় 'আলিএ কালিএ' এ লোকজ্ঞান ও লোকভাস তাহলে কী? লোকের জ্ঞান ও ধারণায় যা ধৃত, দীর্ঘধারণ কথায় আমরা 'অনুজ্ঞান' বা বিষয়ানুভূতির শিক্ষাকে যে কেউ সহজে অনুধাবন করতে পারে, তার প্রভাবে সংসারে লোক সতত ধাবিত, অন্য যে দিব্যজ্ঞান বা ধর্মজ্ঞান তা লোকজ্ঞানের চাইতে আলাদা, সকলের চিত্তে এ জ্ঞান স্ফুট হয় না। তেমনি লোকভাস বা লোকবুদ্ধি একইভাবে উৎপন্ন, ধর্মবুদ্ধি অনুভূত হওয়ার আত্মা কদাচিত্ত থাকে। বজ্রাচার্য কাহু পা ইংগিতময় শব্দে বলতে পারেন আলি কালি প্রভাবে নির্বাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। জীবনে যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে বিষয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি লোকজন্য হতে যায় না, সুতরাং এই লোকজন্মের ক্রম ব্যাপ্তি নির্বাণ লাভে বাধা। জন্ম মানব জীবনে একে সিদ্ধাচার্য কাহু বিষণ্ণ, কী করে জন্মমুক্ত হতে পারেন এটাই তাঁর বিষণ্ণতার কারণ। সিদ্ধাচার্য কাহু পা এ জীবনের ভেতর এমন কী সাধনা গৃহ নির্মাণ করবেন যেখানে নির্বাণ মনোগোচর হয়। কিন্তু সমস্যা হল, যা তার মনোগোচর—তাতে ধর্মপক্ষে উদাসীনতা দেখা দেয়। তিনি এ পদ বা কাব্য নিয়ে কোথায় যাবেন? কে পড়বে তার কবিতা, সকলই তো উদাসীন। কবিতা মানে হৃদয়ানুভূতি।

তাহলে তিনের শরণ নিতে হবে। এ তিনও ইংগিতময় শব্দ। এ তিন কী কী? এটা যদি ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ তাহলে একটা উপায় আছে যদি এ তিন অভিন্ন হয়, যদি ভিন্ন হয়, স্বর্গমর্ত রসাতল কিংবা কায় মন বাক হয়, তাহলেও কিন্তু ভবসংসারের বিনাশ হয়। ভবসংসারের বিনাশের ফলে এজন্য মহাসুখ লক্ষণযুক্ত। যে যে সংসারে এল সে সে চলে গেল; এ আসা-যাওয়ার কারণে কাহুর মন বিষণ্ণ। কেনই বা জন্ম আর অহেতু কেনই বা মৃত্যু, জরা দুঃখ যন্ত্রণা। যে ভাবে উৎপন্ন তার বিনাশ হল। কাহু জানে যে জিনপুর বা নির্বাণ নিকটে তবু তা চিত্তে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে সমর্থ হন না।

খুব সহজ কথায়, আলি কালি সাধনা পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে যাতে নির্বাণ বাধা-প্রাপ্ত হয়। কাহু বোধিচিত্ত লাভ করে এ দশা দেখে বিষণ্ণমনা হলেন তাহলে তিনি কোথায় যাবেন? তিনি জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে দেখলেন অন্য সব স্থান মহাসুখের পক্ষে অন্তরায়, তাই তিনের অভিন্ন শরণ নিয়ে বস্তুজগতের বিনষ্ট হওয়াকে ত্যাগ করলেন। এ মোহজাল ছিড়ে

দেখতে পেলেন এ জীবনের আনাগোনা নিরর্থক, কারণ যে এখানে আসে তাকেই যেতে হয়। অথচ জিনপুর-রূপ নির্বাণকে চিনতে পারে না। গুরুর দয়ায় জিনপুরে প্রবেশ হওয়া যায়।

এদিকে কবি জগতের অনিত্য সম্বন্ধে সচেতন, তিনি বললেন, যারা এল তারা সবাই গেল, যারা জগতে এখন রয়েছে তারাও যাবে এবং যারা ক্রমশ আসছে তাদেরও একই দশা হবে। তবু তারা এ কথা জানে না যে জিনপুর রয়েছে তাদের নিকটে, সহজেই বা সহজানন্দ দিয়ে তাতে প্রবেশ করা যায়, অথচ কী দুর্ভাগ্য তাদের হৃদয়ে জিনপুর প্রবেশ করে না। লোকজ্ঞান ও লোকভাস সম্বন্ধে কবির ধারণা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ এ শ্বাস প্রশ্বাসে চালিত হয়ে তারা বর্তে থাকে। এ পথকে রুদ্ধ করে দিতে হবে।

জিনপুর নিকটে—এ তত্ত্বদর্শনের স্বপক্ষে কবির উপলব্ধি স্পষ্ট, আমার ভেতর যে বোধিচিন্তা রয়েছে তাই জিনপুর, কিন্তু হৃদয় তো তাতে প্রবেশ করতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকে পরবর্তীকালে বাউল দর্শনের সূত্রপাত। মনের মানুষ বা মানুষ গুরুর সন্ধানে সাধক ছুটেছেন, কিন্তু সাধক জানেন না যে তাঁর নিজের ভেতরই রয়েছে সেই মানুষ, তাকে চিনতে পারলে সব সাধনের শেষ। সেই মানুষ নিকটে থেকেও দূরে, কারণ চিন্তা তখন তাতে প্রবেশ করতে পারে না। চিন্তা প্রবেশ করতে না পারার কারণ আলি কালি সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।



প্রেট ৫ : কাহু পা

কাহু পা

প্রাপ্ত পঞ্চাশটি চর্যার ভেতর তেরটি পদ হচ্ছে কাহু পা রচিত, অর্থাৎ সর্বাধিক পদ। বিভিন্ন পদে একই নাম না থাকায় পণ্ডিতেরা প্রথম দিকে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, যেমন টীকায় উল্লিখিত কৃষ্ণচর্যাপাদানং, কোথাও কৃষ্ণ পা, কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণবজ্রপাদ, প্রাকৃত ভাষার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বাংলা) কাহু পা, কাহু পা; এমন কী কণহ পা নামও পাওয়া গেছে। কাহু পা সর্বদা শ্রদ্ধেয় এবং জ্ঞানী ছিলেন, তিনি ৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সে সময়ে বাংলার রাজা দেবপালের রাজত্ব। তবে কাহু পা বাংলার অধিবাসী না বলে পণ্ডিতরা একমত। তিনি কর্ণাটকবাসী, নালন্দায় পড়ালেখা করতে এসে আর নিজ অঞ্চলে ফিরে যান নি, বাকি জীবন সাধনা এবং আচার্য জীবন যাপন করেছেন। নালন্দার শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে থেকেছেন এবং জ্ঞান বিতরণ করেছেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন, অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে দোহাকোষ, অসম্বন্ধ দৃষ্টি, বজ্রগীতি, গীতিকা, মহাট্টন, বসন্ততিলক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চর্যা-৮
রাগ দৈবক্রী
কামলি পা

[Faint handwritten Devanagari script across the bottom margin.]

পাঠান্তর

১. ভরতী। ২. নাবি। ৩. মহিকে ঠাবী। ৪. গম্ব। ৫. কামলী। ৬. বহুউই। ৭. খুঁটি।
৮. মেলিলী। ৯. কাচ্ছি, কাছি। ১০. মঙ্গত। ১১. চড়িলে, চনহিলে। ১২. চাহই।
১৩. কে আল, কেড়আল। ১৪. পারই। ১৫. মাগা, মাঙ্গা। ১৬. সঙ্গা, সাঙ্গা।

শব্দার্থ ও টীকা

সোনে—সোনা, শূন্য। বৌদ্ধদর্শনে শূন্য সোনার চেয়েও দামি। শূন্য করুণা ডেবী ইত্যাদি সিদ্ধাচার্যদের সাধনবস্তু, এখানে ধ্বনি সাদৃশ্যে সোনা ও শূন্য বিশেষ অর্থবোধক। বৌদ্ধদর্শনে আবার শূন্যপদ-একমাত্র লক্ষ্য এবং সত্য। শূন্য থেকে বিকাশ এবং শূন্যে বিলীন হয়ে নির্বাপ লাভ করা। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ্য যে, অন্য ধর্মমতের সঙ্গে দান্যার পাঠক এক হও! ~~~~~ www.amarbol.com ~~~~~

এ শূন্য নিয়ে বৌদ্ধদের পার্থক্য রয়েছে, ব্রহ্মা কিংবা নিরাকার ঈশ্বর থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি এবং তার কাছে আবার ফিরে যাওয়া, এ মতের সঙ্গে বৌদ্ধ তাত্ত্বিকদের একটা যোগসূত্র পরবর্তীকালে স্থাপিত হয়েছিল, যারা সহজযানি তাত্ত্বিক তাদের শূন্য উপাস্য হিসেবে করুণা (নিরঞ্জন), নিরামগিতে রূপান্তরিত হয়ে নারীরূপ পরিগ্রহ করেছিল। নিরঞ্জন ও নিরামগি পুরুষ ও প্রকৃতি (ব্রহ্মা ও মায়্যা) এ মতবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভরলী—ভর্তি হল। করুণা—নৈরাশ্রা, নির্বাণ। নাবী—নৌকা। খোই—রাখা। ঠাবী—ঠাই। রূপা—রৌপ্য, গূঢ়ার্থে—রূপবেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞানাদি নাম ও স্থান ভেদ, জাগতিক দ্রব্য। বাহতু—বেয়ে যাও। কামলি—কবির নাম, তাঁর প্রকৃত নাম কমলাস্বর পাদ, মনে হয় কবি কেবল কমল পোশাকই পরিধান করতেন। সিদ্ধাচার্যরা সাধারণত গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করেন, তিনি বোধহয় পশমি মোটা কমলই ধারণ করতেন। গঅন—গমন। উবেসেঁ—উদ্দেশ্যে। গেলী জাম—গত জন্ম। বহুড়ই—ফিরে আসা, টীকায়—‘জন্যান্তরং ব্যাঘুটতীত্যর্থং’। জন্যান্তর দ্বারা বার বার ফিরে আসা, ব্যাঘুটতীত্যর্থ>ব্যাঘুটতি>বহুড়ই, প্রত্যাবর্তন করা। কইসোঁ—কেমন করে। খুন্টি—খুঁটি, নৌকা বাঁধবার কাঠের খোটা। উপাডী—উপড়ে ফেলা। টীকায়—খুন্টিকা আভাস দোষ; গুরু বাক্য দৃঢ় করা থেকে উপড়ে আসা। মেলিলি—মেলে দিল, খুলে দিল। কাচ্চী—কাচ্চি, ঈশ্বরের রশি। মাঙ্গত—মার্গেতে, এখানে নৌকার সামনে বা পেছনের অংশ গলুই। চড়লিলে—চড়লে, চতুর্দিশ—চারদিক। টীকায়—মার্গে বিরামানন্দং গতা চতুর্দিশং যানাদি বিণা সংসারে পড়তি। কেডু আল—দাড় বা বৈঠা। বাহবকে—বাইতে। মীটা—প্রার্থনা করা। বাটত—পথে। সঙ্গা—সঙ্গ, মিলন, বিবাহ (সাক্ষা) নৈরাশ্রার সঙ্গে মিলন।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

সোনায়ে ভরা করুণার নাও।
 রূপা রাখি ঠাই নেই তাও॥
 কামলি বেয়ে চল গগন উদ্দেশ।
 না ফিরে আসে যেন গতজন্ম রেশ॥
 খুন্টি উপড়ে খুলে দাও কাচ্চি।
 কামলি বেয়ে চল সদগুরু যাচ্চি॥
 মার্গে চড়লে চারদিক চেয়ো।
 দাঁড় নেই বাইতে পারে কেউ?॥
 বামডান চেপে মিলে বেচে ক্ষণে।
 পথে মিলন হল মহাসুখ সনে॥

গদ্যে রূপান্তর

সোনায়ে ভরা করুণার নৌকাখানি, রূপা রাখার ঠাই তাতে নেই। কামলি পা গগন উদ্দেশ্যে এ নৌকা বেয়ে চলুন, গতজন্ম যেন ফিরে আসতে না পারে। খুঁটি উপড়ে কাচ্চি খুলে দিন, সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে কামলি পা বেয়ে চলুন। নাও মার্গে চড়লে চারদিক লক্ষ্য করুন, দাঁড় নেই কে আর বাইতে পারে? বাম ডান চেপে পথ মিলিয়ে দেখুন, পথে মহাসুখের সঙ্গে মিলন হয়ে যাবে।
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

সোনা রূপ নির্বাণ ভরা করুণার বোধিচিন্তা রূপ নৌকা, এ উৎপ্রেক্ষা অলংকার বোধক সদগুরু প্রসাদ রসযুক্ত মহাসুখ চক্র গমন সমুদ্র উদ্দেশ্যে সংবোধ্য সিদ্ধাচার্য কমলি বেয়ে চলেছেন। রূপবেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞানাদি বা মোহমায়া কাম রূপ জাগতিক দ্রব্যাদি রাখার স্থান নেই। এ জন্য বেয়ে যাচ্ছেন যে কোনও উপায়ে যেন সিদ্ধাচার্য গত জন্মান্তর ফিরে আসতে না পারে সে দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। খুঁটি আভাসদোষ উপড়ে অর্থাৎ গুরু বাক্যে দৃঢ় চিন্তে বলবান হয়ে সংসার রূপ মৃত্তিকায় পোতা খুঁটি উপড়ে ফেলেছেন। মার্গে চড়লে বিরামানন্দ পাওয়া চতুর্দিকগ্রাহ্য বিনা সংসারে আবার পতিত হতে হয়। বামদক্ষিণ আভাসদ্বয়ের মাঝে মায়া প্রবেশ করে কিন্তু মার্গে বিরামানন্দ বোধিচিন্তা নিজ জ্ঞানে পরিশোধিত হয়। মহাসুখ চক্রসমুদ্র উদ্দেশ্যে যেমন মিলিত হওয়া যায় তেমনি মার্গে মহাসুখ সঙ্গ নৈরাশ্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

সমীক্ষা

এ পদের প্রথম দুটি লাইন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, রূপকের ভেতর রূপক। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতা লেখার পর বিপদে পড়লেন, নানা রকম ব্যাখ্যা হতে লাগল কবিতার, শেষে কবি নিজে একটা ব্যাখ্যা রেখে সব মুখ চেপে ধরতে পারলেন। কিন্তু সেটা কী ব্যাখ্যা আজও কেউ ভালোভাবে জানে না। এ পদটিতেও রয়েছে সে দশা, আর উভয় কবিতা নৌকা বিষয়ক। নৌকা বাংলার প্রাণ, নৌকায় চেপে পার হওয়া সহজ, নৌকাডুবিও সহজ। রবীন্দ্রনাথ নৌকায় সোনার ধান সাজিয়েছিলেন, যা নাকি মানব জীবনের ফসল। সিদ্ধাচার্য কামলি নৌকায় সোনা ভরিয়েছেন আর ঠাই নেই ঠাই নেই যত বড় হোক এ তরী, সবটা শূন্য শূন্য বা সবটা সোনাশূন্য। ধান যদি জীবনের ফসল হয়, সোনা হল জীবনের সৎকর্মের ফল, যা দিয়ে নির্বাণ অর্জন করা যায়। নির্বাণের জন্য চাই শুধু শূন্য, অর্থাৎ সহজানন্দ, মোহ কাম মল ইত্যাদি শূন্য বোধিচিন্তা, এই যদি নৌকায় ভরা হয় তার পার্থিব আর কোনও রূপ বা রূপার স্থান তাতে হবে না। এই সোনাতে কোন খাদ থাকবে না, অমৃতে কোনও গরল থাকবে না। এ নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, সৌন্দর্যের ভেতর আর কিছু নেই। সিদ্ধাচার্য কবি কামলির চেতনায় এই সূক্ষ্ম অনুভূতি বিরাজ করছিল, তাই তিনি বলেছিলেন রূপার ঠাই নেই। প্রেম যদি পরিপূর্ণ হয় সেখানে কী তিল প্রমাণ অপ্রেম চলে? নির্বাণের বিনিময়ে এতটুকু খাদ তাই চলবে না।

এমন একটি তরঙ্গী বেয়ে যেতে হবে কামলিকে নৈরাশ্ব্যর কাছে, সমস্ত অর্ঘ্য তাকে তুলে দিতে হবে যাতে করে গতজন্মের দুঃখ যন্ত্রণা মোহসহ ইন্দ্রিয়জ কর্মফলের দরুণ আবার জন্ম লাভ না ঘটে, আবার জরা মৃত্যুর অধীন হতে না হয়। সে নৌকাকে বেয়ে নিয়ে যেতে হবে, পৃথিবীর মাটিতে পুঁতে রাখা খুঁটি উপড়ে বন্ধন সূত্র খুলে এবং সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে সেই নৈরাশ্ব্য অবস্থান জেনে তার উদ্দেশ্যে ছুটতে হবে। নৌকায় উঠলে পরে গলুই থেকে সমস্ত আশপাশ দেখে জানা যাবে যে এ নৌকার দাঁড় নেই, কেউ এ নৌকা বাইতেও জানে না, অর্থাৎ এ নৌকা বেয়ে নেওয়া সহজসাধ্য নয়। সদগুরুর কৃপায় বাম ডান চেপে পথ মিলিয়ে দেখে সমস্ত তত্ত্ব জেনে নৌকা চালালে মহাসুখের সঙ্গে মিলন হয়ে যাবে। অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হবে। অন্য একটি চর্যায় ভবনদী পার হবার কথা বলা হয়েছে, এ চর্যায় অনুরূপ ভবনদী নৌকায় পাড়ি দিতে হবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হিসেবে এখানেও

যন্ত্রণা ও ইন্দ্রিয়জনিত দুঃখের জলধারা বেয়ে শূন্য সম্পদ বা সোনা ভরা নৌকা বেয়ে এ জগত সংসার হতে পার হতে হবে। সদগুরুর উপদেশ মত কৌশল ও সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলে ঝড়ঝঞ্ঝা এড়িয়ে যেতে পারবে; নৌকায় দাঁড় নেই মাঝি নেই, গুরুর কৃপা হচ্ছে তাই, এই কৃপাকে অবলম্বন করতে হবে। বাম ডানের কত মোহ, কত বিপদ আপদ সব তুচ্ছ করতে হবে; আর এভাবে চালিয়ে গেলে নির্বাণ লাভ অনিবার্য।

আধ্যাত্মিক এই ব্যাখ্যা ছাড়াও এই পদে তৎকালীন জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ চিত্রের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। মনে হয় বাঙালি স্থিতি জীবন থেকে উপড়ে একটা সমৃদ্ধ জীবনে নিতে চাইছে। জীবন নিস্তরঙ্গ ছিল না, দুঃখ যন্ত্রণাময় ছিল। যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা। নৌকায় বাহিত বাণিজ্যিক সওদা বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রে আনা নেওয়া হত, সোনার দুস্প্রাপ্যতা ও মূল্যমানের প্রতীক যা এখনকার জীবনেরই মত।

বাংলার কবিদের চিরজীবনের কাব্য সৃষ্টির শব্দ চয়ন, ভাবকল্পরচন কিংবা উপমা উৎপ্রেক্ষা সংযোজন বাংলার নৌকা এবং নৌকা বাহিত জীবনকে নিয়ে লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবি এই উপাদানকে তাঁদের কাব্যের উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এই নৌকা দিয়ে যেমন বাস্তব জীবনের চলাচল, কল্পনাজীবন এমন কী পর জীবনেও এই নৌকার রূপক উপাদানগুলো এসে গেছে। এ যেমন দেহতরী, তরীর অন্যান্য অংশ গলুই, দাঁড়, বৈঠা, মাঝি, সেইতি, হাবুইভ্যাতি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। কবিতার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিরা ভ্রাতাই স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন। নৌকার বাদাম তুলে বাতাসের বেগে যাওয়া যেন স্বপ্নের মত উড়ে যাওয়া, তার সঙ্গে ভাটিয়ালি সুরে গান রহস্যময় জীবনাস্বাদের অনুমেদন, বাঙালি জীবন চিরদিনই এর জন্য আকৃষ্ট।



কামলি পা

কমলাস্বর পা দেবপালের সময় জীবিত ছিলেন বলে পণ্ডিতরা মনে করেন অর্থাৎ ৮০৯ থেকে ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর, তবে তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। তাঁর নাম থেকে একটা ধারণা জন্মে যে তিনি হয়তো বা গেরুয়া কমল পরিধান করতেন। কমলকে সাধারণ ভাষায় কামেলি বলে, সে থেকে কামলি পা। তিনি কাহ্ন পা'র শিষ্য ছিলেন বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। তিনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। তৎকালে বাংলা ও উড়িষ্যার ভাষার আলাদা কোনও রূপ ছিল না।

চর্যা-৯

রাগ পটমঞ্জরী

কাহ্ন পা

এবংকার দিড় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বাক্কন তোড়িউ।
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিত।
জিম জিম করিণা করিণিয়ে রিসঅ।
তিম তিম তথতা মতগল বরিসঅ।
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ণ ছুধ।
দশবল রঅন হরিঅ দশ দিসে।
বিদ্যা করি দমকু অকিলেসে।

এবংকার দিড় বাখোড় মোড়িউ।

বিবিহ বিআপক বাক্কন তোড়িউ।

কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।

সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিত।

জিম জিম করিণা করিণিয়ে রিসঅ।

তিম তিম তথতা মতগল বরিসঅ।

ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।

ভাবাভাব বলাগ ণ ছুধ।

দশবল রঅন হরিঅ দশ দিসে।

বিদ্যা করি দমকু অকিলেসে।

7th ----57page ----1

9th----65page----2

10th ---68-----3

11th---74-----4

12-----79-----5

13-----82-----6

18---104-----7

19---108-----8

36---163-----9

40--177-----10

42---184----11

45---192----12

পাঠান্তর

১. এহিবিহি। ২. বাখোড়। ৩. মোড়িউ, মোড়িঅ। ৪. তোড়িঅ। ৫. কাহ্ন।
৬. বিলাসিঅ, বিলসই। ৭. মাতী। ৮. নিবিত, নিবাতা। ৯. করিয়া, করিঅ।
১০. করিনীতে। ১১. রিসংই, রিঅ। ১২. বরিসই। ১৩. ছড়গই। ১৪. সুধ, সুদ্ধ।
১৫. ছুধ। ১৬. দশবব, দশবর। ১৭. বিদ্যাকরিকু, বিদ্যাদমকু, অবিদ্যা করিকু।
১৮. দমকু। ১৯. অহিলেসে।

total 13 poem by kanha pa
but i have got 12 poem

শব্দার্থ ও টীকা

এবংকার—সময়জ্ঞান; মাত্রাজ্ঞান, দিবারাত্রিজ্ঞান; 'এ'কার চন্দ্র আভাস 'বংকার' সূর্য (নাড়ি); বাহ্যিক আচরণ; 'এ'কারং চন্দ্রাভাসং বংকারং সূর্য উভয়ং দিবারাত্রি জ্ঞান'।
দিড়—দৃঢ়। বাখোড়—সুস্তদুটি; বাখোড় সুস্ত হল হস্তি বাঁধার আলাদা বা খুঁটি। মোড়িউ—
ভেঙে ফেলে, দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarbol.com

বিলসঅ—বিলাস করে। আসব—মদ্য। মাতা—মত্ত। আসবমাতা—‘ত্রয়াণামনুপলংভাস্ব’
 পানের জন্যপ্রমত্ত। সহজ নলিনীবন—সহজানন্দ রূপ মহাসুখ পদ্মবন। পইসি—প্রবেশ
 করে। নিবিতা—নিবৃত্ত, নিক্কল্লকারেঁ ত্রীড়নীতি’ নিশ্চিত শূন্য লাভ অবস্থায়। জিম
 জিম—যেমন যেমন। করিণা—হস্তি, হাতি। করিণিরে—হস্তিনীকে; রূপকে জ্ঞান গজেন্দ্র
 কাহু পা তাঁর ভগবতী নৈরাশ্বা সঙ্গে ত্রীড়া। রিসঅ—হিংসে, রিষ, কামাসক্ত হয়ে হিংস্র
 হওয়া। তিম তিম—তেমন তেমন। তথতা—তথাস্তু, নির্বাণ। মঅগল—মদকল, কামাসক্ত
 হেতু হাতি যে কলধনি করে, মত্তহাতি। বরিসঅ—বর্ষণ করে। মদকল বর্ষণ—হাতি
 কামাসক্ত হয়ে কলধনির সঙ্গে শূড় দিয়ে হাতিনীর গায়ে জলবর্ষণ করে। ছড়গই—
 ষড়গতি, ষড়ভিজ্জাতি, বুদ্ধের নির্দেশিত গতিপথ—দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদির বিষয়ে
 অণ্ডজা, জরায়ুজা উপপাদুকা, সংস্কারজা দেবাসুরাদি প্রকৃতিকা; অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি অণ্ডজ
 জরায়ুজ ইত্যাদি। সঅল—সকল। সহাবে—স্বভাবে। সুধ—শুদ্ধ। ভাবাভাব—ভাব ও
 অভাব; স্থিতি ও ধ্বংস, বাঁচা ও মৃত্যু, অর্থাৎ অন্তর্জ জরায়ুজ ইত্যাদি সর্বভাবে স্বভাব
 পরিশুদ্ধ সিদ্ধাচার্য। বলাগ—বলাগ্র, কেশের অগ্রভাগ। সুধ—ক্ষুদ্র, বিচলিত। দশবল—
 বৌদ্ধজ্ঞানের দশ অধ্যায়, দান শীল, ক্ষমা বীর্য ধ্যান যজ্ঞ বল উপায় প্রণিধি ও জ্ঞান এই
 দশবলে বুদ্ধ বলীয়ান ছিলেন। টীকায়—‘দশবল বেশবিদ্যাগি গুণযুক্তং তথতারঅং।’
 রঅন—রতন, রত্ন। হরিঅ—হরিত, অপহরণ করা। দশ দিসেঁ—দশদিকে। বিদ্যাকরি,
 বিদ্যাকরী, টীকায়—অবিদ্যাকরী, মায়া প্রপঞ্চ ইত্যাদি। দম—দমন, দমক—দমন করা
 হল। অলিকেসেঁ—অক্রেশে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

এ ও বংকার দৃঢ় খুঁটিদ্বয় মুড়ে।
 বিবিধ ব্যাপক আরও বন্ধন তোড়ে॥
 কাহু আসব মত্ত হয়ে বিলাস করে।
 সহজ কমলবনে প্রবেশ নিশ্চিত করে॥
 যেমন যেমন হস্তি হস্তিনীতে রমে।
 তেমন তেমন তথতা মদগল বর্ষণে॥
 ষড়গতি সকল স্বভাবে শুদ্ধ।
 ভাব অভাবের কেশাগ্র নয় ক্ষুদ্র॥
 দশবল রত্ন দশদিক হরল।
 বিদ্যাকরী দমন অক্রেশে হল।

গদ্যে রূপান্তর

চন্দ্র ও সূর্য নাড়ি দুটির দৃঢ় খুঁটিদ্বয় ভেঙে বিবিধ ব্যাপক আরও যত বন্ধন মোচন করে কাহু
 আসবে প্রমত্ত হয়ে বিলাস করে এবং সহজ কমল বনে প্রবেশ নিশ্চিত করে। যেমন করে
 হস্তি হস্তিনীরে কামার্ত হিংস্র হয়ে উপগত হয় তেমন করে মদগল বর্ষণ করে। ষড়গতির
 সবগুলোকে স্বভাবে শুদ্ধ করে নেয়। ভাব অভাব নামক স্থিতি ও ধ্বংসের জন্য কেশাগ্রও
 বিচলিত নয়। দশবল রত্ন (বুদ্ধ) চারদিকে হরণ করল এবং বিদ্যাকরীকে অক্রেশে দমন
 করল।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

গজেন্দ্র চিত্ত কাহ্ন পা একার চন্দ্র ভাস বংকার সূর্য উভয় দিবারাত্রিজ্ঞান আলান স্তম্ভদ্বয় উপড়ে ফেলে বজ্র আক্রমণ এবং অপরাপর বিবিধ প্রকার অবধূতীর ব্যাপক বন্ধন মোচন করে অর্ণা, মনু ও পল এ তিন রকম আসব পান করে প্রমত্ত জ্ঞান গজেন্দ্র নলিনী বনে মহাসুখ কমলের সঙ্গে নির্বিকল্প চিত্তে ক্রীড়া করছেন। বাহ্যত হস্তি হস্তিনীকে যেমন করে রমণ করে স্বীয় ভগবতী নৈরাশ্রার সঙ্গে তদরূপ করে তথতা মদ্য বা মদগল বর্ষণ করেন। অণ্ডজ জরায়ুজ ইত্যাদি প্রকৃতি সর্বভাবে স্বভাবে পরিশুদ্ধ হল। কেশাশ্র পর্যন্ত বিচলিত নয়। দশবল বেশারদ্যাদি গুণযুক্ত তথতারতু দশদিক ব্যাপক অনুভব অভ্যাস বলে হরণ করলেন। অতএব তথতারতু প্রভাবে অবিদ্যাকরীকে অক্লেশে দমন করা গেল।

সমীক্ষা

এই চর্যাটি নিতান্ত আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক মন্ত্র বিশেষ। তবে এখানে মানবিকতা বা লৌক্য অনুভূতিও কম নয়। যখন কামার্ত হয়ে হস্তি নলিনী বনে প্রবেশ করে হস্তিনীর সঙ্গে রমে এবং মদকল বর্ষণ করে, সে রকম দৃশ্যপাত ও তুলনা এখানে এসেছে, নৈরাশ্রার সঙ্গে গজেন্দ্রচিত্ত কাহ্নর মিলন প্রসঙ্গে। এই রূপকাশ্রয়ী চিত্র থেকে বলা হচ্ছে নির্বাণ লাভ করতে হলে মদস্রাবী হস্তির মত চরিত্র ও আচরণ করতে হবে।

প্রাণীজগৎ বিশেষত পশুদের ভেতর একটা নির্দিষ্ট সময়ে মিথুনলগ্ন থাকে, এ সময় নর আর মাদী পশুর দেহ থেকে কামস্বেদ প্রবাহিত হলে একে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়। সাধারণত হাতির শরীর থেকে মদস্রাবিত হয়, তখন সে মদকল বর্ষণ করে এবং কামার্ত হয়ে মত্ততা হেতু কলধ্বনি করতে থাকে। হস্তি হস্তিনী এ সময় পদ্ববনে প্রবেশ করে, পদ্ববন তসনস করে কাম নিপাসা নিবারণ করে। সাধারণত আর কোনও প্রাণী এতটা প্রমত্ত কিংবা এমন ভয়ঙ্কর আচরণ করে না।

কাহ্ন পা এ দৃশ্য থেকে শুধু কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন নি, তিনি মন্ত্রশক্তির ভেতর তা প্রয়োগ করিয়ে উদ্ভুদ্ধ করছেন। যখনই হস্তির শরীর কামে নিষিক্ত হয় বন্ধন খুঁটি ফেলে, শিকল ছিঁড়ে ফেলে; দুর্বীর শক্তি তার দেহে সঞ্চারিত হয় এবং তা নিয়ে কামক্রীড়ায় রত হয় পদ্ববনে। কবি বলেছেন এ কার এবং বংকার নামক দু'হাতির বন্ধন ছিঁড়ে এবং আরও বিবিধ প্রকার বাধা-বিপত্তি উপড়ে ফেলে ঠিক যেন মত্তহাতি পদ্ব বনে তাঁর কাঙ্ক্ষিতা নৈরাশ্রার সঙ্গে মিলিত হবেন। কবি নৈরাশ্রা বা নির্বাণকে প্রেমিকা করেছেন, সে নিরামণির সঙ্গে রমণে রত হবেন। কিন্তু তার আগে এই হস্তিরূপ মদমত্ততা অর্জন করতে হবে, বলীয়ান হতে হবে। কী কী করলে এমন মত্ততা দেখা দেয়? ষড়্গতির সকল স্বভাবে শুদ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধ হতে হবে, ভাব অভাবের অবস্থা বা স্থিতিধ্বংস—বাঁচা মৃত্যুতে কেশাশ্রকেও যেন বিচলিত না করে। এ ষড়্গতি হচ্ছে বুদ্ধ প্রদর্শিত ষড়্মার্গ আর ভাব অভাব হচ্ছে জাগতিক জীবনে ইন্দ্রিয় আসক্তিয়ুক্ত মোহমায়াচ্ছন্নতা, এরা যেন চিত্তের ভেতর অবস্থান করতে না পারে বা কোনও রূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। কবির বর্ণনা মতে কেশাশ্র স্পর্শ না করে এমন অবিচল চিত্ত চাই।

বুদ্ধের আদর্শ দশবল যেমন দানশীল ক্ষমা বীর্য ধ্যান বল যজ্ঞ উপায় প্রণিধি ও জ্ঞান, এ দশবল বুদ্ধের আশ্রয় ছিল তাই তাঁকে দশবল রত বলা হয়। এই দশবল রত্নের প্রভাবে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

প্রতিভাত হয়ে চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করতে হবে। তাহলে কেবল মদবল শক্তিসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। এ শক্তির দ্বারা অবিদ্যাকরীকে অনায়াসে দমন করা যাবে, কারণ এই অবিদ্যাই হল নির্বাণের অন্তরায়।

এই পদটিকে মন্ত্র বলা হচ্ছে এইজন্য যে সম্পূর্ণ কবিতাটি হল তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম আদর্শ পালন ও বাম ডান না হেলে সঠিক পথে পরিক্রমণের ব্যাপক অনুভব অভ্যাস বল বা আচরণ। এর কাব্যিক ঐশ্বর্য হয়তো যৎসামান্য, কিন্তু যতটুকু আছে তা তীক্ষ্ণ এবং তীব্র মত্ত হাতির ভাব প্রসঙ্গ। মত্ত হাতির সুতীব্র কামস্রাবী বর্ণনা থাকলেও এখানে তা কঠোরভাবে দমনের উপায় রয়েছে। দেবীর নগ্নমূর্তির সামনে ভক্তবৃন্দের অবনত দৃষ্টি ও তদগত চিন্তের স্তোত্র উচ্চারণের মত।

নলিনীবলে মত্তহাতির প্রসঙ্গ বাংলা কবিতায় পরবর্তীকালে বার বার এসেছে।

চর্যা-১০

রাগ দেশাখ

কাহু পা

১০. মো. মই দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarbol.com

নগর^১ বাহিরে^২ ডোষী^৩ কান্ধারি কুড়িআ।

ছই ছোই^৪ জাইসি^৫ ব্রাহ্ম^৬ নাড়িআ ॥

আলে^৭ ডোষী তো^৮ সম করিবে^৯ স^{১০} সাজ^{১১}।

নিধিন কাহু কাপালি জোই লাঙ্গ^{১২} ॥

এক সো^{১৩} পদমা চৌসঠা^{১৪} পাখুড়ী^{১৫}।

তহি চড়ি নাচঅ^{১৬} ডোষী বাপুড়ী^{১৭} ॥

হালো^{১৮} ডোষী তো পুছমি সদভাবে^{১৯}।

অইসমি^{২০} জাসি ডোষী কাহারি^{২১} নাবে ॥

তান্তি বিকণঅ^{২২} ডোষী অবর গ চাঙ্গেড়া^{২৩}।

তোহোর অন্তরে^{২৪} ছাড়ি নড়পেড়া^{২৫} ॥

তুলা^{২৬} ডোষী হাঁউ^{২৭} কপালি।

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি^{২৮} হাড়েরি মালী ॥

সরবর ভাঞ্জিঅ ডোষী খাঅ^{২৯} মোলান^{৩০}।

মারমি ডোষী লেমি পরাণ ॥

পাঠান্তর

১. কাহু পা, কৃষ্ণপাদানম্। ২. নাগরিক। ৩. বাহিরিরি, বাহিরে। ৪. ডোষী। ৫. ছোই ছোই। ৬. জাইসো, যাইসো। ৭. ব্রাহ্ম, বাহমণ। ৮. অলো, আ লো। ৯. করিব। ১০. মো. মই দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarbol.com

১৫. পাখুড়ি। ১৬. নাচই। ১৭. বাপুড়ি। ১৮. হাঙ্গুলো। ১৯. সদভাএ। ২০. আইসই, আইসসি। ২১. কাহেরি, কাহরি। ২২. বিকণহ। ২৩. চঙ্গতা, চংগেড়া, চাঙ্গিড়া, চঙ্গতা। ২৪. আন্তরে। ২৫. নড়এটা। নড়এড়া। ২৬. তুঁলা, তুল। ২৭. হুঁউ। ২৮. মেনিলি। ২৯. খাহ। ৩০. মণাল।

শব্দার্থ ও টীকা

নগর—বৌদ্ধমতে রূপক অর্থে নগর মানে বস্তুজগৎ, রূপালি বিষয়সমূহ, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাদের অনুভব করা হয়; ‘নগরিকেতি রূপাদি বিষয়সমূহ বৌদ্ধব্যং’ নগর বাসনা তার দেহ। ডোম্বী—ডোমনি অস্পৃশ্য জাতি; নিম্নবর্ণের এই ডোমেরা পেশায় ময়লা পরিষ্কারের জন্য নিয়োজিত, লোকালয়ের বাইরে তাদের বাস ‘জলঅচল’ বলে; ব্রাহ্মণ যে পথে চলতেন সে পথে তাদের চলাচল নিষিদ্ধ; এখানে নৈরাশ্রা। টীকায়—‘অস্পৃশ্যযোগত্বাৎ ডোম্বীতি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাশ্রা বৌদ্ধব্যং’। তোহোরি—তোর, তোমার। কুড়িআ—কুড়ে ঘর, বাঁশ ছন্ন খড় দিয়ে তৈরি ছোট বাসগৃহ। ছই ছোই—ছুঁয়ে ছুঁয়ে। জাওসি—যাও, যাচ্ছ। ব্রক্ষণ—ব্রাহ্মণ, বর্ণহিন্দু, ব্রক্ষার মুখ থেকে যার সৃষ্টি। নাড়িআ—নেড়া, নেড়ে; এটি একটি ঐতিহাসিক শব্দ, বৌদ্ধশ্রমণ, থেরো, সিদ্ধাচার্যরা মাথা নেড়া করতেন, গৃহীদের তাঁদের প্রতিদিন খাবার যোগাতে হত, বাহ্যত শ্রদ্ধা দেখাতেও পশ্চাতে তাঁদের নেড়া ডাকত। মুসলমানরা এদেশে আসার পর বৌদ্ধরাই ঈশ্বরভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদের নেড়াসহ, পরবর্তীকালে মুসলমানদেরই নেড়া বলা হচ্ছিল অবজ্ঞায়; কিন্তু অনেকের মতে ব্রাহ্মণদেরই নেড়া বলা হত, ‘ন্যাড়াবাম্ব’ কারণ তাঁরা মাথার চুল চেঁছে নেড়া করে কেবল চৈতন বা মাথার পেছনে সামান্য চুলের গোছা ‘টিকি’ রাখতেন; কারও কারও মত যে পণ্ডিতরাই মাথা নেড়া করতেন তাই এখানে ব্রক্ষণ নাড়িআ আসলে ব্রাহ্মণ ও নেড়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের লক্ষ্য করা হয়েছে; এ মত কিন্তু দুর্বল। সাক্সা—নিম্নজাতের লোকদের বিয়ে, উচ্চবর্ণের কেউ নিম্নবর্ণের রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে সাধারণত তা বলা হত, সঙ্গম>সাক্সা। নিঘিন—নিঘৃণ, ঘৃণা বোধ নেই যার, টীকায়—‘নিঘৃণ্য লজ্জাদি দোষ রহিতোহং’। কাপালি—কাপালিক; কাপালিকরা সাধারণত নারীদের উপভোগ করে এ দেহ প্রাণহীন করে তার শবের ওপর বসে সাধনা করে; করোটি থেকে মদ্যাদি পান করে; বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কাপালিকদের এমন আচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাদের তান্ত্রিক বিশ্বাস যে এতে করে অমানবিক বা অতিমানবীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারা যায়। জোই—যোগী, সাধক। লাস্ত—নাস্তা, উলস্, গ্রাম্য আচরণে ‘লাঙ’ অর্থাৎ স্বামী, যে নারীর সামনে উলস্ সেই তো তার স্বামী। সো—সেই। পদমা—পদ্ম, বাংলা উচ্চারণ পদ, এ থেকে মনে হয় প্রাচীন বাংলা উচ্চারণে শব্দটি পদমা ছিল। পাখুড়ী—পাপড়ি। তঁহি—তাতে। নাচঅ—নাচে, বাপুড়ী—বাপু+ড়ী। বাপা—বাপ, বাবা, বাবু; আদর অর্থে স্ত্রী লিঙ্গে ‘ড়ী’ যুক্ত। হালো—ওহে, শোরসেনী প্রাকৃত ভাষায় সম্বোধন-হলা। তো—তোমাকে। পুচসি—জিজ্ঞাস করি। সদভাবে—আন্তরিকভাবে, সততার সঙ্গে, প্রাচীন বাংলায় ‘ভাও’ কথার প্রচলন ছিল, ভাব>ভাও অর্থাৎ প্রেম সম্পর্ক, এখন ভাব করাকে প্রেম করা বোঝায়। আইসসি—আস। জাসি—যাও। কাহারি—কার। নাবে—নৌকায়, সংবৃতি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিচিহ্ন নৌকা মার্গে। তান্ত্রি—তন্ত্র, তন্তু, সুতো; এ থেকে স্পষ্ট যে মেয়েরা তৎকালে কার্পাস থেকে সুতো প্রস্তুত করত, যোগীরা (যুগী) বস্ত্র প্রস্তুত করত সেদিনও। ‘যুগীর বস্ত্র’ বলা হত ও কাহ্ন যোগী আর তাঁর প্রেমিকা যোগিনী। বিকণঅ—বিকায়, বিক্রয় করে। মুদ—‘তন্ত্রীতিভগং পদ্মস্থান অবিদ্যারূপং’—অবিদ্যারূপ তাঁতিনি। অবর—অপকৃষ্ট, নঞবর, এখানে বরণ করে না, তৈরি করে না। চাপেরা—বাঁশের বা বেতের ফালি দিয়ে তৈরি বড় ঝুড়ি, টীকায়—চাপিতম, ফুলের ঝুড়ি, চাঙাড়ি। অন্তরে—জন্য। নড়পেড়া—নটপেটিকা, নল দিয়ে তৈরি পেটিকা, টীকায়—‘নটবৎ সংসার পেটিকং’, সংসার-রূপ নট পেটিকা অসাধারণ উপমা। হাঁউ—আমি। ঘনিলি—পরিধান করলাম, ধারণ করলাম। ভাঞ্জিঅ—ভেঙে; ভজ্জস>ভজ্জ (কলঙ্কভজ্জ)। মোলাণ—মৃগাল, পদ্মের ডাটা, গুত্র ও কোমল ডাটা নারীর বাহুর সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। এখানে বর্ণবিপর্যয়, মৃগাল—মোণাল। মারমি—মারব। লেমি—নেব।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

নগর বাইরে ডোষী তোমার কুঁড়ে।
 ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও তো ব্রাহ্মণ নেড়ে।
 ওগো ডোষী তোমার সনে করব আমি সঙ্গ।
 নিঘ্ণ কাহ্ন কাপালিক যোগী উলঙ্গ।
 এক সেই পদ্মের চৌষটি পাপড়ি।
 তুমি নাচ ডোষী তাতেই চড়ি।
 ওগো ডোষী তোমাকে জিজ্ঞাসি সদ ভায়ে।
 আসা যাওয়া কর ডোষী কার নায়ে?।
 তন্তু বিকাও ডোষী না করে চাঙাড়ি।
 তোমার জন্য আমি নট সংসার ছাড়ি।
 তুমি তো ডোষী আমি কাপালিক লো।
 তোমার জন্য আমি পরিলাম হাড়ের মাল্য।
 সরোবর ভেঙে ডোষী খায় পদ্মডাটা।
 মারব ডোষী নেব প্রাণটা।

গদ্যে রূপান্তর

নগরের বাইরে ডোষী তোমার কুঁড়ে, নেড়ে বামুন বা বামুন ও নেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ওগো ডোষী তোমার সঙ্গে আমি সঙ্গ করব। নিঘ্ণ কাহ্ন কাপালিক যোগী (আমি) উলঙ্গ। এক সেই পদ্মের চৌষটি পাপড়ি তাতে চড়ে নাচ ডোষী পটীয়াসী। হাঁ গো ডোষী তোমাকে প্রিয়ভাবে জিজ্ঞাসা করি। আস যাও ডোষী কার নৌকায়? তাঁতের দ্রব্য বিক্রয় কর ডোষী বিনা চাঙারিতে (বিক্রয় যোগ্য দ্রব্য রাখতে হলে কোনও পাত্র বা কোনও কিছুর ওপর সাজিয়ে রাখতে হয়) তোমার জন্য ছাড়লাম সংসার নাটক পেটিকা (পেটিকায় আবদ্ধ সংসার)। তুমি তো ডোষী আমি কাপালিক, তোমার জন্য আমি পরেছি হাড়ের মালা। সরোবর ভেঙে ডোষী খায় মৃগাল, মারব ডোষীকে নেব প্রাণ।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

ডোষীরূপী পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাশ্রা নগরের বাইরে, অর্থাৎ নগররূপাদি বিষয় জগতে বাইরে ধর্মকুটিরের অবস্থান করেন। ব্রহ্মহংকার বীজজাত চপল যোগ চিত্তব্রাহ্মণ ও বটু বোধিচিত্ত সংবৃত্তি শুক্ররূপ মণিমূলাদি আনন্দ স্পর্শ করে যায়। সিদ্ধাচার্য নৈরাশ্রাকে লক্ষ্য করে বলছেন, ওগো ডোষী নৈরাশ্রা তোমার সঙ্গ আমার কর্তব্য। যে রকম দেখতে স্বভাব নিঘূণ্য লজ্জা দোষ রহিত তেমনি সতত নিরন্তর প্রজ্ঞা মহামুদ্রা সিদ্ধিলব্ধ কাহ্ন যোগী। পদ্ম নির্মাণ চক্র চৌষষ্টি দলযুক্ত পদ্ম অবস্থিত নৈরাশ্রাসহ মহারাগ আনন্দ সুন্দরে আরোহণ করে কাহ্ন নাচছেন। বলছেন, ওগো নৈরাশ্রা সদভাবে স্বরূপআশ তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, সর্বধর্ম নৈরাশ্রা কোথায় সংবৃত্তি বোধিচিত্ত নৌকা পথে যাতায়াত কর? তত্ত্ব বিক্রয় কর পদ্মস্থানে অবিদ্যারূপী চাঙেড়ি বা পল্লবভাস নিয়ে; গুরুকৃপায় ডোষী নৈরাশ্রা তোমার জন্য সংসার নাটক পরিত্যাগ করেছে। হে ডোষী নৈরাশ্রা। তুমি ভদ্র সদগুরু প্রসাদতুল্য আমি কাপালিক চর্যাধর। তোমার জন্য ষড় তথাগত চক্রী কুণ্ডল কণ্ঠ ধারণ করে বাহ্য মন্ত্রতন্ত্র নিরপেক্ষ পঞ্চবর্ণ বিহার করি। ডোষী দ্বিধাভেদ মোহে, তাই ডোষী অপরিশুদ্ধাবধূতিকা সরোবরে শরীরমূল বোধিচিত্ত সংবৃত্তা শত্রুরূপকে নিঃশেষ করে।

সমীক্ষা

এই চর্যাপদটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। আত্মপাশ্রব চেষ্টনায় যেমন সংবেদন সৃষ্টি করা সমাজ জীবনকে বিবৃত করেছে ঠিক তেমনি কাব্যগুণ ভুলে ধরছে। চর্যার যুগে মানবতার ওপর নির্যাতন, সামাজিক অসম্মান আচরণ এবং ধর্মীয় অসম্মানসম্ভার দৃশ্যপাত বহন করেছে। স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধাচার্য কবি কাহ্ন পা নির্বাণ বা নৈরাশ্রাদেবীর রূপকে ধর্মাচারকে আত্মসিদ্ধ এবং লোক চেতনায় নিবিষ্ট করেছেন। নির্বাণই জীবনের কাম্য, এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানবজীবন আত্মীয় শরীর নিয়ে এসে যাপন করা থেকে মুক্তির জন্য নির্বাণ। নির্বাণ যেখানেই থাক, তাকে পেতে হবে। কঠোর যোগাভ্যাস দিয়ে, ধর্ম-সমাজ বহির্ভূত উপায় কিংবা আরও যত রকম অসাধ্য সাধন করে হলেও, প্রেমাক্ত নায়কের মত, মত্ত হাতির মত তার সঙ্গে মিলনের বাসনা জাগরিত করতে কাহ্ন পা ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি সব পরিত্যাগ করেছেন, কাপালিক যোগী সেজেছেন। কাপালিকরা বামচারী, একমাত্র নারীভোগ হল তাদের সাধনবস্তু, প্রথমে নারীদেহ ভোগ করে তারপর সে দেহকে লাশ বানিয়ে শ্মশানে তার ওপর বসে সাধনা করে, এতে করে কাপালিক অসীম শক্তিদ্র হয়, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তারা নরমুণ্ডধারণ করে, নর কপাল বা করোটি দিয়ে মদ্য পান করে বিধায় তাদের কাপালিক বলে, কাহ্ন পা এমন ভয়ঙ্কর কাপালিক হয়ে নিরামণি ডোষীকে উপভোগ করবেন পরে তাকে মারবেন, তাঁর ভেতর নির্বাণ লাভ করবেন। তার আগে তিনি জানতে পেরেছেন এই ডোষী বড় ছলনাময়ী নগরের বাইরে অবস্থানকারিণী অস্পৃশ্য রমণী। অস্পৃশ্য মানে তাকে সকলে ছুঁতে পারে না, যারা ব্রাহ্মণ বা সমাজের উচ্চবর্ণ-উচ্চ আসন দখল করে আছে তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অর্থাৎ এ ডোষী কখনও তাদের ধরা দেয় না, বরং মাঝে মাঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাদের জাতধর্ম নষ্ট করে। তাকে কেবল নিঘূণ কাপালিক আলিঙ্গন করতে পারে, কাপালিকের লজ্জা নেই, সে উলঙ্গ, সামাজিক দায়দায়িত্ব নেই, সেই ডোষীর সমান। ডোষী তুরন্ত রমণী, সে চৌষষ্টি পাপড়ি যুক্ত পদ্মের ওপর নাচে। তান্ত্রিক মতে দেহের বিবিধ চক্র ও পদ্ম রয়েছে, সাধনার জন্য অর্থাৎ সাধনার

সফলকামের জন্য। সবচক্র ও চৌষষ্টি পাপড়ি পদ্মের অস্তিত্ব অনুভূতি অতিক্রম করতে হবে। এই ডোষীর সঙ্গে যখন কাহ্ন পা'র মিলন হবে তখন ডোষী সাধক কাহ্ন পা'র দেহের চৌষষ্টি পাপড়ি পদ্মের অনুভূতিতে বিরাজ করবে। কিন্তু এই পদ্ম ফোটে সরোবরে বা বিলে, সেখানে ডোষী যায় কেমন করে? যায় নৌকায়, কার নৌকায়? কাহ্ন পা সেটা জানেন না, তাই তাকে সদভাবে বা প্রেমাচরণে জিজ্ঞাসা করছেন, ডোষী তো তত্ত্ব বিকাও, চাঙাড়ি তৈরি কর সে জন্য এ নাটক সংসারের বন্ধন পেটিকা থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। তার জন্য তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন। এখানে তত্ত্ব বা তত্ত্ব বিকানোর অর্থও গভীর রহস্যপূর্ণ; যোগীরা সাধারণত তাঁতি, বস্ত্র তৈরি ও যোগিনীরা কার্পাস থেকে সুতো বের করে, এই সুতো চাঙেড়ি করে বিক্রি করে, এখানে সে ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে কাহ্ন কাপালিকের কাছে ডোষী যোগিনী সুতো বিক্রয় করতে এনেছে অপকৃষ্ট চাঙেড়ি করে অথবা চাঙেড়ি না করে। তবে কাহ্ন কাপালিক তো তাঁতি নন, তিনি উলঙ্গ নিষ্কণ, তিনি ডোষীর জন্য নাটকের সংসারের পেটিকা করেছেন, এখন তাঁর ক্রয়-ক্ষমতা নেই, আছে শুধু তাঁর চিন্ত। এখানে তত্ত্বও প্রকৃত তত্ত্ব নয়, হৃদয়ের তত্ত্ব তাই ডোষী যেমন কাপালিকও তেমনি, আর কাপালিক তার জন্য নিজেকে সাজিয়েছেন হাড়ের মালা পরিধান করে। কাপালিক নরমুণ্ডের মালা পরিধান করে, এর চাইতে উর্ধ্ব সাজসজ্জা তার আর কী?

সুতরাং যোগী কাপালিক এত কষ্টকর সাধনা করেছেন, কত মানুষকে বধ করতে হয়েছে তাদের মুণ্ড সংগ্রহের জন্য সবই তো ডোষীর জন্য, আর যদি তিনি দেখেন যে সেই ছলনাময়ী ডোষী সরোবর ভেঙে পদ্মের ডাঁটা বা মৃণাল খেয়ে নিচ্ছে, তাহলে একি নির্ভরতা! যার জন্য যোগী কাপালিক এত কিছু করলেন সেই ডোষী তাকে বঞ্চিত করছে, অর্থাৎ তার নিস্তরঙ্গ দেহ বা জীবন সন্ধানের নেমে তাকে তছনছ করে (পদের ভঙ্গের অর্থ ভেঙে বা লুকিয়ে, যেমন মানভঙ্গম) যে পদ্মের পাপড়ির ওপর নাচে, তার মৃণাল ভেঙে যায়, পদ্ম আস্ত রাখে না বা পদ্মের অস্তিত্ব রাখে না। সে ক্ষোভে কাহ্ন পা বলছেন, ডোষী আমি তোমাকে বধ করব যেমন করে কাপালিকরা বধ করে থাকে, তোমার প্রাণ নেব। এই সাধনা থেকে নির্বাণ লাভের শক্তি অর্জন করব।

এই চর্যাপদের ভেতর তৎকালীন বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক চিত্র চরিত্র উঁকি দিচ্ছে, ইঙ্গিতবহ প্রমাণ উপস্থিত করছে। এখানে নগর এবং নগরের বাইরের জীবনের ইঙ্গিত আছে। নগরের ভেতর ব্রাহ্মণ সমাজপতি এবং বিদ্যাবান লোকেরা বাস করত। স্মৃতি-পুরাণ শাস্ত্রাদিতে বাঙালির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে বাংলাদেশে নগর বলতে কিছু ছিল না, সকলই মৎস্যজীবী, কুৎসিত শব্দালাপ করে জীবন যাপন করত। কিন্তু এ চর্যার বক্তব্য ও জীবন চরিত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল যে নগর জীবন খুব জাঁকালো বরং ছিল। নগর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল নগের (সাপের) মাথার মত বাড়িঘর তোলা যেখানে, অর্থাৎ উঁচু উঁচু সৌধ-ইমারত রয়েছে যেখানে তাকে নগর বলে। সেখানে কুঁড়েঘর থাকে না, তা থাকবে নগরের বাইরে। সে দারিদ্র্যপীড়িত, ধর্মপীড়িত জনগোষ্ঠী বাস করে, এখনকার মত নগরের ভেতর কিংবা কাছাকাছি কোথাও স্নান বা বস্ত্র ছিল না; এর কারণ বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোকদের জাত্যাভিমান এমনই ছিল যে নিম্নশ্রেণীর বস্ত্রবাসী বা কুঁড়েঘরবাসী কেউ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত পথে চলাচল করতে পারত না। দেখা গেছে ভুলে কেউ নগরের 'পবিত্র পথ বা জায়গা মাড়িয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে এই পথ বা জায়গাকে পবিত্র করা হত। ডোম জাতীয় লোকেরা সেই দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarbol.com

নিম্নবর্ণের বলে নগরের বাইরে বাস করত কুঁড়েতে, তাদের পেশা ছিল পচা মৃতদেহ সরানো বা পরিষ্কার করা, যত সব নোংরা পরিষ্কার করা। কিন্তু তা হলেও এ চর্যায় একটা সাংঘাতিক ইঙ্গিত ‘ছোঁই ছোঁই যাও ডোম্বী ব্রাহ্মণ নাড়িআ’—ডোমের যুবতী মেয়ের আকর্ষণে হয়তো নেড়ে ব্রাহ্মণ বা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত তার সে কুঁড়ের কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কিছু দিয়ে তার দেহ ভোগ করবার লক্ষ্যে। ‘ছোঁই ছোঁই যাও’—এ কথাতে বোঝাচ্ছে যে ব্রাহ্মণের জাত সে ডোম্বী নষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কাহু পা বুঝতে পেরেছেন ডোম্বী এমন ছিনালি বা ছলনাময়ী।

এ ডোম্বী সুন্দরী তব্বী হালকা গড়ন, তা না হলে সে পদ্মের পাপড়ি ভর করে নাচতে পারে না; পদ্মের পাপড়ির ওপর তার পদ পদ্মের ভর আমাদের চোখে অপূর্ব নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা সৃষ্টি করেছে; কবির এই রূপকল্পের আর তুলনাই হয় না। তাছাড়া ডোম্বী যে নাচে অর্থাৎ নিম্নবর্ণের সুন্দরী মেয়ের নাচগান করে জীবিকাও রাখতে পারে সে চিত্রও পাওয়া গেল। তারা অস্পৃশ্য হলেও তাদের দেহ ও নাচগান উপভোগ অসিদ্ধ নয়।

তান্ত্রিক কাপালিক যোগীদেরও সমাদর ছিল না নগরে, তারা নিষ্ফণ অর্থাৎ তাদের ঘৃণা বলতে কিছু ছিল না, তারা উলঙ্গ যোগী। নরমুণ্ডের মাথা পরিধান করত। নগর বাইরে নিম্নশ্রেণীর ডোমের সমান ছিল। কাহু পা বলছেন, ‘আমি কাপালিক যোগী, ডোম্বী তোমার সমান’। কাপালিকদের সাধনা পদ্ধতি খুব ভয়ঙ্কর, তারা বামাচারী, মৃতদেহের ওপর বসে সাধন উপাচার সমাধা করে। হয়তো ডোমেরা তাদের জন্য মৃতদেহ সংগ্রহ করে দিত। অথবা নিম্নবর্ণের লোকদের মৃতদেহ সে মাফকর্মে ব্যবহৃত হত। কারণ তাদের মৃতদেহ দাহ বা শ্রাদ্ধশাস্তি করার ক্ষমতা আত্মীয়স্বজনদের নেই। ধনীদের লাশ অতি সম্মানে চন্দন কাঠের আঙুনে পুড়ে ফেলত বলে সেসব লাশ পাওয়া যেত না।

যোগী বা যুগীরা সাধারণত তীতি, বস্ত্র বোনা আর সাধনা বলতে তারা একই মনে করত। যদিও তারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল তবু তাদের আর্থিক সংগতি পরিশ্রম উপযোগী ছিল বলে মনে হয় না, তার প্রধান কারণ তাদের নিগৃহীত নিম্নশ্রেণীভুক্ত করে রাখা হয়েছিল এবং নানাভাবে তাদের প্রতারণা করা হত। যোগীর নারী কার্পাস থেকে সুতো বের করত, সে সুতো চাঙেড়ি করে বিক্রি করত, হয়তো বা তারা চাঙেড়িও বানাত।

তৎকালে সামাজিক জীবনের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের সঙ্গে রাস্ত্রীয় শোষণ ও অবিচার পুরোদমে চলছিল। এসব অত্যাচার নির্যাতন শোষণকে সিদ্ধাচার্যরা কর্মফল, ইন্দ্রিয় মল ইত্যাদি বলে দুঃখবোধ ভিন্নভাবে প্রবাহিত করলেও দু’একটি স্থানে প্রকৃত ইঙ্গিত অনুধাবন করা যায়, যেমন, তোহের অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া’—তোমার জন্য আমি ‘নলপেটিকা’ ছাড়লাম। টীকাকারদের অন্যান্য ব্যাখ্যা যাই থাক, নড়পেড়া থেকে তাঁরা যে অর্থ বের করেছেন তা এটা—‘নটবৎ সংসার পেটম’, যা নাটক সংসার তা পেটিকায় আবদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনটাকে বাস্তববন্দি করে দিয়েছে। বাস্তববন্দি গিনিপিগ যেমন ঠিক তেমনি। এ যন্ত্রণা থেকে ছিটকে অনেকে যোগী সন্ন্যাসী হয়ে যেত। অনেকে ধর্মীয়ভাবে মেনে নিত এটা পূর্বজন্মের কর্মফল, কিংবা আল্লাহ আমার অদৃষ্টে এ যন্ত্রণা মঞ্জুর করেছেন, আল্লাহর দরবারে তার কান্নাকাটির শেষ নেই। কাপালিক হবার বাসনা আরও মর্মান্তিক, অব্যক্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করা।

চর্যা-১১'
রাগ পটমঞ্জরী
কাহ্ন পা২

নাড়ি শক্তি দিটু ধরিআ খাটে^৪ ।
অনহা^৫ ডমরু বাজই^৬ বীর নাটে^৭ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন কাপালী জোই^৮ পইঠ অচারে^৯ ।
দেহ নঅরী বিহরই^{১০} এককারে^{১১} ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি ঘণ্টা, নেউর চরণে^{১২} ।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ ধ্রু ॥
রাগ দেশ^{১৩} মোন লাইঅ^{১৪} ছার ।
পরম মোখ লবএ^{১৫} মন্তিহার^{১৬} ॥ ধ্রু ॥
মারিঅ^{১৭} সাসু^{১৮} নগন ঘরে শালী^{১৯} ।
মঅ মারিঅ^{২০} কাহ্ন ভইঅ কপালী^{২১} ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর

১. মূল পাণ্ডুলিপি ও টীকা বিশ্লেষণের পরে পর্যালোচনা করে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, ১১ নং চর্যা উদ্ধৃত হয়নি, অথচ গানের আদ্য আছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়াতে শেষ অবধি বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ ঐ চর্যার ব্যাখ্যার হয়তো প্রয়োজন ছিল না, কিংবা যথেষ্ট মানবিকতার কারণে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অযোগ্য ছিল, যথেষ্ট অরুচি অশ্লীল শব্দ ছিল যাতে টীকাকার বা পাণ্ডুলিপি সংকলকরা বিব্রত বোধ করেছেন, প্রমাণস্বরূপ মুনিদত্ত মূল পাণ্ডুলিপির ১০ নং চর্যার ব্যাখ্যার শেষে একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করেন, “নাড়ী ডোষী পদানাং সূনেত্যাতি। চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি” তাতে দৃঢ় ধারণা করা যেতে পারে যে ডোষী পা রচিত ঐ অজ্ঞাত চর্যা ‘সুরচিত বা কুরচিত’ যাই হোক তা ব্যাখ্যার যোগ্য নয়। ডোষী পা রচিত ১৪ নং চর্যা রয়েছে তা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা, তবে মনে হয়, নাড়ী ডোষী পা অথবা লাড়ী ডোষী পা নামক অন্য চর্যাকার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে নাম বিভ্রান্তির কারণেও এ চর্যা পরিত্যক্ত হতে পারে; যে চর্যার প্রথম শব্দটি সুগে অর্থাৎ শূন্য। তাহলে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি চর্যাপদ সর্বসাকুল্যে সংকলিত হয়েছিল একান্নটি। ২. কৃষ্ণাচার্য্যপাদাং। ৩. দিট, দৃঢ়। ৪. খটে। ৫. আনহা। ৬. বাজএ, বজই। ৭. নাদে, বীরনাদে। ৮. যোহী। ৯. পচারে, ১০. বিহরএ। ১১. একারেঁ, একাচার। ১২. উহা। ১৩. দোষ, দ্বেষ। ১৪. লইআ। ১৫. লভই। ১৬. মন্তাহার। ১৭. মারি। ১৮. শাসু। ১৯. সালী। ২০. মারি, মারিঅ। ২১. কপালী।

শব্দার্থ ও টীকা

নাড়ি—দেহের নাড়ি, ধমনী, এখানে তন্ত্রশাস্ত্রের নাড়ি, যে তিন নাড়ি দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়, ললনা রসনা ও অবধূতিকা; তাদের ৩২ শাখা-প্রশাখা রয়েছে, হিন্দু তান্ত্রিক মতে তিন নাড়ি ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। নাড়ি শক্তি—শক্তিধর নাড়ি, ‘দ্বাত্রিংশনাড়িকা : সক্তিস্তাসাং মধ্যে প্রধানাবধূতিকা’ কিন্তু তাদের ভেতর তিনটি মূল ‘ললনা প্রজ্ঞারোণ। সহজং সম্পশ্য, অধূতিকা মধ্যদেশেহেতু গ্রাহ্য গ্রাহক মণিমূলে বিধূতা’।

অর্থাৎ শক্তিধর তিন নাড়ি ভেতর অবধূতিকা প্রধান তা মণিমূলে অবস্থিত। খটে—খাটে, শবাবধার ঘাটে বা শরীর রাখার খাটে, পালঙ্ক। অনহা—এমন একটা ধনি যা দু’কান বন্ধ করলেও শোনা যায়, অনাহত। ডমরু—ডুগডুগি, মধ্যক্ষীণ ডমডম শব্দকারী বাদ্যযন্ত্র। বীর নাটে—খুব জোরে, বীরনাদে। জোই, যোগী। পইঠ—প্রবিষ্ট। আচারে—আচারে, যোগাচারে। নঅরী—নগরী। বিহরই—বিচরণ করে, বিহার করে। এককারে—একাকার। আলিকালি—চন্দ্রসূর্য, ৭ নং চর্যা শব্দার্থ ও টীকা দ্রষ্টব্য। নেউর—নূপুর। কিউ—কেউ, অণুরূপ। আভরণ—অলংকার। দেশ—দেহ, ঈর্ষা। মোন—মন। লইঅ—নিয়ে, হিন্দি লাইয়ে, কিন্তু এখানে লেপন করে। ছার—ছাই, তুচ্ছ, ক্ষার> ছার। মোখ—মুখ, মোক্ষ। লবএ—লাভ করে, নেব, গ্রহণ করে। মন্ত্রিশরী—মুক্তার হার। সাসু—শাড়ুড়ি, শ্বাস। ননন্দ—ননদ, আনন্দ দেয় যা। শালী—স্ত্রীর ঘেঁটে বোন, গালি, অবিদ্যা। মাত—মা, মায়া, মার।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

নাড়ি শক্তি দৃঢ় ধরে ধরে।
 অনাশ্রুত ডমরু বাজিয়ে দাপটে॥
 কাহু কাপালিক যোগী প্রবিষ্ট আচারে।
 দেহ নগরী বিহারে একাকার করে॥
 আলি কালি ঘণ্টা নূপুর চরণে।
 রবি শশীকেও কুণ্ডল আভরণে॥
 রাগ দেহ মন নিয়ে ছার।
 পরম মোক্ষ লভে মুক্তোহার॥
 মেরে শাড়ুড়ি ননদ ঘরের শালী ঠিক।
 মাকে মেরে কাহু হল কাপালিক।

গদ্যে রূপান্তর

তন্ত্রশক্তির তিন নাড়িকে অথবা তিনটি নাড়ির প্রধানটিকে দৃঢ়ভাবে খাটে বেঁধে (শবাসন করে), অনাশ্রুত ডমরু বীরনাদে (প্রবলভাবে) বাজিয়ে কাপালিক কাহু যোগাচারে প্রবিষ্ট হলেন। দেহ নগরীকে বিহার করে একাকার করেন অথবা একাকার দেহ নগরীতে বিহার করেন। আলি কালিরূপ ঘণ্টা চরণে নূপুর তাঁর, রবিশশী রূপ কুণ্ডল পরলেন অলংকার করে। রাগ দেহ মন ছাইতে লেপে পরম মোক্ষকে মুক্তোহার বলে লাভ করলেন। শাড়ুড়ি ননদ ঘরের শালীকে মেরে, মাকে মেরে কাহু কাপালিক হলেন, অথবা শ্বাস বন্ধ করে আনন্দ ঘরে অবিদ্যা ও মায়া থেকে মুক্ত হইলেন।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

পরম মহানন্দ সুন্দর কৃষ্ণাচার্যপাদ দ্বাত্রিংশ নাড়িকা শক্তির মধ্যে প্রধান অবধূতিকা বিরামানন্দরূপ গুরু প্রসাদ নিয়ে মণিমূলে বিধৃত হলেন। খাটে শুয়ে প্রভা স্বরে সহজে সংস্পর্শিত হলেন। অনাহত ডমরু শব্দ বীরনাদে শূন্যতা সিংহ নাদ শুনে কাপালিক, দেহ নগরীতে প্রবেশ উপাচারে ক্রেশ ভক্ষণ দ্বারা একাকার বিহার-ভ্রমণ করলেন। বজ্র পরিশোধিত চন্দ্র সূর্যাদিকে চরণে ঘণ্টা নূপুরাদি করলেন। মহাসুখরাগ বহ্নিতে রাগ দ্বেষ অগ্নিতে মনকে দগ্ধ করে ভস্ম করে দেহে প্রলিঙ করে বজ্রসত্ত্বরূপ পরম মোক্ষ মুক্তোহার মণ্ডিত হয়ে এমন করতে লাগলেন। স্বাসে পূর্বোক্তমাত্রা মন পবন অধিকার করে চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি নানা প্রকার বোদ্ধা যোগী অবিদ্যা মায়া প্রপঞ্চকে প্রজ্ঞোপায়ে সিদ্ধিতে নিঃশেষ করলেন।

সমীক্ষা

এই চর্যাপদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রথমে তাত্ত্বিক যোগ সাধনার বিষয়ে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। বৌদ্ধ তাত্ত্বিকদের প্রায়ই মর্মে দেহতত্ত্ব ও সাধন-জীবনে যোগাশ্রয়ী। যোগের আদিম ধারা অবশ্য আর্য বেদান্ত যোগ এবং পরবর্তীকালে তন্ত্রাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুফীরা এদেশে আসার পূর্বে হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথধর্ম, জৈন এমনকি লোক সাধারণের মর্মে আসন পেয়ে গিয়েছিল। সুফীধর্ম ইসলামের তাত্ত্বিক সাধনা, তাই এখানে উর্বরা পেয়ে উপর্যুপরি সুফী সাধনা সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। আসলে এদেশের সে রহস্যময় গুরু সাধনার প্রভাব গুরুতর।

যোগের শক্তি সাধনায় যেমন আসন-প্রণায়াম, বায়ুধারণ প্রণালীর সঙ্গে তন্ত্রের ঘটচক্র, কুণ্ডলিনী শক্তি, হৃদ্যার বীজ ও শক্তি সহায়ে সাধনার পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে, পরবর্তী যোগ ও তন্ত্র একেবারে মিলেমিশে গিয়ে পার্থক্য লুপ্ত হয়েছে। যোগে নাদ-বিন্দু বা চন্দ্রসূর্যের মিলন (নাদ=সূর্য=নারীরজ; বিন্দু=চন্দ্র=অমৃত)=পুরুষবীর্ষ—।) এই যোগ বাস্তব নরনারী তাদের দেহগত মিলনের স্বীকৃত প্রতীক। বৈষ্ণব ধর্মে যা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন রূপে গৃহীত। কিন্তু যোগ সাধনা গুহ্য ও রহস্যময়। এ সাধনা দেহকে নিয়ে, দেহের ভেতরই সব কিছু। দেহতত্ত্ববাদীরা বলেন, যা আছে ভাঙে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। দেহস্থ বায়ু হল সবকিছুর মূলাধার প্রধান ক্রিয়া-দেহে 'পবনবন্ধি' করা এবং বায়ু, মন ও শুক্রকে উর্ধ্বদিকে চালনা করা।

যোগের লক্ষ্য সিদ্ধযোগী হওয়া; যোগ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় এবং অসীম বলশালী হতে পারে বলে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া বজ্রযানিরা এ যোগাচার পালন করতেন, সিদ্ধাচার্যদের ভেতর প্রায় সবাই যোগী, তাঁরা নিজেরা ঘোষণা করেছেন 'জোই' বা যোগী বলে। কারু পা আবার নিজকে কাপালিক যোগী বলেছেন, হয়তো তিনি কাপালিক ছিলেন না, কাপালিক নিঘণ, উলঙ্গ এবং বামাচারী। বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনে তা অনুমোদন নেই, কেবল রূপক হিসেবে তা বলতে পারেন। তবে তিনি যে সাহসী ছিলেন সেটা নিশ্চিত, অন্তত এ চর্যা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে॥
 রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥
 রাগদেশ মোহ লাইঅ ছার।
 পরম মোক্ষ লবএ মুক্তিহার॥

একটি যোগীর যে বেশ তা এতে স্পষ্ট হয়েছে, যোগীর চরণে নূপুর, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার হার, দেহে ভস্ম, এটাই সাধারণ বেশ; পরণে কোনও বস্ত্রাবরণ নেই, হয়তো বা কৌপীন আছে, কেউ কেউ কণ্ঠে মুক্তাহারের পরিবর্তে হাড়ের মালা এবং হাতে ডমরু ধারণ করেন।

বৌদ্ধ সহজিয়া যোগীরা সহজ সুখ কামনা করেন। এই সহজ সুখ মহাসুখের অবস্থা আনন্দঘন বা আনন্দ ঘরে, যা এ চর্যায় দেখা যাচ্ছে—

মারিআ শাসু ননন্দ ঘরে শালী।
 মাঅ মারিআ কাহু ভইল কবালী॥

অর্থাৎ, শ্বাসকে মেরে আনন্দ ঘরে অবিদ্যাশালী (গালিতে) মায়ামোহকে মেরে কাহু কাপালিক হল। এটা আনন্দঘন অদয়জ্ঞানের অবস্থা। অসুখ ও অভাব, লৌকিক দুঃখ ও সুখ এ অবস্থায় একাকার, এ চর্যায় যেমন—

দেহ নঅরী বিহরএ একাকারে

অর্থাৎ, দেহ নগরীতে একাকার বিহার করে। পূর্ববর্তী চর্যা নং ৯, ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ, ভাব ও অভাব কেশাঘ্র ও স্পর্শ করে না। চিত্ত চাঞ্চল্য একদম থাকবে না, (চর্যা নং ১); এই চিত্ত চাঞ্চল্যকে দমন করার মায়ামোহ যোগ। যে দেহে চিত্তের অবস্থান তা বায়ুর বাহন। বায়ুই চাঞ্চল্যের কারণ। বায়ু নিরুদ্ধ হলে দেহের নিরোধ হয়, চিত্ত চাঞ্চল্য প্রদমিত হয়। পরবর্তীকালে বাউলরা নিজেদের বায়ুভুক বলে থাকে, বায়ু+ভুক>বায় + ভুস>বাউল। চর্যাপদের সঙ্গে প্রাপ্ত দোহাকোষ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়,

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
 রবি শশী নহি পবেশ।
 তহি বট চিঅ বিসাম করু
 সরহে কহিঅ উবেশ॥

—সরহ পা'র দোহা।

অর্থাৎ, যেখানে মন পবনের সঞ্চরণ নেই, যেখানে রবিশশীর প্রবেশ নেই, সরহ বলেন সেখানেই চিত্তকে বিশ্রাম করাও।

দেহের এই স্থানটি কোথায়? দেহ মেরুর বামে ও দক্ষিণে যে দুটি নাড়ি আছে তাতে বায়ু রোধ করতে হবে, আর আঁকাবাঁকা পথে বায়ু প্রবাহিত হলে চিত্ত চাঞ্চল্য হবেই। চর্যা নং ৫-এ দেখা যাচ্ছে,

সাক্ষমত চহিনে দাহিন বাম মা হোহী

অর্থাৎ, সাক্ষর চড়ে ডান দিক বাম দিক হেল না।
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা নং ৮-এ রয়েছে,

বাম দাহিন চাপী মিলি মিলি মাগা

বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা

অর্থাৎ, বামদিক ডানদিক চেপে মিলেমিলে পথ চল, পথে আছে মহাসুখ সঙ্গ মিলন। দেহের অবধূত মার্গ বা দেহস্থ মধ্যপথ বা সোজা পথ, চর্যাকারদের ভাষায় ‘মঝবেণী বা উজুবাট দিয়ে বায়ু, শুক্র এবং মনকে চালনা করতে হবে। অন্য একটি চর্যা নং ৩২-এ রয়েছে—

মান দাহিন জো খাল-বিখলা

সরহভণই বাপা উজুবাট ভইলা।

অর্থাৎ বাম ডানের খাল-বিখাল ছেড়ে সোজাপথে যাও, তাই যোগের আসন, কায়াসাধন, বায়ুবন্ধন প্রভৃতির উল্লেখ প্রায় প্রত্যেকটি চর্যায় রয়েছে; সে জন্য বলা যায় চর্যাপদ যোগতাত্ত্বিকদের সাধন ফসল মাত্র।

এই পদটি নির্বিচারে যোগতাত্ত্বিক সাধন ভজন। তিনটি নাড়ি, মতান্তরে বত্রিশটি নাড়ি যা দিয়ে প্রাণবায়ু আনাগোনা করে তাকে দৃঢ় করে বেঁধে রাখতে হবে, সাধারণত প্রাণায়াম শ্বাসন দ্বারা তা হয়ে থাকে। কাহ্ন শব্দটির পর সে যোগাসনে দৃঢ় প্রবৃষ্ট হলেন এবং সমস্ত দেহের নগরীর নাড়ি একাকার করে পর্যবেক্ষণ করলেন। আলিকালি (যা ৭ নং চর্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) কে পায়ের নূপুর করা হল, চন্দ্রসূর্য (যা ৪ নং চর্যায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে) কর্মকুণ্ডল করা হয়েছে, রাগ ঘেম মোহ ইত্যাদিকে পুড়ে ছাই করে তার ভস্মমায়ে মাখা হয়েছে, তার পর মোক্ষরূপ মুক্তহার ধারণ করে, শ্বাসরোধ করে, আনন্দ দ্বারা অবিদ্যারূপ ইন্দ্রিয় দমন বা ধ্বংস করে কাহ্ন পুরো যোগী হলেন।

তাই এ পদটি সম্পূর্ণ যোগের প্রক্রিয়া।

এখানে শাশুড়িকে মারা, সঙ্গে সঙ্গে নন্দ, শালী এবং মাকে মারার উক্তি বাহ্যিক হলেও তা থেকে জীবনচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। একটা শক্ত সমর্থ উপার্জনশীল ব্যক্তি সংসার হতে ছিটকে পড়ে যোগী সন্ন্যাসী বা তাত্ত্বিক হয়ে যাওয়া খুবই দুঃখজনক। প্রকৃত মারা না হলেও সে যখন সংসার ত্যাগ করে যাচ্ছে তা হলে যে যে তার ওপর নির্ভরশীল, মাকে কি মারা হয় না? পুত্র শোকে মা হয়তো এমনিতে মরে যাবেন। তেমনি শাশুড়িকে মারাও তাই, তার যুবতী স্ত্রী গিয়ে উঠবে শাশুড়ির কাছে, কত বড় বেদনাবহ, মেয়ে ও জামাইর শোকে শাশুড়িও বেঁচে থাকতে পারেন না। শালীকে মারা আরও তাৎপর্যবহ, যার বোন তার নিজের স্বামীকে সংসার বন্ধন হতে তাকে পরিত্যাগ করে যায় তাকে অন্য কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। নন্দিকে মারার অর্থ এখানে স্ত্রীর নন্দী অর্থাৎ সংসার পলাতক যোগীর বোন; মায়ের মত ভাইয়ের শোকে কিংবা তারও ভবিষ্যৎ অন্ধকার এ কারণে তাকে মারা হল। এই পদের ভেতর একটি পারিবারিক বেদনাবহ চিত্র উঁকি দিচ্ছে।

চর্যা-১২
রাগ ভৈরবী
কাহু পা

করুণা পিড়ি খেলই নঅ-বলং। সদগুরু বোহে জিতেল ভববল ॥ ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর। উআরি উএস কাহু নিঅড় জিনউর ॥ পহিলে তোড়িআ বড়িআ মরাড়িইউ ॥ গঅবরে তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ॥ মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা ॥ অবশ করিআ ভববল জিতা ॥ ভগই কাহু আক্ষে ভলি দায় চউষঠী কোঠা গুণিআ লেই ॥

করুণা পিড়ি^১ খেলই^২ নঅ-বলং^৩।

সদগুরু বোহে^৪ জিতেল ভববল ॥

ফীটউ^৫ দুআ মাদেসিরে^৬ ঠাকুর^৭।

উআরি^৮ উএস^৯ কাহু নিঅড় জিনউর^{১০} ॥

পহিলে^{১১} তোড়িআ^{১২} বড়িআ^{১৩} মরাড়িইউ^{১৪} ॥

গঅবরে^{১৫} তোলিআ^{১৬} পাঞ্চজনা ঘালিউ^{১৭} ॥

মতিএ^{১৮} ঠাকুরক পরিনিবিত্তা^{১৯} ॥

অবশ^{২০} করিআ ভববল জিতা^{২১} ॥

ভগই কাহু আক্ষে^{২২} ভলি^{২৩} দায়^{২৪} দেই ॥

চউষঠী কোঠা গুণিআ লেই ॥

পাঠান্তর

১. পিহাড়ি, পীড়িহি। ২. নয়বল, ববল। ৩. বোহে। ৪. ফীটিউ। ৫. মাদসি রে। ৬. ঠকুর। ৭. তআরি। ৮. উআস। ৯. জিনবর। ১০. পহিলে। ১১. তোলিআ। ১২. বড়িঅ। ১৩. মরাড়িইউ। ১৪. তোড়িআ। ১৫. ঘোলিউ। ১৬. মন্তিএ, মলিএ। ১৭. পরিনিবিতা। ১৮. অবস। ১৯. জিতা। ২০. অমহে। ২১. ভালদান।

শব্দার্থ ও টীকা

করুণা—মহাসুখ, নিরামণি, নৈরাশ্রা। পিড়ি—পিঁড়ি, বসার ছোট আসন, এখানে দাবার ছক, 'স্বাধিষ্ঠান চিত্তরূপং চিত্ত; বোদুব্যাং পিড়ীতি'। অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চিত্তরূপ চিত্ত। খেলই—খেলি। নঅ বল—দাবা, চতুরঙ্গ, দ্যুতক্রীড়া বা নয়ং—বলায়ং মন্ত্রনয় রহস্যং চতুর্থানন্দ বলং', বোধিচিত্ত। বোহে—উপদেশ দেন, বোধেন, বোধ দেন, বোঝান। জিতেল—জিত হল, জিতল। ভববল—ভব সংসারের বল, পার্থিব শক্তি; বিষয়াভাস বল। ফীটউ—ফেটা, ফ্লেটিট, ঘুলিয়ে ফেলা, সরিয়ে ফেলা। দুআ—দুই, দুইদোষ (আলিকালি?)। মাদেসিরে—মারা, ধ্বংস করা, উত্তেজিত অবস্থায় ধ্বংস করা, মদনাবেশ? ঠাকুর—ঠকুর, দাবার রাজা; মুদ—'ঠকুরমবিদ্যাচিত্তং'। উআরি—উপকারিতা, মূল লক্ষ্যস্থল, রাজার আসন। উএস—উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যে। নিঅড়—নিকট। জিনউর—জিনপুর, নির্বাণ, 'কম্বাচার্যস্য জিনবর স্বয়সে'। পহিলে—প্রথমে, প্রথম বড়ে, টীকায়—নিঃস্বভাবীকৃত্য। তোড়িও—উপড়ে ফেলা, (ত্রাটকিয়ত্বা) তোড়িআ। বড়িআ—বড়ে, দাবার সবচেয়ে ছোট ঘুটি, বটিকা-বড়ে। মরাড়িইউ—মারা হয়েছে, গঅবরে—গজবরে। তোলিআ—তুলে, উপড়ে। পাঞ্চজনা—পাঁচজন, পঞ্চ ক্ত, পঞ্চ বিষয়-অহঙ্কারাদি।

ঘোলিউ—ঘায়েল করা হল। মতিএঁ—মন্নি, মন্নিনা>মন্নী>মন্নী>মতিএঁ। ‘মুদ—‘মত্যা
প্রজ্ঞা পারমিতানুবুদ্ধ্যা’। পরিনিবৃত্তা—পরিনিবৃত্ত করা হল, নিবৃত্ত। ‘চিন্তাং
পরিনিবৃত্তারোতিং কৃতং’। অবস—অবশ। জিতা—জিতল। চউসঠঠী—চৌষটি, দাবার
ছকে চৌষটি ঘর—কালো সাদা স্বতন্ত্রে চৌষটি পীট, ‘এক সো পদমা চউসঠঠী পাখুড়ি’।
কোঠা—কুঠরী। ভলিদায়—ভালদান। লেহঁ—নিলাম। টীকায়—‘দায়ং প্রাভূতশয়াভিপ্রায়ং
চতুষ্টিকোষ্টকে নির্মাণ চক্রে স্থিরকৃত্য স্বচিণ্ডং।’

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

করণা পিঁড়িতে খেলি দাবা নবল।
সদগুরু বুদ্ধিতে জিতি ভববল॥
দু’চালেই মেরে দিলাম রাজা ঠাকুর।
লক্ষ্য উদ্দেশ্য কাহুর নিকট চিনপুর॥
প্রথমে উপড়ে বড়ে মারা হল।
গজবরে পাঁচজনকে ঘায়েল করল॥
মন্নী রাজঠাকুরকে নিবৃত্ত করল।
অবশ করে ভববলকে জিতল॥
কাহু বলেন আমি দান ভালো দিই
চৌষটি কুঠরি গুণে নিই॥

গদ্যে রূপান্তর

করণা পিঁড়ি দাবার ছক নিয়ে খেলি। সদগুরুর সুবুদ্ধিতে ভবসংসারের বল জিতেছি।
দু’চালে রাজাকে হটিয়ে দেওয়া হল, উপদেশ মত লক্ষ্য উদ্দেশ্য জিনপুর কাহু নিকটে
পেল। প্রথম তোড়ে বড়ে মারা হল, গজবরের সাহায্যে পাঁচজনকে বা পাঁচ ইন্দ্রিয়কে
ঘায়েল করা হল। মন্নী দিয়ে রাজাকে পরিনিবৃত্তি করা হল, অবশ করে ভববলকে জেতা
হল। কাহু বলেন, আমি দান ভালো দিয়েছি, চৌষটি কুঠরি গুণে নিয়েছি।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

কাহু পা দ্যুতক্রীড়াধ্যানে ধর্মপক্ষে নির্বাণ লাভ প্রসঙ্গে এ চর্যার অবতারণা করেন। তিনি
বলেন, করণা স্বাধিষ্ঠান চিন্তরূপ চিন্তাবোধক পিঁড়ি, সেখানে আশ্রয় সপ্তদোষ সমাধিমলা
বিদীর্ণ, নিরাসিকরা নয় মন্ত্র নয় রহস্য চতুর্থ আনন্দবল বোধিচিন্ত বজ্রগুরু উপদেশে সম্যক
কুলিশ সংযোগে উভয়ে অবিরত আনন্দ অভিযোগে ক্রীড়া করে ভববল বিষয়াভাস বলকে
জয় করলেন। প্রথমত বজ্রজাপক্রমণা আভাসদ্বয় পুনরায় ঠাকুর বিদ্যাচিন্ত উপকারীর
উপদেশে রাগান্ত্রে বিরাম আনন্দ উদয় সময়ে বোধিচিন্ত কাহুর জিনবর স্বয়ং সন্নিধান
মিলিত হলেন। ষষ্ঠ্যন্তরশত প্রকৃত বজ্র আক্রমণে প্রথমে নিঃস্বভাবী করে মারা হল,
পুনরায় যোগিন্দের তথ্যতা চিন্ত কাহু গজেন্দ্ররূপে পঞ্চ ব্রহ্ম পঞ্চবিষয়ে অহংকারাদি কে
নির্মম প্রহারে নিঃশেষ করা হল। প্রজ্ঞা পারমিত অনুবোধ ঠাকুর সংক্লেষ আরোপিত
চিন্তনির্বাণে রোপিত হলেন। তাই ভববল রূপাদি বিষয় সুচত্র সমগ্র করে জিতলেন। কাহু
বলছেন, দান করে চৌষটি কুঠরি নির্মাণচক্রে স্থির করে স্বচিন্ত প্রকৃতি প্রভাস্বরূপ গৃহলগ্ন
হয়েছেন। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীক্ষা

এ পদে দাবা খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে, প্রাচীন বাংলায় এর প্রচলন ও নামও দেখা যাচ্ছে। নবল অথবা ণবল, কিন্তু নবল থেকে দাবা নাম কীভাবে হল তা আমাদের জানা নেই। খেলাটি উপমহাসাগরীয় খেলা, আল বেরুনি (অষ্টম শতক) তা পারস্যে নিয়ে যান। মহাভারতে দ্যুতক্রিয়া এবং চতুরঙ্গ প্রসঙ্গ দেখা যায়। এটি একটি রাজসিক ক্রীড়া, কোনও রাজা কর্তৃক অন্য রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনার ছক; চতুরঙ্গ নামের ভেতর এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়—অশ্বগজরথ পদাতিক, এ সৈন্যবাহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আক্রমণ; অবশ্য রাজমন্ত্রী সেনাপতির নেতৃত্বে। খেলাটি পারস্যে পৌঁছার পর নবরূপ ধারণ করে এবং নাম শতরঞ্জ হয়, রাজার নাম বদলে শাহ হয়, পারস্য সৈন্যবাহিনীতে নৌবাহিনী অতিপরাক্রমশালী করে কিস্তি বল যুক্ত হয়; শাহ বা রাজাকে কিস্তি বলের আক্রমণ সামলাতে না পারলে তার মৌত বা মাত নিশ্চিত, সে জন্য খেলাটি কিস্তি মাতে শেষ হয়। ইরান থেকে ফ্রান্সে গিয়ে এ খেলার নাম হয় ‘চেসট’। পরে ইয়োরোপে চেস, খেলা শেষ হয় চেস মেট বা চেকমেট, বা কিস্তিমাতে এরই রূপান্তর। দাবার ছকে চৌষটি ঘর রয়েছে, বত্রিশটি সাদা, বাকি কালো, ঘুটি থাকে এক পক্ষে যোল। রাজার শক্তি গজ অশ্ব ও নৌকা, মন্ত্রীরও তাই, সামনের আট বড়ে বা সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধ। চতুরঙ্গ পর্যায়ে খেলার নিয়মের রথের স্থান দখল করেছে কিস্তি। এই উপমহাদেশীয় খেলাটি বিশ্বমানের বর্তমান খেলা।

খুব সম্ভব নবল খেলার নিয়ম পারস্যে রীতিমত নয়, চতুরঙ্গ পর্যায়ের, কারণ ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটেনি। তাছাড়া গজ দিয়ে বা মন্ত্রী দিয়ে ঠাকুরকে মারার কথা আছে, কিন্তু ঠাকুর নয়।

চর্যাকার নবলের ছককে করুণা পিড়ি বলে উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধির খেলা। করুণা হল সে ডোষী যে মহাসুখ ও ছন্দসময়ী। পিড়ি পেতেছে তাতে জীবন মরণ লড়াই, কিন্তু সদগুরুর বুদ্ধিতে কাহ্ন পা খেঁদায় জিতে গেলেন, কারণ তিনি সদগুরুর উপদেশে ভবের মায়াবলকে নিস্তেজ করে দিয়েছেন। আর এটা স্পষ্ট যে ভববল হচ্ছে তার প্রতিপক্ষ শক্তি। সে চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্ররোচিত করে। সদগুরুর উপদেশ মত খেলতে গিয়ে কাহ্ন দেখলেন জিনপুর তাঁর নিকটে। তিনি জিনপুরে প্রবিষ্ট হলেন। ৭ নং চর্যায় জিনপুর প্রসঙ্গ রয়েছে, বোধি। বোধি লাভ করে প্রথম তোড়ে কাহ্ন বড়েগুলো খতম করলেন, বড়েগুলো হল জাগতিক দোষসমূহ। তারপর গজবরের সাহায্যে পাঁচ জনকে মারা হল, গজবর হল যোগাদি প্রক্রিয়া আর পাঁচজন পাঁচ ইন্দ্রিয়। মন্ত্রী দিয়ে রাজাকে নিবৃত্ত করা হল, মন্ত্রী হল গুরুর উপদেশ, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি আর রাজা হল দেহ। এই সমস্ত নিয়ম আচরণ আবার বুদ্ধির সাহায্যে দেহকে একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অবিচল করে নির্বাণের উপযুক্ত করা হল। চৌষটি ছক হচ্ছে দেহের চৌষটি পীঠ, এই চৌষটি পীঠের সবটা দান সম্মতভাবে পরিশুদ্ধ, কোথাও এতটুক মল নেই।

নির্বাণ তাহলে বুদ্ধির খেলা। যার প্রজ্ঞা, মেধা, বল এবং কৌশল রপ্ত হবে না তার পক্ষে নির্বাণ অসাধ্য। খেলার রূপকে নির্বাণের প্রতিপক্ষকে আক্রমণ রচনার কৌশল অপূর্ব। প্রতিপক্ষ ভববল। কম নয়—ইন্দ্রিয়, মায়া, অবিদ্যা এবং অন্যান্য জাগতিক দোষ নিয়ে খেলছে, তার আক্রমণ কৌশলও প্রায় অপ্রতিরোধ্য, সদগুরুর সুবুদ্ধি এবং উপকারী উপদেশ ছাড়া তা কাটা যায় না। সদগুরু হলেন বোধিচিৎ।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দার্থ ও টীকা

তিশরণ—ত্রিশরণ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জ, বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি, ধর্মং শরণম গচ্ছামি, সজ্জম শরণম গচ্ছামি, এ তিন শরণে যেতে হবে; বৌদ্ধ শাস্ত্রে একে বলে ত্রিরত্ন। মুদ—‘কায়বাক চিত্তং যশ্চিৎ চতুর্থং শরলীন গতং তং মহাসুখকায় নৌকা বৌদ্ধব্যং’—কায় বাক্যচিত্ত যখন চতুর্থ শরণে যায় তখন মহাসুখ (নির্বাণ) কায় নৌকা বোঝায়। নাবী—নৌকা। অঠক মারী—আট মার, অষ্টশক্তি; অবিদ্যারূপ মার আট প্রকার—মোহ, মমতা, স্নেহ, সুখদুঃখের বন্ধন, ইন্দ্রজাল, কাপট্য, ছলনা ও ছদ্মবেশ, এদের এককথায় ‘সত্ত্বর জন্তুমোময়ী প্রকৃতি’ বলা হয়, অনিমা, মহিমা, গরিমা লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকামা, ইচ্ছিত্ব ও বশিত্ব; যোগের এই অষ্টঐশ্বর্য। টীকায়—‘অঠকমারীতি বুদ্ধৈশ্বর্যাদি সুখ মনুভতং’ তাই এখানে অঠকুমারী অষ্টশক্তি অনিমা মহিমাদি বোঝাচ্ছে। নিজ—নিজ। শূণ মেহেরী—শূন্যতা রমণী, টীকায়—‘শূন্যতা করুণায়োরৈক্যং নিজ দেহ’, কিন্তু কোনও কোন পণ্ডিত গুনমে হেরী, হিন্দি ভাষার অনুকূলে বলে শূন্যতাকে দেখি, তাহলে ‘মেহেরী’ অর্থবোধক হয় না। তরিত্তা—তরিয়ে যাওয়া, ভবজলধি—ভবনদী, ভবসমুদ্র। জিম—যেমন। মাত্ত—মায়া। সুইনা—স্বপ্ন, স্বপ্ন>সইন, স্বপ্ন>সুবিন>সুইন+আ। মাধ্যবেণী—মাঝের বেণী, নদীর মাঝের স্রোত; টীকায়—‘মধ্য বেণিকায়ং পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠানচিত্তস্য তরঙ্গং সুল্লোং সুখং’—মধ্যবেণী হল স্বাধিষ্ঠান চিত্তের তরঙ্গ সুখ। ম—আমি, কিন্তু পাঠান্তরে ‘তরঙ্গম’ও হতে পারে, কারণ চর্যার ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ স্বাধীন বিচ্ছিন্ন লিখনরীতি কদাচিত্, ম-মঅ, বা মই। মুনিআ—মনস্থ করা, মত্বা>মুনিআ। তথ্যগতি—বুদ্ধ, অর্থাৎ তথা (বুদ্ধ) রূপে গত বা নির্বাণ প্রাপ্ত। পঞ্চতথাগত—বুদ্ধের পঞ্চসালনীতি বা দর্শন, যেমন—সৎকর্ম, সৎচিন্তা। কিঅ—করা হয়, করলাম। কেডুআল—দাঁও, কৃপীঠপাল>কেডুআল>কেডু য়াল। বাহএ—বেয়ে। কাঅ—দেহ, কায়। কাহিল—কাহ+ইল, নামধাতু। মাত্তজাল—মায়াজাল। গন্ধপরসস—গন্ধ পরস রস, গন্ধ স্পর্শ রস। জইসোঁ—যেমন, বিছনে—বিহনে বিনে। চিত্ত—চিত্ত। কণনহার—কর্ণধার। সুনত—শূন্যতা। মাত্তে—প্রার্থনা করে। সাত্তে—মিলনে, সঙ্গমে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

ত্রিশরণ নৌকা করলাম আট কুঠরি।
 নিজ দেহ করুণা শূন্যতা নারী॥
 তরিত্ত ভবজলধি পার মায়া স্বপ্ন।
 মধ্য স্রোত তরঙ্গে আমি মগ্ন॥
 পঞ্চ তথাগত করলাম দাঁড়।
 কায় বেয়ে কাহ মায়াজাল ফাঁড়॥
 গন্ধ স্পর্শ রস যেমন যেমন আছে।
 নিদ্রাবিহনে স্বপ্ন যেমন নাচে॥
 চিত্ত কর্ণধার শূন্যতা মার্গে।
 কাহ চলল মহাসুখ সংসর্গে॥
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্যে রূপান্তর

ত্রিশরণ নৌকাতে আট কুঠরি করলাম, নিজদেহ তাতে করুণা শূন্যতা করলাম। তরিং ভবসমুদ্র পার হওয়া মায়াজাল স্বপ্ন মাত্র, তার মধ্যস্রোত তরঙ্গে আমি রয়েছি মনস্থ করলাম। তথাগতের পঞ্চশীল হল আমার দাঁড়, কায়া নৌকা বেয়ে কাহু মায়াজাল ফেড়ে ফেলল। গন্ধ স্পর্শ রস যেমন যেমন রয়েছে নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন ঠিক তেমনি। চিত্ত কর্ণধার শূন্যতা মাগে কাহু চলল মহাসুখ সন্নিধানে।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

ত্রিশরণাদি দায় বাকচিহ্ন যেমন চতুর্থে শরণশীলগত তেমনি মহাসুখকায় নৌকা রূপ শূন্যতা করুণা নিজ দেহ। অষ্টশক্তি বুদ্ধের ঐশ্বর্যসুখ অনুভূত। সেই চতুর্থানন্দ উপায়ে নৌকাতে মায়াময় স্বপ্ন প্রপঞ্চ সাদৃশ্য ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন কাহু পা। মধ্যবেগী কায়া পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠানচিন্তের তরঙ্গ সুখ ভুক্ত আত্মবেদন প্রত্যক্ষ করে বিত্তদ্ধ পঞ্চ তথাগতাত্মক স্বদেহ মহাসুখে নৌকায় ক্রীড়ারত, কাহু পা মায়াজাল সাদৃশ্য স্বন্ধধাত বিষয় সমুদ্রের বাধা মুক্ত করলেন। বাহ্য গন্ধ রস স্পর্শ বিষয়ে যেমন যেমন করার তাই করলেন। সর্বধর্ম স্বরূপ অবগমনহীন নিদ্রারহিত জাগ্রত স্বপ্নের মত প্রতিভাত। শূন্যতা নৌমার্গে চিত্ত কর্ণধার সমারোহে কাহু মহাসুখ চক্ষুদীপে উপনীত হলেন।

সমীক্ষা

যে কোনও ধর্ম প্রচারক নতুন মতবাদ বা ধর্মনীতি জীবন আচরণ উপযোগী করে জনসমক্ষে প্রথমে উপস্থাপন করেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরে অনুচর-অনুরাগীবৃন্দ প্রকাশ এই ধর্ম প্রচার করতে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গিয়েছে, কোনও কোনও ধর্মমত মানুষ স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করেছে; কোন কোন ধর্ম জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর অনুসারিবৃন্দ কখনও জবরদস্তিমূলক কাউকে ধর্মান্তরিত করেন নি, সে কারণে বৌদ্ধধর্মকে শান্তির ধর্ম বলা যায়। কিন্তু এ ধরনের শান্তিপ্রিয় অহিংস মতবাদ হিংস্রতার আঘাতে যুগে যুগে নিঃশেষ হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও মতবাদ সে কারণে নিষ্ক্রিয় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। কারণ বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন বা ত্রিশরণ এ ধর্মকে রক্ষা করেছে, যদিও উৎপত্তিস্থলে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন। বিশেষত ত্রিরত্নের অন্যতম সজ্জারাম বা বৌদ্ধমঠ এ ধর্মের প্রাণশক্তি। বৌদ্ধ মঠে ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ বৌদ্ধভিক্ষু, থেরো, সিদ্ধাচার্যরা বাস করেন এবং ধর্মপ্রচার দ্বারা অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। এই ত্রিশরণ হচ্ছে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্জ-এ ত্রিশরণ বা আশ্রয় হচ্ছে জীবন সংগতি। ধর্মকে রক্ষা করেছে সজ্জ, সজ্জের আদর্শ বুদ্ধ ও তাঁর উপদেশ। একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; তাই প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করতে হয়, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সজ্জং শরণং গচ্ছামি। এর কোনটা বাদ দিলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকে না। রূপকভাবে বলতে গেলে বৌদ্ধধর্ম তাই একটা দেহ, এ দেহের কায়বলে চিত্ত হচ্ছে ত্রিশরণ।

চর্যাকার সিদ্ধাচার্যগণ তান্ত্রিক মহাযানি মতাবলম্বী হলেও সজ্ঞবিমুখ বা সজ্ঞ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। যদিও তান্ত্রিক নিয়মে ব্যক্তিগত সাধন পদ্ধতি ও আচার নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল এবং তাঁদের ভেতর কিছুটা উদার স্বাধীন সাধনার অবকাশ ছিল। কিন্তু শ্রমণ আদর্শ সহজযানি হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাজ্য ছিল না। কাহু পা বলেছেন তিনি শৃশানচারী কাপালিক, আসলে তিনি হয়তো তা ছিলেন না, তাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন, তবু তিনি ত্রিশরণ আচারী। বলেছেন, আমার দেহ হল ত্রিশরণ কায় বাক চিত্ত বহনকারী নৌকা, অর্থাৎ ত্রিশরণের জন্য আমার দেহ নিয়োজিত। তারপরও তিনি বজ্রযানি তান্ত্রিক, তান্ত্রিক আচারেই ত্রিশরণ কায়বাকচিত্ত বহন করছেন। দেহের আটটি কুঠরি, তাও বুদ্ধ নির্দেশিত আটশক্তির আবার অনিমা লঘিমা মহিমা লঘিমা প্রাকামা প্রাপ্তি ঈশিত্ব বশিত্ব, তা নিয়ে নৌকা সাজিয়েছেন, কারণ তাতে বাস করছে শূন্য নিরামণি বা নৈরাশ্রা। আর সেটাই তথাগত আদর্শ নির্বাণ। দুঃখ যন্ত্রণা ইন্দ্রিয় মলাদিপূর্ণ জরা মৃত্যুর অধীন মানব জীবন পুনঃপুনঃ জন্মে এই কষ্টভোগ করে থাকে। তথাগত নির্দেশিত পথ অনুসরণ করলে বোধিচিন্তা আয়ত্ত হয়। ফলে নির্বাণ নিশ্চিত হয়। আর পুনর্জন্মে ফিরে আসতে হবে না। শূন্যতায় মহাসুখে অবস্থান হয়। কাহু পা'র বোধিচিন্তা দেহের আটকুঠরিতে অবস্থান করছেন শূন্যতায়। কিন্তু শূন্যতাকে লাভ করা সহজ নয়। তরিৎ ভবজলধি পার হওয়া যেমন মায়াস্বপ্ন এবং ভবনদীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ উত্তাল তীব্র মধ্যস্রোতে পড়ে আনন্দে তা উপলব্ধ হয়। অবশ্য নৌকা চালাতে জানাও এই 'মধ্যবেণী' একেবারে 'উন্মুপথ' বা সোজাপথ। তার জন্য চাই তথাগত নির্দেশিত পাঁচটি নির্দেশ নিয়মকে নৌকার দাঁড় করে নিতে হবে। এই নির্দেশমত কায়রূপ নৌকাকে ভবসমুদ্রে পরিচালিত করলে মায়াজাল এড়িয়ে যাওয়া যাবে বা মায়াজাল ছিন্ন হয়ে সমুদ্র ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে। শূন্যতারূপ বোধিচিন্তা ভরা নৌকায় গন্ধ স্পর্শ রস যেমন যেমন থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির প্রভাব যেন নিদ্রাবিহীন স্বপ্নের মত পড়ে থাকে। কাহু বোধিচিন্তাকে কর্ণধার করেছেন আর শূন্যতা রয়েছে নৌমার্গে, মহাসুখের বা নির্বাণের সঙ্গে মিলন হবে তাঁর।

এ কবিতার সমস্ত রূপক অনুভূতির ভেতর থেকে জীবন অনুভূতির বাস্তব দিক উঁকি দিচ্ছে। বাংলার জনজীবনের চিরকালীন গতি দিয়েছে নৌকা; নদীমাতৃক বলে স্থলপথে চলাচল সীমিত। বিভিন্ন ধরনের নৌকা বাংলার নদী হাওর বন্দরগঞ্জের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করত। এই পথে ভবজলধি বা সমুদ্রে নৌকা চালানোর ইঙ্গিত থেকে বাংলার অতীত গৌরবের জীবনকে হয়তো আবিষ্কার করা যায়। যে নৌকা নদী-খাল-বিল হাওরে চলে, নিশ্চয়ই সে নৌকা দিয়ে সমুদ্র পার হওয়া যায় না। সমুদ্রগামী নৌকা যে তৎকালে ছিল না তা নয়, সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে বিভিন্ন কৌশলে পার হওয়ার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। বহু প্রাচীনকালে বাংলার সমুদ্র উপকূলে পোত নির্মাণের কথা জানা যায়। সমুদ্রতীরের অধিবাসীরা অনেকে পেশায় নাবিক।

শ্রীলঙ্কার ইতিহাস দ্বীপবংস এবং মহাবংসগ্রন্থে রয়েছে বাংলার কোনও এক রাজপুত্র বিজয় সিংহ নৌকাযোগে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে দ্বীপে সদলবলে যান এবং তথায় বসতি স্থাপন করেন। এ কথা হয়তো বা সিদ্ধাচার্যরা জানতেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বহু আগে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

থেকে বাঙালির সামুদ্রিক পোত চালাতে জানত। কাহু পা বলছেন মধ্যস্রোতের তরঙ্গে তিনি স্থিতধী, অর্থাৎ সমুদ্রের দুরন্ত বিক্ষুব্ধ স্রোতের মধ্যে নৌকা চালানোর অভিজ্ঞতা তার রয়েছে।

নদীর ভেতর মায়াজালের উল্লেখ রয়েছে। মায়াজাল বাস্তবিকপক্ষে এক রকমের মাছ ধরার জাল, যদিও দার্শনিক তত্ত্বে তার অর্থ মোহ, মমতা, স্নেহ, বন্ধন ইত্যাদি। কিন্তু নদীতে বা সমুদ্রে বড় বড় মাছ ধরার জন্য জেলেরা মায়াজাল পেতে রাখে। এ জালের ঘর বেশ বড় বড় বলে ছোট ছোট মাছ অনায়াসে এর ভেতর দিয়ে চলাচল করতে পারে, কিন্তু বড় মাছ ধরা পড়ে। এই মায়াজাল ডুবে থাকে, তাতে অনেক সময় নৌকা বা জাহাজও আটকা পড়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

এই কবিতায় আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে, যা কাহু পা'র কবিমনের অসামান্য পরিচয় বহন করে, যেমন—

গন্ধ পরসরস জইসো তইসো।

নিদ্ বিহনে সুইনা জইসো॥

অর্থাৎ গন্ধ স্পর্শ রস যেমন যেমন আছে।

নিদ্রাবিহনে স্বপ্ন তেমনি মাঠে।

নিদ্রাহীন স্বপ্নের উপমা আধুনিক মনকে ছুঁয়ে যায়। সৃষ্ণ উপলব্ধির জীবন অনুভূতি তাত্ত্বিকতাকেও যেন উপহাস করছে। তাত্ত্বিকের চাইতে কাহু পা এখানে শিল্পী ও কবি বড়ো হয়েছেন।

চর্যা-১৪

রাগ ধনসী

ডোয়ী পা

এই কবিতাটিতে কাহু পা'র আধুনিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গন্ধ পরসরস জইসো তইসো' এবং 'নিদ্ বিহনে সুইনা জইসো' এই দুটি পদটিই কবিতার মূল ভিত্তি। এখানে 'গন্ধ' শব্দটি 'স্পর্শ' এবং 'রস' শব্দটি 'স্বপ্ন' এর অর্থ দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। 'নিদ্ বিহনে' অর্থ 'নিদ্রা ছাড়া' এবং 'সুইনা' অর্থ 'স্বপ্ন'। 'জইসো' অর্থ 'যেমন'। 'তইসো' অর্থ 'তাই'। 'মাঠে' শব্দটি 'স্বপ্ন' এর অর্থ দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

গঙ্গা জউগা^২ মাঝে রে^৩ বহই নাই^৪।

তহি বুড়িলী^৫ মাতঙ্গী পোইআ^৬ লীলে^৭ পার করেই^৮ ॥

বাহতু^৯ ডোয়ী বাহলো^{১০} ডোয়ী বাটত^{১১} ভইলা উছারা^{১২}।

সঙ্গুরু পাঅ পসাএ^{১৩} জাইব পুনু জিনউরা^{১৪} ॥

পাঞ্চ^{১৫} কেডুআল পড়ন্তে^{১৬} মাঙ্গে পীঠত^{১৭} কাছী^{১৮} বাকী।

গঅন দুখোলে^{১৯} সিঞ্চুল^{২০} পানী গ পইসই সাকী ॥

চন্দ^{২১} সুজ্জ দুই চকা^{২২} সিটি সংহার পুলিন্দা^{২৩}।

ডাম ডাহিন দুই মাগ গ চেবই^{২৪} বাহতু ছন্দা ॥

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই^{২৫} সুচ্ছড়ে^{২৬} পার করই।

জো রাখ চড়িলা বাহবা ন^{২৭} জাই^{২৮} কল কল বড়ই^{২৯} ॥
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

পাঠান্তর

১. ধানশ্রী। ২. জউনা। ৩. মাঝেরে। ৪. নাই। নই। ৫। চড়িলী। ৬. বোইআ, মাতঙ্গিবোই আ। ৭. লীলা। ৮. করই। ৯. বাহতু। ১০. বাহ লো। ১১. বাট। ১২. উছারা। ১৩. পাআপএ। ১৪. জিণউরা। ১৫. পাঞ্চ কেড় আল, পাঞ্চ কেআল। ১৬. পিটত। ১৭. কাঙ্ক্ষী। ১৮. দুখোলে। ১৯. সিঞ্চুই। ২০. চান্দ, চন্দসূজ। ২১. চাকা। ২২. পলিন্দা, পুলিন্দ। ২৩. রেবই। ২৪. উহ। ২৫. সুচ্ছলে। ২৬. বাহবান। ২৭. জোই। ২৮. বুলই।

শব্দার্থ ও টীকা

ডোঙ্গী পা—হয়তো এটি তাঁর সঠিক নাম নয়, ডোঙ্গীকে লক্ষ্য করে পদ রচনার জন্য এ নাম, ডোঙ্গী স্ত্রী লিঙ্গ, তাই মনে হয় তা ছদ্মনাম; ১০ নং চর্যার শেষে মুনিদত্তের টীকায় লাড়ীডোঙ্গী পাদানং দেখা যাচ্ছে, তাহলে লাড়ীডোঙ্গী পা এবং ডোঙ্গী পা কি একই? গঙ্গা—গঙ্গা নদী গঙ্গা—গাং যে কোনও নদী। জউনা—যমুনা। গঙ্গা যমুনা নৌকা বাইতে হলে বাংলায় নয়, উত্তর প্রদেশে যেতে হবে, কারণ এলাহাবাদের কাছে গঙ্গা যমুনা মিলিত হয়ে আবার গঙ্গা নাম নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্তে এসেছে, তারপর পদ্মা নাম নিয়েছে। সে জন্য এ কবিতার পটভূমি বাংলার বাইরে মনে হয়। আবার কথা প্রসঙ্গে, হৃদয়গঙ্গা—যমুনা এমনও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে যমুনা নদী আছে তা ব্রহ্মপুত্রের শাখা, হয়তো বা হালে এ নাম হয়েছে। বহই—বয়ে যাওয়া। নাই—নৌকা, নই—নাবী—নাই। তহি—তারে। বুড়িলী—ডুবে যাওয়া+ইলী, পাঠান্তরে চড়িলী অর্থবোধক মনে হয়, কারণ নৌকা ডুবিয়ে চলা যায় না, তবে যেহেতু মাতঙ্গী পার করেছে তার লীলায় ডুবিয়ে পার করা বোঝাতে পারে, মাতঙ্গী—হস্তিনী, ৯ নং চর্যার করিণী অর্থাৎ নৈরাশ্রা বলা হয়েছে, নৈরাশ্রা এখানেও পোইআ—কন্যা; পুত্র—পুস্ত—পুত+ইয়া=পুতিয়া—পোইআ। টীকায়—‘যোগীন্দ্র পারং করোতিতি’ তাই যোগীন্দ্র, জোই+আ=জোইআ পাঠান্তরে। লীলে—লীলাক্রমে, অবলীলায়। পার করেই—পার করে, অবলীলামুক্ত করে পার করে। বাহতু—তুমি বেয়ে চল, এ শব্দে হিন্দি প্রভাব রয়েছে। বাটত—পথে। উছারা—গোধূলী, সন্ধ্যাবেলা—অতিক্রান্তবেলা—উছারা। পাঅ পসাএ—পাদ প্রসাদে। জিনউরা—জিনপুর। কেডুআল—দাঁড়। পড়ন্তে—পড়ছে। মাঙ্গে—মার্গে, রাস্তায়। পিঠত—পিঠে। গঅন—গগন। দুখোল—সেঁউড়ি। গঅন দুখোলে—গগন সেঁউতিতে। সিঞ্চুই—সিঞ্চন করে, সেঁচে। পইসই—প্রবেশ করে। সাকী—সন্ধি, নৌকার জোড়ার ফাঁক, কাঠের জোড়ায় ছিদ্র, দাড়ার মাঝবান দিয়ে। চকা—চাকা, চন্দ্রসূর্য চাকার মত ঘুরে কক্ষপথ অতিক্রম করে আকাশপথে। সিটি—সৃষ্টি; সৃষ্টি—সিঞ্চি—সিঠি। সংহার—ধ্বংস। পলিন্দা—পুঁটলি, এখানে এ অর্থ হতে পারে না, তবে মাস্তুল অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু তাতেও অর্থ যথেষ্ট নয়, বর্বর জাতি বা রাজা অর্থ যথায়থ, কারণ আকাশের রাজা চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি সংহারে ঘুরছে, গগনপথ পিষে দিচ্ছে, টীকায়—‘চন্দ্রং প্রজ্জাজ্ঞানং সূর্যমুৎপাদা দৃঢ়জ্ঞানং পুলিন্দং। মাগ—মার্গ, পথ। চেবই—চেতনা, সচেতন থাকা; চিন্তা—চেতয়তি—চেবই। কবড়ি—কড়ি, কপর্দক—কবড়ী। বোড়ি—সিকিপণ, পাঁচ গঙ্গা অর্থাৎ বিশ; বোড়ী—বোড়ি, বুড়ি। সুচ্ছরে—সুচ্ছন্দে। বাহবা—বাইতে। জাই—জানি। বুড়ই—ডুবে যাই।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

গঙ্গা যমুনার মাঝে বাইয়ে নাও ।
 তাতে ডুবিয়ে মাতঙ্গি কন্যা লীলায় পার করাও ।
 ডোমনি বেয়ে যাও, ডোমনি যাও যাও আসছে সাঁঝ ।
 সদগুরু পাদ প্রসাদে যাব পুণ্য জিগপুর মাঝে ॥
 পাঁচ দাঁড় পড়েছে পথে কাছি বাঁধা পিটে থাকে ।
 গগন সিঁউতি যাতে ছুইয়ে না ঢোকে পানি ফাঁকে ॥
 চাঁদ সুরুজ দুই চাকা সৃষ্টি সংহার রাজা ।
 বাম ডান দুই পথে না চিতে বেয়ে যাও সোজা ॥
 কড়ি নেয় না বুড়ি নেয় না স্বেচ্ছায় করে পার ॥
 যে রথে চড়ল বাইতে জানে না কুলে কুলে ডুবে সার ।

গদ্যে রূপান্তর

গঙ্গা যমুনার মাঝ দিয়ে নৌকা বেয়ে যায়, তাতে প্রচ্ছন্ন থাকা মাতঙ্গি কন্যা অবলীলায় পার করিয়ে নেয় । ওগো ডোমনি (ডুবনি) বেয়ে যাও, ওগো ডোমনি বেয়ে চল পথে অবেলা হয়ে যাচ্ছে । সদগুরুর চরণ প্রসাদ নিয়ে আবার জিগপুর যাব । পাঁচ দাঁড় পথে পড়েছে নাও বাইতে, পিটে কাছি তো বাঁধা রয়েছে, গগন সিঁউতিতে সঁচে দাও ফাঁকে যাতে পানি না ঢুকে । চাঁদ সুরুজ দুই চাকা সৃষ্টি সংহারের নিকর, বাম ডান দুই পথের চেতনা না রেখে বেয়ে যাও স্বচ্ছন্দে । কড়ি নেয় না বুড়ি নেয় না স্বেচ্ছায় পার করিয়ে দেয় । যে রথে চড়ল বাইতে জানে না কুলে কুলেই ডুবল

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

ব্যঙ্গার্থে নৌকায় গঙ্গাযমুনা চন্দ্রসূর্যভাস গ্রাহ্য গ্রাহক যথা শুক্রনাড়ি বিরামানন্দ অবধূতিকার পথকে বোঝানো হচ্ছে । নৌকায় স্থিত সহজযানি প্রমত্ত মাতঙ্গি কন্যারূপ ডোমনি নৈরাত্ম্য সংসার নৌকায় যোগী ডোমনি পাকে লীলায় নদী পার করান । সহজশোধিত বিরূপানন্দ নৌপথে প্রাপ্ত পানাসক্ত ডোমনি আত্ম সংবোধে বলছেন, কী জন্য বিলম্ব? সদগুরু প্রসাদে নিরন্তর জিনপুর মহাসুখ অতিসন্নিহিত, এ কথা মনে করে বেয়ে যাও । পাঁচ দাঁড় পাঁচ ক্রমউপদেশে গৃহীত কাছি মণিমূল বোধিচিন্ত্ত সহজানন্দে বিধৃত পথ প্রদর্শক । গগন সঁউতি চতুর্থ অভিষেক দ্বারা সিংহন করে যোগী ডোমনি বিষয় উল্ফপানি নিষ্কাশিত করেছেন । চন্দ্র প্রজ্ঞাজ্ঞান সূর্য সমুদ্র পাদকজ্ঞান পুলিন্দ সংহারের সৃষ্টিকে সংহার করছে । এই পারাপারের জন্য বাহ্যত কোনও কড়ির প্রয়োজন নেই, সেই ভগবতী ডোমনি নৈরাত্ম্য স্বেচ্ছায় পার করিয়ে দেন । নৈরাত্ম্য ধর্ম পরিচয়ে শাস্ত্রাভিমानी যে যোগী কুলে শরীরে ভ্রম রেখে দেন সে কুলেই ডুবে যায় ।

সমীক্ষা

এই চর্যাপদের রূপকল্প একটু ভিন্ন প্রকৃতির, মাতঙ্গি কন্যা ডোমনি দুরন্ত স্রোতের গঙ্গা যমুনা ডুবুরি (মৎস্যকন্যা) : তবঙ্গাঘাতে নৌকা ডুবলেও ডুবন্ত নৌকাকে অথবা প্রচ্ছন্ন দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

বোধিচিন্তকে পার করিয়ে দেন। বোধিচিন্ত উৎসাহী তাড়াতাড়ি পার হবার জন্য এই প্রমত্ত তরঙ্গ দেখে বলছেন, তাড়াতাড়ি কর, বেলা বেশি নেই, তাড়াতাড়ি পার কর। সদগুরু চরণপ্রসাদ নিয়ে আবার জিনপুর যেতে হবে।

নৌকার পিঠে শক্ত করে কাছি বাঁধা কিংবা নৌকার তলদেশ দিয়ে পানি চুঁইয়ে প্রবেশ করলেও গগন বা শূন্যতা সিঁউতি দিয়ে সে পানি সঁচে নিষ্কাশিত করা হয়েছে। চাঁদ সূর্যের জ্ঞান চাকা দিয়ে সংসারের সৃষ্টিকে সংহার করা হয়েছে। ডান বামের চেতনা পথে একটুকুও সচকিত না হয়ে পার হতে হবে। এ নায়ের মাঝি ডোম্বী পারানি নেয় না, স্বেচ্ছায় পার করায়। আর যে এ নৌকায় শরীরে ভ্রম মলাদি রেখে দেয় সে কুলেই ডুবে যায়।

ইতোপূর্বে ভবনদী প্রসঙ্গ ৫ নং চর্যা, সোনাভরা নৌকা ৮ নং চর্যা, ত্রিশরণ নৌকা ১৩ নং চর্যায় দেখা গেছে, এ ভয়ঙ্কর নদী পার হওয়ার উপায় রয়েছে সেটা নিজের সাধ্যমত, কিন্তু এ যেন আলাদা চরিত্র, নৌকাকে মাতঙ্গি কন্যা প্রচ্ছন্নে পার করিয়ে দেবে। পার করিয়ে নির্বাণে নিয়ে যাবে।

গঙ্গা যমুনা এক্ষণে নদী কিংবা ভবনদী বলা হয়নি কেবল, জীবনের ধারা হিসেবে এদের অনুভব করা যায়, গঙ্গা হল দুঃখ যন্ত্রণা আর যমুনা হল মোহমায়া কাম প্রেম ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ধারা, তারা জীবনে এসে মিশেছে। অথবা জন্ম মৃত্যু ও কর্মফলের কারণে জীবনে এ ধারা এসে জড়ো হয় এবং ধারণা অতিক্রম করতে হয়। আবার এ ধারার মিলিত স্রোতের মধ্য দিয়ে দেহরূপ নৌকা চালিত করতে হয়। যদি এ দেহ নানা দোষে ভারগ্রস্ত হয় তবে সদগুরুর চরণপ্রসাদে মাতঙ্গি কন্যার সাহায্যে পার হওয়া সম্ভব। বলা নিম্প্রয়োজন যে মাতঙ্গি কন্যা হল মনোহারা। নৌকায় সংযোজিত পাঁচটি দাঁড় বুদ্ধের পঞ্চশীল, নৌকার পেছনটাকে কাছিতে বেঁধে গুন টেনে নিতে হবে, গগন বা শূন্যতা সঁউতি দিয়ে নৌকায় চুঁইয়ে পানিরূপ প্রবিশ্ট দোষ সিঞ্চন করতে হয়। অথবা এমনও হতে পারে যে চুঁইয়ে প্রবেশ করার ফাঁক চুকে দিতে হবে। চন্দ্রসূর্য প্রজ্জ্ঞাজ্ঞান দিয়ে সংসার সংহার করে দিতে হবে, এখানে রূপকে বোঝাতে পারে যে সমুদ্রের ওপর চন্দ্রসূর্যের প্রভাবে জোয়ারভাটা তাতে নৌকার চলাচলের ওপর প্রভাব থাকতে পারে। নৌকা চালাতে হবে ডানবাম চিনে, যাতে নৌকা বা দেহের সহজ ছন্দ থাকে। এ সাবধানতা না থাকলে কুলেই ডুবে যাবে নৌকা।

এই চর্যাপদের কোথাও কোথাও শব্দ অনুপ্রাসের বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, যেমন— 'বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা' এখানে দুবার ডোম্বী উচ্চারণের দু'অর্থ হয়তো প্রকাশ করছে, আগে বলা হয়েছে মাতঙ্গি কন্যা নিমজ্জমান, তাহলে প্রথম ডোম্বীকে ডুবুরি মনে করার ইঙ্গিত ও কবিতার অন্তর্গত সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায় থাকে।

কবড়ী ন লেই বোড়ী গ লেই সুচ্ছড়ে পার করই

কড়বী আর বোড়ি প্রায় একই, যেমন দৈনন্দিন আমরা টাকা-কড়ি উচ্চারণ করি, যা নগদ অর্থ হিসেবে মনে করি। চাঁদসূর্যকে চাকা কল্পনা করার ভেতর কবির বিজ্ঞানমনস্কতা প্রকাশ পাচ্ছে। তৎকালে জনবিশ্বাসে পৃথিবীর অবস্থা ভাবা হত কোনও একটা ষাঁড়ের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিঙের ওপর, বছরান্তে শিং বদল করলে ভূমিকম্প। আর ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে আছে একটা কচ্ছপের ওপর, কচ্ছপটা মাছের ওপর, সে মাছটা অন্য মাছের ওপর, এমনি চলতে থাকবে। চাঁদসুরুজ হল আকাশে খচিত। কিন্তু সিদ্ধাচার্য বলছেন তা হল চাকা, অথবা তারা ঘোরে। এ কথা বলার জন্য সে সময়ে অন্য ধর্মের আইনে গর্দান যেত।



প্রেট ৭ : ডোম্বী পা

ডোম্বী পা

ডোম্বী পা রাজা দেবপালের রাজত্ব (৮০৯-৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ) এ সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ডোম্বী পা তাঁর ছদ্মনাম। তিনি বাংলার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তবে হিন্দিভাষী পণ্ডিতরা বলছেন তিনি মগধের অধিবাসী, তাঁর রচিত একটি গ্রন্থে একটি স্থানের নাম থেকে তিনি ত্রিপুরাবাসীও হতে পারেন। অনেকের ধারণা তিনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর ভেতর 'নাড়ী বিন্দু' দ্বারে যোগচর্যা; অক্ষর দ্বিকোষ; গীতিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চর্যা-১৫
রাগ রামকী
শান্তি পা

2 poem by shanti pa

১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১
২৬২
২৬৩
২৬৪
২৬৫
২৬৬
২৬৭
২৬৮
২৬৯
২৭০
২৭১
২৭২
২৭৩
২৭৪
২৭৫
২৭৬
২৭৭
২৭৮
২৭৯
২৮০
২৮১
২৮২
২৮৩
২৮৪
২৮৫
২৮৬
২৮৭
২৮৮
২৮৯
২৯০
২৯১
২৯২
২৯৩
২৯৪
২৯৫
২৯৬
২৯৭
২৯৮
২৯৯
৩০০
৩০১
৩০২
৩০৩
৩০৪
৩০৫
৩০৬
৩০৭
৩০৮
৩০৯
৩১০
৩১১
৩১২
৩১৩
৩১৪
৩১৫
৩১৬
৩১৭
৩১৮
৩১৯
৩২০
৩২১
৩২২
৩২৩
৩২৪
৩২৫
৩২৬
৩২৭
৩২৮
৩২৯
৩৩০
৩৩১
৩৩২
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭
৩৩৮
৩৩৯
৩৪০
৩৪১
৩৪২
৩৪৩
৩৪৪
৩৪৫
৩৪৬
৩৪৭
৩৪৮
৩৪৯
৩৫০
৩৫১
৩৫২
৩৫৩
৩৫৪
৩৫৫
৩৫৬
৩৫৭
৩৫৮
৩৫৯
৩৬০
৩৬১
৩৬২
৩৬৩
৩৬৪
৩৬৫
৩৬৬
৩৬৭
৩৬৮
৩৬৯
৩৭০
৩৭১
৩৭২
৩৭৩
৩৭৪
৩৭৫
৩৭৬
৩৭৭
৩৭৮
৩৭৯
৩৮০
৩৮১
৩৮২
৩৮৩
৩৮৪
৩৮৫
৩৮৬
৩৮৭
৩৮৮
৩৮৯
৩৯০
৩৯১
৩৯২
৩৯৩
৩৯৪
৩৯৫
৩৯৬
৩৯৭
৩৯৮
৩৯৯
৪০০
৪০১
৪০২
৪০৩
৪০৪
৪০৫
৪০৬
৪০৭
৪০৮
৪০৯
৪১০
৪১১
৪১২
৪১৩
৪১৪
৪১৫
৪১৬
৪১৭
৪১৮
৪১৯
৪২০
৪২১
৪২২
৪২৩
৪২৪
৪২৫
৪২৬
৪২৭
৪২৮
৪২৯
৪৩০
৪৩১
৪৩২
৪৩৩
৪৩৪
৪৩৫
৪৩৬
৪৩৭
৪৩৮
৪৩৯
৪৪০
৪৪১
৪৪২
৪৪৩
৪৪৪
৪৪৫
৪৪৬
৪৪৭
৪৪৮
৪৪৯
৪৫০
৪৫১
৪৫২
৪৫৩
৪৫৪
৪৫৫
৪৫৬
৪৫৭
৪৫৮
৪৫৯
৪৬০
৪৬১
৪৬২
৪৬৩
৪৬৪
৪৬৫
৪৬৬
৪৬৭
৪৬৮
৪৬৯
৪৭০
৪৭১
৪৭২
৪৭৩
৪৭৪
৪৭৫
৪৭৬
৪৭৭
৪৭৮
৪৭৯
৪৮০
৪৮১
৪৮২
৪৮৩
৪৮৪
৪৮৫
৪৮৬
৪৮৭
৪৮৮
৪৮৯
৪৯০
৪৯১
৪৯২
৪৯৩
৪৯৪
৪৯৫
৪৯৬
৪৯৭
৪৯৮
৪৯৯
৫০০
৫০১
৫০২
৫০৩
৫০৪
৫০৫
৫০৬
৫০৭
৫০৮
৫০৯
৫১০
৫১১
৫১২
৫১৩
৫১৪
৫১৫
৫১৬
৫১৭
৫১৮
৫১৯
৫২০
৫২১
৫২২
৫২৩
৫২৪
৫২৫
৫২৬
৫২৭
৫২৮
৫২৯
৫৩০
৫৩১
৫৩২
৫৩৩
৫৩৪
৫৩৫
৫৩৬
৫৩৭
৫৩৮
৫৩৯
৫৪০
৫৪১
৫৪২
৫৪৩
৫৪৪
৫৪৫
৫৪৬
৫৪৭
৫৪৮
৫৪৯
৫৫০
৫৫১
৫৫২
৫৫৩
৫৫৪
৫৫৫
৫৫৬
৫৫৭
৫৫৮
৫৫৯
৫৬০
৫৬১
৫৬২
৫৬৩
৫৬৪
৫৬৫
৫৬৬
৫৬৭
৫৬৮
৫৬৯
৫৭০
৫৭১
৫৭২
৫৭৩
৫৭৪
৫৭৫
৫৭৬
৫৭৭
৫৭৮
৫৭৯
৫৮০
৫৮১
৫৮২
৫৮৩
৫৮৪
৫৮৫
৫৮৬
৫৮৭
৫৮৮
৫৮৯
৫৯০
৫৯১
৫৯২
৫৯৩
৫৯৪
৫৯৫
৫৯৬
৫৯৭
৫৯৮
৫৯৯
৬০০
৬০১
৬০২
৬০৩
৬০৪
৬০৫
৬০৬
৬০৭
৬০৮
৬০৯
৬১০
৬১১
৬১২
৬১৩
৬১৪
৬১৫
৬১৬
৬১৭
৬১৮
৬১৯
৬২০
৬২১
৬২২
৬২৩
৬২৪
৬২৫
৬২৬
৬২৭
৬২৮
৬২৯
৬৩০
৬৩১
৬৩২
৬৩৩
৬৩৪
৬৩৫
৬৩৬
৬৩৭
৬৩৮
৬৩৯
৬৪০
৬৪১
৬৪২
৬৪৩
৬৪৪
৬৪৫
৬৪৬
৬৪৭
৬৪৮
৬৪৯
৬৫০
৬৫১
৬৫২
৬৫৩
৬৫৪
৬৫৫
৬৫৬
৬৫৭
৬৫৮
৬৫৯
৬৬০
৬৬১
৬৬২
৬৬৩
৬৬৪
৬৬৫
৬৬৬
৬৬৭
৬৬৮
৬৬৯
৬৭০
৬৭১
৬৭২
৬৭৩
৬৭৪
৬৭৫
৬৭৬
৬৭৭
৬৭৮
৬৭৯
৬৮০
৬৮১
৬৮২
৬৮৩
৬৮৪
৬৮৫
৬৮৬
৬৮৭
৬৮৮
৬৮৯
৬৯০
৬৯১
৬৯২
৬৯৩
৬৯৪
৬৯৫
৬৯৬
৬৯৭
৬৯৮
৬৯৯
৭০০
৭০১
৭০২
৭০৩
৭০৪
৭০৫
৭০৬
৭০৭
৭০৮
৭০৯
৭১০
৭১১
৭১২
৭১৩
৭১৪
৭১৫
৭১৬
৭১৭
৭১৮
৭১৯
৭২০
৭২১
৭২২
৭২৩
৭২৪
৭২৫
৭২৬
৭২৭
৭২৮
৭২৯
৭৩০
৭৩১
৭৩২
৭৩৩
৭৩৪
৭৩৫
৭৩৬
৭৩৭
৭৩৮
৭৩৯
৭৪০
৭৪১
৭৪২
৭৪৩
৭৪৪
৭৪৫
৭৪৬
৭৪৭
৭৪৮
৭৪৯
৭৫০
৭৫১
৭৫২
৭৫৩
৭৫৪
৭৫৫
৭৫৬
৭৫৭
৭৫৮
৭৫৯
৭৬০
৭৬১
৭৬২
৭৬৩
৭৬৪
৭৬৫
৭৬৬
৭৬৭
৭৬৮
৭৬৯
৭৭০
৭৭১
৭৭২
৭৭৩
৭৭৪
৭৭৫
৭৭৬
৭৭৭
৭৭৮
৭৭৯
৭৮০
৭৮১
৭৮২
৭৮৩
৭৮৪
৭৮৫
৭৮৬
৭৮৭
৭৮৮
৭৮৯
৭৯০
৭৯১
৭৯২
৭৯৩
৭৯৪
৭৯৫
৭৯৬
৭৯৭
৭৯৮
৭৯৯
৮০০
৮০১
৮০২
৮০৩
৮০৪
৮০৫
৮০৬
৮০৭
৮০৮
৮০৯
৮১০
৮১১
৮১২
৮১৩
৮১৪
৮১৫
৮১৬
৮১৭
৮১৮
৮১৯
৮২০
৮২১
৮২২
৮২৩
৮২৪
৮২৫
৮২৬
৮২৭
৮২৮
৮২৯
৮৩০
৮৩১
৮৩২
৮৩৩
৮৩৪
৮৩৫
৮৩৬
৮৩৭
৮৩৮
৮৩৯
৮৪০
৮৪১
৮৪২
৮৪৩
৮৪৪
৮৪৫
৮৪৬
৮৪৭
৮৪৮
৮৪৯
৮৫০
৮৫১
৮৫২
৮৫৩
৮৫৪
৮৫৫
৮৫৬
৮৫৭
৮৫৮
৮৫৯
৮৬০
৮৬১
৮৬২
৮৬৩
৮৬৪
৮৬৫
৮৬৬
৮৬৭
৮৬৮
৮৬৯
৮৭০
৮৭১
৮৭২
৮৭৩
৮৭৪
৮৭৫
৮৭৬
৮৭৭
৮৭৮
৮৭৯
৮৮০
৮৮১
৮৮২
৮৮৩
৮৮৪
৮৮৫
৮৮৬
৮৮৭
৮৮৮
৮৮৯
৮৯০
৮৯১
৮৯২
৮৯৩
৮৯৪
৮৯৫
৮৯৬
৮৯৭
৮৯৮
৮৯৯
৯০০
৯০১
৯০২
৯০৩
৯০৪
৯০৫
৯০৬
৯০৭
৯০৮
৯০৯
৯১০
৯১১
৯১২
৯১৩
৯১৪
৯১৫
৯১৬
৯১৭
৯১৮
৯১৯
৯২০
৯২১
৯২২
৯২৩
৯২৪
৯২৫
৯২৬
৯২৭
৯২৮
৯২৯
৯৩০
৯৩১
৯৩২
৯৩৩
৯৩৪
৯৩৫
৯৩৬
৯৩৭
৯৩৮
৯৩৯
৯৪০
৯৪১
৯৪২
৯৪৩
৯৪৪
৯৪৫
৯৪৬
৯৪৭
৯৪৮
৯৪৯
৯৫০
৯৫১
৯৫২
৯৫৩
৯৫৪
৯৫৫
৯৫৬
৯৫৭
৯৫৮
৯৫৯
৯৬০
৯৬১
৯৬২
৯৬৩
৯৬৪
৯৬৫
৯৬৬
৯৬৭
৯৬৮
৯৬৯
৯৭০
৯৭১
৯৭২
৯৭৩
৯৭৪
৯৭৫
৯৭৬
৯৭৭
৯৭৮
৯৭৯
৯৮০
৯৮১
৯৮২
৯৮৩
৯৮৪
৯৮৫
৯৮৬
৯৮৭
৯৮৮
৯৮৯
৯৯০
৯৯১
৯৯২
৯৯৩
৯৯৪
৯৯৫
৯৯৬
৯৯৭
৯৯৮
৯৯৯
১০০০

সঅ সম্বেঅন^১ সরুঅ বিআরেতে^২ অলকখলকখণ ৭ জাই^৩।জে জে উজু বাটে^৪ গেলা অনাবাটা^৫ ভইলা সোই^৬ ॥ ধ্রু ॥কুলে কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসাররা^৭।বালতিল^৮ একু বাকু^৯ ৭ ভুলহ রাজপথ কন্টারা^{১০} ॥ ধ্রু ॥মাতা মোহা সমুদারে অন্ত ৭ বুঝসি যাহা^{১১}অগে^{১২} গাব ৭ ভেলা^{১৩} দীসঅ ভাতি ৭ পচ্ছ সি^{১৪} নাহা ॥ ধ্রু ॥সুণা পান্তর^{১৫} উহ ৭ দিসই ভাতি ৭ বাসসি^{১৬} জাংতে।এষা^{১৭} অঠ মহাসিদ্ধি সিঝএ^{১৮} উজুবাট^{১৯} জাঅন্তে ॥ ধ্রু ॥বাম ডাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুল থেউ^{২০} সংকেলিউ।ঘাট^{২১} ৭ গুমা খড় তড়ি নো হোই^{২২} আখি বজিঅ^{২৩} বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর

১. সম্বেইন। ২. বিআরে, বিআরেতে। ৩. লকখ ৭ জাই, অলক লক। ৪. উজুবাট।
৫. অনাবাটে। ৬. সোই। ৭. মুঢ়া, মুঢ়াই উজুবাট সংসারা। ৮. ভিতন, ভিন। ৯. বাকু,
বাক্স। ১০. কণকধারা, কন্টারা, কঙ্কারা। ১১. তাহা, মাতামোহ সমুদ্র অন্ত বুঝসি
তাহা। ১২. অগে। ১৩. নভেল। ১৪. নাহনাথ। ১৫. শূন্যপ্রান্তর। ১৬. জান্তে, জাঅন্তে।
১৭. এথ, এথা। ১৮. সিঝই, সীঝই। ১৯. উজুবাটে। ২০. বেলেথেই, বুলথি। ২১. ঘাস,
ঘাটন। ২২. নোহোই। ২৩. বুজঝিঅ।

শব্দার্থ ও টীকা

সঅ—স্ব। সম্বেঅন—সংবেদন। সরুঅ—স্বরূপ। বিআরে—বিচারে। অলকখ
লকখণ—অলক্ষ্য লক্ষণ, টীকায়—অলক্ষলক্ষণাদি বিচারং। ৭ জাই—যায় না, হয় না।
উজুবাট—সোজাপথ। অনাবাটা—অন্যপথ হওয়া, ফিরে আসা। মা হোই—হয়ো না।
বাল—বালক, তিল—তিলেক, তিল পরিমাণ। একু বাকু—আঁকা বাঁকা। কন্টারা—
কঙ্কারা, সৈন্যদল। কঙ্কারা>কন্টারা>কন্টারা। সমুদারে—সমুদ্রে, সমুদ্র>সমুদ্র+রে।
৭ বুঝসি—বোঝে নি। নাব—নৌকা। দিসই—দেখা যায়। ভাতি—ভ্রাতি। পুচ্ছসি—
জিজ্ঞাস কর। নাহা—নাথ, গুরু। সুণা পান্তর—শূন্যপ্রান্তর, শূন্যপথ, শূন্য মার্গভাতি-
ভ্রাতি। জাংতে—জানতে, যেতে যেতে জানতে। এষা—এখানে। অঠ—আট।
সিঝএ—সিদ্ধ হয় সিদ্ধ>সিঝঝা>সিঝই। জাঅন্তে—যাওয়া অন্তে, গেলে। বাটা—পথ।
বুলথেউ—ঘুরে বেড়ায়। সংকেলিউ—খেলা করতে করতে। গুমা—গুম হয়ে যাওয়া,
নিঃশেষ। খড়তড়ি—ঘাসতণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

15=====p91

26th=====126

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

স্ব সংবেদন স্বরূপ বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ হল না।
 যারা যারা সোজাপথে গেল তারা আর ফিরে এল না॥
 কুলে কুলে ঘুরে কী হবে রে মৃত সংসারের সোজাপথ নে তো।
 বালকের মত আঁকাবাঁকা পথে না ভুলো রাজপথে সেনা টহলরত॥
 মায়ামোহ সমুদ্রের অন্ত বোঝনি থইও পাওনি।
 সামনে নৌকাভেলা ভুল, যায় না দেখা গুরু থেকেও জেনে নাও নি॥
 শূন্য প্রান্তর উহ্য দেখা যায় যেতে যেতে আর ভুল না কর।
 এই আট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ সোজা পথ থেকে আর না সরো॥
 বাম ডান দুই পথ ছেড়ে শান্তি পা খেলাচ্ছলে ঘুরে বেড়ায়
 ঘাট নেই খড় নেই তৃণও নেই চোখ বুজে কি পথ খুঁজে পায়?॥

গদ্যে রূপান্তর

স্বয়ং সংবেদন স্বরূপ বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ হয় না, যারা যারা সোজা পথে গিয়েছে তারা সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করেনি। একুলে ওকুলে ঘুরে (জন্মে পুনর্জন্মে) কী হবে রে মৃত, সংসারের সোজাপথ যা তাই নাও। বালকের মত আঁকাবাঁকা হেঁটো না, সাবধান, রাজপথে সৈন্য দলের পাহারা আছে। মায়ামোহ সমুদ্রের অন্ত বোঝনি তার থইও পাওনি। সামনে নৌকা ভেলা কিছুই দেখা যায় না, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। শূন্যপ্রান্তর দূরসীমা কিছুই নজরে পড়ে না তাই যেতে যেতে আর ভুল করো না, এখানে আট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ সোজা পথ রয়েছে তা অবলম্বন করো। ডান বাম দুপথ ছেড়ে শান্তি পা খেলাচ্ছলে ঘুরে বেড়ায় (এখানে), ঘাট নেই খড় নেই তৃণও নেই, অথচ চোখ বুজে সোজা তার পাওয়া যায় না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

স্বয়ং সংবেদন অনুভব স্বরূপে সিদ্ধাচার্য শান্তি পা অলক্ষ্য লক্ষণাদি বিচার করে না, যে যে যোগীরা বিরাম আনন্দ অবধূতীমার্গ বরে মহাসুখ চক্রে লগ্নাগত সে রূপ হলেন। মূর্খ বালযোগী কুলে কুলে বা জন্মে জন্মে প্রত্যেক শরীরে এই বিরাম আনন্দ উপায় মার্গে উপনীত হতে পারেন না, কারণ বুদ্ধত্ব শুদ্ধ বজ্রমার্গের বামদক্ষিণে বালকের মত বিশৃঙ্খলভাবে তাকান, কারণ বালকেরা জানে না কখন ধারাপথে ক্রীড়া প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

মায়াপ্রজ্ঞা ও মোহসঙ্গ মহাসমুদ্র প্রমাণ আদ্যঅন্ত কিছু বোঝার উপায় নেই, নৌকায় অগ্রপশ্চাৎ ভেদ নির্ণয় তাই গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। শূন্যতা পথে প্রভাস্বর পরিদৃষ্ট হয় না, যেতে যেতে জেনে নিতে হবে। এই প্রভাস্বর পরিশোধিত স্বাধিষ্ঠান চিত্ত ভাবনা অষ্টসিদ্ধি ভাবনা সিদ্ধ। শান্তি পা বামদক্ষিণ আভাসদ্বয় পরিহার করে স্কুট ভাব বিষয়ারণ্যে সংহার করে পরিশুদ্ধ অবধূতী বিরাম আনন্দ মার্গে গেলেন। খড়কুটা গুল্ম ডালাদির ক্রোন ভয় রইল না। তৃণ কণ্টকে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার উপদ্রব রইল না।
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধ উন্মিলিত লোচনে যুগ্মভাবে প্রবেশ করলেন, চিত্ত চৈতন্য শূন্যতা যেখানে বিরাজমান।

সমীক্ষা

প্রায় প্রত্যেক ধর্মের নির্দেশ হল, সোজা পথ অবলম্বন কর। প্রত্যেক ধর্মে আবার সোজা পথের কিছু ব্যাখ্যা, কিছু ইংগিত আছে; বাকিটা নিজের চলার ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধি এবং বিচার গুণে বুঝে নিতে হবে। কোন কোন জায়গায় বলা আছে, যত মত তত পথ অর্থাৎ মতগুলোও সোজা এবং পথগুলোও সোজা, তাই এই সোজা মত ও পথ ধরে চললে লক্ষ্য অর্জিত হবে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে এই ধারণাটা শান্তি পা উল্লিখিত বালকের আঁকাবাঁকা পথ চলার তুল্য। কেউ রয়েছে ঢাকা, যাবে কলকাতা, তাহলে ঢাকা থেকে কলকাতা যাবার সোজা পথ অভিজ্ঞ জনের (গুরু) কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। বিপরীত পথ কিংবা আঁকাবাঁকা পথে চললেও হয়ত কোনও সময় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যেতে পারে, কিন্তু খুব দেরিতে। তাহলে মতের কারণে পথ সোজা হল না। মত বা মতবাদ যতই জোরালো হোক তা যে সোজা পথে চালিত হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

সিদ্ধাচার্য শান্তি পা বলেন যারা সোজা পথে গিয়েছেন, তাঁরা আর ফিরে আসেন নি। তাঁরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছেন, আঁকাবাঁকা পথে যন্ত্রণায় তাঁদের আর ভুগতে হয়নি। কিন্তু যারা গুরুকে জিজ্ঞাসা না করে নিজের মতে ঘুরপথে পা দিয়েছে তারা অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, আবার সংসার কষ্ট যন্ত্রণা ভুগতে হচ্ছে তাদের। তারা বালকের মত, তারা চঞ্চলচিত্ত। শান্তি পা বলেন, নিজের গুরু নিজে হওয়া যায় না বা স্বসংবেদন স্বরূপ বিচার বিকল্প কিছু নেই। নিজেকে নিজে বুঝে লক্ষ্য স্থির করা যায় না, লক্ষ্য অব্যর্থ হয় না।

চঞ্চলমতি বালকের মত অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে রাজপথে যদি বা হাজির হওয়া গেল, কিন্তু তখন দেখা গেল পথে রয়েছে স্ফাবার অর্থাৎ সৈন্যদলের ব্যারিকেড। ওরা ধরে নিয়ে যেতে পারে, শান্তি দিতে পারে কিংবা বিপদে ফেলতে পারে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারে, তাই জীবনপথে অথবা ধর্মপথে চলতে চলতে সাবধান।

জীবনরূপ সমুদ্রের মায়ামোহের অন্ত নেই, অথৈ সে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গস্কন্ধ। যে নৌকা নিয়ে পার হতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে সেটা তো সামনে আছে, অথচ এতই ঝঞ্ঝাবিস্কন্ধ ঝটিকা আচ্ছন্ন যে নৌকা বা ভেলা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোধিচিত্ত নয় বলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি তাই এই অবস্থা। এই ভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য সদগুরু পরামর্শ নিতে হবে। শূন্য প্রান্তরে চলতে গিয়ে দৃষ্টিসীমা হারিয়ে গেছে, তাই গুরু থেকে ভ্রান্তি দূর করার উপায় জেনে নিতে হবে। আট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ যে গুরু তাই আর তা হল বুদ্ধ নির্দেশিত অনিমা লঘিমা গরিমা মহিমা প্রাপ্তি প্রাকামা ঈশ্বিত্ব ও বশিত্ব, এই আট ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য যার আছে তার সোজা পথে চলার কড়ি আছে, সে-ই সোজা পথের খবর জানে। তার চিত্ত চঞ্চল নয়, সে সোজা জিনপুরে পৌঁছতে পারে। শান্তি পা বললেন, তিনি জিনপুরবাসী অর্থাৎ বোধিচিত্ত, তিনি বামদক্ষিণ সম্বন্ধে সচেতন, তাই সোজা পথে খেলতে খেলতে ও দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে বেড়াতেও পারেন। নৌকায় চড়ার জন্য ঘাট না থাকলেও খড়তৃণ ইত্যাদি আচ্ছন্ন থাকলেও তিনি চোখ বুজে পার হতে পারেন।

এ কবিতার ভেতর জীবনরস ও সমাজ জীবনের তখনকার প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। যেমন—

বাল তিল একুবাক্ষুণ ভুলঅ রাজপথ কন্টারা

বালকের মত আঁকাবাঁকা পথে এবং পথ ভুলে চলতে গিয়ে যদি রাজপথে পড়ে তাহলে স্কন্ধাবার বা সৈন্যদলের বাধায় পড়বে, রাজপথে তারা টহল দিচ্ছে যেন রাজা সহজে চলতে পারেন। রাজা ছাড়াও রাজন্যবর্গ, রাজদরবারের লোকেরা চলতে পারেন, রাজকীয় দ্রব্যসামগ্রী আনা-নেওয়া করতে পারে। বোঝা যাচ্ছে তৎকালে রাজপথ দিয়ে জনসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। শত্রু এসে আক্রমণ করতে পারে এজন্য পথে স্কন্ধাবার বা সৈন্যদলের পাহারা মজবুত ছিল।



প্রেট চ : শান্তি পা

শান্তি পা

রাজা মহীপালের সময়ে শান্তি পা বিদ্যমান ছিলেন, মহীপাল রাজত্ব করেন ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ। শান্তি পা মগধবাসী ছিলেন। তিনি অতীশ দীপঙ্করের গুরু ছিলেন। তাছাড়া তিনি কুলগুরু। রাজগুরুও ছিলেন, সম্ভবত তিনি নালন্দার অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু-ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। তাঁর রচিত গ্রন্থের ভেতর 'সুখ দুঃখদ্বয়, পরিত্যাগ দৃষ্টি' প্রধান। মনে হয় তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন নি, শান্তি নাম তার আসল নাম। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা-১৬
রাগ ভৈরবী
মহিমা পা

তিনিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহ^১ কসণ ঘণ গাছই^২ ।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে^৩ বিসঅ মণ্ডল সএল^৪ ভাজই^৫ ॥ ধ্রু ॥
মাতেল চীঅ গঅন্দা^৬ ধাবই ।
নিরন্তর গঅনন্ত তুসেঁ খোলই ॥
পাপপুন্না^৭ বেণি তিড়িঅ^৮ সিকল মোড়িঅ খজাঠা গা ।
গঅন টাকলি লাগি রে^৯ চিন্তা পইঠা^{১০} নিবাণা ॥ ধ্রু ॥
মহারস পাণে^{১১} মাতেল রে তিহঅণ সএল^{১২} উএখী ।
পঞ্চ বিষঅ^{১৩} রে নায়ক^{১৪} রে বিপখ^{১৫} কোবী^{১৬} কোসখী ॥ ধ্রু ॥
খরর বিকিরণ সংতাপে রে গঅগাঙ্গণ^{১৭} গই পইঠা^{১৮} ।
ভণ্ডি মহিতা^{১৯} মই এথু বুড়ন্তে^{২০} কিশি গদিঠা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর

১. মহীধর পা, মহিতা, মহেমন্দ । ২. তিনিএঁ পাটে । ৩. অণহা, অণহঅ । ৪. সনঝান গাজই । ৫. ভয়ঙ্কর. রে উহা । ৬. বিসঅ মণ্ডল সএল । ৭. ভাজই । ৮. গয়ন্দা, গএন্দা । ৯. পাপপুন্না । ১০. তোড়িঅ । ১১. লাগেলি রে । ১২. পইউঠা । ১৩. মহারস পানে । ১৪. সঅল । ১৫. পঞ্চ বিষয় রে । ১৬. বিষয়ের নায়ক রে । ১৭. বিগখ । ১৮. কোবী, কোবী । ১৯. গঅনগঙ্গা, গগনগঙ্গা । ২০. জই পইঠা । ২১. মহিগা । ২২. বুলন্তে ।

শব্দার্থ ও টীকা

তিনিএঁ পাটে—তিন পাঠ, তিন পাটাতন; মুদ—‘পাটত্রয়ং কায়ণন্দদিকং’, পাটত্রয় হল কায়, আনন্দ ও দিক; স্পষ্টত পটাতন হচ্ছে কায়, চিত্ত ও বোধি, এ তিনের সমন্বয়ে বোধিচিত্ত । অণহ—অনাহত । কসণ—কৃষ্ণ, কালো । গাজই—গর্জন করে । তিনিএঁ—... গাজই—তিনটি পাটাতন অনাহত জুড়ে আছে, কালো মেঘ গর্জন করেছে, টীকায়—‘কায়ং কায়াকারেণ চিত্তং চিত্তাকারেণ কায়ং চিত্তং বাকপ্রত্যাহারেণ ইত্যুক্তং’, ‘অনাহতমিতি শূন্যতাশব্দং, কসণ ভয়ানকং, শূন্যতানাদং শ্রুত্বা কণ্ঠ গর্জনং কারোতি’—কায় চিত্তে অনাহত শূন্যতানাদ শুনে কণ্ঠে কৃষ্ণ মেঘের মত গর্জন করে । মার—অবিদ্যা, বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ করতে যে নারীরূপী মায়ামোহ উপস্থিত হয়েছিল, মুদ—‘সংসার ভয়ংকরাহ শত্বককক্ষশ্বেশাদয়ো মারা ভগ্নাং’ । বিসঅ মণ্ডল সএল ভাজই—বিষল মণ্ডল সকল ভঙ্গ, ভজতে>ভাজই, পাঠান্তরে—বিসঅ মণ্ডল সঅল-বিজয় মণ্ডল সকল অর্থাৎ মন্ত্রপ্রয়োগ মণ্ডল ভগ্ন । মাতেল—মাতান হল । চীঅ—চিত্ত । গঅন্দা—গজেন্দ্র, চিত্তগজেন্দ্র—যে মেঘনাদ গর্জন করছে । ধাবই—ধাবমান, ধায় । গঅনন্ত—গগন অন্ত, গগনপ্রান্তে, গগন দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

চতুর্থ আনন্দ উপদেশ। তুসেঁ—তুষায়। ঘোলই—ঘুলিয়ে দেয়। পাপপুণ্যবেণী—পাপ ও পুণ্য একটার সঙ্গে অন্য বেণীর মত থাকে, একটা না থাকলে অন্যটার অস্তিত্ব থাকত না। তিড়িঅ—ছিড়ে। সিকল—শিকল। মোড়িঅ—মুড়ে। খঙা—স্তম্ভ, থাম, স্তম্ভ>খাঙা>থাঙা>থাম। ঠানা—স্থান। টাকলি—টাকরা, মুখের ভেতর টাকরা যেমন গগনের উপমা-অসাধারণ। নিবানা—নির্বাণ। মহারস—মহাসুখ রস খজ্জুর ইস্ফু কেশুর আঙ্গুর কাঁজি আমানিজাত মদ্য। তিহুন—ত্রিভুবন। উএখী—উপেক্ষা করে। পঞ্চবিষয়—পঞ্চভূত, পঞ্চবিষয় রে নায়ক—পঞ্চভূতের নায়ক দেহ; ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম, এ পঞ্চভূত মিলিত হয়ে পঞ্চভূতপ্রাপ্তি। বিপখ—বিপক্ষ। কোবী—কাউকে। খররবিকিরণ—সূর্যের প্রখর তাপ বিকিরণ। সন্তাপে—উত্তাপে। গগনঙ্গন—গগন অঙ্গন, পাঠান্তরে গগন গঙ্গায়। গই পইঠা—গিয়ে প্রতিষ্ঠা হল। মহিত্তা—কবির নাম মহীধর, ডাকনাম মহি বা মহিতা হতে পারে। বুড়ন্তে—ডুবে। কিম্পি—কিছুই, কিঞ্চিৎ>কিম্পি। দিঠা—দেখা।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

তিন পাটে লাগল অনাহত কালো মেঘ গর্জাল।
তা শুনে ভয়ঙ্কর মার বিষয় মণ্ডলসহ ভাগল
প্রমত্ত চিত্ত গজেন্দ্র ধাবিত।
নিরন্তর গগন প্রান্তে তুষা যাপিত।
পাপপুণ্যবেণী শিকল ছিড়ে থাম উপড়ে।
গগন টাকরায় চিত্ত পশে নিঃশব্দ পুরে॥
মহারস পানে মত্ত ত্রিভুবন সকল উপেক্ষা।
পঞ্চ-বিষয় নায়ক বিপক্ষে কেউ যায় না দেখা॥
খর রবি কিরণে তাপে গগনঙ্গন গঙ্গায় পৌছে একি।
মহিত্তা বলেন আমি এখানে ডুবেও কিছু না দেখি॥

গদ্যে রূপান্তর

তিন পাটে (কায়া আনন্দ দিক) লাগল অনাহত কালো মেঘ গর্জন করল; তা শুনে ভয়ঙ্কর মার সকল বিষয় মণ্ডলীসহ পালিয়ে গেল। চিত্ত মত্ত হস্তির মত ধাবিত হল, নিরন্তর গগন প্রান্তে তুষা ঘুলিয়ে উঠল। পাপপুণ্যবেণী শিকল ছিড়ে স্তম্ভস্থান উপড়ে ফেলল। গগন টাকরায় চিত্ত প্রবেশ করল নির্বাণে। মহারস পানে মত্ত হল, ত্রিভুবন সকল উপেক্ষা করল, পঞ্চ বিষয়ের নায়ক তার বিপক্ষে কাউকে দেখা যায় না। খর রবি কিরণে উত্তাপেও গগনঙ্গন গঙ্গায় পৌছে গেল। মহিত্তা বলছেন, আমি এখানে ডুবেও কিছুই দেখি না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

পাটত্রয় কায়া আনন্দ দিক ভেদ উপচারে গৃহীত, জ্ঞান মধুপানে সিদ্ধ সিদ্ধাচার্য মহীধরের চিত্ত অনাহত কৃষ্ণ মেঘের মত ভয়ানক শূন্যতা নাদ কণ্ঠগর্জন করল। তা শুনে সংসার-ভয়ঙ্কর আগন্তুক স্বপ্ন ক্রেশ ভঙ্গ করল, মত্ত প্রয়োগ মহাবল সকল মণ্ডলসহ ভগ্ন হল। চিত্ত গজেন্দ্র চন্দ্রসূর্য দিবারাত্রি বিকল্প ঘুলিয়ে গগন চতুর্থ আনন্দ উপদেশ গ্রহণ করে মহাসুখ রস নিরন্তর পান করল। পাপপুণ্যের সংসার পাশ খণ্ডন করল। অবিদ্যাস্তম্ভ মর্দন করল অনাহত শব্দে প্রেরিত চিত্তগজেন্দ্র নির্বাণ সরোবরে গমন করল। ভাবাতাব মহামুখরস দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানে প্রমত্ত হয়ে ত্রিভুবন উপেক্ষা করল। পঞ্চবিষয়ের নায়ক মহাব্রজধর পুনঃ ক্রেশ বিপক্ষী হয়ে প্রবেশ করল না। মহাসুখ রাগানলে প্রেরিত চিত্ত গজেন্দ্র গগনগঙ্গা মহাসুখ চক্র সরোবরে গিয়ে মিলিত হল। সিদ্ধাচার্য মহীধর এরপরও বলছেন আমি মগ্ন স্বরূপ হয়েও এখানে বিকল্প কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সমীক্ষা

তিন পাট দেহ আনন্দ ও দিক, এই তিন পাট বা পাটাতন যুক্ত হলে বোধিচিহ্ন আর নির্বাণ নিশ্চিত। যখন পাটাতন সংযোগ করার প্রক্রিয়া চলে (দেহ তরীর) অর্থাৎ নির্বাণের জন্য সোজা পথে দেহকে পরিচালিত করা হয় তখন নানারূপ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হতে পারে, কৃষ্ণ মেঘের গর্জন হুঙ্কার কণ্ঠনাদ দিয়ে তা দূর করতে হবে। ভয়ঙ্কর মার মায়ামোহ উপস্থিত হয়ে চক্রান্ত করতে পারে; বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য এই মার নারীরূপে এসে ছলনা চাতুরি প্রদর্শন করেছিল, সেই প্ররোচনা নিপাত করেন। তাই সোজা পথ অনুসরণ করতে গেলে বামদক্ষিণ চেতনা ছেড়ে দূর চিত্তবল দিয়ে সকল বিষয়মণ্ডলী বিশৃঙ্খল করে দিতে হবে, তাতে করে ভয়ংকর মার পালিয়ে যাবে। মত্ত হস্তির মত শূন্যতাকে আকর্ষণ করার জন্য গগন প্রান্তে প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে তোলপাড় করে দিতে হবে।

এ তৃষ্ণা মহাসুখরস পান করার তৃষ্ণা। পাপপুণ্য বোধ একটা সংস্কার মাত্র, এই পাপপুণ্য শুষ্ক সংস্কারের বেণী খুলে ফেলে দিতে হবে। এখানে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় মিলে। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন্টা পাপ আর কোন্টা পুণ্য সেটা কেউ বলতে পারে না। কারও কাছে হত্যা করা হল পাপ, সংসারে প্রতিদিন পশুপাখি প্রাণী হত্যা করছে, এমনকি মানুষও। বিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ছলে নির্মমভাবে হত্যা করছে, কিন্তু তাতে পাপবোধ জাগ্রত হয় না বরং অনেকে তাকে পুণ্য বলে মনে করে থাকে। আবার কেউ কোনও পাপ না করেও নিজেকে পাপী মনে করে এবং দিনরাত সেজন্য অনুতাপ করে। দেখা গেছে সব পাপীই নিজেদের নির্দোষ মনে করে। প্রকারান্তরে অনেক পুণ্যবান নিজেকে পাপী মনে করে। তাহলে কে পুণ্যবান আর কে পাপী তা কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। এমনকি ধর্মও তা নির্ধারণ করে দেয়নি। যিগু বলেছিলেন, এমন নিষ্পাপ যদি কেউ থাকে সে যেন পাপিষ্ঠা এক নারীর ওপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে। দেখা গেল এমন কেউ পুণ্যবান খুঁজে পাওয়া গেল না। কবি তাই প্রজ্ঞাপন্ন হয়ে বলেছেন, পাপপুণ্যের বন্ধন ছিঁড়ে দাও, এই দুই শিকল বাঁধা খুঁটি উপড়ে ফেলে দিতে হবে। তারপর মত্ত হাতির বল নিয়ে গগন টাকরায় উর্ধ্বে পৌঁছে যেতে হবে। সেখানে নির্বাণ মহাসুখ লাভ করতে হবে। এ মত্ততা সৃষ্টি করতে হলে মহাবলের জন্য মহারস পান করতে হবে। চিত্তকে সহজ আনন্দ রসে সিক্ত করতে হবে। এই মহারস পান করতে পারলে ত্রিভুবনকে উপেক্ষা করা সম্ভব। ত্রিভুবন অর্থ হল ভোগআসক্তপূর্ণ জগত সংসার-বাল্যকালে পিতার ভুবন, যৌবনে নিজের ভুবন এবং বার্ধক্যে পুত্রের ভুবন। এ ছাড়াও অন্য তিনটি ভুবন আছে—পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। জীবনের এই তিন ভুবনকে উপেক্ষা করে মহারস পান করে পাঁচ বিষয়ে নায়ক পঞ্চভূতের দেহ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ হল শূন্যতার পরিপন্থী, এ পঞ্চভূতের নায়ক হল রাগ দ্বেষাদির উৎস। তাই এই পঞ্চ বিষয়কে যে জয় করতে পারে সে জিতেন্দ্রিয়, তার বিপক্ষ কেউ থাকতে পারে না। যত

দুঃখ তাপ হোক, খর রবি কিরণের উত্তাপ হোক তিনি গগনাস্ত্র গঙ্গায় পৌছে যাবেন, নির্বাণকে আলিঙ্গন করবেন। কবি মহিষা বলছেন, আমি তো এই গঙ্গায় ডুবে আর কিছু দেখি না, অর্থাৎ জগত সংসার বিষয়াদি কিছুই দেখতে পাই না।

এই কবিতায় গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছাড়াও জীবনবেদ এবং কাব্য সৌন্দর্যের কতকগুলো দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দেহ পাট না দেহ পাটাতন বলা হচ্ছে, দেহকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, নৌকার যেমন বিভিন্ন তক্তা জুড়ে পাটাতন বা পাট করে খোল নির্মাণ করা হয়, দেহকে তেমনি বিভিন্ন উপাদানে সংযুক্ত হবার উপমা খুব উপভোগ্য হয়েছে।

গগন টাকরার উপমাটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ, মানুষের মুখের হা, তাতে ওপরের অংশ গগনের মত গোলাকার গামলা, আর টাকরা হল এমন স্থান যেখান দিয়ে প্রাণবায়ু কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস চেষ্টনা সম্পূর্ণ; বাকও তা থেকে নিঃসারিত হয়। টাকরায় মোক্ষম আঘাত দিলে মৃত্যু অনিবার্য। সেরূপ গগনের টাকরায় রয়েছে নির্বাণ, যা কবির সবচেয়ে প্রিয়, সিদ্ধাচার্যরা তাকে নারীরূপে প্রিয়তমা করেছেন।

এখানে মহারস পানের উল্লেখ আছে, যদিও আধ্যাত্মিকভাবে মহারস পান হচ্ছে মহাসুখ আনন্দন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মহারস হল মদ্য আর যেসব কিনাদি থেকে বের করা রস চোলাই করে মদ্য প্রস্তুত করা হয় তাবা ইক্ষু ইক্ষু আঙ্গুর খজুর কেশুর কাঁজি ও আমানি। মানবসভ্যতার আদি যুগ থেকে মদ্যপানের রেওয়াজ রয়েছে, এক সময় প্রায় সকল ধর্মে মদ্যপান অনুমোদিত ছিল। কোনও ধর্মে মদ্যপান পবিত্র পান হিসেবে বিবেচিত। সম্ভবত মহাযানি তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যরা কেউ মদ্য আসক্ত থাকতেও পারেন, কারণ বৌদ্ধধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ নয়।

এ চর্যায় মার প্রসঙ্গ রয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু স্থানে মারের কথার উল্লেখ আছে। মার হল চিত্ত অনিষ্টকারী, বিশেষত নারীদের মার বলা হয়েছে। গৌতমবুদ্ধ যখন সিদ্ধির জন্য ধ্যানরত ছিলেন তখন মাররূপী নারী এসে নানা ছলাকলা চাতুরি প্রদর্শন এবং দৈহিক প্রলোভন সাজিয়ে বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ করতে চেয়েছিল। তথাগত দৃঢ় চিত্তে মুদ্রা ব্যবহার করে মারকে বিতাড়িত করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র জাতকের ৬১-৭১ সংখ্যা জাতক প্রায় মার সম্বন্ধীয়। তাতে নারীকে সকল অনিষ্টের মূল বলা হয়েছে। বস্তুত নারীকে এমন অবজ্ঞা এবং অবিচার দিয়ে আর কোনও ধর্মে বলা হয়নি।

মহিষা পা

কবির প্রকৃত নাম মহীধর, মহিআ বা মহিষা নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। কিন্তু চর্যাপদের অনুলিপিতে লিপিকার ভুলের জন্য মহিষা নাম এসে থাকতে পারে, পরে লিখিত বিভিন্ন টীকা গ্রন্থাদি থেকে তা শুদ্ধ করা হয়েছে। রাজা বিগ্রহপাল ও রাজা নারায়ণ পালের রাজত্বকালে কবি মহীধর বর্তমান ছিলেন। সেটা সম্ভবত ৮৫০-৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। হিন্দিভাষী পণ্ডিতবর্গ তাঁকে মগধের অধিবাসী বলেছেন, কিন্তু তিনি যে বাঙালি এমন কোনও তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সম্ভবত তিনি বাঙালি ছিলেন না। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা, তার ভেতর 'বায়ুতত্ত্ব' দোহা গীতিকা প্রধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা-১৭
রাগ পটমঞ্জরী
বীণা পা১

১১ সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী। অনহা দান্তী২ চাকি৩ কিঅত৪ অবধূতী ॥ক্ষ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ৫ বীণা। সূন তান্তি ধনি বিলসই রুণা৬ ॥ক্ষ॥
আলি কালি বেগি সারি৭ মুগিআ৮। গঅবর সমরস সাক্ষি গুগিআ৯ ॥ক্ষ॥
জবেঁ করহা করহকলে চাপিউ১০। বতিস তান্তিধনি১১ সঅল বিআপিউ ॥ক্ষ॥
নাচন্তি বাজিল১২ গান্তি১৩ দেই১৪। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ক্ষ॥

সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দান্তী২ চাকি৩ কিঅত৪ অবধূতী ॥ক্ষ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ৫ বীণা।
সূন তান্তি ধনি বিলসই রুণা৬ ॥ক্ষ॥
আলি কালি বেগি সারি৭ মুগিআ৮।
গঅবর সমরস সাক্ষি গুগিআ৯ ॥ক্ষ॥
জবেঁ করহা করহকলে চাপিউ১০।
বতিস তান্তিধনি১১ সঅল বিআপিউ ॥ক্ষ॥
নাচন্তি বাজিল১২ গান্তি১৩ দেই১৪।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ক্ষ॥

পাঠান্তর

১. পিআন। ২. ডাণ্ডি। ৩. বাকী। ৪. ছিঁচিউ। ৫. হেরুক। ৬. করুণা। ৭. সারিঅ।
৮. মুনোআ, সুনিআ, শুনেআ। ৯. গুগিআ। ১০. লেপিচিউ, ১১. ধনিল। ১২. রাজিল।
১৩. গাঅন্তি। ১৪. দেবী।

শব্দার্থ ও টীকা

বীণা—উপমহাদেশীয় সবচেয়ে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র, প্রথমে সাতটি তার ছিল বলে উল্লিখিত, পরবর্তীকালে 'ইরানি বাঁশি' যা বীণার মতই, অষ্টম নবম শতকে তিন তার যুক্ত ইরানি বাঁশি বা সেতার এর মিশ্রণ ঘটে, কাঠামোটি উপমহাদেশীয় থাকে কিন্তু তার বদলে যায়, আমির খসরু এর আবিষ্কর্তা। কবির নাম বীণা পা নয়, মনে হয় এটা আরোপিত, কবিতায় 'বাজই আলা যাহি হেরুঅ বীণা'—ওলো সখি, হেরুক বীণা বাজাচ্ছে; এ কথা থেকে মনে হয় কবির নাম হেরুক; আবার হেরুক একজন সিদ্ধাচার্য এবং দেবতাস্থানীয় ছিলেন; মুদ—'হেরুকার্থাবগমেন বীণাপাদা:। বীণা শব্দদ্বারেণ প্রতিপাদয়ন্তি'। এ বক্তব্য থেকে কবির নাম হেরুক। যেহেতু চর্যাপদ আবিষ্কর্তা প্রাতঃস্মরণী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির নাম বীণাপাদ রেখেছেন, তাঁর সম্মানে এ চর্যার পদকর্তা বীণা পা। সূজ লাউ—সূর্য লাউ। লাউ কথাটির ভেতর ইতিহাস লুকিয়ে আছে। অনেকের ধারণা বাংলার বাউলদের সঙ্গে লাউ-এর একটা সম্পর্ক আছে, তাঁরাই লাউয়ের খোলের ভেতর একটা তার লাগিয়ে এক বা দুই তান্তির সঙ্গে গৌঁথে একতারা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ চর্যাপদের ভেতর লাউ-এর উল্লেখ থাকাতে এ ধারণা মেনে নিতে হবে, লাউ বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সৃষ্টি, বাউলরা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের উত্তরাধিকার, বাউল ইতিহাসের খোলসা এখানেই রয়েছে। একটু খুটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বৌদ্ধ সহজয়ানিদের আরও সহজধারাটি হচ্ছে বাউল, তাদের চীবর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

বা আলখিল্লা পরা জীবনধারা এখনও অটুট, ধর্মবোধও তাঁদের একটুও পরিবর্তন হয়নি। সসি—শশী। তান্তি—তার, তান্ত্রী>তান্তি। অনহা—অনাহত, অনাহত, আহতি দেওয়া হয়নি এমন। দান্তী—ডাঙা, ছোট দণ্ড; দণ্ড>ডাঙা। চাকি—চাকতি। কিঅত অবধূতী—অবধূতী করা হল; অবধূতীকে সাধন সঙ্গিনী করা হল; তাত্ত্বিক আচারের সহজ মার্গ, দেহের মধ্যক নাড়ি, শুক্রবাহী অবধূতী মহাসুখধার। হেরুঅ—অন্য একজন সিদ্ধাচার্য যিনি বীণা বাজাচ্ছেন; একটু নিরাসক্ত মনে দেখা যায় হেরুঅ শুধু বীণা বাজাচ্ছেন না, গানও গাচ্ছেন, সম্ভবত নাচ্ছেনও।

কারণ 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেই'—বজ্রধর নাচছে দেবতা গাইছে, বজ্রধর যিনি দেবতাও তিনি, আর পদকর্তাও তিনি হতে পারেন, কারণ সে যুগের নিয়মানুযায়ী যিনি গান বাঁধেন, তিনি গান গানও এবং তিনি নাচেনও; বাউলদের যেমন। এ থেকে মনে হয়, হেরুঅ এ গানের পদকর্তা। তবে বীণা পা পদকর্তার নাম হতেও পারে। সূর্য তান্তিধনি—শূন্যতারূপ তন্ত্রীধনি। বিলসই—বিলাস করছে। রুণা—করুণা। সারি—সুর। মুনিআ—মনে করলাম। আলি কালি বেণি সারির—মুনিআ-আলি কালিকে বেণী করে সুর বাঁধলাম, অর্থাৎ দু'কাঠিতে তার জুড়ে সুর বেঁধেছি মনে করলাম। গঅবর—গজবর, গজের মন্ততার মত। গঅবর সমরস—সুরনিসৃত রস গজের মত মন্ততা সৃষ্টি করছে। সাক্তি—সক্তি। জবেঁ—যখন। করহা—করাসুলি, গজের মন্ততা হতে পারে, কারণ আগে গজমন্ততার কথা রয়েছে, 'করহমিতি চিন্তায়া চিহ্নে' পরবর্তী শব্দ করহকল—গজকল এর অর্থ হয় না, এখানে করাসুলির কল বা কলসে সুর প্রকাশিত হচ্ছে, একথা যথার্থ, 'করহকলতিমি। করুণাবহতং কলং প্রভাসকং—করুণা প্রবাহিত হওয়া প্রভাস্বরের কল, অবশ্যই আসুলের কারসাজিতে এই করুণা ধরা দেবে। চাপিউ—চেপে ধরল। বতিস তান্তিধনি—বত্রিশ তন্ত্রীধনি, 'দ্বাত্রিশতব্রাহ্মদেবতাবিগ্রহস্য ধনি', বত্রিশটি নাড়ী দেবতার মূর্তি প্রতিভাত ধনি; একথা থেকে সিদ্ধাচার্যরা শাস্ত্রীয় বা মার্গীয় সঙ্গীতেরও ওস্তাদ ছিলেন মনে হয়। সংগীতের রাগ-রাগিণীর কল্পিত মূর্তি সুরের ভেতর তাঁরা রচনা করেন। বিআপিউ—ব্যাপ্ত হল। নাচন্তি—নাচল। বাজিল—বজ্রধর, এখানে সিদ্ধাচার্য বীণা পা। গান্তি—গান করেন। দেই—দেবতা, দেবী, শব্দটা খুব প্রাচীন আর্যশব্দ, ভারতীয় আর্যভাষায় যা দেবতা, আভেস্তীয় আর্য ভাষায় তা দেউ বা দেও। বিসমা—বিষম হওয়া, পরিসমাপ্তি।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

সূর্য লাউ শশীতে লাগিয়ে তার।
অনাহত দণ্ড চাকতি অবধূতী যার॥
বাজায় ওগো সখি হেরুক বীণা।
শূন্য তন্ত্রীধনিতে বিলাসে করুণা॥
আলি কালি বিনানো সুরে মনে হয়।
গজবর সমরস সঙ্গে গুণে রস॥
যখন কর করাসুলে চেপে দেয়।
বত্রিশ তন্ত্রীধনি সকল ব্যাপে নেয়॥
নাচেন বজ্রধর গায়েন দেবী।

কল্পনাটক বিষম সেবী॥
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্যে রূপান্তর

সূর্যকে লাউ করে চন্দ্রে তার লাগিয়ে অনাহত দণ্ডে ও চাকতিতে অবধূতীকে রাখা হল। ওগো সখি হেরুক বীণা বাজায়। শূন্যতা সে তন্ত্রীধ্বনিতে করুণ বা করুণারূপে বিলাস করে। আলি কালি বিনানো সুরে মনে হয় গজবর মত্ততা সমরস সঙ্গে গুণে নিচ্ছে। যখন করে করাসুল চেপে (সুর) দেয় বত্রিশ তন্ত্রধ্বনি সকলই ব্যাপ্ত হয়ে যায়। বজ্রধর নাচেন দেবী গান গাচ্ছেন, বুদ্ধ নাটক এভাবে সমাপ্ত হল।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

সূর্যভাষ উৎপ্রেক্ষা চন্দ্রভাস তন্ত্রিকা বিষয়াচক্রী অবধূতীকে একাত্রিত করে অনাহত দণ্ড কায়াতে লাগিয়ে দেখ সখি নৈরাশ্রার জন্য বীণা পা বীণাদ্বারে হেরুকের চার প্রকার অর্থযুক্ত অনাহত ঘোষণা করছেন। তাই শূন্যতাদ্বনি প্রভাস্বর অনাহতরূপ যা ভবে ভব বন্ধনরূপে বিলাস করে না (তাই ঘোষিত হচ্ছে)। আলি কালি নাম সংগীত নানা কার তমাস্বর স্বরূপ প্রতীয়মান আগ্রহবরে চিত্তরাজ্য সন্ধি দোষ ছিদ্র গুণে নিচ্ছে (যা নস্যাত করবেন বলে)। করে চিত্তউষ্ম চিন্তা বোধ করা কৌশলে করুণাবহ কলপ্রভাস্বর বোধ হচ্ছে। যখন মিলিত লক্ষণ সময়ে সেই চিত্ত উষ্ম প্রভাস্বরকে চেপে ধরে আক্রমণ করে তখন বত্রিশ নাড়ি দেবতা বিগ্রহ ধ্বনিত করে। অনাহত নৈরাশ্রা জ্ঞানে প্রজ্ঞা উপায়াত্মক ভাবাভাবে ব্যাপ্ত হয়। বীণা পা বজ্রধর নৃত্য করতে থাকেন দেবী যোগিনী নৈরাশ্রা বজ্র গীতিকা পাশে গমনমঙ্গল রাখেন। তাই এভাবে বুদ্ধ নাটক বিশিষ্ট সত্তাসম নির্বাণ লাভ করে।

সমীক্ষা

ধর্ম সাধনার গতিতে সাধকদের ভেতর যারা আত্মগত বা বজ্রমূল বিশ্বাসে প্রতি নিশ্বাসে জীবন ব্যয় করেন তাদেরও হৃদয়ে চিন্তায় এবং কল্পনায় শিল্প সৌন্দর্য মানবিক আবেদন মাঝে মাঝে নীড় বাঁধে। এ চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য তিনিও তাই। ধর্মের পেটিকার ভেতর বাস করেও তিনি নীলাকাশে বিচরণ করেন। এ সিদ্ধাচার্যের নাম যাই হোক তিনি ছিলেন একজন সাধক শিল্পী, তাঁর সাধন বীণার তারে তারে বেজেছে চিরায়ত সুরে। তিনি যোগাচার বা প্রাকৃত জনের মত ধর্মকে শুষ্ক সংস্কারে বা অভ্যাসে ফেলে রাখেন নি, বেঁধেছেন শিল্পীর তারে। এ তার তাঁর বীণার সাতটি ঝংকৃত সুরে উদ্ভুদ্ধ ছিল। তাঁর বীণার একটি তারও হতে পারে, কারণ তিনি সূর্য লাউ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একতারার প্রতিচ্ছবি সকলের চোখে ভাসে। একতারা যা লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি। শূন্য নিরাসক্ত মনে নির্জন পথ প্রান্তরে যা বাজিয়ে গাওয়া হয় আত্মসাধনার গান। বাউল যেমন উচ্চারণ করে আমার সাধন তারে তারে, এখানেও তাই সাধক কবি বীণা পা তাঁর আরাধ্য নৈরাশ্রাকে নানা তারের বাঁধনের ভেতর রেখেছেন, সে বাঁধনের কল্পনা ও অনুভূতি সাধারণের গ্রাহ্য কিংবা বোধ্য নয়, তার অন্য একটি অপরূপ আত্মাদিত রূপ রয়েছে। সূর্য লাউ আর চাঁদের তার, চাকতিতে অবধূতী-অনাহত দণ্ড কায়; তা থেকে নির্গত হচ্ছে সুর।

আলোচিত কয়েকটি চর্যায় এবং আরও অন্যান্য চর্যায় চন্দ্র সূর্যের রূপক বা তাত্ত্বিক নাম রয়েছে। ব্যাখ্যা রয়েছে, যোগসাধনায় তাদের ভূমিকা ও নাড়িরূপে বিশিষ্টার্থক। এখানেও সে চিন্তার বাইরে নয়, চন্দ্রসূর্যের অবস্থান এক নয়, চন্দ্রাধারে বৃদ্ধি বা বীৰ্য আর সূর্যে রয়েছে ক্ষয় বা রয়েছে রজোধারে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও তাদের অবস্থান দৃঢ়, আর অবধূতী হল মধ্যমনাড়ি মূলাধারে; এ সবকে সাধনায় যুক্ত করে নৈরাশ্রার জন্য বাজাচ্ছেন বীণা। তাই কবি বলছেন হেরুক বীণা বাজিয়ে তাঁকে হৃদয়ে আবদ্ধ করতে হবে। সুরের ভেতর তাঁর সাধনা, সুরের ভেতর শূন্যতা বা করুণা, যা বোধিচিহ্ন জিনপুর। তবে করুণা না করুণ সুর এ কথাও আমরা মনে রাখছি। সংগীতের যারা সাধক মার্গে বিচরণ করেন, তারা সুর-রাগ রাগিণীকে কোন নারীর রূপকে অনুভব করেন, সে সুরের রাগ বা রাগিণীর আচরণ-ভঙ্গি কল্পনা করে সুরকে ভাসিয়ে দেন রেশমি জালের মত। যেমন মালকোশ রাগের বিস্তারের জন্য সাধক ধ্যান চক্ষে এমন একটি নারী কল্পনা করেন, যে একটি বৃক্ষতলে একটি ডাল ধরে দূর প্রান্তরের দিকে দীর্ঘ আয়তনয়নে তাকিয়ে আছে দয়িতের অপেক্ষায়। এ কবিতায় 'পটমঞ্জরী' রাগের বিস্তার হয়তো বা কবি বত্রিশ তন্ত্রী ধ্বনিতে বা বত্রিশটি দেবীর বা নাড়ি বিগ্নহ তুলে ধরেছেন, অথবা নৈরাশ্রাকে এই সুরের ভেতর দিয়ে দেখছেন। করুণ বা করুণাকে নিয়ে এমন বিলাস করায় সময় আলি কালি বিনানো সুর মনে হয়। মন বিনানো আলি কালি বা লোকজ্যোতি-লোকভাসের ভেতরও ছড়িয়ে যেতে থাকে। হাতির মত্ততার সঙ্গে এ সুরের রস সঞ্চার করা হয়, আসলে এখানে কবি হাতের আঙ্গুলের কারসাজিতে বীণার তারের মত উপভোগ করছেন। বত্রিশ তন্ত্রীর গূঢ়ার্থ হল প্রকারের রাগ-রাগিণী। বর্তমান রাগ-রাগিণীর ব্যাখ্যা হল ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী, তখন হয়তো বা বত্রিশ রাগ-রাগিণীই ছিল। বত্রিশ রাগ বিকশিত হয়ে বিয়াল্লিশ রাগ রাগিণীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান ছয় রাগের নাম—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। তাদের ছত্রিশ পত্নী বা রাগিণী যথা—ভৈরবী, ভূপালী, মালশ্রী ইত্যাদি। এই বত্রিশ রাগিণী বা রমণী অন্যতম পটমঞ্জরী হল এ গানের আশ্রয় এবং তারা চিন্তে ব্যাপ্ত। এমন রসঘন আসরে বজ্রধর চর্যাকার সাধনা মার্গের সঙ্গীতের সুর বিস্তার করতে থাকেন। অতঃপর বুদ্ধনাটক সমাপ্ত; বুদ্ধ নাটক হল নির্বাণ। বুদ্ধের জীবন নাটক বা বুদ্ধ নির্দেশিত জীবন নাটকের অবসান, আর পুনর্জন্মে ফিরে না আসা। তৎকালীন বাংলাদেশে সংগীত চর্চা অফুরন্ত ছিল, বিশেষত চর্যা গানগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় এগুলো কেবল সাধনভজনের নিমিত্ত গীত নয়। লোক সাধারণের কাছেও এর আবেদন গিয়েছে। বাঙালি মার্গীয় সঙ্গীতে খুব অগ্রসর ছিল এবং 'পদ' সৃষ্টি হতো তাদেরই হাতে। পদ অর্থ গান বাঁধা, সঙ্গীতের পদ, ধ্রুবপদ, ধ্রুপদ ইত্যাদি চর্যাকারদের অন্তর্গত ছিল। বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সংগীত আশ্বাদন এ চর্যায় রয়েছে, তার সঙ্গে নৃত্যেরও উল্লেখ দেখা যায়। দেবতার মনতুষ্টির জন্য দেবদাসী নৃত্য হয়তো বা সহজযানি তাত্ত্বিকদের ভেতর সংক্রমিত হয়েছিল, চৌষটি পাখুড়ী বা চৌষটি ছলা কলার নৃত্য চর্যায় উল্লিখিত। একটা সুস্থ এবং সংস্কৃতি উন্নত সমাজ পরিবেশ গড়ে না উঠলে সংগীত নৃত্যকলার শৈল্পিক বা ধ্রুপদ রূপ দেখা যায় না। এখানে বুদ্ধ নাটক উজ্জ্বল থেকে আধুনিক নাটক অনুমান করার কারণ নেই।

হয়তো বা চর্যাকাররা সংস্কৃতি নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সংস্কৃত নাটকে ইয়োৰোপীয় গুণ চৰ্চিত নয়, কিন্তু নাট্যগীত বাংলা অঞ্চলে অনাস্বাদিত ছিল না। বাংলাদেশে যাত্রা বা সে জাতীয় সংলাপ সমৃদ্ধ, ঘটনাবহুল কাহিনীর অভিনয় অপ্রতুল ছিল না। বৈষ্ণব যুগেও নাট্যগীতির জনপ্রিয়তা ছিল। ভারত নাট্যম মূলত নৃত্যগীত ও বাদ্যকে বোঝায়।



প্লেট ৯ : বীণা পা

বীণা পা

টীকায়—বীণা পা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, পদকর্তার নাম হেরুক, না বীণা এমন সন্দেহ কবিতার ভেতর রয়েছে। সাধারণত কবিতার শেষে পদকর্তা ভণিতায় তাঁর নাম উল্লেখ করেন, এখানে তা না থাকাতে এ সন্দেহটা দানা বেঁধেছে। হেরুক হয়ত বা তান্ত্রিক সাধক বা সিদ্ধাচার্যদের দেবতা হতে পারেন, কারণ আরও দু'একটা পদে হেরুক উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুনিদত্তের যে টীকা পাওয়া গেছে তাতে 'হেরুকার্থাবগমেন বীণা পাদণ' বলা হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণে 'বীণাপাদা বীণাদ্বারেণ শ্রীহেরুকেত্যক্ষর' রয়েছে। তাছাড়া 'বীণাপাদা বজ্রধরপাদেন নৃত্যং' এমন উদ্ধৃতি থেকে ধারণা করা যায় যে পদকর্তার নাম বীণা পা। হেরুক তাঁর সঙ্গি অন্য একজন সিদ্ধাচার্য হতে পারেন। এ পদে সখি শব্দের উল্লেখ আছে, তাই পদের চরিত্র ও সামাজিক আবেষ্টনীয় প্রভাবকালের দিক থেকে অনুমান করা যায় যে এ পদকর্তার সময়কাল হচ্ছে নবম শতকের পরে। তিনি গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী কিংবা মগধবাসীও হতে পারেন।

काहू पा

[illegible]

ডোম্বী তো আগলি^{১৯} গাহি চিনালী^{২০} ১৫১

১. তীণ, তিণি। ২. ধাহিঅ। ৩. হেনে। ৪. হইউ। ৫. সূতেলী, সূতেলি। ৬. মহাসুখ লীলৈ, মহাসুহ লীড়ে। ৭. ভাভরী আলী, বাবরি আলী। ৮. অন্তে। ৯. টালিউ। ১০. কাজগ। ১১. কারণ। ১২. কেহে। ১৩. বিরুআ। ১৪. বিদূজন। ১৫. কণ্ঠে। ১৬. মেলঙ্গ। ১৭. কাহু। ১৮. গাঙ্গ। ১৯. ডোংতিত আগলি। ২০. ছিনালী।

তিনি—তিন। ভূঅন—ভুবন, কায়বাকচিঙ, মুদ-‘বজ্রতণিবাভিসংগান্তিভুবনং কায়বাকচিঙ’। রাহিঅ—বাহিত, অতিবাহিত। হেলৈ—অবহেলাক্রমে, অবলীলাক্রমে। বাহিত হৈলৈ—মুদ-‘শব্দ প্রকৃতি দোষোহবহেলায়া বাধিতঃ’। সুতেলি—সুপ্ত হয়েছি, সুপ্ত>সুত+ইলি। লীলৈ—ক্রীড়া; এখানে যোগনিদ্রা। কইসনি—কীরূপে। ভাবরী আলী—ভাব করে যে নারী, হিন্দিতে—বাবরি বাল ওয়ালী, ভাব করে যে মেয়েরা এ রকম চুল এলোমেলা করে রাখে। অস্তে—কিনারে, এখানে বাহ্যে। কুলীনজন—জাতিভেদ কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের যুগে বৌদ্ধপ্রভাব ক্ষীণ হয়ে আবার কৌলিন্যপ্রভাব সমাজে আচরিত হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধাচার্যরা তাকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি, ‘ব্রাহ্মণ নাড়িআ’ কিংবা ব্রাহ্মণ কুলীনদের প্রতি অশ্রদ্ধা—মর্মজ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। কাবালী—কাপালিক। অস্তে কুলীন জন মাঝে কারালী—ছিনালি নারী ডোস্তী কাপালিককে সঙ্গ দিচ্ছে কুলীনকে সরিয়ে রাখছে, ‘মুদ—‘শরীরে লীনং যৎ প্রকাশ্বর্য যদজ্ঞানরসেগাংতে ব্যাহ্যকৃতং’। বিটালিউ—বিশৃঙ্খল করা, বিটকাল>বিটাল (বিটকেল), বিটাল। কাজুন কারণ—কার্যকারণ। সসহর—শশধর। টালিউ—টলানো।

বিরুআ—বিরূপ, বিরুদ্ধ কুৎসিত। বিদুজন—বিদ্বান। লোঅ—লোক। মেলই—মেলায়
চঙালী—চঙাল নারী, চাঁড়াল। কাম চঙালী—চঙাল মেয়েরা উগ্র কামাসক্ত বলে ধারণা।
আগলি—আলগা, অগ্রগামী। ছিনালী—ভ্রষ্টা নারী; ছিন্ননাসিকা>ছিনালী, শব্দটা রামায়ণ
থেকে নেওয়া, সূৰ্পনখা লক্ষণের প্রতি কামাবেগ প্রকাশ করলে লক্ষণ তার নাক কেটে
দিয়েছিলেন।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

তিন ভুবন আমিই অবহেলায়
আমি সুগু মহাসুখ লীলায়।
ওগো ডোষী একি তোমার প্রেমবাতিক?
অন্তে কুলীনজন মাঝে কাপালিক।
তুই ওগো ডোষী সকল বেহাল করলি।
কার্যকারণ শশধরকে টলালি।
কেউ কেউ তাই তোকে বিরূপ বলে।
বিজ্ঞজন লোক তোকে কঠে ভুলে।
কাহু গাইল তুই কাম চঙালী।
ডোষী তোর অধিক নেই ছিনালী।

গদ্যে রূপান্তর

তিন ভুবন অবহেলায় বেয়ে এলাম, আমি মহাসুখ সৃষ্টিতে লীলা করলাম। ওগো ডোষী এ
কেমন তোমার ভাবখেলা, অন্তে আমিই কুলীন জনকেও মাঝে কাপালিক। ডোষী তুমি
সকল বিশৃঙ্খল করে দিলে, কার্যকারণ শশধরকে টলিয়ে দিলে। তাই কেউ কেউ
তোমাকে বিরূপ বলে, বিজ্ঞজন কিন্তু তোমাকে কঠ থেকে ছাড়ে না। কাহু গাইলেন,
ডোষী তুমি কামচঙালী, তোমার চেয়ে অধিক ছিনালী আর কেউ নেই।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

আমি কাহু পা তিন ভুবন কায় বাক চিত্ত ছিয়াত্তর শত প্রকৃতি দোষ অবহেলায় বাধিত
হয়েছি। তাই আমি লীলা ক্রীড়ায় সুগু যোগনিদ্রার অঙ্গ নৈরাশ্র্য পরিশুদ্ধ অবধূতি নিয়েছি।
ভাবআলি ডোষী পরিশুদ্ধ অবধূতিকা এ কি তোমার আরোপিত কর্ম? কোন শরীরে লগ্ন
হয়ে প্রভাস্বর জ্ঞান রসনাকে বাহ্যে রাখ? সংবৃতি বোধিচিন্তকে পালন কর। কাপালিকচিত্ত
বজ্রাধান কর। তুমি ডোষী পরিশুদ্ধ অবধূতিকা দেবাসুর মনুষ্যাদি ত্রিধাতু সকলকে
মিথ্যাভ্রানে টলিয়ে বিনাশ কর, শশধর সংবৃতি বোধিচিন্ত প্রভাস্বরও টলিয়ে বিনষ্ট কর।
যে স্বরূপ পান অনভিজ্ঞা সহজানন্দ ডোষীকে মানে না তাই কর্মবাসী সংসার দুঃখানুভব
বাস্তবতার বিরুদ্ধে বলে। যোগিন্দ্র সম্যক বজ্রসংযোগ সুখ তোমাতে বিশেষভাবে রয়েছে
যারা জানে তারা কঠের সংভোগচক্র থেকে পরিত্যাগ করে না। এই রকম কর্ম
সাধনোপায় চঙালীর জন্য কাহু পা গাইছেন, ডোষী ব্যতীত অগ্রসর ছিন্ন নাসিকা নাগরিকা
আর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীক্ষা

তিন ভুবন কায়বাকচিও অবহেলায় অতিক্রম করার মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক যোগকীড়া লীলা সকল সাধ্যসাধনার ধন, তিন ভুবনের সার হল বোধিচিও নির্বাণ অতি কষ্টকর সাধন মার্গ উপায়ে দেহ শাসিত তাত্ত্বিক আচারে সে অতীষ্ট সিদ্ধি লাভ করা, অবশেষে জিনপুর পৌছতে পারা। তিন ভুবন শত প্রকৃতি দোষের প্রথম হল কায়া, কায়াকে ছেদন করতেই হবে, কায়াশ্রিত ইন্দ্রিয়াদি মায়ামোহ পঞ্চ ঋক চিত্তচাঞ্চল্যকে জয় করতে হবে, কায়া জয় করার পর অন্যান্য তাত্ত্বিক উপায়ে চিত্তে প্রবেশ করে অবিচল বোধিচিও লাভ করতে হবে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধদের দু'সম্প্রদায় হীনযানি এবং মহাযানি; সিদ্ধাচার্যরা মহাযানি তাত্ত্বিক, কিন্তু হীনযানিরা খুবই রক্ষণশীল, তাঁরা বোধিচিও লাভ তত্ত্বকে উপেক্ষা করেন, তাঁরা বলেন, বোধিসত্ত্ব ব্যতীত নির্বাণ লাভ হবে না। হীনযানিরা কঠোর অনুশাসনের দ্বারা বুদ্ধের সমান হওয়াকে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধি বলে থাকেন। কিন্তু উদারপন্থী মহাযানিরা মনে করেন বোধিসত্ত্ব লাভ করা একমাত্র বুদ্ধের পক্ষে সম্ভব, বুদ্ধ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তা লাভ সাধ্যাতীত, তাই অন্যরা কেবল বোধিচিও লাভ করতে পারে এবং তাতেই তাদের নির্বাণ সিদ্ধি।

তিন ভুবন বিষয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন ধারণার উল্লেখ রয়েছে, তিনস্তর জীবন বা দেহের তিন মার্গ অতিক্রম করে নির্বাণ। নির্বাণরূপ মহাসুখ সাগরে নিমজ্জিত হলে—সুপ্তি, আর কোনও দিন দুঃখযন্ত্রণাময় ভবে ফিরে আসতে হয় না।

সিদ্ধাচার্যরাও মানুষ ছিলেন, মানুষের প্রিয় জিনিস সব সময় পাওয়া না পাওয়ার মরীচিকা বা ছলনায় পর্যবসিত থাকে, অপ্রাপ্তির ও অপ্রাপ্তির আশা-নিরাশায় বঞ্চিত থাকে, ঠিক যেন কোনও ছলনাময়ী নারীর মত, ধরা দিতে গিয়েও ধরা দেয় না, একবার ভাবচিও প্রদর্শন করে আর একবার বঞ্চনায় দুঃস্বপ্নকে ঘোরাতে থাকে। সিদ্ধাচার্যদের নির্বাণ হচ্ছে সেই প্রিয়বস্তু, তাই নির্বাণকে তাঁরা ছলনাময়ী নারীর রূপকে বেঁধেছেন, তাকে ডোম্বী বা কামচণ্ডালী নারীর রূপে অনুভব করেছেন। কামচণ্ডালী নারীরা একাধিক পুরুষকে আকর্ষণ করে, কাকে কখন প্রেমিকের আসনে রাখে আর কাকে সে আসন থেকে সরিয়ে অন্য কাউকে স্থান দেয় কেউ বলতে পারে না। তারা ভাব করে তবে একনিষ্ঠতা হয়তো নেই। তাদের প্রেমিকরা এক জাতের নয়, কেউ কুলীন, কেউ কাপালিক নিম্ন।

এই চর্যায় এমনই একটি চিত্র এসেছে, হয়ত তা তৎকালীন জীবনচিত্রও হতে পারে কিন্তু সিদ্ধাচার্য কাহ্ন পা জীবনচিত্র রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন নি, তিনি জীবনচিত্র রূপকে রেখেছেন। শব্দের ও ভাবের কৌশলে তাঁর সাধন মার্গীয় বক্তব্য স্ফুট করে গেছেন, টীকাকাররা যাকে সাক্ষ্য ভাষা বলেছেন, সেই আধবোধ্য আধবোধ্য প্রাচীন বঙ্গীয় প্রাকৃত ভাষায় তার ইংগিত দিয়েছেন। এখানে কুলীন শব্দের অর্থ সাধারণভাবে আমাদের জানা আছে, বংশমর্যাদা, কিন্তু কবি ব্যঙ্গ করে হয়তো বা এই কুলীন শব্দের অর্থের অবনতি ঘটিয়েছেন, যেমন—কু+লিন বা লীন, যে কুকাজে সমাহিত। এখনও যেমন, তৎকালেও বংশমর্যাদা জাহির করে সকল কুকার্য করে যারা, তারা প্রকাশ্যে সাধারণের শ্রদ্ধা সম্মান ভোগ করে কিন্তু গোপনে তারা ডোম্বী বা কামচণ্ডালী দেহরূপোজ্জীবিনীদের সঙ্গে প্রেমাস্বাদনে বা দেহ আস্বাদনে মগ্ন থেকে সমুদয় কুকর্ম করতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধা করে না। তারা হয়তো বা খুব ছুতমাগী, নিম্নবর্ণের উলঙ্গ কাপালিক সংস্পর্শে এলে যোজনদূরে নিজকে সরিয়ে নিয়ে রাখে, এদিকে ডোষী বা কামচণ্ডালীর কুড়ে প্রেমলীলা করতে এসে সেই কাপালিকের সঙ্গে এক পংক্তিতে উপভোগ করতে তারা দ্বিধা করে না। তেমনি কাপালিক শব্দকেও রূপকে রাখা যায় কপালে যার বোধিচিন্তা।

সে যাই হোক, ডোষী তো নাগরালিতে বড়ই নিপুণা, কোন নাগরকে বঞ্চিত করে না। তার প্রেম বা কামের দাপট এমনি যে এক ঘাটে কুলীন-কাপালিক পানি খেতে বাধ্য হয়। সেটা কবি লক্ষ্য করেছেন, তাই বলছেন,

তুই লো ডোষী সঅল বিটালিউ

অর্থাৎ ডোষী তুমি সব কিছু বিশৃঙ্খল করে দিয়েছ, সব তাল বিতাল করে দিয়েছ। সমাজের মেকি কাঠামোকে তুমি কেবল বিশৃঙ্খল করে এক করে দিতে পার; তুমি মৃত্যুর সমান, কারণ মৃত্যুই সকলকে এক করে দেয়। কার্যকারণবশত ডোষী শশধর সংবৃতি বোধিচিন্তাকেও টলিয়ে দেয়। তাই কেউ কেউ বিরুদ্ধে বলে কিন্তু বিজ্ঞজন কণ্ঠলগ্ন করে রাখেন, ছাড়েন না।

গূঢ়ার্থে ভাববিলাসী ডোষীর আরোপিত কর্ম সাধারণের বোধ্য নয়, প্রভাস্বর জ্ঞান রসনাকে বাইরে সংবৃতি বোধিচিন্তা সঙ্গ দান করে, যেমন করে কাপালিক বজ্রাধান করে। তখন ডোষী দেবতা অসুর মানুষ ইত্যাদি ত্রিধাতু সকলকে মিথ্যা জ্ঞানে বিনাশ করে। কাহ্ন পা এমন কামচণ্ডালী ছিনালীর গান গাইলেন

এই চর্যায় অফুরন্ত সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। ভাবরী আলী বা ভাব প্রদর্শনকারী নারী। সে যুগেও দেহরূপজীবনী নারী ছিল, তারা কাম বা প্রেমের লীলা দেখিয়ে পুরুষদের ভোলাত। ভাবরী আলী শব্দের নানা বিবর্তন হতে পারে, সাধারণত প্রেমাকাজক্ষী মেয়েরা চুল এলোমেলো করে শূন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের এ চুল এলোমেলো করে রাখা থেকে বাবরি বা বাবড়ি চুল কথাটা চালু আছে। নষ্টা চরিত্রের মেয়েরা সকলের সঙ্গে ভাব রাখে, তাদের একনিষ্ঠতা বলতে কিছু নেই। তাই সমাজের উঁচুনিচু সকল শ্রেণীর কামপিয়াসী লোক তাদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়, সেখানে কারও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ভিন্ন থাকে না।

কুলীন সমস্যা এদেশে খুব প্রাচীনকাল থেকে বিরাজ করছে। কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলে ধূর্ত অলস শ্রেণীর লোকেরা নিরীহ কর্মঠ নিঃস্ব লোকদের সহজেই প্রতারিত করার জন্য ধর্মীয় বোধে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধধর্ম এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে মানবতার প্রথম আহ্বান এবং বিপুল সাড়া সত্ত্বেও কৌলীন্যবোধ জনমন থেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি, দেখা গেছে বৌদ্ধ রাজারাও ব্রাহ্মণদের আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। চর্যাপদের যুগে এই কৌলীন্য প্রথা আরও ব্যাপক হয়েছে, তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যরা কৌলীন্য প্রথাকে সম্মান করতে না পারলেও কিংবা কৌলীন্য প্রথার প্রতি কটুক্তি করলেও তার প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারেন নি।

কাপালিক সাধু বর্তমান যুগে দেখা না গেলেও চর্যায় যুগে কাপালিকদের বিচরণ এবং সংসার ছেড়ে এ রকম নির্জন সাধু হওয়ার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। সামাজিক নানা কারণে গৃহত্যাগ করে কেউ কেউ এক রকম তান্ত্রিক যোগী হত। ধারণা করা যায়

কাপালিকরা বামাচারী, নারীদেহ ভোগ করার পর সে দেহ প্রাণহীন করে তার শবের ওপর বসে তপস্যা করলে চরম মোক্ষ এবং অত্যন্ত বলশালী হওয়া যায়—এ বিশ্বাস তাদের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তার ইংগিত রয়েছে। তৎকালে জীবন প্রতিষ্ঠা খুবই দুর্লভ ছিল, কুলীন বা উচ্চ শ্রেণীর পীড়ন নিম্নশ্রেণীর ওপর প্রায় বর্বরোচিত ছিল, দুস্থ পরিবার থেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যুবকরা গৃহত্যাগ করে এ ধরনের যোগী সন্ন্যাসী হয়ে যেত। দেখা গেছে উচ্চবংশীয় বা সম্পন্ন পরিবার থেকে কদাচিত কেউ সন্ন্যাসী হত।

কামচণ্ডালী ও ছিনালী শব্দ থেকে করুণ দৃশ্যবোধ রয়েছে। চণ্ডাল বা সমাজের সবচেয়ে নিচুস্তরের লোকদের মেয়েরা দেহদানে বাধ্য হত, এদিকে কুলীনরা প্রচার করত চণ্ডালমেয়েরা খুব কামুকী হয়ে থাকে, তাই চণ্ডাল মেয়ে হলে তাকে কামচণ্ডালী বলা হত। হয়তো চণ্ডাল পাড়াটা নারীদেহ ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ছিনালী শব্দ যদিও রামায়ণের সূৰ্পনখার নাক লক্ষণ কর্তৃক ছিন্ন করেছে বলেছে, কিন্তু বাস্তব চিত্র হল নিম্নবংশের নারী মাত্রই ছিনালী এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। চর্যাকাররা এ ধারণাবোধের বাইরে ছিলেন না।

তবে প্রাচীন কালে পুরনারী এবং বারনারী বা বারাসনার কথা গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত। বারাসনা থেকে বাইজি কথাটা এসেছে। পুরনারীরা অন্তপুরে থাকত, সন্তানাদি গৃহকর্মে রত ছিল, তাদের পরপুরুষের সংস্পর্শে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বারাসনা বা বাইজিরা ছিল সর্বস্তরের পুরুষদের আনন্দচারিণী। তবে নিকেশালী, রাজ-রাজড়ারা তাদের গৃহে আপ্যায়ন লাভ করত, তারা নৃত্যগীতে পটিনসী ব্যুৎসায়ন শাস্ত্রভিজ্ঞ, অনেকেই রাজনীতি কিংবা সে রকম উচ্চ পর্যায়ের কাজের জন্য আকীরাণি ছিল। রাজপুত্র, সেনাপতি প্রমুখ জন নানা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করতে তাদের সহায়তা নিত।

চর্যা-১৯

রাগ ভৈরবী

কাহ্ন পা

১২

ভব নিক্সাগে^১ পড়হ মাদলা^২।মন পবণ বেণি^৩ করণকশালা^৪ ॥ ৫৫ ॥জঅ জঅ দুংদুহি^৫ সাদ^৬ উছলিঅ^৭।কাহ্ন ডোষী^৮ বিবাহে চলিআ^৯ ॥ ৫৬ ॥ডোষী^{১০} বিবাহিআ^{১১} অহারিত^{১২} জাম^{১৩}।জউতুকে কিঅ আগুতু^{১৪} ধাম^{১৫} ॥ ৫৭ ॥অহিনিসি^{১৬} সুরঅ পসংগে জাঅ^{১৭}।জোইগিজালে রএণি^{১৮} পোহাএ ॥ ৫৮ ॥ডোষীএর সঙ্গে জো জোই রন্তো^{১৯}।সুগহ^{২০} গু ছাদজ^{২১} সহজ উন্যন্তো^{২২} ॥ ৫৯ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠান্তর

১. নির্বাণে। ২. মাদলা। ৩. বেগ্নি। ৪. করণ কশালা। ৫. দুন্দহি, দুন্দভি। ৬. সাদু।
 ৭. উছাললা। ৮. ডোম্বী। ৯. চললা। ১০. ডোম্বী। ১১. বিবাহিঅ। ১২. আহরিউ।
 ১৩. জান্ন। ১৪. অনুত্তর, আণুন্নুত। ১৫. অনুত্তরধাম্ম। ১৬. অহনিসি। ১৭. জাই।
 ১৮. রঅণি। ১৯. রত্ত। ২০. খণই। ২১. ৭ ছাড়অ। ২২. উন্নুত্ত।

শব্দার্থ ও টীকা

ভবনির্বাণ—ভব থেকে নির্বাণ, ভবরূপ নির্বাণ, মুদ—ভবনির্বাণ মনপবনাদি বিকল্প
 পূর্বোক্তং ক্রমেণ পরিশোধিত। পড়হ—পটহ, বড় ঢাক, রণবাদ্য; বড় মাটির পাত্র যার
 ওপর আঘাত দিয়ে বাদ্যধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। মাদলা—মাদল, খোল; মৃদঙ্গ>মাদল। করণ
 কশালা—বাদ্যযন্ত্র, কাড়া নাকাড়া, করলাকাশি থালা; প্রাচীন বাংলার বাদ্যযন্ত্রের যে যে
 নাম পাওয়া যায় তার ভেতর চর্যায় উল্লিখিত পটহ মাদল করলা করতাল কাড়া নাকাড়া
 কাহাল বীণা লাউ বা একতারা ঢোল এবং দুন্দুভি দেখা যাচ্ছে। জয় জয়—জয় জয়; জয়
 জয় বাংলার আদি আনন্দধ্বনি। দুন্দুহি—দুন্দুভি, রণবাদ্য। সাদ—শব্দ। উছলিআঁ—
 উছলে, উচ্ছৃত>উছল। আহরিত—আহরণ করল। জাম—জান্ন, জইতুকে—যৌতুকরূপে।
 কিঅ—করা হয়। আনুতু—অনুত্তর, যার কোন উত্তর নেই, শ্রেষ্ঠ। ধাম—নিবাস।
 অহিনিশি—অহর্নিশ, রাত দিন। সুরঅ—সুরত, রতক্রিয়া। সুরঅ পসংগে জাএ—কাম
 চর্চায় থাকে। জোইনি জালে—যোগিনীর জালে। রঅনি—রজনী, রাত্রি। রত্তো—অনুরক্ত।
 খনহ—ক্ষণমাত্র।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

ভব নির্বাণে বাজে পটহ মাদল।
 মন পবন বেগীতে কাড়া কাঁসি থাল॥
 জয় জয় দুন্দুভিতে শব্দ উছলে।
 কাহ ডোম্বী বিবাহে চললে॥
 ডোম্বী বিয়ে করে লভে নবজান্ন।
 যৌতুক করে অনুত্তর হর্ম্য॥
 অহর্নিশ সুরত প্রসঙ্গে যায়।
 যোগিনীজালে রজনী পেহায়॥
 ডোম্বীর সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত।
 ক্ষণমাত্র ছাড়ে না সহজ উন্নুত্ত॥

গদ্যে রূপান্তর

ভবনির্বাণ কালে পটহ মাদল বাজছে, মন পবন দুটি বেগীও ঝংকৃত কাড়া-নাকাড়ায়।
 দুন্দুভিতে জয় জয় শব্দ উচ্ছসিত, কাহ পা ডোম্বী বিয়ে করতে চললেন। ডোম্বীকে
 বিয়ে করে কাহ পা নবজান্ন লাভ করলেন, যৌতুক হিসেবে পেলেন অনুত্তর ধাম (উৎকৃষ্ট
 হর্ম্য)। অহর্নিশ সেখানে তাঁর সুরত প্রসঙ্গে কেটে যায়, যোগিনীর প্রেমজালে রাত
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোহায়। ডোষীর সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত হন ক্ষণমাত্র তিনি সহজ আনন্দ উন্মত্ততা ছাড়তে পারেন না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

ভব নির্বাণ মনপবনাদি বিকল্প পূর্বোক্ত ক্রমে পরিশোধ কারণে পটহ ভাঙাদি উৎপ্রেক্ষা মহাসুখ সঙ্গে গৃহীত। ডোষী শুক্রনাড়িকা পরিশুদ্ধ অবধূতিকার রূপকে কাহু পা এখানে বর্ণনা করছেন। জয় জয় ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টিরূপ দুন্দুভি শব্দে নির্বাণ আকাশ মুখরিত, সে ডোষী রূপ তার গমনদ্বারে বিবাহ। উৎপাদন বা পুনর্জন্মদোষ নাশ হয়েছে। তাই যৌতুক অনাক্রেশে অনুত্তর ধর্ম সাক্ষাৎ করেছে। এই জ্ঞানমুদ্রাসহ যে যে যোগী অহর্নিশ সুরত প্রসঙ্গে থাকে সেই যোগিনী জালে আবদ্ধ, এই জ্ঞান রশ্মি কারণে ক্রেশ অন্ধকার পালিয়ে যায়। ডোষী সেই প্রকৃতি প্রভাস্বর পরিশুদ্ধ জ্ঞান মুদ্রা। তার সুরত প্রসঙ্গ যে যে যোগী আহরণ করেছেন তাঁরা সেই জ্ঞান মুদ্রা মহাসুখ আনন্দধারাকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন না।

সমীক্ষা

ভব নির্বাণকে কবি তিন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ভব থেকে নির্বাণ, ভবরূপ নির্বাণ কিংবা ভব এবং নির্বাণ। তবে ভব থেকে নির্বাণই এখানে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু টীকায় অন্য দুই ভব অসিদ্ধ প্রসঙ্গ নয়; ভবরূপ মনপবনাদি বিকল্প পরিশোধে আবার ভব ও নির্বাণের কারণ এখানে বলা হচ্ছে। এই তিন অর্থের জন্য পটহ মাদলের বাদ্যধ্বনি। ভবরূপ ক্রেশ থেকে সুকৃতি বোধিচিন্তা লাভ করে নির্বাণে যাত্রা যেন বিবাহ যাত্রা। বিবাহ কার সঙ্গে? নির্বাণ রূপ ডোষীর সঙ্গে ডোষী প্রসঙ্গ এর আগে একাধিকবার উল্লিখিত। এখানে সামান্য একটু সংযুক্তি। তা হল ডোষীকে বিয়ে করলে সে তার সুরত প্রসঙ্গ ছাড়ে না, তাই ডোষী পরিশুদ্ধ জ্ঞান মুদ্রাও বটে।

কাহু ডোষী বিবাহ করে জন্ম পেল, তাত্ত্বিক অর্থ হল বায়ুরূপা ডোষী গগনদ্বার কাহুর জন্য উন্মুক্ত করল, কাহু নির্বাণ লাভ করল। বাহ্য অর্থ ডোষী বিয়ে করার জন্য কাহুর জাত গেল, কাহু নতুন জন্ম পেল। অতিবাহিত সমাজ ও জীবন নতুন রূপ পেল। কাহু কাপালিক। লৌকিক আচরণে বিবাহ এবং এর কারণে যৌতুক হিসেবে কন্যা পক্ষ থেকে অর্থ সম্পদ আদায় করা হয়। ডোষীর বিবাহের কারণে কাহু শ্রেষ্ঠ নিবাস বা অনুত্তর ধাম পেল, তা হল মহাসুখ। নির্বাণ হল মহাসুখ, নির্বাণের ধামই হল শ্রেষ্ঠ। তাই মনুষ্য জন্ম ছেড়ে কাহু পা জন্ম নিলেন বোধিচিন্তা রূপে, যার নিবাস হল নির্বাণ। সহজানন্দে উন্মত্ত হয়ে সেখানে বাস করেন।

এ কবিতায় তৎকালীন বিশিষ্ট সমাজচিত্র উন্মিলিত হয়েছে। তৎকালীন বিবাহ যাত্রা ও রীতির নিখুঁত বর্ণনা আছে। বিবাহ যাত্রার সময় নানাশ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উৎসব সাজিয়ে জয় জয় ধ্বনি করে বরপক্ষ কনের বাড়ি যেত, যা এখনও সমানে চলছে। অবশ্য শুধু বিবাহযাত্রা কালে এমন উৎসব ছিল তা নয়, রাজ্য জয় কিংবা যুদ্ধযাত্রা কালে এমনি সমারোহ হত। বিরাট জয়ঢাক, দুন্দুভি ইত্যাদির সঙ্গে জয় জয় ধ্বনি উচ্ছসিত ছিল। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দেশের সমাজ জীবনের সবচেয়ে প্রাচীন ও দুঃখজনক রীতি হল যৌতুক প্রথা। কন্যাপক্ষকে বিয়ের সময় এ যৌতুক দিতে হয়, অতি দরিদ্র নিঃস্বও এই যৌতুক প্রদান থেকে রেহাই পায় না। বিয়ের সময় যৌতুক নগদ প্রদান না করতে পারলে পরবর্তীকালে স্ত্রীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চলে, স্বামী শাশুড়ি ননদ প্রভৃতি দৈহিক বা বাক্যবাণে নব পরিণীতা কন্যাকে নির্যাতন করে। কোনও কোনও সময় প্রাণে বধও করে থাকে। এ কবিতায় সুপ্রাচীন এ নির্যাতন চিহ্নটি দেখে যুগ যুগের ব্যথানুভব নতুন করে জেগে ওঠে।

সামাজিক চিত্র হিসেবে 'জোইনি জালে রএনি পোহাএ' এর ভেতরও কোনও কোনও পরিবারের দুঃখবোধ অনুভব করা যায়। প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে কুলীন বা বিত্তশালী পরিবারের লোকেরা বাঈজি বা বারাজনা বিলাসী ছিল, ঘরের অসূর্যস্পশ্যা কঠোর অন্তরীণ আবদ্ধা সুন্দরী স্ত্রীকে বঞ্চিত করে প্রতি রাত বাঈজিগৃহে কাটালেই আভিজাত্য চাপা হয় বলে ধারণা করা হত। এখানে প্রায় সে দৃশ্যটি রয়েছে, যোগিনী ডোম্বী রূপকে কবি সুরত প্রসঙ্গে তা তুলে ধরেছেন।

তাছাড়াও অন্যত্র ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, তৎকালে পুরনারী এবং বারনারীদের চরিত্র ও সামাজিক রীতি এক ছিল না। পুরনারীরা গৃহকর্ম, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি কর্মে ও কারণে গৃহ অন্তপুরে থাকত, বারনারীদের সে সুযোগ ছিল না, তারা বিভিন্ন পুরুষ বা রাজপুরুষদের আনন্দদান ও সঙ্গদান করত। তারা সুন্দরী সুশিক্ষিতা কামনিপুণা নৃত্যগীতে পারদর্শিনী এমন কি রাজনীতি অভিজ্ঞ ছিল। তাদের প্রেমলীলার কারণে আসক্ত পুরুষরা সারারাত তাদের গৃহে কাটিয়ে দিত।

চর্যা-২০

রাগ পটমঞ্জরী

কুকুরী পা

এই মর্মে বর্ণিত পদটি ১৯৮৩ খ্রিঃ ১০/১১/৮৩ তারিখে প্রকাশিত। এটি একটি গল্পের পদ। এখানে কবি কবিতা রচনা করেছেন। এটি একটি গল্পের পদ। এখানে কবি কবিতা রচনা করেছেন।

হাঁউ নিরাসী^১ খমন সাঈ^২।মোহোর বিগোআ^৩ কহণ না জাই ॥ ৫৭ ॥ফিটি লিউ^৪ গো মাএ^৫ অন্তউড়ি^৬ চাহি।জা এথু জাহাম^৭ সো এথু নাহি ॥ ৫৮ ॥পহিল^৮ বিআন^৯ মোর বাসনপূড়া^{১০}।নাড়ি বিআরন্তে সেব^{১১} বাপুড়া^{১২} ॥ ৫৯ ॥জানঅ জৌবন^{১৩} মোর^{১৪} ভইলেসি^{১৫} পুরা^{১৬}।মূল^{১৭} ওখলি বাপ সংঘারা^{১৮} ॥ ৬০ ॥ভণমি কুকুরি পা এ ভব থিরা^{১৯}।জো এথু বরাএ^{২০} সো এথু বীরা ॥ ৬১ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠান্তর

১. হাঁউ নিরাসী। ২. খমণ ভতারে, খমণভাতারে। ৩. বিকোআ। ৪. ফেটলেউ। ৫. মাই, গোমাএ। ৬. অন্ত উড়ি। ৭. বাহাম, চাউনি। ৮. পাহলে। ৯. বিয়ান। ১০. বাসনপুড়, বাসনয়ুড়। ১১. সেঅ। ১২. বায়ুড়া। ১৩. জান জৌবন। ১৪. ভোর। ১৫. হইলেসি। ১৬. উহ্য। ১৭. মাত। ১৮. মূল কমলিবাএ সংঘারা। ১৯. ভমমি কুকুরী পা এ ভব থিরা। ২০. বুঝএঁ, বুঝই।

শব্দার্থ ও টীকা

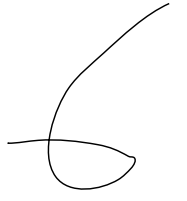
হাঁউ নিরাসী—আমি আসক্তিহীন, মুদ—‘অহং ভগবতী নৈরাশ্বা নিরাসা, আসন্নরহিতা’।
 খমণ সান্ধ—শ্রমণ সাঁই, শ্রমণ স্বামী, ক্ষপণক>খমণ, পাঠান্তরে শ্রমণ ভাতার,
 মুদ—‘খমণেতি সর্বশূন্যং মনঃস্বামী’; বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে কারও সম্পর্ক বা আত্মীয়তা
 থাকে না, তাঁরা সর্বত্যাগী যোগী, চীবর পরিধান করেন, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন না। তবে
 কিছু কাল সংসারধর্ম অতিবাহিত করার পরও যে কেউ শ্রমণ হতে পারেন, সে ক্ষেত্রে
 পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ করতে হবে। এখানে যে রমণী বলছেন, আমার স্বামী শ্রমণ
 তাঁর সংসারে এই দুর্ঘটনা হতে পারে। বিগোআ—বিপথে যাওয়া, বিপথে যাওয়া; মূল
 সং—খিট, বি+ঘট=বিঘট, বিগড়া>বিগোআ। ফিটকিট—ক্ষুটিত হওয়া, প্রসূত হওয়া।
 মুদ—‘মহাসুখ চক্রস্বকুটী দৃষ্টা’। অন্তউড়ি—অন্তঃপুর, আঁতুড়ঘর, যে ঘরে সন্তান প্রসব
 হয়, অন্তঃকুটি>অন্তউড়ি (আঁতুড়)। গোমাএ—গো মা, মুদ—‘ভোমাতনৈরাশ্ব’।
 বিআন—প্রসব করে, সং-বী (গর্ভক্ষেপণ) আন...। বাসনপুড়া—বাসনাপুত্র, রাসনাপুট’
 মুদ= ‘সংবৃত্তিবাসনাপুট কায়োয়ং প্রসূতং’। বিআরন্তে—বিচারাতে; নাড়ি বিআরতে—
 মুদ—‘নাড়ি দ্বাত্রিংশদেবী তস্য শিষ্টক্রমানুপূর্ব্বা সদগুরু বচন প্রমাণ তো বিচার্যমাণে’।
 সেব—সেও, সেই বাসনা। বাপুড়া—বেচারা, বাপু+ড়া, হতভাগ্য; পাঠান্তরে বায়ুড়া
 (তুচ্ছার্থে)। জান জৌবন, জা গঅ জৌবন, যা নব যৌবন; জান শব্দ বিদেশি
 তাই কষ্টকল্পনা। ভইলেসি পুরা-পূর্ণ হল। মূল গখলি—মূল বিনষ্ট করে। বাপ
 সংঘারা—পিতা সংহার হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে। পাঠান্তরে মাত গখলি বাপ সংঘারা—মাকে
 বিনষ্ট করে বাপকে সংহার করা হয়েছে; এ অর্থে—মাতৃগর্ভ বিনষ্ট হওয়ার দরুন বাপ
 সন্তান দিতে পারবে না, কিন্তু- সংশোধিত পাঠ-মূল কমলে বাঅ সংঘারা অর্থাৎ মূল
 যোনিতে বজ্রসংঘাত। মুদ—‘মূলং সংবৃত্তিবোধিচিহ্নং তস্য নিকৃন্তি’। থিরা—স্থির,
 বীরা—বীর।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

আমি নিরাসী, স্বামী শ্রমণ।
 আমার বিকৃতকাম যায় না বর্ণন।
 প্রসব হয় গো মা আঁতুড় দেখেই।
 যা এখানে চাই তা এখানে নেই।
 প্রথম বিয়ান আমার বাসনা পুট।

নাড়ি বিচারে সেও বায়ুছুট।
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নব যৌবন আমার পূর্ণ হল।
মূল বিনষ্ট বাপ সংহারে মরল॥
বললেন কুকুরী পা এ ভব স্থির।
যে এটা বুঝে সে হয় বীর॥



গদ্যে রূপান্তর

আমি নিরাশ বা আসক্তহীন নারী, স্বামী আমার শ্রমণ। আমার বিকৃত কাম বা মিলন তৃপ্তির কথা কাউকে বলা যাবে না। মাগো আমি প্রসব করলাম আঁতুড় ঘর চেয়ে চেয়ে (আঁতুড় ঘর পাইনি)। যা এখানে চেয়েছি তা এখানে নেই। আমার প্রথম বিয়ান বাসনাপুট বা বাসনার ধন। নাড়ি বিচার করে দেখি সে হতভাগ্য বা বায়ুছুট (প্রাণহীন)। নব যৌবন আমার পরিপূর্ণ হল, মূল (মাতৃগর্ভ) বিনষ্ট হয়েছে, বাপ সংহারে মরেছে। কুকুরী পা বলছেন, এ ভব সংসার স্থির। যে একথা বুঝতে পারে সেই বীর।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

নৈরাশ্রা যোগিনী বলছেন, আমি ভবগতী নৈরাশ্রা নিরশ্রা, আসঙ্গরহিতা। খমণের তুল্য সর্বশূন্য মনঃস্বামী আমার, সংযোগ সুখানুভব তাঁর কখনও কথায় প্রকাশ করা যায় না। মহাসুখচক্র স্ফুটিত নৈরাশ্রা বিকশিত। নৈরাশ্রা যে যে বিষয়ে গোচরীভূত হল তা সব এখানে নেই। সংবৃত্তি বাসনাপুট কায়ান্তে স্ফুট হল, এ কায়ার নাড়ি বত্রিশ, তার পিণ্ডি অনুক্রম সদগুরু বচনে বিচার্য, সেও সর্বশূন্য। মূল সংবৃত্তি বোধিচিন্তা, তার উৎসমূলে কুকুরী পা সংহার করলেন। এ সংবৃত্তি বোধিচিন্তা ভবে স্থির এবং স্থির করে প্রজ্ঞা পারমিতা যে যে যোগিন্দের, তাঁরা ভবমুক্তির বিষয় অরি মর্দন করে বীর।

সমীক্ষা

বৌদ্ধ ধর্মের বিধানে ক্ষপণক (ভিক্ষু) বা শ্রমণ কারও স্বামী হতে পারে না, শ্রমণদের সঙ্গে কারও বৈষয়িক বা আত্মিক সম্পর্ক থাকতে পারে না, তাঁরা সর্বত্যাগী যোগী, ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তারা চীবর পরিধান করেন, ধর্মচর্চা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করেন না। তাই তাদের ভার্যা, পুত্রকন্যাাদি থাকার কথা নয়। এমনকি তাঁদের পিতামাতাও দাবি করতে পারেন না পুত্রের সম্পর্ক। তবে কিছুকাল সংসার জীবন অতিবাহিত করার পর ধর্মের জন্য বিশেষ আকর্ষণ এবং সংসার সম্পর্কের প্রতি অনীহার কারণে কেউ কেউ শ্রমণ জীবন পরিগ্রহ করেন (আবার কেউ কেউ শ্রমণ জীবন ছেড়ে গৃহীও হয়ে থাকেন, এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে)। তাই শ্রমণ জীবনে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক থাকবে না। এ কবিতায় এমন একটি চিত্র রয়েছে, একজন রমণী উচ্চারণ করছেন তার স্বামী শ্রমণ, অর্থাৎ স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করে শ্রমণ হয়েছেন। তাহলে তার দুঃখের সীমা নেই।

শ্রমণেরা রাজপরিবার থেকে এলেও তাঁরা ভিক্ষু, প্রতিদিন ভিক্ষালব্ধ অল্পে দেহ ধারণ করে ধর্ম সাধন করেন, সকাল সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর অবধি অনুগ্রহণ করতে পারেন, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকি সময় উপবাসে কাটান। এটা হীনযানি বিধান। মহাযানিদের এর বিকল্পও দেখা যায়; তিব্বতী লামারা ভার্যা গ্রহণ করেন, যৎসামান্য বিষয় আশয়ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যেহেতু চর্যাকার হলেন মহাযানি তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁদের শ্রমণদের স্ত্রী থাকাও সম্ভব ছিল হয়তো।

এই চর্যায় তেমন একজন শ্রমণের স্ত্রী বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। স্বামীগৃহ ছেড়ে গেলে নবযৌবনবতী নারী কী আশায় আর বাঁচতে পারেন? তিনি অবশ্যই বলতে পারেন আমার মিলন সুখ কাউকে বলা যাবে না, অথবা আমার বিকৃত কাম কাউকে বলা যায় না। যেহেতু এ কবিতায় এ কথা রূপকার্থে বলা হয়েছে, তাই আমরা মনে করতে পারি শ্রমণের স্ত্রী বা প্রিয় হবেন নৈরাশ্রা বা নির্বাণ। নৈরাশ্রার সঙ্গে বোধিচিন্তের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে কবি রূপকল্প এবং শব্দের আড়াল নিয়েছেন। শ্রমণ ও নৈরাশ্রার ঘর সংসার বিগড়ানোর বিকৃতি, তাঁদের সঙ্গম বা মিলনের কথা কাউকে প্রকাশ করা যায় না। নৈরাশ্রাকে লাভ করতে শ্রমণ কতটা সাধ্য সাধনা করছেন, অন্য কেউ তো সে কথা জানবে না। নরনারীর সম্পর্ক হল স্বাভাবিক কাম, কিন্তু শ্রমণ পুরুষ হলেও উন্মত্ত যোগী ছাড়া নির্বাণকে আর কে নারী কল্পনা করতে পারে?

এই স্বাভাবিক কামহীনতা বা বিকৃতকাম মিলনসুখ না থাকলেও শ্রমণের ও নির্বাণের মিলনের ফলে সন্তান প্রসব হল। এ সন্তান আঁতুড় ঘরে যত্নে প্রসূত হওয়ার অধিকার পেল না, তবে নৈরাশ্রা মাতা মেরিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সন্তান প্রসব করলেন, শ্রমণ স্বামীর সন্তান। কিন্তু কী আশায় এখানে যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না। কী করে পাওয়া যাবে? আঁতুড় ঘরে তো প্রসব হয়নি, কোথায় ঠাই, কোথায় নাড়ি কাটার ব্যবস্থা—এ সব তো কিছু নেই। রূপকে কবি বলে দিচ্ছেন, এই সন্তান প্রসব হল সংবৃতি বাসনাপুট কায়াতে, এ কায়ার নাড়ি বত্রিশ, তার পিণ্ডি বা জন্ম জন্মান্তর অনুক্রম রয়েছে, সদগুরু, বচন প্রমাণ সাপেক্ষে এ সন্তান বিচার্য। এই বাসনাপুট সন্তান হল বোধিচিন্ত, তাই তার মাতৃগর্ভ বা কায়াকে নির্মূল করা হল এবং যে পিতা তাকে জন্ম দিচ্ছেন জন্ম জন্মান্তরের জন্য তাকে সংহার করা হল। অবশেষে বোধিচিন্ত স্থির বা স্থবির হয়ে নির্বাণ লাভ করল। এ কথা যে ভবমণ্ডলে বুঝতে পারে সে হল বীর, অর্থাৎ সে নির্বাণ লাভের যোগ্য বীর।

নব যৌবন আমার পূর্ণ হল এই উক্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল এই, যৌবনের প্রারম্ভে বা পূর্ণ যৌবনে নরনারী একে অন্যের সঙ্গে মিলনে পরিপূর্ণ জীবন উপলব্ধি কিংবা জীবন আনন্দ উপলব্ধি করে থাকে। নির্বাণ লাভ বা নির্বাণের সঙ্গে মিলনের সময় পরিপূর্ণ বোধিচিন্ত যা নব যৌবনতুল্য, তাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। জীবনের সুন্দর সময় হচ্ছে যৌবন, নৈরাশ্রা বা ভোম্বীরূপ নির্বাণকে যুবতী কল্পনা করা হয়েছে; তাকে লাভ করতে তো চাই নব যৌবন, দেহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আর এ বোধিচিন্তই হল সে নব যৌবন। বোধিচিন্ত বা সম্পূর্ণ মায়ামোহ বিষয়াদির আধার শূন্য প্রজ্ঞাপারমিতা নবযৌবনে অবস্থান করে কায়াতে বা বোধিচিন্তরূপ সন্তানের মাতৃগর্ভে সে মূল মাতৃগর্ভ বিনষ্ট করা হল, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়াদির আধার পিতাকে সংহার করা হল। তা হলে তো আর জন্ম বা সন্তান উৎপাদনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, অতএব নির্বাণ অনিবার্য।

তৎকালীন জীবনচিত্র এ কবিতায় বিধৃত, তেমনি রস উপলব্ধির মাত্রাও এতে কম নেই। প্রথম একজন নিরাশী স্বামী পরিত্যক্তা নারীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তৎকালে যে কোনও যুবক হঠাৎ করে নানা কারণে সংসার ত্যাগ করে ক্ষপণক বা নগ্ন ভ্রম্মপরিহিত সন্ন্যাসী হয়ে যেত, এ প্রসঙ্গে ১১ নং চর্যায় আলোচনা দ্রষ্টব্য, সংসার থেকে ছিটকে শ্রমণ বা সন্ন্যাস হয়ে যাওয়াতে একটা পরিবারে অনেকটা দুঃখ বয়ে আনত। বৌদ্ধ ধর্মে শ্রমণ জীবন প্রায় শৈশব থেকে শুরু হয়, নিয়ম ছিল পিতামাতার তিন পুত্র থাকলে একজনকে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করতে হবে। কিন্তু যে কোনও লোকের যে কোনও বয়সে প্রবজ্যা গ্রহণ করার নিয়মও আছে সে ক্ষেত্রে পিতামাতা স্ত্রী পুত্রকন্যাকে দুঃখ সাগরে ঠেলে দিয়ে শ্রমণ হতে হত।

এ কবিতায় শ্রমণের স্ত্রীর দশা এমনও হতে পারে, স্বামী প্রবজ্যা নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে, তাই তো তার জীবনের আশা বলতে কিছুই নেই, কারণ ধর্মের বিধানমতে নারীর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় না, তার ওপর তার হয়তো একটি বা দুটি সন্তানও রয়েছে, এখন পিতামাতার সংসারে গলগ্রহ। অথবা কোন সন্তান জন্মের আগেই শ্রমণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন, এখন তার বাপের ঘরে সন্তান প্রসব করেছে, আঁতুড় ঘর করে দেওয়া হয়নি। ধাই ডাকা হয়নি, মৃত সন্তান প্রসব করেছে, মা মা হয়তো চায় এই অবহেলায় মাও মরে যাক। তাই পরিপূর্ণ যৌবন তার বয়সই গেল। আর তো কোন সন্তান তাঁর হবে না। তাঁর মত হতভাগ্য সংসারে আর কে আছে?

এমনও হতে পারে স্বামী প্রবজ্যা নিয়ে শ্রমণ হয়েছেন, দুঃখে যন্ত্রণায় স্ত্রী বিকৃত কামে আসক্ত হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন, যা আর কাউকে বলা যাচ্ছে না। আঁতুড় ঘর ছাড়াই সন্তান প্রসব করছেন গোপনে, সেখানে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, কোনও রকমে প্রসব করলেন বটে তবে নিজে কষ্ট করে খুঁজে দেখলেন যে সন্তানের নাড়িতে প্রাণ নেই।

এখনকার দিনে আঁতুড় ঘর কী তা কেউ জানে না হয়তো; কারণ হাসপাতালে কিংবা কোন নার্সিং হোমে সাধারণত সন্তান প্রসব হয়, তাঁকে ঠিক আঁতুড় বলা যাবে না, তবে লেবার রুম বা ডেলিভারী রুমকে এক অর্থে আঁতুড় বলা যায়। তখনকার দিনের আঁতুড় ঘর অন্য রকম ছিল। যদিও মূল শব্দ 'অন্তঃকুটি' কিন্তু সেটা প্রধান ঘরের অন্তপুরে থাকত না। আলাদা একটি ছোট ঘর তৈরি করে প্রসূতিকে প্রসবের আগে সেখানে স্থানান্তর করা হত। যার যেমনি সংগতি, তবে সাধারণের আঁতুড় হল পাতায় ঘেরা খড়ের ছাউনি এবং ভূমিতে খড় বিচালি দিয়ে প্রসূতি শয্যা রচিত হত, সারাক্ষণ তাতে ধূপ ধুনো দেওয়া হত অশুভ আত্মা যেন না আসতে পারে। অনেক সময় ধোঁয়ার কারণে নবজাতক শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়ত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাত দিন মা ও শিশু আঁতুড় ঘরে থাকার পর পবিত্র স্নান দিয়ে তাদের মূল ঘরে স্থানান্তরিত করা হত। প্রসূতিকে আঁতুড় ঘরে নেওয়ার সময় তিনি সকলের কাছে বিদায় চেয়ে নিতেন। কারণ প্রসবের সময় মায়ের এবং শিশুর অনেক সময় মৃত্যু ঘটত।

চর্যা-২১
রাগ বরাড়ী
ভুসুকু পা

নিম্নলিখিত পদগুলি 'চর্যা' নামের একটি গানের অন্তর্গত। এগুলি 'রাগ বরাড়ী' নামের একটি গানের অন্তর্গত। এগুলি 'ভুসুকু পা' নামের একটি গানের অন্তর্গত।

নিসি^১ আকারী^২ মুসা^৩ অচারা^৪ ।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা^৫ ॥ ফ্র ॥
মার রে^৬ জোইআ মুসা পবণা
জোঁণ তুটআ অবনা গবণা^৭ ॥ ফ্র ॥
ভব বিংদারঅ^৮ মুসা^৯ খণঅ গাতী^{১০} ।
চঞ্চল মুসা কলিআ^{১১} নাশক^{১২} যাতী ॥ ফ্র ॥
কাল^{১৩} মুসা উহ^{১৪} বাণ^{১৫} ।
গঅণে উঠি চরঅ^{১৬} অমণ ধাণ^{১৭} ॥ ফ্র ॥
তব সে^{১৮} মুসা উম্বল^{১৯} পাঞ্চল^{২০} ।
সদ গুরু বোহে করিহ সো গিচ্ছল ॥ ফ্র ॥
জবে মুসা এর অচার^{২১} তুটই^{২২} ॥ ফ্র ॥
ভুসুকু ভণঅ তবৈ বাকন ॥ ফ্র ॥

পাঠান্তর

১. নিসিঅ । ২. আকারী । ৩. মুসার, মসার । ৪. চারা । ৫. অহারা । ৬. মারবে ৭. তুটই
অবনা পবণা । ৮. বিন্দারঅ, বিন্দারজ । ৯. মুসার । ১০. গতি, গাতো । ১১. গাশক ।
১২. কলা । ১৩. উহণ । ১৪. মুসা উহণ বাণ । ১৫. চরই । ১৬. করঅ অমিত পান ।
১৭. তবসে, বাতসে । ১৮. হুঞ্চল । ১৯. অঞ্চল চঞ্চল । ২০. চার, চারা, মুসা অচার । ২১.
তুটই । ২২. ফীটই ।

শব্দার্থ ও টীকা

মুসা অচারা—মুখিকরা বিচরণ করছে; মুদ—‘মুখক চিত্তপবন’-নিসি প্রজ্ঞা কর্ম্মাঙ্গণা’র
চঞ্চল চিত্ত; সংবৃত্তিবোধিচিত্ত হল বিড়াল, ইঁদুর তাই বিড়ালের ভক্ষ্য । অমিঅ ভখঅ—
অমৃত ভক্ষণ, বোধিচিত্ত অমৃত স্বাদ আহার । অহারা—আহার । মার রে—হত্যা কর ।
জোইআ—যোগী, মুসা পবণা—মুখিক পবন, পবনের মত চঞ্চল মুখিক; তুটঅ—টুটে ।
অবনাগবনা—আনা গোনা; মুদ—‘সংসারচক্রে যাতায়াত’ । বিংদারঅ—বিদীর্ণ করে, বিন্ধ
করে; বিন্দা>বেঁধা; মুদ—‘ঘনানন্দোৎকীর্ণে’ । খণঅ—খনন । গাতী—গর্ত; গর্ত>গন্ত>
গাতী>গাতা । কলিআ—জেনে । নাশক—বিনাশকারী । যাতী—স্থিত, সঞ্চিত; স্থিত>থাতী
>থিত (থির) । কাল মুসা—ভয়ঙ্কর মুখিক । বাণ—বর্ণ । উহ—উহ্য । গঅণে উঠি—ওপরে
ওঠে । চরঅ অমণ ধান—আমন ধানে বিচরণ করে, রূপকে—গগনে উঠে মনোযোগহীন
ধ্যান আচরণ করে; মুদ—‘চিত্ত মুখক কাল’; তস্য পিণ্ডাহাণভেদে বিচারেন ভো যোগিন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তাপলস্তোপদেশং ৭ চিদ্যতে গগনমিতি ।' উষ্ণল পাঞ্চল—অঞ্চল চঞ্চল, আঁচল চঞ্চল (অঞ্চল প্যাঁচানো?) । পিচ্ছল—নিশ্চল । আচার তুটঅ—আচরণ টুটে । ফীটঅ—স্ফুট হয়, খোলে ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

নিশি আঁধারে মুষিক চরে ।
 অমৃত চেখে আহার করে ॥
 মার রে যোগী মুষিক পবন ।
 যেন টুটে গমনাগমন ॥
 ভব বিঁধে (মুষিক) খোঁড়ে গর্ত ।
 চঞ্চল (মুষিক) জেনে বিনাশ করতো ॥
 কাল মুষিক উহ্য তার বরণ ।
 গগনে উঠে আমন ধানে (করে) বিচরণ ॥
 তবে সে মুষিকের অঞ্চল চঞ্চল ।
 সদগুরু বচনে কর তাকে নিশ্চল ॥
 যখন মুষিকের আচরণ টুটে ।
 ভুসুকু বলেন তখন বন্ধন ছুটে ॥

গদ্যে রূপান্তর

রাতের আঁধারে মুষিক চরে বেড়ায়, অমৃত চেখে মুষিক আহার করে । যোগীবর, পবনের মত চঞ্চল মুষিক ধরে মেরে ফেলে, যেন তার আনাগোনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । মুষিক ভব (মাটি বা সংসার) বিদ্ধ করে গর্ত খুঁড়ে থাকে, মুষিকের চঞ্চলতা বুঝতে পেরে বিনাশ করুন । কাল মুষিক তার বরণ উহ্য রাখে; গগনে (ওপরে) উঠে সে আমন ধানে চরে বেড়ায় (গগনের জন্য ধ্যান করেও সে অমনোযোগী হয়ে যায়) । তবে সে মুষিকের চঞ্চল অঞ্চল ধরে ফেলে সদগুরুর উপদেশ মত তাকে নিশ্চল করে ফেলুন । যখন মুষিকের এ আচরণ ঘুচে যাবে ভুসুকু বলেন, তখন তাঁর বাঁধন ছুটে (স্ফুট) যাবে ।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

চিন্তাপবন মুষিক নিশি প্রজ্ঞা কর্মাস্ত্রণে বিচরণ করে, সেই কর্মাস্ত্র জুড়ে বিচিত্র ক্ষণে বা বিভিন্ন সময়ে কায়ার আনন্দাদি ব্যাপার দ্বারে কুলিশ অরবিন্দ সংযোগে বোধিচিন্ত অমৃতস্বাদ আহার করে ফেলে । গুরু মুখলব্ধ উপায়ে তাকে নিঃস্বভাবীকর, যাতে যোগী সংসার চক্রে যাতায়াত দ্বার বন্ধ হয়ে যায় । ভব স্বকায়াকে মুষিক বিদ্ধ করে প্রকৃতি চাঞ্চল্য অন্যথা ভাব সৃষ্টি করে সংবৃতি বোধিচিন্ত নাশক কাল স্বরূপ এ মুষিকের জন্মক্রমের বিচরণ বুঝতে পেরে তাকে শূন্য বা গগনে বিচরণ দেখতে পেলে বিনাশ কর এবং মহাসুখরস পান কর । চিন্ত মুষিকের মোহ উন্মত্ততার জন্য সদগুরুবচন যন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাকে নিশ্চল কর । সে সময়ে সহজ আনন্দচিন্ত মুষিকের আচার নিষ্ক্রিয় হবে, সে সময় সংসার বন্ধনমুক্ত হবে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীক্ষা

পর্বত অতিশয় বিশাল এবং স্থবির বটে, সে পর্বতকেও মুষিক গর্ত করে ভেতরে প্রবেশ করে, তার ভেতরে মুষিক বাস করতে পারে। যাঁরা পর্বতের মত স্থবির (থের) যোগী তাদের চিন্তের ভেতর মুষিকরূপ অবিদ্যা চঞ্চলতা প্রবেশ করে তাঁদের ধ্যানভঙ্গ এবং চিন্তা অবিচলতা নষ্ট করে দিতে পারে, মায়ামোহ ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি অনুভূতি সৃষ্টি করে দিতে পারে। মুষিক ক্ষুদ্র হলেও তার নষ্ট করে দেবার শক্তি কম নয়। যোগীবরকে কবি তাই সাবধান করে দিচ্ছেন। মুষিক পবনের মত চঞ্চল, পবনরূপ মন অথবা মন রূপ পবন গর্ত পথে ভেতরে প্রবেশ করে চিন্তা অবিদ্যা মুষিককে বাস করতে সহায়তা করে। চিন্তা চাঞ্চল্য নির্বাণের অন্তরায়। সে জন্য যোগীবর, এখন মুষিক নিধন করুন, মুষিকের আনাগোনা আচরণ একেবারে নির্মূল করুন।

যোগীবর, আপনি তো জানেন কীভাবে ভব (মাটি) সংসার বিদ্ধ করে মুষিক গর্ত খনন করে, সে ছোট হলেও বিশাল পর্বতরূপ সাধনালব্ধ চিন্তের ভেতরে বিশাল গর্ত সে করে ফেলতে পারে। সে কারণে সে মুষিক কালরূপ ভয়ঙ্কর, কালো রাত্রির আঁধারে তাকে দেখা যায় না। তার বর্ণকে সে গোপন রাখে, সে বর্ণচোরা। আপনার কাছে মনে হবে সে সুবর্ণ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কাল, ত্রাপাত সুবর্ণ মনে হলেও তাকে সনাক্ত করা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব নয়, সে যখন আপনার মত স্থবির পর্বতের অন্তরে থাকে তখন আপনি বুঝতে পারবেন না। তবে যদি একা সচেতন হন যেমন জুতার ঘষায় পায়ের ভেতর কোথায় কাটা গেছে সেটা যেমন ঠাণ্ডা ফুটলে বোঝা যায় ঠিক তেমনি পরে আপনি বুঝতে পারবেন। মুষিক কেবল ক্ষেত্রে আপনার চিন্তাকে কুরে কুরে দেয় না, বাইরে এসেও আপনার আমন ক্ষেত্রে মন নষ্ট করে ফেলে, অর্থাৎ আপনি যখন গগন বা নির্বাণের জন্য ধ্যান করেন তখন মুষিকরূপ চিন্তাপবন আপনার গগন অধিকার করে আপনার ধ্যান নষ্ট করে। সে অবিদ্যা মুষিক যেমন তার অঞ্চল উড়িয়ে অপেয় যৌবন প্রদর্শন করে (বুদ্ধকে মার যেমন করেছিল), কিংবা ইন্দ্রিয়কে বিচলিত করে দিতে যায়, সেটা যদি আপনি জেনে থাকেন (বা জেনে না থাকেন) তবে সদগুরুর উপদেশ শ্রবণ করুন, সে উপদেশ রূপ যন্ত্র দিয়ে মুষিককে মেরে ফেলুন এবং সম্পূর্ণ নিশ্চলতা লাভ করুন। তাতে করে কীভাবে বোধিচিন্তা অর্জন করা যায় তা জেনে নিন। ভুসুকু কবি বলছেন, এই মুষিকের আচরণ যখন জন্ম হবে ভব সংসারের বাঁধন মুক্ত হবে, নির্বাণ তখনই অনিবার্য লাভ করবেন।

মনে হয় এ কবিতা সর্বসাধারণকে লক্ষ্য করে রচিত হয়নি। দেখা যাচ্ছে এটি শ্রেণী পাঠবদ্ধ যোগী, শ্রমণ, স্থবির, সাধকদের (তন্ত্র সাধক) জন্য রচিত হয়েছে। সে কারণে এ কবিতা বা পাঠ্যবিদ্যা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অন্য চর্যাপদের চাইতে আলাদা। এ কবিতার পরিবেশ লোকালয়ের সংস্পর্শে নেই, দূরে কোনও গুহায় নির্জন নিভতে; কিংবা মঠ বা সজ্জারাম বোধিদ্রুম তলে তপোবনের পতিত ছায়া নির্জনতায়। পীত বসন পরিহিত বা চীবরধারী বালযোগীবৃন্দ অর্ধ চক্রাকারে গুরুর মুখোমুখি সারিবদ্ধভাবে আসীন, শুধু বালযোগীরা নয়। হয়তো বা থের মহাথেররাও আচার্য ভুসুকু পা'দের অমৃত বাণীনিচয় পান করছেন, তাঁদের সামনে আচার্য, আচার্যের পশ্চাতে রয়েছে মহাধ্যানে নিবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি; তারই পদতলে সদগুরু; অন্যরা নিস্তব্ধ অবনত মণ্ডিত মস্তকে সদগুরুর উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বৃক্ষতলে পাঠদান। সৈয়দ মুজতবা আলী এমনই একটি পাঠদান এবং পরিবেশের বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি বালযোগীদের এই বাধ্যতামূলক মনোনিবেশের পক্ষপাতী নন, শান্তিনিকেতনের পরিবেশের সঙ্গে তার পার্থক্য হল কবি সুন্দর এবং প্রকৃত শিক্ষার আদর্শকে লক্ষ্য করেছেন, কঠোরতাকে পরিহার করেছেন। তাই মুজতবা আলী বলেন, আট থেকে কুড়ি বছর বয়সি বালক শ্রমণবীশদের দীর্ঘ ষোল ঘণ্টা একই দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে স্থির দৃষ্টি এবং চিত্ত নিশ্চলতা করার সাধ্যসাধনা যারা পরিচালনা করেন তাঁরা লক্ষ্য করেন একটু কারও নড়াচড়া হল কিনা, নিশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ কণ্ঠ দিয়ে বেরুল কিনা, তাহলে পৃষ্ঠদেশে লগুড় আঘাত। এভাবে যোগাভ্যাস করতে হবে কমপক্ষে বার বছর অথবা সারাজীবন।

কবি ভুসুকু যোগী বা বালযোগীর জন্য এ কবিতা রচনা করলেও সাধারণের জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মুষিকের যে বাস্তব উপমা নিয়েছেন তাতে আমরা জানি শস্যক্ষেতে মুষিক মানুষের অশেষ ক্ষতি সাধন করে। ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে গর্ত করে বাস করে, কৃষকের অমৃত ফসল, যা তারা সারা বছরের শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে এর পর গৃহে তোলার উপযোগী হলেই তাদের এ প্রাণের বস্তু নষ্ট করে ফেলে। তাই মানব জীবন সুকৃতি ফসলও ইদুররূপ কাল অশুভ প্রভাবের ফলে কোন সুযোগে জীবনে প্রবেশ করে নষ্ট করে দিতে পারে। সারা জীবনের সাধ্যসাধনা মাত্র একটি ভুলে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

চর্যা-২২

রাগ গঞ্জরী

সরহ পা

total 4 poem by sarah pa

অপণে^১ রচি রচি ভব নির্বাণা^২।মিছে^৩ লোঅ বন্ধাব^৪ এ অপণা^৫ ॥অন্তে^৬ ৭ জানহ^৭ অচিন্ত জোই^৮।জাম মরণ ভব কইসণ হোই^৯ ॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো।

জীবন্তে^{১০} মঅলৈ^{১১} নাহি বিশেসো ॥জা এথু^{১২} জাম মরণে বি সন্ধা^{১৩}।সো^{১৪} করউ রস রসাণেরে^{১৫} কংখা ॥জে^{১৬} সচরাচর ত্রিঅস ভ^{১৭} মন্তি।তে^{১৮} অজরামর কিম্পি^{১৯} ৭ হোন্তি ॥

জামে কাম কী কামে জাম।

সবহ ভগতি^{২০} অচিন্ত সো ধাম ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

www.amarboi.com ~

22th-----119 page

32th-----148

38th -----171

39th-----174 page

পাঠান্তর

১. আপনে। ২. নিব্বাণা, নিবাণা। ৩. মিছে। ৪. বাঁধবই। ৫. আপনা। ৬. অমহে।
 ৭. জানসুঁ। ৮. অবখেঁ ন জানহু অচিন্ত জোই। ৯. হোসি। ১০. জীবতেঁ। ১১. মইলে।
 ১২. জাএহ। ১৩. মরনেরি সঙ্কা, বিসঙ্কা। ১৪. জো। ১৫. বসানেরে কথা। ১৬. জো।
 ১৭. তিদশ। ১৮. জে। ১৯. কিম্প। ২০. ভণই।

শব্দার্থ ও টীকা

অপণে—আপনে, আপনা আপনি, নিজে নিজে, মনে মনে। আপণে রচি রচি—অনাদ্য
 বিদ্যা বাসনা দোষ। বাঁধবএ—বাঁধে, বাঁধায় এ মিছে লোঅ বন্ধাবএ—মিথ্যা লোকে বাঁধে,
 ভবনির্বাণ কল্প আরোপ লোক চরিত্র ভ্রান্তিতে স্বয়ং ভববন্ধন আবদ্ধ হয়। অস্তে—আমি।
 অস্মাভিঃ>অমহাহি>অস্তে>আস্মি। অচিন্ত জোই—অচিন্ত্য যোগী, যোগী হয়েও অচিন্ত্যকে
 জানে না, মুদ—‘গুরু চরণ রেনুপ্রসাদাৎ ভাবসরূপ পরিজ্ঞানেনাচিংত্যা যোগিনো’। জীবন্তে
 মঅলৈ—জীবন্ত মরা বা জীবন্তে মরা; বৌদ্ধতাত্ত্বিক ও বাউলদের সাধন নিয়ম, জীবিত
 থেকেও ভোগতৃষ্ণা বিষয়ানুভূতিহীন জীবন। বিশেসো—বিশেষ। রসরসানেরে কংখা—রস
 রসানোর আকাঙ্ক্ষা, রস ভোগের আকাঙ্ক্ষা। তিঅস—ত্রিদশ, মন্ত্রোষধ শক্ত ত্রিদশ
 দেবালয়, বাল্য কৈশোর যৌবনা, জন্ম স্থিতি মৃত্যু, ভ্রমণ—‘জংবুদ্বীপ মহাস্থবধন অথবা
 মন্ত্রোষদ্যাশিষ্টা ত্রিদশং দেবালয়ং’। ভমণ্ডি—ভ্রমণ করে। অজরামর—অজর অমর।
 কিম্পি—কিছুই, কোনও অভাবেই। ৭ হোস্তি—হয়না। ধাম—নিবাস।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

নিজে রচে রচে ভব নির্বাণ।
 মিছে লোক বাঁধে নিজ প্রাণ।
 আমরা জানি না অচিন্ত্যযোগীনিচয়।
 জন্ম-মৃত্যু-ভব কী করে হয়।
 যেরূপ জন্ম মৃত্যুও সেরূপ।
 জীবন্তে মৃত্যে নেই বিশেষরূপ।
 যার এখানে জন্ম মৃত্যুরও শঙ্কা।
 সে করুক রস রসায়নের আকাঙ্ক্ষা।
 সে সচরাচর ত্রিদশ ভ্রমণ করে।
 সে অজর অমর রূপ কিছু না ধরে।
 জন্মে কর্ম না কর্মে জন্ম।
 সরহ বলেন অচিন্ত্য সেই ধর্ম।

গদ্যে রূপান্তর

আপনা আপনি ভব নির্বাণ রচনা করে মিছে লোকে নিজেকে বেঁধে রাখে। আমরা যোগী
 হলেও যা অচিন্ত্য তাকে জানি না এবং আরও জানি না জন্ম মৃত্যু ও ভবের রূপ, অথবা
 জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে ভবরূপ কীভাবে হয়ে থাকে। জন্ম যে রূপে হয় মরণও ঠিক
 তেমনি, জীবিত ও মৃতের ভেতর বিশেষ কোনও রূপ নেই। যার জন্ম এখানে তার মনের
 আশঙ্কা রয়েছে তাই সে রস রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। যে সচরাচর ত্রিদশ ভ্রমণে
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

(জন্ম-ভব-মৃত্যু) যায় সে অজর অমর কিছুই হয় না। জন্মে কর্ম নাকি কর্মে জন্ম, সরহ বলেন এ ধাম বা ধর্ম অচিন্ত্য।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

অনাদ্য বিদ্যা বাসনাদোষে ভবনির্বাণ কল্পনা আরোপিত লোক চরিত্র মিথ্যা ভববন্ধন রচনা করে। গুরু চরণ রেনু প্রসাদ ভাবস্বরূপ পরিজ্ঞান চিন্তা যোগী বলেন, ভবের উৎপাদন ভঙ্গ কী সাদৃশ্যে হয়ে থাকে জানি না। সর্ব নৈরাশ্রা আগমনে কখনও উৎপাদন হয় না, তাই যেমন উৎপাদন বিনষ্ট হল সেরূপ উৎপাদন পরিদৃষ্ট হল। অতএব জীবিত সম্ভাবনার পুনর্জন্ম মরণাদি ভয়ে নিঃশঙ্ক নিर्वিকল্পরূপী। যে যোগী জুহুদ্বীপ মহাস্থানে সচরাচর ভ্রমণ করে অথবা মন্ত্র ওষধ শক্তি ত্রিদশ দেবালয়ে গমন করে তিনি গুরু মার্গলব্ধ রত্ন লাভ করে। কর্তৃকর্মবিহীন যোগীর জন্ম কর্ম কী হয়, কর্ম বা উৎপাদনের সরহ বলেন, পরামর্থ-বিদ্যা উপযোগী চিন্তায় হয়।

সমীক্ষা

বৌদ্ধ ধর্মীয় জীবন আদর্শের মূল লক্ষ্য নির্বাণ লাভ। জীবন সাধনার সুফল মার্গ অতিক্রম করে অর্জিত হয় এ লক্ষ্য। তবে জন্মের বিভিন্ন দোষ কারণে মৃত্যুর পরও পুনর্জন্মে তা মোচন হয় না, কিন্তু নির্বাণের পর আরও তবে সন্তোষ হবে না। এ ভাব বা এ লব্ধ জীবনের সে মহাসুখ বিস্তৃত হয়ে জীবনের সুখ উৎসাহযোগী কৃত্রিম নির্বাণ নিজে নিজে রচনা করে এবং মিছে তাতে নিজেদের বেঁধে রাখে। অর্থাৎ ভববন্ধন মোহ তাদের এরূপ আকৃষ্ট করে যে বারবার জন্মগ্রহণ করেও তারা প্রকৃত মহাসুখ লাভ করতে পারে না, বরং বারবার ভবযন্ত্রণায় জন্ম জরামৃত্যুর অধীন থাকে। চর্যাকার তাই বলছেন, আমরা যোগী বটে তবে যা অচিন্ত্য তা তো কিছু জানি না। এ বাক্যটি বেশ শ্লেষযুক্ত অর্থাৎ আমরা যোগীরা এ ভবনির্বাণের যোগ্য এটা অচিন্ত্য, অথবা যোগীরাও এ বিষয়ে অচিন্ত্য। মানুষ জন্ম নিয়ে ভবে আসে এবং মৃত্যু দ্বারা আবার একটা ভবে প্রবেশ করে, তবে জন্মমৃত্যু কী ভাবে হয়ে থাকে কেউ তা জানে না। অর্থাৎ কর্মফলের কারণে কারও মৃত্যু। আবার ভবে তার কীভাবে জন্ম হবে কেউ তা বলতে পারে না। তবে জন্ম যেমন মৃত্যুও তেমনি; জীবিত হোক কিংবা মৃত হোক এর ভেতর কোনও ভেদাভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ জন্ম হলেই মরতে হবে আর মরলেই আবার জন্ম নিতে হবে; এ জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে রেহাই নেই। এই ভবে যার জন্ম তার আবার মরণের আশঙ্কা থাকে তাই তার রস রসায়ন বা ভোগ আকাজক্ষার প্রত্যয় থাকে। যারা মরে তারা সচরাচর অমর লোকে কিংবা জুহুদ্বীপ মহাস্থানে ভ্রমণে যায় বটে। কিন্তু অমর লোক হলেও অমর অজর হয়ে সেখানে থাকতে পারে না। অথবা যারা চরাচরের মধ্যে মরে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানের ত্রিদশ দেবালয়ে যায়—তীর্থ উপযোগী যাগযজ্ঞ জীবন নিয়ে থাকে কিছু দিনের জন্য, তারপর তারাও ফিরে আসে। সেখানে কেউ অমর অজর হয়ে থাকতে পারে না। তাই জন্ম থেকে কর্ম, নাকি কর্ম থেকে জন্ম এই পরমার্থ তত্ত্ব বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ জন্ম হলেই ভবনির্বাণ সৃষ্টি করার জন্য কর্ম করে। মরলে এই কর্মফলের দরুন আবার জন্ম হয়, এমনি চলতে থাকে। সরহ পা তাই বলছেন, এই ধর্ম বা ধাম অচিন্ত্য; এখানে ধাম কথার দুটো অর্থ প্রকাশ করে। এক হল জন্ম মৃত্যুর যে ধর্ম যা পর্যায়ক্রমে চলছে তা। অন্য ধাম হল নিবাস, জন্ম দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর যে অবস্থান অর্থাৎ ভবজীবন বা আপনা-রচা ভবনির্মাণ। এ দুটো ধামই অচিন্ত্য। চিন্তা থেকে তাকে বোঝা যায় না।

এই কবিতাটির একটা ব্যতিক্রমী ভাব রয়েছে, তেমন এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও। এর আগে ভব নির্বাণ এ কথাটি এসেছে কিন্তু তার নির্গলিতার্থ বর্তমান কবিতায় ব্যবহৃত ভবনির্বাণের সঙ্গে সমঞ্জস নয়। এখানে ভব নির্বাণ রূপ লৌকিক চেতনার একটা সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। জীবনে সবাই সুখ চায়, যোগীরা ভবের সুখ ত্যাগ করে মহাসুখ কামনা করে। তবে সব সুখই মহাসুখের অনুপাতে। অনেকে বেহেশত উপযোগী জগতে বেহেশত রচনা করে বেহেশত লাভ করে, এও ঠিক তেমনি। সরহ যেমন প্রাজ্ঞ তেমনি কবি। এ তত্ত্বকে অপূর্ব শব্দ ও ভাষায় গেঁথেছেন। তাছাড়া নিজের কাছে তো একটা নির্বাণ অর্থাৎ বেহেশত রাখে সবাই। সকলের সুখ এক রকম হয় না। কারও কাছে মরুভূমির তাঁবুর ভেতর রাতের স্নিগ্ধতার ভেতর নৃত্যগীত সুখ। অন্য কারও কাছে অন্য কিছুতে সুখ। তাই ভবনির্বাণ সকলের নিকট এক নয়। তাই কবি দৃঢ়দৃষ্টিতে বলেছেন, ‘অপনে রচি রচি ভবনির্মাণা’—এই যে বৈচিত্র্য সেটাই তো অচিন্ত্য।



প্রেট ১০ : সরহ পা

সরহ পা

রাজা গোপাল ও ধর্মপালের রাজত্বকালে সরহ পা বর্তমান ছিলেন। গোপাল ৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ এবং ধর্মপাল ৭৭০-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ। তিনি ছিলেন রাজকবি এবং খুব সম্মানিত। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ। তিনি মগধ অধিবাসী, প্রথমে জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য হচ্ছে তাঁর রচিত এই গ্রন্থাবলী ১. মহামুদোপদেশ দোহাকোষ। ২. তত্ত্বোপদেশ শিখর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

দোহাকোষ। ৩. কায়কোষ অমৃত বজ্রগীতি। ৪. দোহাকোষ। ৫. বসন্ত তিলক দোহাকোষ। ৬. চর্যাগীতি দোহাকোষ। ৭. ভাবনা ফল দৃষ্টি চর্যা দোহাকোষ। ৮. দোহাকোষ উপদেশ গীতি। ৯. চিত্তকোষ অজঃবজ্রগীতি। ১০. ডাকিনী গুহ্য বজ্রগীতি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সরহ পা'র দোহাকোষের জন্য বিশেষ গবেষণা রয়েছে।

চর্যা-২৩
রাগ বড়াড়ী
ভুসুকু পা

জই তুমহে^১ ভুসুকু অহেরি^২ জাইবে^৩ মারিহসি পঞ্চজনা^৪।
নলিনীবন^৫ পইসন্তে^৬ হোহিসি একুমণা^৭।
জীবন্তে^৮ ভেলা বিহণি মএল গঅনি^৯।
হণবিণু মাংসে ভুসুকু পম্ববণ পইসহিলি^{১০}।
মাআজাল পসরিউরে বাধেলি মাআ হরিণী^{১১}।
সদগুরু বোহে^{১২} বুঝিরে কাসু কাহিনী^{১৩}।

এরপর তিনটি পাতা পাওয়া যায়নি, ফলে ২৩ নং চর্যার শেষ চার পংক্তি এবং ২৪, ২৫ নং চর্যাপদ দুটি পাওয়া যায়নি, এমনকি টীকাও পাওয়া যায়নি, তবে তিব্বতি অনুবাদ রয়েছে। অনুবাদ অনুসারে কেউ কেউ পদের অনুরূপ কাঠামো সৃষ্টি করেছেন, তা অন্য বিষয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

পাঠান্তর

১. তুম্কে। ২. অহেই। ৩. পাঞ্চ জনা। ৪. গলিনীবন। ৫. পাইসন্তে। ৬. একুমণা, পইসন্তি হোহিসি একুমণা। ৭. জীবন্ত মা বিহনী মএল গ অণিহিলি। ৮. গউ বিণু মাংসে ভুসুকু পউমবণ পইসহিলি। ৯. মাআজাল পসারী বাঁধলি মাআ হরিণী। ১০. কাহিনী, কহানী।

শব্দার্থ ও টীকা

জই—যদি। অহেরি—শিকারী। মারিহসি—মারবে। পইসন্তে—প্রবেশ করে। হোহিসি—হও, হবে। বিহণি—সকাল, বিহান। মএল—মৃত। গএণি—রজনী। হণবিণু—হনন বিণে। পইসহিলি—প্রবেশ করল। পসরিউরে—প্রসারিত করে, বিস্তার করে। কাসু—কার। কাসু কাহিনী—কার কী বৃত্তান্ত।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাবে মারতে পাঁচজন।
নলিনী বনে প্রবেশ করতে হয়ো একাগ্রমন।
জীবন্ত হল প্রভাত রজনী মরল।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হনন বিনা মাংসের জন্য ভুসুকু পদ্ববনে প্রবেশ করল।
 মায়াজাল প্রসারিত করে বাঁধল মায়া হরিণী।
 সদগুরুর বোধে বোঝা গেল এ কার কাহিনী।

গদ্যে রূপান্তর

ভুসুকু, যদি তুমি শিকারে যাবে তবে যেন মার পাঁচজনকে। নলিনীবনে প্রবেশ করতে তুমি একাগ্রমনা হও। জীবন্ত হল প্রভাত আর রজনী মরে গেলে। হনন বিণে মাংসের জন্য ভুসুকু পদ্ববনে প্রবেশ করল। মায়াজাল সম্প্রসারিত করে মায়াহরিণীকে বাঁধল। সদগুরুর উপদেশ বুদ্ধিতে বোঝা যায় এ কার বৃত্তান্ত।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

পঞ্চ স্কন্ধকে শিকার করে বধ করতে হত, সাধনার নলিনীবনে প্রবেশ করে তাদের সিদ্ধাচার্য ভুসুকু শিকার করেন, খুব একাগ্রচিত্ত না হলে শিকার করা যায় না, পঞ্চ স্কন্ধ বধ করে লাভ করা হয় নৈরাশ্রাকে। জীবন হল প্রভাত, মৃত্যু রাত্রি। সে কথা না জেনে পঞ্চ স্কন্ধকে হত্যা না করে বিষয়াদি মায়ামোহ নিয়ে নলিনীবনে বা নৈরাশ্রাধামে প্রবেশ করে মায়ামোহ দিয়ে নৈরাশ্রা লাভ করতে গেলে সদগুরুর বুদ্ধিতে এ কার কথা বোঝা যায়।

বিলুপ্ত বাকি চার পংক্তির তিস্ততি অনুবাদ অনুসরণে গদ্যে রূপান্তর

মাংসহীন হলেও নিজের দেহের বিনাশ নেই। মাল্যদান করতে কালাকাল আসছে। মায়াজাল নেই, শিকলও নেই অথচ হরিণটাকে ধরতে যায়। মায়াহরিণ চঞ্চল, ছুটে শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

সমীক্ষা

এই চর্যাপদের প্রথম ছয় পংক্তি পাওয়া গেছে, পরবর্তী চার পংক্তির যে অনুবাদ পাওয়া গেছে (টীকাবিহীন) তা থেকে সম্পূর্ণ কবিতার একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সাজানো যায়। চর্যাকাররা পাঁচ জনের কথা বার বার বলেছেন, এ পর্যন্ত ১, ১৩, ১৪, ১৬, ৪৫, ৪৭ নং চর্যায় পঞ্চ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। দেহের এ পঞ্চস্পন্দকে বিনাশের জন্য সর্বত্র একই কথা বলা হয়েছে, তাই এখানেও তার ব্যত্যয় নেই। এই পঞ্চভূত দেহকে মলাশ্রিত করে, ইন্দ্রিয়াদি যোগে কামনা বাসনা দুঃখ যন্ত্রণা ছড়ায়, এ দেহকে মারতে পারলে অর্থাৎ তার পুনর্জন্ম রোধ করতে পারলে তার নির্বাণ লাভ হবে, মহাসুখে শূন্যে বিরাজ করবে। আর কোনও মায়ামোহ দুঃখ যন্ত্রণা নেই। ভুসুকু পা শিকারির বেশে এ দেহকে মারতে গেলেন নলিনীবনে বা সাধনক্ষেত্রে বা নৈরাশ্রা আশ্রয়ে, সেখানেই বধ্যভূমি প্রকৃত; কারণ মত্ত হস্তির মত হয়ে নৈরাশ্রার জন্য আসবমত্ত এবং তাকে আলিঙ্গন করতে পারলেই পাঁচজনকে অবোধে শিকার করে বধ করা যাবে, অবশ্য এর জন্য একাগ্রমনা হতেই হবে।

জীবন্ত থাকলেই সবাই ভাবে সকালবেলাতেই জীবন অর্থাৎ জীবনের আয়ু শেষ হয়ে যাবে তা আর মনে থাকে না। জীবন যেহেতু আছে অর্থাৎ জন্ম যেহেতু হয়েছে, মৃত্যু রাতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমায়, মৃত্যুর পর দেহ ঘুমিয়ে থাকে, আবার জন্ম হলে প্রভাত। হনন বিনে ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করল, মত্ত বীরের মত নৈরাত্মকে আকর্ষণ করতে পারল না, মায়াজাল ফেলে মায়া হরিণীকে যেভাবে শিকারে আবদ্ধ করে ঠিক তেমনি। সদগুরু কীভাবে, কাকে এবং কার কী কাহিনী জানিয়েছিলেন, সেই বোধি নিয়ে হরিণ শিকার করা হল অর্থাৎ দেহকে মারা হল।

মৃত্যু রজনীতেও পাঁচজনকে মারা হলে ভুসুকু মাংসহীন (মায়ামোহহীন) তার বিনাশ নেই। সে মাল্যদান করছে কাল এবং অকাল (শূন্যতা)কে। যেহেতু সেই ভুসুকু তাই তার চিন্তে মায়ামোহ নেই, মায়াহরিণের সঙ্গে সে শূন্যে মিলিয়ে গেল, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করল।

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু এখানে তন্ত্রের রূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি যে কবি এবং শৈল্পিক চেতনায় মানবিক রূপ অনুভূতি দিয়ে প্রকৃষ্ট আড়াল করেছেন সেটা ধরা পড়েছে। জীবন্তে ভেল বিহনি মএক রঅনি—জীবন হল প্রভাত, মৃত্যু হল রজনী; এ তো মানবিক সত্য, প্রভাতে কাজের শুরু, মৃত্যুতে সমাপ্তি, অর্থাৎ রাত হল মৃত্যুতে সমাপ্তি, অর্থাৎ রাত হল।

চর্যা-২৪ এবং ২৫

তিব্বতি অনুবাদ থেকে জানা যায় যে ২৪ নং চর্যা হচ্ছে কাহ্ন পা-এর, এ পদের রাগ ইন্দ্রজাল। এবং ২৫ নং চর্যার রচয়িতা তন্ত্রি পা। তিব্বতি অনুবাদ থেকে এ দুটি চর্যার একটি পাদরূপ ও বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু দেখা গেছে, অধিকাংশ চর্যার ক্ষেত্রে তিব্বতি অনুবাদ মূল চেতনার সহযোগী হয়ে ওঠেনি, অনেক স্থলে শব্দের উচ্চারণগত প্রভেদ এবং তাদের অর্থের ভারসাম্য হারিয়েছে। তাছাড়া এদের সঙ্গে টীকাও বিক্ষিপ্ত, অবশ্য ২৫ নং চর্যার শেষ চার পংক্তি (?) টীকা রয়েছে। তবু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় চর্যা ২৪ এবং ২৫ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখনও সৌভাগ্য বঞ্চিত রয়েছে। সে কারণে দুর্ভাগ্যবশত এখানে তারা আলোচনার বাইরে রইল। তবে অনেকে আশাবাদী যে একদিন হয়তো বা এ দুটি চর্যাপদ আপন স্বরূপে আমাদের কাছে হাজির হবে। শোনা যায় জাপানে চর্যাপদের অস্তিত্ব কিংবা জাপানি ভাষায় চর্যার অনুবাদ রয়েছে তা থেকে বা অন্য কোথা থেকে কোনও সুফলের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

[illegible]

m

১৬. মাংস ১৭. পাইস ১৮. ফল
১৯. এই ২০. জু ২১. বোলথি ২২. শান্তি ২৩. রে। ২৪. অগ্নি অশু। ২৫. অশু
২৬. সুনে আহরিউ। ২৭. দীসই। ২৮. বলাগ্ন।

১. শবরী, শাবরী। ২. আসুরে। ৩. অশুঁই অশুঁ। ৪. অশুঁ। ৫. নিরবর। ৬. তইসে।
৭. কিণ, সভাবিঅই। ৮. তুল। ৯. সুলে আহরিউ। ১০. পুন। ১১. অগ্নন চটারিউ।
১২. বাট। ১৩. দুই মার। ১৪. দীসই। ১৫. বলাগ্ন। ১৬. পইসই। ১৭. এথু।
১৮. জুগতি, জুগতী, জঅতি। ১৯. সঅঁ সম্বেঅন। ২০. বোলথী।

। १९. सअं सन्वेअन । २०. बो

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

তুলা ধুনে ধুনে আঁশ আঁশে ।
 আঁশ ধুনে ধুনে নিরবয়ব শেষে ॥
 তবু সেই হেতু পাওয়া যায় না ।
 শান্তি বলেন কেন সেরূপ ভাবনা ॥
 তুলা ধুনে ধুনে শূন্যকে আহা করলাম ।
 পুনরায় নিয়ে নিজের মধ্যে চটলাম ॥
 বহুল পথ দুই মার্গ দেখা যায় না ।
 শান্তি বলেন কেশাগ্র প্রবেশ পায় না ॥
 না কার্য না কারণ এ হল সে যুক্তি ।
 স্বসংবেদন কেবল তা, শান্তির উক্তি ॥

গদ্যে রূপান্তর

তুলা ধুনে আঁশ আঁশ পেঁজা হল, আঁশ ধুনে ধুনে নিরবয়ব করা হল। তার হেতু কিছু পাওয়া যায় না। শান্তি বলেন, সেরূপ আর ভাবনার দরকার কী? তুলা ধুনে ধুনে শূন্যে বিলীন করে দেওয়া হল, সে শূন্যতা পেয়ে সে নিঃশেষ হল। বহু পথ রয়েছে কিন্তু দুই পথ দেখা যায় না। শান্তি বলেন সে পথে কেশাগ্র প্রবেশ করে না। এর কার্যও নেই কারণও নেই তবে এটাই তার যুক্তি, এটা স্বসংবেদন, শান্তি বলেন।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

প্রকৃতি দোষ তুলা যোগ্য ত্রিলোক কায়বাক চিত্ত; তার অবয়ব পরমাণুপুঞ্জের পরমাণুভাব, তাকে ধুনে ধুনে বা ধুয়ে ধুয়ে নিরবয়ব করা হল, তথাপি হেতু কিছু পাওয়া যায় না। শান্তি পা বলছেন, ভাব আহরণ ভাবের কারুরূপ সে বিচারে প্রমাণ হল পানি যেমন শূন্যে বিলীন হয়, তেমনি প্রভাস্বর চিত্ত আত্মাগ্রহ ভাবঅভাব রূপে বাধিত নিজের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে শূন্যে গৃহীত হয়। অদ্বয় মার্গ দ্বিআকার দেখা যায় না। তাই শান্তি পা বলছেন কেশাগ্রজ্ঞান যেমন ধর্মে প্রবেশ সুদূরপর্যন্ত অথবা কেশাগ্রসন্ধি পরিদৃষ্ট নয় তেমনি। সিদ্ধাচার্য শান্তি পা কার্যকারণ রহিত পদ বিবৃত করে এর যুক্তি প্রমাণ প্রতিপন্ন সদগুরু প্রসাদ শ্রেষ্ঠ পদ স্বয়ং জ্ঞাত করালেন।

সমীক্ষা

এই কবিতায় আন্তরিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রূপকল্প ও শব্দ শিল্পের চমৎকারিত্ব রয়েছে। কবি শান্তি পা কায়বাকচিত্তকে তুলার রূপকে উপস্থাপন করেন, বহুল পথের বিভ্রান্তি থেকে সিদ্ধপথ ও একাগ্র চিত্তের এই পথ অবলোকন করেন, যাতে নির্বাণ নিশ্চিত হয়।

কায় বাকচিত্তকে কেশাগ্র থেকেও সূক্ষ্ম করে নিতে হবে সাধনার পথে, যেমন—ধুনুরি তুলো ধুনে ধুনতারাঘাতে, প্রতিঘাতে কার্পাস আঁশ তার সত্তা ছেড়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঁশে পরিণত হয়; পুনরায় তার ওপর তারাঘাত হলে সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিলীন হয়ে শূন্যে মিশে যায় ঠিক তেমনি আপন দেহকে নিরবয়ব করে ফেলতে হবে এবং এর হেতুও অবলুপ্ত করে দিতে হবে। কায় যে ভাবে ধারণ করা হয়েছিল তার কোনও একটি আঁশের হেতু দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পুনরায় হয়তো কায়া জন্মাভ করে ফেলতে পারে। তাই কেবল আঁশহীন ও একেবারে হেতুহীন করে দিতে হবে। সেজন্য সাধক শান্তি পা বলছেন, এই অস্তিত্বহীনতার জন্য বৃথা ভাবনা কেন? সব হেতু ও ভাবনাকেও তুলো ধুনো করে শূন্যে মিলিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ শূন্যকে আহা করানো হবে অথবা শূন্যতার ভেতর এমনভাবে মিশে যেতে হবে যেন তার অস্তিত্ব বলতে কিছু না থাকে। জল যেমন আকাশে উবে যায় তার অস্তিত্ব সমস্ত শূন্যে পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি মহাশূন্যতার ভেতর আঁশ একাকার হয়ে যাবে।

অস্তিত্বহীনতা বা শূন্যবাদ বহুল অথবা দুস্তর মার্গ, বহু পথের বিভ্রান্তিকর সমন্বয়। তাকে অতিক্রম করা খুব সহজ নয়, অথচ তাই সহজানন্দের মার্গ এক, এটার দ্বিতীয় আর কোনও পথ নেই। অন্যান্য পথে অনেক কিছুই হয়, আনাগোনা করতে হয়, দুঃখ যন্ত্রণা সহিতে হয়, কিন্তু এ পথে তার কোনও কিছু ভোগ করা সম্ভব নয়। কারণ এ শুধু বিলীন হবার পথ তাই কেশাগ্র; এ পথে প্রবেশ করানোর উপায় নেই।

এর পরিণতি তাহলে কী? এর কার্যও নেই কারণও নেই; ভূত ও ভবিষ্যৎও নেই, এমন কী বর্তমানও নেই। যে আঁশ থেকে নিরবয়ব হয়ে গেল, সমস্ত কালকালের অধীন থেকে মুক্তি পেল। বিশুদ্ধ আনন্দের শূন্যতায় একেবারে মিশে গেল। তাই শান্তি পা নির্বাণের জন্য এ যুক্তিই পছন্দ করেন, আর কোনও মুক্তি নেই; আর কোনও ভাবে মুক্তিও নেই; তাহলে এটা জানবে কে? কেউ জানবে না, এটা হল স্বয়ংবেদন তা নিজ থেকে জানা এবং চেতনার অভিক্ষেপ। স্বয়ংবেদন কখনো আধ্যাত্মিক ধারণা হল—এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ বাতাস মাটি জল এর সবকিছু রয়েছে আমার চেতনার ভেতর। আমি এখানে আছি অথবা বিলীন হয়ে আছি, কিন্তু বিশ্বের অপর প্রান্তে কোথাও যদি একটি পিনের পতনও হয় তা আমার সংবেদনের বাইরে নয়।

প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন কিংবা অবাস্তব হলেও এখানে উল্লেখ্য যে, জার্মান পণ্ডিত ভন হামার এই বৌদ্ধচেতনা বা শূন্যবাদ থেকে সুফীবাদের সৃষ্টি বা সমন্বয় বলেছেন। এ কবিতায় দেহ যেমন বিশাল শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেল, ঠিক তেমনি সুফীদের আত্মা থেকে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়ার চিন্তা এই শূন্যবাদেরই প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে। সুফীরা ফানা ও বাকা তত্ত্ব ও সাধনার ভেতর দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন করেন, যেমন ওমর খৈয়াম বলেছেন,

কাতরা বগরিস্ত কেহ আয বহর জুদায়েম হামা
বহর তর কাতরা বখন্দিত কেহ কায়েম হামা
আয হাকিকত দিগরেনিস্ত খোদায়েম হামা
লায়েক আয গরদেশই য্যাক নোকতা জুদায়েম হামা

অর্থাৎ, বিন্দুজল কেঁদে বলল, হায়! আমি সিঁদু হতে বুঝি পৃথক হয়ে গেলাম। আমার কী নিস্তার নেই? সিঁদু হেসে বলল, তুমি কোথায়? আমার বুকের ভেতর এস। আমিই জগৎব্যাপি জল, আমিই কারণ, আমিই খোদা, আমিই সত্য, আমি সর্বত্র, আমার থেকে আলাদা কেউ নই।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্ধাচার্য শান্তি পা কবি লক্ষ্য করেছেন তুলো ধুনার সময় তা আঁশে পরিণত হয়, আর সে আঁশগুলোকে নাটাই ঘুরিয়ে সুতো তৈরি করা হয়। মসলিন যারা তৈরি করত তাদের ধুনুরি তার, নাটাই কিংবা অন্যান্য যন্ত্রসামগ্রী ছিল অতি সূক্ষ্ম, আঁশ যতটা নিরবয়ব বা ফিনফিনে হয় সে দিকে লক্ষ্য ছিল। সর্বোপরি সুদৃশ্য হাতের সূক্ষ্মতাই আসল কথা, ওটাই সাধনা। বলা আছে, একটা আংটির ভেতর দিয়ে যায় এমন এক প্রস্থ মসলিন ইংল্যান্ডের রানিকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সে কারণে বাঙালি মসলিন শিল্পীদের হাতের বড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া হয়েছিল।

ডেস্ক পা

[illegible]

অধরাতি^১ ভর কমল বিকসউ ।
 বতিস জোইনী তসুঅঙ্গ উহসসিউ^২ ॥ ৫৫ ॥
 চালিউ^৩ সসহর^৪ মাগে^৫ অবধুই ।
 রঅণহু মহজে কহেই^৬ ॥ ৫৬ ॥
 চাইলঅ সসহর^৭ গউ নিবাণে^৮ ।
 কমলিনি কমল বহই পণালৈ ॥ ৫৭ ॥
 বিরামানন্দ বিলক্ষণ সুধ^৯ ।
 জো এথু বুঝই^{১০} সো এথু বুধ^{১১} ॥ ৫৮ ॥
 ভুলক ভণই মই বঝিঅ মেলৈ ।

সহজানন্দ মহাসুহ লীলোঃ ॥
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

পাঠান্তর

১. আধরাতি। ২. উল্লসিউ, উল্লসিউ। ৩. চালিউঅ, চালিউহ। ৪. ষষহর। ৫. মগগ।
 ৬. রঅণই সহজ কহেমি, রঅণ হ সহজে পহেই। ৭. ষষহর। ৮. নিব্বাণে। ৯. সুদ্ধ।
 ১০. বুজঝই। ১১. বুদ্ধ। ১২. লোলে।

শব্দার্থ ও টীকা

অধরাতি—অধরাতি, মুদ—‘অধরাতি চতুর্থীসন্ধ্যায়াং প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদানসময়ে’
 প্রজ্ঞাজ্ঞান অভিষেকদান অধরাতির চতুর্থীসন্ধ্যা সময়ে। অষ্ট প্রহরের রাত্রে চতুর্থ ভাগ।
 ভর—সম্পূর্ণ, ভরা, রাতভর। কমল—পদ্ম, মুদ—‘বজ্রসূর্যরশ্মিনা কমলং উধ্বীষকমল’।
 বতিস জোইনী—বত্রিশ যোগিনী, মুদ—‘দ্বাত্রিংশ যোগিনীতি দ্বাত্রিংশলাডিকা বোধিচিন্তবহা
 ললনা রসনা অবধূতী’। তসুঅঙ্গ—তাহের অঙ্গ। উথ সিউ-উল্লসিত। চালিউ—চালিত হয়।
 সসহর—বোধিচিন্ত চন্দ্র। মার্গে অবধূই—অবধূতীর পথে। রঅনহ—রত্নের হেতু,
 মুদ—‘বজ্র শিখরপতঃ সদগুরুবচন তত্ত্ববরত্ব প্রভাবাৎ’। গউ—গেল। বহই—বহন করছে।
 পনালে—মৃণাল; খাল পদ্মাল>পনাল; প্রণালী>পলাল, বিরামানন্দ—বিশেষ আনন্দ,
 তন্ত্রযোগ মতে আনন্দের চার রূপ: প্রথমানন্দ, পরমনির্ভর, বিরামানন্দ এবং সহজানন্দ।
 মেলে—মিলনে। লীলে—লীলায়, অবলীলাক্রমে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

অধরাতভর কমল বিকশিত।
 বত্রিশ যোগিনী তাদের অঙ্গ উল্লসিত॥
 শশধর চালিত হল অবধূতী মার্গে।
 রত্নপ্রভাব হেতু সহজ বচনার্থে॥
 শশধর এভাবে গেল নির্বাণে।
 কমলিনী কমল বহে মৃণালে॥
 বিরামানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ।
 যিনি এ কথা বোঝেন তিনিই বুদ্ধ॥
 ভুসুকু বলেন, আমি বুঝি মিলনে।
 সহজানন্দ মহাসুখ লীলায়নে॥

গদ্যে রূপান্তর

আধা রাতভরে কমল বিকশিত হল। বত্রিশ যোগিনী তাদের অঙ্গ সঞ্চালন করে
 উল্লাস করল। অবধূতী মার্গে শশধর চালিত হল, রত্নপ্রভাবে সহজ আনন্দ ব্যক্ত হয়।
 শশধর এভাবে চালিত হয়ে নির্বাণে চলে গেল যেমন করে কমলিনী কমল পদ্মালে
 প্রবাহিত বা প্রোথিত হল। বিরামানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ, যিনি একথা বোঝেন তিনিই প্রকৃত
 বুদ্ধ বা বোধিচিন্ত। ভুসুকু বলেন, মিলনের দ্বারা সহজানন্দ স্বরূপ মহাসুখ অবলীলায় পেয়ে
 যাই।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

অর্ধরাতের চতুর্থী সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাজ্ঞান অভিষেকদান সময়ে বজ্র সূর্যরশ্মি সম কলমউষ্মীষ কমল বিকশিত, সে সময়ে বত্রিশ যোগিনী তথা বত্রিশ নাড়ি-বোধিচিহ্নবাহী ললনা রসনা অবধূতী অভেদ সূক্ষ্মরূপে প্রবাহিত। সে সময় সেহেতু বোধিচিহ্ন চন্দ্র অবধূতীমার্গে বজ্র শিখর সদগুরু বচন রত্ন প্রভাবে সহজানন্দ ব্যক্ত করে। বোধিচিহ্ন অবধূতী মার্গে চালিত বজ্র শিখরাগ্নে প্রভাস্বর নির্বাণ। কমলরস মহাসুখ কমলিনী প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবধূতী নৈরাশ্রা যেরূপ কমলরস সেরূপ বোধিচিহ্ন মহাসুখ, তা বিলক্ষণ চতুর্থানন্দ শুদ্ধ বিরামানন্দ বত্রিশ লক্ষণযুক্ত ব্যঞ্জন স্নিগ্ধকর। ভুসুকু পা বলছেন, প্রজ্ঞোপায় মিলনে সহজানন্দ মহাসুখ সদগুরু প্রসাদ লীলায় আমি অবগত।

সমীক্ষা

এই চর্যাও দেখা যাচ্ছে, কমল যোগিনী, শশধর, সহজানন্দ মহাসুখ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও রূপক ভাবানুশদের ব্যঞ্জন রয়েছে, এই দুর্ভেদ্য অথবা মার্গীয় তত্ত্ব অনুভূতির ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। তাই এই রূপক অনুভূতির চাবি দিয়ে এই কবিতার ব্যাখ্যা খোলা সম্ভব। তুলনামূলকভাবে এখানে বরং সহজতর উপায়ে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তথ্যটা হচ্ছে নির্বাণ লাভের উপায় ও কৌশল। নির্বাণ লাভের মার্গ এবং প্রাসঙ্গিক সূক্ষ্ম কৌশল বিষয়ে যথেষ্ট সমাধান দেওয়া হয়েছে।

বৌদ্ধতাত্ত্বিক পরিভাষায় ব্যবহৃত বিষয়াদির ব্যাখ্যায় দেখা যায় অর্ধরাতে বা মধ্য রাতের তত্ত্ব এই টীকায়—‘অর্ধরাত্রৌ চতুর্থী সন্ধ্যায়াং প্রজ্ঞাজ্ঞানাবিষেক দান কাল,’ অষ্ট প্রহর রাতের মধ্যভাগের আগের সমষ্টি অর্থাৎ রাত বারটার আগের চতুর্থাংশ। বৌদ্ধ নিয়মে মধ্যদিবা এবং মধ্যরাত্রির সীমানা তাৎপর্য রয়েছে। শ্রমণরা মধ্যদিবার পর আর আহাৰ্য গ্রহণ করেন না। তেমনি মধ্যরাত্রির আগে ‘চতুর্থী সন্ধ্যায়’ প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভিষেক দান কিংবা প্রজ্ঞাজ্ঞান ধ্যান সমাপ্ত করেন। তাই এই চর্যায় যে কমলের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে তা বিকশিত হয় এই সময় অর্থাৎ কমলরূপ প্রজ্ঞাজ্ঞান বিকশিত হয় মধ্যরাতের চতুর্থী সন্ধ্যায়। তার সঙ্গে উপমা বা সমন্বয় করা হল বত্রিশ যোগিনী ও বত্রিশ নাড়ির, এ জ্ঞান বিকশিত হওয়ার রূপ হচ্ছে বত্রিশ যোগিনীর অঙ্গ উল্লসিত হওয়ার মত। দেহস্থ নাড়িকেই বত্রিশ যোগিনী বলা হচ্ছে। দেহের চারচক্রের আটটি কমলিনী, শশী মিহির রূপ ললনা রসনা অবধূতী (ইড়া পিঙ্গলা সুষমা) আদি, টীকায়—‘বিদ্যাসালা বিলাসা মুনিসমসি লসন্তুরূপ সুমূক্ষ’—দেহের এই বত্রিশ যোগিনী একত্রে প্রকম্পিত হয়ে উল্লসিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

অবধূতী মার্গ হল যেহেতু মধ্যপথ (মাঝবেণী, উজ্জ্বাট), যা দেহ মেরুর বামে ও দক্ষিণের নাড়ি, তাতে বায়ু প্রবাহিত হলে চিত্ত চঞ্চল হবে না। তার বাইরে বা আঁকাবাঁকা পথে বায়ু চালিত করলে চিত্তচাঞ্চল্য হয়। সে অবধূতী মার্গ চন্দ্ররূপ বীৰ্য চালিত হয় রত্নপ্রভাবে। রত্ন হল সদগুরু উপদেশরত্ন, তাহলেই সহজানন্দ দ্বারা দেহ চালিত হবে। শশধর চালিত দেহ অবশ্যই নির্বাণে আরোপিত হবে। নির্বাণের যে মার্গ তাকেও কমল ফোটান মার্গ বলা হয়েছে। কমলমার্গ চুয়ে পদ্মলাল বেয়ে জলাধার (মূলধার) থেকে শূন্যে বিকশিত হয় অর্থাৎ জলাশয়ে কমল যেভাবে ফোটে ঠিক তেমনি দেহ ও চিত্ত থেকে বোধিচিহ্ন শূন্যে ফুটিয়ে দিতে হবে। এভাবে বিকশিত হওয়াকে বলে বিরাম আনন্দ।

পাঠান্তর

১. বল্লাভী, বরাটি। ২. উঁচা উঁচা, উচা উচা। ৩. মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিহিল, মোরগ পিচ্ছ পরিহান। ৪. গুহাড়া। ৫. তোহৌরী। ৬. সুন্দরী। ৭. মৌলীল। ৮. ডালি। ৯. মহাসুখে। ১০. ভূঅঙ্গ। ১১. পেমহ, পেশ্ব। ১২. হিএ। ১৩. বাণে, গুরুবাক পুঞ্জিআ ধণু নিঅ মণ বাণে। ১৪. বিন্ধু, বিন্ধউ, বিন্ধঅ বিন্ধঅ বিন্ধঅ। ১৫. গিবানে, একে সব সন্ধানে বিন্ধু পরম নিবানে। ১৬. সঙ্কী পইসন্তে সবরো লড়িব কইসে।

শব্দার্থ ও টীকা

বল্লাভী—এই নামে শাস্ত্রে কোনও রাগ নেই, হয় বরাডি, নয়তো বরাটি, হয়তো তা লিপিকর প্রমাদ। পাবত—পর্বত, সুমেরু শিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে। বসই—বাস করে। সবরীবালী—ব্যাধ বালিকা, কিরাত কন্যা, প্রাচীন বর্ণবিন্যাসে শাস্ত্রে বর্ণিত যে, পূর্বাঞ্চলে কিরাত বা শবর জাতি বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। তাদের পেশা শিকার। বাল—বালক; বালী—বালিকা; জ্ঞান মুদ্রা নৈরাখ্য। মোরঙ্গ>মোরগ, মৌর (ময়ূর), প্রাচীন বাংলার; মোরগ ময়ূর প্রজাতির পাখি, যাদের পুরুষ পাখিদের লেজের পুচ্ছে বিচিত্র রঙের পালক ও পেখম সজ্জিত। পীচ্ছ—পুচ্ছ। পরহিন—পরিহিত, পরাণ। মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ—মোরগ পুচ্ছ পরিহিত, মুদ—‘ময়ূরাস্ত্র নানা বিচিত্র পক্ষবিকল্প রূপং স্বরূপেনাধিবাসাতয়া পরিধান মলংকারংকৃত’। বিজিত>গলায়, গ্রীবা—শবর—শবরী ময়ূর পুচ্ছ, গুঁজে কণ্ঠে গুঞ্জাফুলের মালা পরিধান করে, মুদ—‘গুঞ্জতি গ্রীবায়াং সংভোগচক্রে গুহ্যমন্ত্রমাবিকেটিপ বিধৃতা’। উমত—উম্মত, উন্মত্ত বিষয় বিহ্বল। মা কর—কারো না। গুলী—গোলমাল। গুহাড়া—শুধুমালি; প্রাজ্ঞোপায় মিলনে আনন্দের বিকল্প। তোহৌরী—তোমার। নিঅ ঘরণী—নিজ গৃহিণী। সহজ সুন্দরী—সহজ আনন্দরূপ সুন্দরী। মৌলিল—মুকুলিত। গঅণত—গগনে। ডালী—ডালসমূহ; দারু>ডাল। একেলী শবরী—একলা শবর বালিকা; বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদকেও লিঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে; ‘বড়ায়ি চলিলি’—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। হিওই—ঘুরে বেড়ায়, টোঁড়ে। কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী—কর্ণে কুণ্ডলি বা বালি ধারণকারী বজ্রধর; মুদ—‘কর্ণেতি নানাস্থানে কুণ্ডলাদি পঞ্চমুদ্রানিরংগকালং’, পঞ্চমুদ্রা ইন্দ্রিয় শক্তিরূপ বজ্রজ্ঞান। তিঅ ধাউ খাউ—তিন ধাতুর ধাট, সেজি-সেজ, শয্যা>সেজ। ছাইলী—বিছানো। খাট... ছাইলী, মুদ—‘কায় বাক চিত্তং সুখ প্রভাস্বরেতং টানায়িত্বা তেন মহাসুখেন শয্যা, ভূজঙ্গ—সাপ, ভূ উপরি যে অঙ্গ বিছিয়ে রাখে বা চলে; বাহুর মত যার অঙ্গ, কিন্তু যে ভূজ দিয়ে অঙ্গ জড়িয়ে রাখে—দয়িতা, চিত্তবজ্রভূজঙ্গ অর্থে। গইরামণি—নির্বাণ রূপ মণি, নিরামণি। দারী—স্ত্রী, মুদ—‘ক্রেশান দারয়তীতি দারিয়া নৈরাখ্য দারিকায়া’। পেশ্বা—প্রেম। হিঅ-হৃদয়, হিয়া। তাঁবোলা—তাম্বুল, পানগুয়া, পান পাতার রূপ হৃদয়, এই লগো হয়তো তৎকালেও কবির কল্পনা করেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ, হৃদপিণ্ডের পূর্ণ অবয়ব সন্ধান তাঁরা পেয়ে থাকেন—পেতেও পারেন, শিল্পী মাইকেলঞ্জেলো কবরখানায় ঢুকে গোপনে মৃতদেহ চিরে চিরে মাংসপেশী কিংবা সম্পূর্ণ শারীরিক গঠন রূপ পেয়ে চিত্র এঁকেছেন। তান্ত্রিকরা কি শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন তা জানা যায় না। কাপূর—কর্পূর, পানের সঙ্গে মিশ্রিত সুগন্ধি। বিঅ... কাপূর খাই—মুদ—‘হৃদয়ং প্রভাস্বরং দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাংবুলেকাধিসুখচা কপূরং যুগনদ্ধ রূপে ফলহেতু সম্বন্ধেন'। গুরুবাক—গুরুবাক্য।
 পুষ্পআ—ধনুক। বিবাহ—বেঁধা, বিধ। নিঅমন—নির্গমন। গুরুআ—গুরুতর, প্রবল।
 গিবিবর সিহর—গিরিশিখর। সন্ধি রন্ধে—ফাঁকে। পইসন্তে—প্রবেশ কর। লোড়ির—
 সন্ধান।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

উঁচু উঁচু পর্বত তাতে বাস করে শবরী বালিকা।
 ময়ূর পুচ্ছ পরা শবরী গলায় গুঞ্জার মালিকা॥
 উন্মত্ত শবর পাগল শবর কর না গোল দোহাই তোর।
 নিজ ঘরনী নামে সহজ সুন্দরী (ও হল ওর)॥
 নানা তরুণের মুকুলিত গগনে লাগে ডাল (তারি)।
 একেলা শবরী এ বন ভ্রমে কর্ণেকুণ্ডল বজ্রধারী॥
 ত্রিধাতু খাট পাতল শবর মহাসুখ শেজ বিছাল।
 শবর প্রেমিক নৈরাশ্রী স্ত্রী প্রেমে রাত পোহাল।
 হিয়া তাণ্ডুল মহাসুখে কর্পূর (যোগে) ধারি।
 শূন্য নিরামণি কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত পোহায়।
 গুরুবাক্য ধনুকে বিধ নিজ মনে (ছুড়ে) বাণ।
 এক শরসন্ধানের বিধ বিধ দ্বিধ পরম নির্বাণ॥
 উন্মত্ত গুরুতর রোষে
 গিবিবর শিখর সন্ধিতে পশে, শবর লড়বে কিসে?॥

গদ্যে রূপান্তর

সুউচ্চ পর্বতমালা তাতে শবরী বালিকা বাস করে। শবরী ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে গলায় পরে গুঞ্জা ফুলের মালা। উন্মত্ত সরব, পাগল শবর গোলমাল কর না, সে তো তোমারই; নিজ ঘরনী নামে সহজ সুন্দরী। নানা শ্রেণীর তরুণরা ফুল পল্লবে মুকুলিত হয়েছে, গগন পর্যন্ত তাদের ডালগুলো লেগেছে। একেলা শবরী এ বনে ঘুরে বেড়ায় কর্ণে কুণ্ডল সে বজ্রধারী। তিন ধাতুর খাট পেতে শবর মহাসুখে শেজ বিছাল। শবর নাগর নিরামণি নাগরী সঙ্গে অস্পৃশ্য বলে লোকালয় হতে দূরে তাদের বাস করতে হয়, সেজন্য দুর্গম পর্বতশ্রেণীর ভেতর তারা বাস করে। (এই ভীষণ ভয়ঙ্কর জাতির ভেতর ভীষণ সুন্দরী নারী কল্পনা করা হয়েছে, যে নাকি সিদ্ধাচার্য শবর পা'র আরাধ্য)।

শবরী বালিকারা সাজগোজ করে তাদের প্রথা অনুযায়ী। ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করে, গুঞ্জা ফুলের মালা গলায় পরে শিকার উৎসবের সময় এমনি সাজে তারা নাচে। তাদের ঘরে শিকারে উন্মত্ত শবরবা পাগলের মত আনন্দ প্রকাশ করে নাচে। এ কবিতায় শবর পা অন্য প্রাণী শিকার করার জন্য আনন্দে পাগল হন নি, তিনি এমন অফুরন্ত সাজের উদ্ভিন্ন যৌবনা শবরী বালিকারূপী নির্বাণকে বা নৈরাশ্রকে লাভ করার জন্য উন্মত্ত পাগল হয়েছেন। জীবন ধরে শবররূপী সাধক হয়তো এমনই নারী অন্বেষণ করছেন আর এখন পেয়ে গেলেন উঁচু পর্বতের শিখরে উপত্যকায়। তাই দেখে তাঁর পূর্বসত্তা হারিয়ে গেল এবং তিনি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

হয়ে গেলেন শবর পা। শবর না হলে তো এ শবরী লাভ করতে পারবেন না। এ শবরীকে পেয়ে শবর পা এমন উন্মত্ত হয়েছেন যে তার কবিমন তাঁকে বলছে, পাগল শবর, গোলমাল করো না, শান্ত থাক। দৃঢ়চিত্ত হও, অবিচল হও। কারণ এ নারী শবরী বেশে নাচে বটে কিন্তু চঞ্চল চিত্তের নিকটই কেবল ধরা দেন না। তাই অনুরোধ করছে কেন গোলমাল করে মিলন আমার ভুল করছে সে, তাকে তো তুমি শবর পাবেই। লোকে বিবাহ করে যেমন আসর জমায় এবং কনেকে সাজিয়ে রাখে—তাই বর তো জানে এ কনে সে পাবেই। তেমনি এ শবরী তো সে কনে, কারণ তাঁকে পাবার জন্য শবর পা এ পর্বতে আরোহণ করেছেন, শিকারির পেশা অবলম্বন করেছেন, সে তো তাঁর নারী সহজসুন্দরী, তার প্রেমিকা, কারণ তিনি ভুজ দিয়ে তাঁর অঙ্গকে বেষ্টন করেন বলে তিনি ভুজঙ্গ আর শবরীরূপী নৈরাশ্রা হলেন তার স্ত্রী, তার সঙ্গে মিলে তিনি বিলীন হবেন।

এই মিলনের সময় নানাশ্রেণীর তরুরাজি মুকুলিত, অবশ্য এ তরুর হল দেহের নানারূপ দৃশ্য; আকাশে গিয়ে ঠেকেছে তরুদের পত্রপল্লব, যদিও তাদের এ সাজ ইন্দ্রিয় বা পঞ্চস্পন্দ বা পঞ্চবায়ু—প্রাণ অপ্রাণ সমান উদান ধ্যান বুদ্ধি ও মন ইত্যাদি নানা পত্রপল্লবে আকাশ আচ্ছন্ন, ডালগুলো গগনে ছাইয়ে গিয়েছে। নৈরাশ্রা একাকি এ বনে ক্রীড়া করছেন তার কর্ণে কুণ্ডলি বজ্রশিখ্যুক্ত সংবিদ এতই প্রবল যে তিনি ধরা নাও দিতে পারেন, তবে দোহাই যে মিলন কালে যেন কোনও গোল না করেন।

তিন ধাতুর ঘাট কায় বাকচিহ্ন দিয়ে উন্মত্ত মহাসুখ শয্যা রচিত হয়েছে। কনে শবরীকে নিয়ে তিনি এ খাটে শোবেন, একমুহুরে হবে দু'জনের মিলন। শবরী প্রেমে মত্ত হয়ে সারারাত কাটিয়ে দেবেন। রাত কাটিয়ে দেওয়া যায় না, বৌদ্ধ নিয়মে রাত হল প্রজ্ঞাজ্ঞান বা বিভিন্ন জ্ঞান অভিমুখ সময়। সবাই যখন তন্দ্রায় মগ্ন জ্ঞান সেখানে উগ্ধ, শবর তখন প্রেমে উন্মত্ত, তিনি জাগরিত; আনন্দের নিমন্ত্রণে তিনি রাতকে দীর্ঘ করেন। এই আনন্দ সময়ে হৃদয় প্রভাস্বর তান্বল কর্পূর সহযোগে শবরী লাভের উৎসবকে উজ্জ্বল করছেন। তার পর তাকে কণ্ঠলগ্ন করে সারারাত অতিবাহিত করেছেন। মিলন হল রাত, অর্থাৎ শবর নির্বাণকে চির রাতের জন্য কণ্ঠলগ্ন করেছেন।

এই অসাধন সিদ্ধ করতে হলে অর্থাৎ শবর হয়ে দুরন্ত শবরী লাভ করা সম্ভব একমাত্র সদগুরু বচন প্রসাদ দিয়ে, গুরুবাক্য অব্যর্থ, দেহ ধনুকে বাণ যোজনা করে নিজ মনে একবারে বিদ্ধ করতে হবে। গুরু ধনু তুলে দিয়ে বাণ নিক্ষেপ করতে লক্ষ্য ভেদ করতে পারঙ্গম করে দিয়েছেন, আর নির্দেশ দেন বিধি বিধি বিধি, এ যেন সেনাপতি। প্রেমে রাত পোহাল, হিয়া তান্বল মহাসুখে কর্পূর সহযোগে খায়। শূন্য নিরামণিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত পোহায়। গুরুবাক্য-রূপ-ধনুকের বাণে বিদ্ধ কর নিজ মন। একমাত্র শরসন্ধানে বিদ্ধ কর পরম নির্বাণকে। উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে, গিরিশিখর সন্ধিতে পশে শবর লড়বে কিসে?

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

যোগীর স্বকায় কঙ্কাল দণ্ড সমুন্নত সুমেরু শিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে সকার পরোপকার পরিধিতে তাঁর পৃথিবী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাশ্রা অংকারজা বাস করেন। নানা বিচিত্র পক্ষ বিকল্পরূপ স্বরূপে অধিবাস অলংকার পরিধান করেন যা গুরুশ্রীবাণ সন্তোষচক্রে মহামন্ত্রে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

বিধৃত। নৈরাশ্রা ভাবকায়ান্বাস দান করে বলছেন, হে উন্মত্ত বিহ্বল চিত্ত শবর প্রাজ্ঞোপায় মিলনে গোলমাল আনন্দ বিকল্প কম্প করো না, আমি তোমার গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা সহজ সুন্দরী। এই কায়াসুমেষ্টির তরুণবর অবিদ্যা রূপ আনন্দাদি নিজ রূপ আমন্ত্রণে নানা প্রকার মুকুলিত হয়েছে। তার ডাল পঞ্চ স্কন্ধ গগনে প্রভাস্বরে লগ্ন অতএব সেই নৈরাশ্রা একাকিনী, কর্ণের নানা স্থানে কুণ্ডলাদি পঞ্চমুদ্রা নিরংসুকে অলংকার করা হয়েছে। বজ্রোপায় জ্ঞান বিধৃত যুগন্দররূপে এই কায়াপর্বতে ঘুরে ক্রীড়া করছেন। ত্রিধাতু কায় বাক চিত্ত সুখ প্রভাস্বর টানিয়ে মহাসুখ শয্যা রচনা করা হয়েছে শবর চিত্ত ভূজঙ্গসহ ক্রেশদায়িনী নায়িকা স্বীকায়া, প্রেম ক্রীড়ারস অনুপম দ্বারা রজনী দীর্ঘ করে। অন্ধকার প্রাজ্ঞোপায় বিকল্প নাশ করে। হৃদয় প্রভাস্বর তাম্বুল কর্পূর যুগন্দররূপে অধিমুক্ত। শূন্যতা নৈরাশ্রা জ্ঞান যোগিনী মহাসুখ জ্ঞান রশ্মির রজনীতে কণ্ঠে সম্মোগচক্রে বিধৃত। স্বকায় ক্রেশ স্বয়ং নাশ হল। সদগুরু বাক্যের ধনুকৃত নিজ মন বোধিচিত্ত বাণ একশয় নির্দোষে নির্বাণময়। বিদ্যা বাসনাদোষকে হত করা হল। সহজপান উন্মত্ত চিত্ত বজ্র শবর গুরুতর রোষে জ্ঞানানন্দ গন্ধে প্রেরিত মহাসুখ চক্র নলিনীবন উদ্দেশ্যে চালিত হল। গিবিবর সন্ধিতে নিমগ্নমায়া, সিদ্ধাচার্য শবর পা কোথায় অন্ত্রেষণ করবেন।

সমীক্ষা

উঁচু উঁচু পর্বতে লোকান্তরালে শবরী বালিকা বাস করেন। কে এ শবরী বালিকা? তিনি কবির সাধনের ধন। তিনি তাঁর জীবনের পূর্ণ আকর্ষণ। বজ্রচার্যরা তাকে নানাভাবে দেখতে পান। কেউ দেখেন ডোম্বী হিসেবে, কেউ চাণালী-কামচণালি, কেউ ইন্দ্রজাল-যোগিনী, হরিণী, করী-এ সবই সহজ সুন্দরী-নিরামগি-নির্বাণরূপিণী নারী হিসেবে। প্রকৃত পক্ষে নির্বাণই লক্ষ্য, সেটাই উদ্দেশ্য। নির্বাণ লাভে উজ্জুপথ বা সোজা পথে, পদ্মনালের ভেতর দিয়ে, সাঁকোর কঠিন পথ অতিক্রম করে, ভবনদী গম্বীর ও বিষ্ণুধ্বজ তরঙ্গ সংকুল তরিয়ে তাকে লাভ করতে হয়। সিদ্ধাচার্য শবর পা তাঁকে অন্ত্রেষণ করেন সুউচ্চ পর্বত-শ্রেণীর ওপরে, সেখানে তিনি কিরাত কন্যা বা শবর বালিকা হিসেবে বাস করছেন। মনে হয় সিদ্ধাচার্য শবর পা আগে শবর ছিলেন না বা তাঁর নামও শবর ছিল না। হয়তো বা তিনি তাঁকে লাভ করার জন্য এ নাম নিয়েছেন এবং এই শবর হয়েছেন। পুরাণোক্ত গ্রন্থাদিতে কিরাত বা শবরশ্রেণীর লোকদের উল্লেখ রয়েছে; তারা হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াই করে, পশু ও পাখি শিকার করে তাদের মাংস খায় কিংবা তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা ভীরু ধনুক কিংবা এ জাতীয় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার করে যাতে দূর থেকে হিংস্র প্রাণী কিংবা শিকার উপযোগী পশু পাখি ঘায়েল করতে পারে। তারা হিংস্র বলে সাধারণ লোক তাদের ঘৃণা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে ‘ফায়ার ফায়ার ফায়ার’ আদেশ করছেন সেনাপতি তার অনুগত সুশিক্ষিত বাহিনীকে। এই সেনাপতিরূপী গুরুবাক্যবাণে নিজ মন, ফলে বোধিচিত্ত অনিবার্য। ঠিক এই মুহূর্তে শবরের শরীর কিংবা রোষ আক্রান্ত শারীরিক প্রতিচ্ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি জয়ী হবেন কিনা। শত্রু নিধন যজ্ঞে ক্ষিপ্ত সৈনিক যখন অস্ত্র নিক্ষেপ করে শত্রুকে কাবু করে তখন তার কী চেহারা থাকে? পৃথিবীর আর কিছু তার সামনে দৃশ্যমান থাকে না, কেবল শত্রু। তেমনি গুরুতর রোষে ক্ষিপ্ত শবরের সামনে আর কিছু নেই, কেবল নির্বাণ। আর এ বোধ আক্রান্ত শবর গিরি শিখরের সন্ধিতে মগ্নমায়া কী আর অন্ত্রেষণ করেন?

এ কবিতায় বিভিন্ন রূপকল্পের অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে এবং তাদের অর্থের শৃঙ্খলা ও সহজ উপলব্ধির সুযোগও রয়েছে। কাব্যিক গুণাবলীর সমস্ত প্রকাশের চিন্তারও সমাবেশ ঘটেছে। ভাব ও ব্যঞ্জনার মিলন হয়েছে। উঁচু উঁচু পর্বতশ্রেণীর উন্মেষের ভেতর স্বর্গলোকের কিংবা প্রাচীন গ্রিকের অলিম্পাস ধামের অনুভূতি লেগেছে। সাধারণত দেবলোক হিমালয় এবং হিমালয়ের কিরাত শ্রেণীর লোকদের জীবন আদর্শ এখানে কাব্যিক কৌশলে অঙ্কিত হয়েছে, মনে হয় শবর পা হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বত গিয়েছিলেন, অথবা অন্যান্য দেশে পরিব্রাজক হিসেবে ভ্রমণকালে পর্বত আরোহণ কিংবা পর্বত অধিকায় আশ্রিত লোকদের লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি এখানে তা কাব্য কৌশলে অঙ্কিত করেছেন। তিনি কিরাতদের জীবন দেখেছেন এবং তাদের শিকার কৌশলও লক্ষ্য করেছেন, গুরু বাক্যরূপ বাণ নিষ্ক্ষেপ, অবশেষে পর্বতশিখর দেশের সন্ধিস্থলে শিকারের অন্বেষণ রাখা সবকিছু মিলে কবিতার সর্বপ্রকার ভাব সাজু্য রক্ষিত হয়েছে।

এ কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হল এর 'ছন্দ ও রচনাইশলী'। একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব আগাগোড়া ভাবমিলন সাজিয়ে রেখে শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বনির নির্ঘোষ নিয়ম রক্ষা করা, অন্যান্য চর্যার চাইতে এখানে একটু ব্যতিক্রম। কোন দুর্বোধ্য শব্দ বা ভাব নেই, সাক্ষ্য ভাষার প্রভাব নেই, যে টীকাকার সাক্ষ্য ভাষার কথা বলেছেন তিনিও এ কবিতার ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করেন নি বরং 'মহাকরণরূপবিশুদ্ধ লোকার্থায় প্রতিপাদয়াতি' বলে উল্লেখ করেছেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এ কবিতায় প্রাচীন বাংলা ভাষার খাঁটি প্রভাব, সে কারণে একজন হিন্দি ভাষী পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন এ চর্যার একটি বিকল্প পাঠ সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রমাণ করা যায় চর্যাপদ প্রাচীন হিন্দি ভাষাতে লিখিত।



শবর পা

এ কবিতার কোনও ভণিতা নেই, তাই শবর উল্লেখ থেকে শবর পা রচিত ধরা হয়েছে, তবে টীকায় উল্লেখ রয়েছে, 'শবর পাদোহি সিদ্ধাচার্য'। শবর পা ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) বর্তমান ছিলেন, তিনি বিক্রশিলাবাসী ছিলেন। তার রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে, যার ভেতর 'সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান', 'চিত্তগুহ্য গাঙ্গীর্ষ গীতি', 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি', 'শূন্যতা ছবি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চর্যা-২৯

রাগ পটমঞ্জরী

লুই পা

এই পাঠ্যে একটি সম্ভাব্য ভুল সংশোধন করা হয়েছে। মূল পাঠ্যে 'লুই ভণই বট' বাক্যটি 'লুই ভণই বট' হিসেবে ভুলভাবে প্রিন্ট করা হয়েছে। এখানে 'লুই ভণই বট' বাক্যটি 'লুই ভণই বট' হিসেবে সংশোধন করা হয়েছে।

ভাব না হোই অভাব গ জাই।

আইস সংবোহে^১ কো পতিআই^২ ॥ ধ্রু ॥লুই ভণই বট^৩ দুলকথ^৪ বিণাণা^৫তিঅ ধাত বিলসই উহ গা^৬ ॥ ধ্রু ॥কাহের বাণ চিহ্ন রূব গ জানী^৭।সো^৮ কইসে আগম বেদ^৯ বখানী ॥ ধ্রু ॥কাহেরে কিসভণি^{১০} অই^{১১} দিবি পিরিচ্ছা^{১২}।উদক চান্দ জিম সাচ গ মিচ্ছা^{১৩}।।লুই ভণই মই ভাইব কীষ^{১৪}।জা লই^{১৫} অচ্ছম তাহের^{১৬} উহ গ দিস^{১৭} ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর

১. সর্বোহে, আইস সংবোহে। ২. পতিআই। ৩. বট, বড়। ৪. জলখ, দুলকথ। ৫. বিগানা। ৬. উহ গ জানা। ৭. বনুচিহ্ন রূব গ জানী। ৮. তো। ৯. আগম বেদ। ১০. কিসভণি। ১১. অই। ১২. পিচ্ছা। ১৩. কীষ। ১৪. লেই, জা লেই আচ্ছম তাহের উহ গ দীষ। ১৫. অচ্ছমতাহের। ১৬. দীস।

শব্দার্থ ও টীকা

ভাব—কীভাব স্বরণে আসে। অভাব—অসংরূপ ভাব গ হোই, মুদ—যস্মাৎ পিণ্ড গ্রহানুভেদে বিচারেণ ভাবস্যোপলব্ধে ন বিদ্যাতে। অভাব গ জাই—‘অভাবোপি ন ভবতি অসদ্রূপত্বাৎ।’ আইস—এমন। সংবোহে—সংবোধে, সংবেদ, চেতনায়। পতিআই—প্রত্যয় করে। বট—বড়। দুলকথ—দুর্লভ্য। বিণাণা—বিজ্ঞান, ক্রীড়া, কৌশল, মুদ—যস্মাত্ত্রৈধাতুকং কায়বাকচিৎ বিলসতি ক্রীড়তি—‘কায়বাকচিৎতোর বিলাস করার যন্ত্র কৌশল। তিধান—তিনধাতু কায়বাকচিৎ। বিলসতি—বিলাস করে। উহ—অনুমান।

জাহের—যার। বান—বর্ণ। আগম বেঐ—আগামবেদ; আগম গুরু শিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে শিষ্য যা অবগত হয়, অলিখিত শাস্ত্রবাক্য; বেদ-চতুর্বেদ, ঋক সামযজু অথর্ব। বখানী—ব্যাখ্যা। কিসভনি—কীভাবে বর্ণনা করি। পিরিচ্ছা—প্রশ্নের উত্তর (পরীক্ষার উত্তর)। উদক—জল পানি; উদকচান্দ—জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ। সাচ ণ মিচ্ছা—সত্য না মিথ্যা। জা লই অচ্ছম—যা নিয়ে আছি। তাহের—তাকে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

ভাব হয় না অভাব যায় না।
এমন সংবেদন কেউ প্রত্যয় করে না॥
লুই বলেন বড় দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান।
ত্রিধাতু বিলাস করে কিছু না জানান॥
যার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা নেই।
তাকে কিসে আগাম বেদ বাখানি দেই॥
কাকে কী বলে আমি প্রশ্নোত্তর দেব।
জলে পড়া চাঁদ যেমন সত্য না মিথ্যা নেই॥
লুই বলেন কিসে আমার ভাবনা।
যা নিয়ে আছি তার উদ্দেশ্য দূরী না॥

গদ্যে রূপান্তর

ভাব হয় না, আবার অভাব যায় না এমন সংবেদনা কে প্রত্যয় করে? লুই বলেন, বিজ্ঞান খুবই দুর্লক্ষ্য; ত্রিধাতুতে সেটা বিশ্লেষণ করা হয় তার উদ্দেশ্য কিছু জানা যায় না। যার বর্ণ চিহ্নরূপ জানা নেই তাকে কী করে আগম বেদ ব্যাখ্যা করে বোঝান যায়? কাকে কী বলে আমি প্রশ্নোত্তর রাখব? জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ যেমন সত্য না মিথ্যা? (সত্য মিথ্যা কোনোটাই নয়)। লুই বলেন, তাই আমার ভাবনা কিসের? যা নিয়ে আছি তার হৃদিস তো কিছু জানি না।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

কী ভাব শ্রুতিতে রয়েছে ভাব উপলক্ষ হয় না। অভাব কোনও অসংরূপ লাভ করে। এই সংবেদ কে প্রত্যয় করে? লুই বলেন, অতএব দুর্লক্ষ্য তত্ত্ব যোগীর লক্ষ্যে উৎপন্ন। যেমন মন্ত্রধাতু কায়বাকচিহ্নে বিলাস ক্রীড়া করে। তাঁর সৃষ্টভাব দীর্ঘহ্রস্ব পরিমণ্ডলের কোন দিকে কখন নিয়ত তা জানা যায় না। যে তত্ত্বের বর্ণচিহ্নরূপ অধিগম্য নয় তা কথায় নানা কাব্যে আগমশাস্ত্রে বেদব্যাখ্যাতত্ত্বে সম্ভব নয়। কার কিসে মুক্তি আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারি না। যেমন চাঁদকে জলে না সত্য না মিথ্যা দেখা যায়। তেমনি যোগীর ভাবগ্রাম প্রতিভাস কী অর্থে ব্যক্ত বলা অসাধ্য। লুই বলছেন, আমি ভাবভাবক ভাবনা অভাব কী করে ভাবব? অতএব যে চতুর্থ রূপ গৃহীত তাকে গুরুবচন বিচারে তদুদ্দেশ্যে দেখা যায় না।

সমীক্ষা

এই কবিতায় তত্ত্বজ্ঞান সমাচারে সমাকীর্ণ। কবি বলছেন যে ভাবে উপলভ্য হয় না, অভাবে যায় না, এমন সংবেদ বা সম্বন্ধ চেতনা কে প্রত্যয় করে? অর্থাৎ ভাবত্ব হয় না অভাবও হয় না, এমন দুই ব্যাপার জগতে কিছুতে নেই। সাধারণের ধারণায় ভাব এবং অভাব কী? সার্বিক অর্থে ভাব-জন্ম বা উৎপত্তি, অস্তিত্ব বা সত্তা। প্রীতি প্রণয়ও এর এক অর্থে হয়। আবার অভিপ্রায়, স্বভাব, মর্ম, চিন্তা ধ্যান কল্পনা ভক্তি আবেগ অনুভূতি ইত্যাদিও হয়। তাহলে চিন্তা যখন ভেতরে জাগরিত আছে চিন্তের এই ক্রিয়াকল্পও রয়েছে। তবে সিদ্ধাচার্য লুই পা তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক অর্থে এর অর্থ বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন, টীকাকার বলেছেন, ভাব হল 'ভাবস্বাবৎ তত্ত্বং' কিংবা 'ভাবস্যোপলব্ধম'। সে অর্থে চিন্তের চাঞ্চল্যকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়ে থাকে। আর অভাব অর্থে ভাবের বিপরীত যে অবস্থা, অনস্তিত্বকে বোঝায়, টীকায় অবশ্য অসংরূপকে অভাব বলা হয়েছে। সে যাই হোক, সাধারণ ধারণা যেটা অভাব সেটা অনটন না প্রাচুর্যহীনতা, এমন কী প্রয়োজনের অপূর্ণতাকে বোঝায়। তবে এটা সত্যি কথা যে দেহ ও চিন্তা নিয়েই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। দেহাধারে উদ্ভূত ভাব অভাব হয় না এমন সংবেদ কেউ প্রত্যয় করে না। তাই এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে কেউ সম্পূর্ণভাবে নিরুপা অথবা সম্পূর্ণ অভাব অসংরূপে আচ্ছন্ন তাই মানসিকতা ও তাত্ত্বিকবোধের এই সমন্বয় এটা কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু কবি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, এর পরই বলেছেন, হোমেরা যত তত্ত্বজ্ঞান উদ্ধার কর না কেন, এ বিজ্ঞান কিন্তু দুর্লভ। বোধিদ্রুম তলে তুষ্প্রসূত ধ্যান নিমগ্ন থেকে এ বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছেন; 'বোধি'-যা দিয়ে ইন্দ্রিয়াদি প্রশাসন, দুঃখ যন্ত্রণা জরা মৃত্যু থেকে মুক্তি এবং নির্বাণ লাভ হয় কবির বক্তব্যে সেটাই দুর্লভ।

তিন ধাতুর বিন্যাস বা কায়বাকচিন্তের বিলাস রয়েছে দেহে তাকে নির্মূল করার তত্ত্ব রয়েছে। লুই বলেছেন, যার বর্ণচিহ্ন রূপ কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না, যার বর্ণ চিহ্নরূপ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান নেই, কায়বাকচিন্তের পরিমণ্ডলে তাকে জ্ঞান দান করার উপায় নেই, তাকে আগাম বেদ ব্যাখ্যা কিংবা অন্য কোনও উপায়ে তাকে সে জ্ঞান দিতে পারা যাবে না। এই যখন অবস্থা তখন স্বভাবত কবি দুর্ভাবনাগ্রস্ত, চারদিকে ঘিরে আছে অজ্ঞান অনিয়ম, সত্য কী তা উদ্ধার করে কোথায় রাখবেন? এ সত্য তিনি কাব্যে বিশ্লেষণ করে দিবেন। সত্য বস্তুত্ব, আজ যা সত্য কাল সেটা সত্য নয়। একদিন পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরত এ মতট ছিল সত্য। কিন্তু সে সত্য আজ সত্য নয়। বিজ্ঞান চেতনাকে দিয়েছে নবসত্য, এখন যে কেউ বিজ্ঞান বলে জানতে পারে যে পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। সত্য যদি এই বর্ণ ও রূপ পরিবর্তন করে থাকে, তাহলে কবি কাকে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন? বুদ্ধত্ব নির্বাণ, নাকি বোধিচিন্তা নির্বাণ—এক সময়ে এ কঠিন তত্ত্বের সমাধান দিতে গিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। সে জন্য কবি বলেছেন, জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ সত্য নয় কিন্তু মিথ্যাও নয়। সত্য না হলে কারণ না হতে পারে জলের ভেতর চাঁদ খুঁজতে গিয়ে কোনও চাঁদই পাওয়া যাবে না, আবার মিথ্যা না হলে কারণ হবে চাঁদ আকাশে রয়েছে বলেই জলে প্রতিফলিত।

নভোযান নিয়ে চাঁদের ওপর অবতরণ করতে কেউ পারে এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, যে চাঁদকে পৃথিবী থেকে দেখা যায় তার বিভিন্ন রূপ ও বর্ণ রয়েছে। যুক্তি তর্ক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ফারিআ, করুণ মেহ নিরন্তর ফারিআ। ২. দুন্দল, দ্বন্দল। ৩. দালিআ। ৪. উইএ।
৫. উইউ গগণ মাজয অদভূআ। ৬. সরুঅ। ৭. শুণন্তে। ৮. ইন্দিয়াল। ৯. নিহুরে।
১০. ৭ দে, দেঅ। ১১. উলাস এ নিহুএ রে নিঅমণ দে উলাস। ১২. বিসঅ বিসুজঝে মই
বুজুঝিউ আনন্দে। ১৩. তিলোএ, তৈলোএঁ। ১৪. হেবভই। ১৫. অঁধআরা, আঙ্কারা;
জেউঅই ভুসুক ফোইউ আঙ্কারা জোই ভুসুক ফেডই অঁধআরা।
দানিয়ার পাঠক এক হও! ~~~~~ www.amarbol.com ~~~~

শব্দার্থ ও টীকা

করুণা মেঘ—করুণারূপ মেঘ, চিত্ত বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াদি মেঘ, করুণা আকর্ষণ ঘনীভূত উথিত চিত্ত বিক্ষোপ। নিরন্তর ফরিআ—নিরন্তর ক্ষুরিত; ক্ষুরিত>ফরিত>ফরিঅ; গুরুপ্রসাদ প্রক্ষুরিত। ভাবাভাব—ভাব ও অভাব, ২৯ নং চর্যার টীকা দ্রষ্টব্য। দ্বংদল—দ্বন্দ্ব, মুদ—‘গ্রাহ্যাদি বিকল্পং’। উইত্তা—উদিত। অদভূআ—উদ্ভূত। পেথরে—দেখ, প্রেক্ষণ>পেক্ষ>পেথ (দেখ)। সহজ সরুআ—সহজ স্বরূপ, সহজ আনন্দ স্বরূপ। জাসু—যাকে। সুনন্তে—শুনছ, জানা। তুট্টই—টুটে। ইন্দিআল—ইন্দ্রিয় উপাচার, ইন্দ্রিয় বন্ধন, মুদ—‘ইন্দ্রিয়সমূহং ক্রটিতি’। নিভ্এ—নিভূতে। উলাল—উল্লাস, এখনও গ্রামীণ প্রয়োগে উলাল। বিসঅ—বিষয়। বুঝাঝিঅ—বুঝি। উজোলি—উজ্জ্বল। তৈলোএ—ত্রিলোকে। ফেড়ই—ফেড়ে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

করুণা মেঘ নিরন্তর ক্ষুরিত।

ভাবঅভাব দ্বন্দ্ব দলিত॥

গগন মাঝে উদিত অদ্ভূত।

দেখ ভুসুকু সহজ স্বরূপ॥

যা শুনলে ইন্দ্রজাল টুটে।

নিভূতে নিজমনে উল্লাস দেয়।

বিষয় বিশুদ্ধি বুঝে আমি আনন্দে।

গগনে যেমন উজ্জ্বল চাঁদ (আনন্দে)॥

এ ত্রিলোকের এই ভ্রম সার।

যোগী ভুসুকু ফলিত আঁধার॥

গদ্যে রূপান্তর

করুণা মেঘ নিরন্তর ক্ষুরিত, ভাব অভাবের দ্বন্দ্বকে দলিত মথিত করা হয়েছে। গগনের মাঝে অদ্ভুতভাবে উদিত, ভুসুকু দেখ, সহজ আনন্দস্বরূপ (সেখানে)। যা শুনলে ইন্দ্রিয় বন্ধনজাল টুটে যায়, নিভূতে নিজমনে উল্লাস দেয়। বিষয়বিশুদ্ধি থেকে আমি আনন্দে বুঝি, যেমন গগনে উজ্জ্বল হয় চাঁদ। এই ত্রিলোকের সার তো এই, যোগী ভুসুকু অন্ধকার বিদীর্ণ করেন।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

করুণা ভাবাভাব গ্রাহ্যাদি বিকল্প দলিত মথিত নিঃস্বভাবী করে পরিশুদ্ধ সঞ্জোগ কায় যোগী গুরুপ্রসাদে ক্ষুরিত হলেন। আগত প্রভাবেরে অদ্ভূত যুগানন্দ ফলোদয়ে অবস্থান করেন। তাই ভুসুকু পা তৃতীয় আনন্দ সহজানন্দ স্বরূপে প্রবেশ করে জানলেন এবং স্বয়ং আত্মবোধন করে বললেন যে, সহজানন্দের প্রত্যক্ষ স্পর্শে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রটি পলায়ন করে। নিভূত নির্বিকল্প আকারে নিজমন বোধিচিত্ত বজ্রগুরু প্রসাদ সহজ উল্লাস দান করে। যেমন চাঁদের গগন উজ্জ্বল্য তেমনি আমার বিষয় বিশুদ্ধি আনন্দ, বিরামানন্দ পরমানন্দে গমন, সেরূপ সহজানন্দ চন্দের দ্বারা মোহ অন্ধকার বিনাশ হয়। এ রকম ত্রিলোক চতুর্থ আনন্দ ব্যতিরেকে অনন্যোপায় সিদ্ধাচার্য ভুসুকু পা ক্রেশ অন্ধকার ক্ষুরিত করলেন।

সমীক্ষা

করুণাকে নির্বাণ বা নৈরাশ্র্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি চর্যায়, ১২ নং চর্যায় কাহ পা বলেছেন, 'করুণা নিহাড়ি খেলুই নওবল'—করুণারূপ পিঁড়ি দাবার ছকে খেলছি। আর্জদেব পা ৩১ নং চর্যায় বলেছেন, 'অকট করুণা ডমরুলি বাজআ'—করুণা ডমরু অদ্ভুতভাবে বাজে এবং বর্তমান চর্যায় করুণা মেঘ নিরন্তর ফরিঅ' করুণা মেঘ নিরন্তর স্কুরিত, কিন্তু এখানে করুণা ঠিক নির্বাণ বা নৈরাশ্র্য হয়ে থাকেন নি, করুণাকে আকর্ষণ করার জন্য ঘনীভূত মেঘ বা চিত্ত বিক্ষোভ, করুণা ভাবভাব গ্রাহ্যাদি বিকল্প রয়েছে। বজ্রযানি তান্ত্রিক সাধারণত সাধনবস্তুকে নারী কল্পনা করেন। ডোম্বী শবরী, নিরামণি ইত্যাদি নামে তাকে অভিহিত করেন। যোগীরা নিজেদের তাঁদের প্রেমিক মনে করে সাধনবস্তু নির্বাণকে প্রেমিকা করেছেন। প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের রূপকে সুষমামণ্ডিত করে বর্ণনা করেছেন। অন্যত্র প্রেমিকা কামচণ্ডালি কিংবা কামদায়িনী হলেও এখানে করুণা দেবী হিসেবে দেখা দিয়েছেন এবং ভক্ত প্রেমিকের কাছে স্কুরিত হয়েছেন।

করুণা মেঘ চিত্তাকাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছেড়ে গিয়েছে, নব ঘন উন্মত্ত মেঘ যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করে, সেরূপ করুণা মেঘও আকাশে মত্ততার রূপ নিয়েছে। এই মত্ততার রূপ যেন মনের ভাব অভাব গ্রাহ্যাদির বিকল্প। অদ্ভুতভাবে তার উদয় হয়েছে, তাই কবি বলেছেন, দেখ নিজ স্বরূপ, দেখ তোমার সহজানন্দ স্বরূপ, যা বোধিচিত্ত স্বরূপ হয় তা সমগ্র গগনে পরিব্যাপ্ত।

এই ফলোদয়ে ইন্দ্রিয় বন্ধন কিংবা বিষয়াশ্রেষ্ট যাবতীয় হৃদয় আচ্ছন্নতা টুটে যায়। চিত্ত স্কুরিত হয়, দোষমুক্ত হয়। এই ফলোদয়ে দেখা শোনা কিংবা উপলব্ধি নিভৃতে নির্বিকল্প আকারে নিজমনে সূচিত হয়, বোধিচিত্তের উন্মেষ ঘটে। নিভৃতে যেমন নরনারীর দেহ সন্তোগের ফলে উদ্ভিত উল্লাস এবং পরিতৃপ্তি, বোধিচিত্ত সন্তোগও ঠিক তেমনি। কবি বলেছেন জাগতিক যত প্রকার আসক্তি ও বিষয় আকর্ষণ থেকে বিশুদ্ধ হয়ে আত্মবোধন দ্বারা নিজমন বোধিচিত্ত বজ্রগুরু প্রসাদ সহজানন্দে গমন করে। এ আনন্দ লাভের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন গগনে চন্দ্রোদয়ের প্রভাব, পূর্ণচন্দ্র দ্বারা সমস্ত গগন যেমন উদ্ভাসিত তেমনি বিশুদ্ধ সহজানন্দ। এতে অন্ধকারের বিনাশ ঘটে। ত্রিলোকের ভেতর এ আনন্দ হল সারবস্তু। ত্রিলোক হল জীবনকাল, রজনী এবং নির্বাণ। দুঃখযন্ত্রণা জরা পরিপূর্ণ জীবন, রজনী হল মৃত্যু; জীবনের শেষে রজনী যেমন দিনের শেষে রাত্রি, রজনী বা মৃত্যুতে জীবন সুপ্ত থাকে, পুনর্জন্মের ফলে আবার জীবন্ত অবস্থা পায়। এই দিনরাত্রির আনাগোনার ভেতর যদি গুরুপ্রসাদ বিশুদ্ধ আনন্দ বোধিচিত্তের উদ্বোধন হয়ে থাকে তবে আর জন্মমৃত্যুর দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে না, নির্বাণ লাভ নিশ্চিত হয়। তাই ত্রিলোকের সার হল নির্বাণ। টীকায় ত্রিলোককে চতুর্থ আনন্দ বলা হয়েছে; এই চতুর্থ আনন্দ হচ্ছে সহজানন্দ; চর্যা ২৭ নং বিভিন্ন আনন্দ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সহজানন্দ ব্যতিরেকে অনন্যোপায় সিদ্ধাচার্য ভুসুকু পা ক্রেশ অন্ধকার নিষ্কাশিত করলেন। ক্রেশ অন্ধকার হচ্ছে মানবজীবন এবং মৃত্যু। ত্রিলোকের ক্রেশকে তাই বিদীর্ণ করে দিতে হবে, তার সার নির্বাণকে লাভ করতে হবে।

ভয়ঘিন লোআচার—ভয়ঘৃণা লোকাচার, লোকলজ্জাদি লোক ব্যবহার।
চাহন্তে—দেখে। সুন বিআর—শূন্য বিচার, শূন্যভাবে নৈরাআ রূপ দৃষ্টি। বিহলিউ—বিফল
করে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

যেখানে মন ইন্দ্রিয় পবন হয় নষ্ট।
জানি না আত্মা কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট॥
আশ্চর্য করুণা ডমরু বাজে।
আজদেব নিরাশায় বিরাজে॥
চাঁদের চন্দ্রকান্তি যেমন প্রতিভাসে।
চিত্ত বিকিরণে তাতে টলে পশে॥
ছেড়ে ভয় ঘৃণা লোকাচার।
দেখে দেখে কর শূন্য বিচার॥
আজদেব সকল বিফল করে।
ভয় ঘৃণা নির্ধারিত (নিবারিত) দূরে॥

গদ্যে রূপান্তর

যেখানে মন এবং ইন্দ্রিয় পবন বিনষ্ট হয়, জানি না আত্মা কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট হয়। আশ্চর্য
(রবে) করুণা ডমরু বাজছে। আজদেব নিরাশায় বিরাজ করছেন। চন্দ্রের যে চন্দ্রকান্তি
প্রতিভাসিত হয় চিত্ত বিকিরণে সব টলে (তাতে) প্রবেশ করে। ভয় ঘৃণা লোকাচার ছেড়ে
দেখে দেখে (অভিজ্ঞতা দিয়ে) শূন্যকে বিচার কর। আজদেব সকলকে বিফল করেছেন,
ভয় ঘৃণা দূরে নিবারিত করেছেন।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

যেমন প্রভাস্বরে সংহার মণ্ডলাদিক্রমে বিষয় পবন ইন্দ্রিয়াদি নিঃস্বভাবীকরণ হয় জানি না
তখন বিরাজিত চিত্ত কী উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হয়। আশ্চর্য করুণা সংবৃ্ত্তি বোধিচিত্ত ডমরু
অনাহত শব্দে বাজছে। তাই আজদেব পা নিরাবলম্বন সর্বধর্ম উপলভ্যযোগে বিরাজ করে
শোভিত হন। অন্তর্গামী চাঁদের আলো হরণ সাদৃশ্যচিত্তলীন সর্ববিকল্প দোষযুক্ত সহজে
প্রবেশ করে। আমি সিদ্ধাচার্য আজদেব ভয় ঘৃণা লজ্জাদি লোকব্যবহার পরিত্যাগ করেছি।
গুরুবচন মার্গ নিরীক্ষণ শূন্যভাবে নৈরাআরূপে দৃষ্টি এবং সদগুরুপ্রসাদ নৈরাআ
ধর্মমুখিকরণে সর্বসংসার দূষণ বিফল করেছি।

সমীক্ষা

বৌদ্ধ ধর্মীয় বিধান মতে আত্মা, ভগবান, স্বর্গ-নরক বা পরকাল বলতে কিছু নেই। স্বয়ং
তথাগত ভগবান বা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। তেমনি আত্মা সম্বন্ধে তাঁর মুখ নিসৃত
কোনও ধর্মীয় উপদেশ নেই। তবে পরবর্তীকালে বুদ্ধকে ভগবান বলে পূজা করা শুরু
হয়েছে। হিন্দুধর্মের আদলে বুদ্ধকে বুদ্ধদেব বলা হচ্ছে আর স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ শ্রেণী বুদ্ধকে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবতার হিসেবে আখ্যা দিয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্মে টেনেছেন। এখানে আত্মার উল্লেখ হিন্দুধর্ম সমন্বয়ের কারণে হয়ে থাকতে পারে। তবে টীকাকারক ‘অপা’ কে আত্মা না বলে চিহ্ন বলেছেন, তাতে কবিতার ভাবমূর্তি কিছুটা বিনষ্ট হয়।

পৃথিবীর যত ধর্ম আছে, তাদের অনেকটাতে আত্মার বিশ্বাস রয়েছে। এ দেশের বৌদ্ধ, জৈন নাথপন্থী নিরীশ্বরবাদী আরও অন্য ধর্মমতে আত্মার ধারণা নেই। সেমেটিক ধর্মের আত্মার সঙ্গে এদেশের হিন্দুধর্ম বা এ শ্রেণীর ধর্মের আত্মা বিশ্বাসের বেশ পার্থক্য রয়েছে। সেমেটিক ধর্মমতে মানুষ মরে গেলে আত্মা সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যায়, কিংবা বিলীন হয়ে থাকে। পুনরুত্থানের দিন আবার আকার ধারণ করবে। হিন্দুধর্মে আত্মার ধারণা হচ্ছে, দেহচ্যুত আত্মার বিনাশ নেই, পুনর্জন্মে দেহ ধারণ করে। এখানে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিল রয়েছে, কিন্তু যেটা আত্মা—অবিনশ্বর সে রকম ধারণা বৌদ্ধ ধর্মে নেই, মৃত্যুর পর জীবন ঘুমিয়ে থাকার কথা আছে। তবে আত্মা অর্থে যদি সত্ত্ব হয়, যেমন বোধিসত্ত্ব; বিভিন্ন জাতকে বোধিসত্ত্ব জন্ম নিয়ে ‘সৎ’ স্বরূপে সর্বশেষ সত্ত্ব তথাগত রূপে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এখানে যাকে আত্মা বলা হচ্ছে তাকে ‘জীবসত্ত্ব’ বলা যেতে পারে। লক্ষ্য করা গেছে সিদ্ধাচার্যদের অন্য কেউ এই অপা কিংবা আত্মা শব্দ উচ্চারণ করেন নি। কেবল আজদেব এই অপা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা টীকাকাররা ‘চিহ্ন’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অপা শব্দের অর্থ আত্মা যদি হয় তাহলে তা হতে পারে, ‘জীবসত্ত্ব’ও হতে পারে। কারণ ‘ন জাহিমি অপা কঁহি গই পইঠা’—জানি না আত্মা কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট। তাই ধারণা করা যাচ্ছে আজদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারণা এখানে উচ্চারণ করেছেন। এক সময় বজ্রযানি বা সহজযানি তান্ত্রিকরা অনেকটা হিন্দু তান্ত্রিকদের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। সে চিন্তা ‘আত্মা’ ব্যবহার হতেও পারে। তবে সিদ্ধাচার্যদের মূল চেতনার সঙ্গে এখানে আত্মার বিক্ষিপ্ত সংযোজন ভাবাদর্শের ব্যত্যয় ঘটায়নি।

সিদ্ধাচার্য কবি আজদেব পা বলছেন, মন চাক্ষুণ্যহেতু এবং ইন্দ্রিয়পবন বিষয়াদি নিঃস্বভাবীকরণ হেতু আত্মার কী রূপ হতে পারে? আত্মা কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট হয় জানি না। গ্রিক দর্শনে আত্মার অস্তিত্বের কথা আছে, দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ রয়েছে, দেহ অপচিত হয়ে গেলে আত্মা বিনষ্ট হয়ে যায়। এখানে অনুরূপ আত্মা চিন্তা অনুভব করা যায়। এখানে কবি বলছেন, দেহের দুঃখ যন্ত্রণা বিষয়াদিও আত্মাকে ভোগ করতে হয়। দেহ সংকটে থাকলে আত্মা সংকটে থাকে। তবে কবি সংশয় প্রকাশ করেছেন, আত্মা তখন কোথায় গিয়ে প্রবেশ করে? আত্মা যেখানে যাক, কবি স্বয়ং শুনতে পান করুণা ডমরুনাদ, অনাহত হত জ্ঞান তখন বিশেষ বোধে আসে। যার ফলে কবি নিরাবলম্বনে সর্বধর্মউপলভ্যযোগে বিরাজ করেন। দেহের চন্দ্রকিরণ—তান্ত্রিক মতে যা শুক্রবাহী নাড়ি তার ক্ষয় হতে থাকে অস্তগামী চাঁদের প্রভা লীন হবার মত। তখন সংসার টলিয়ে বোধিচিহ্ন প্রবিষ্ট হয়। আজদেব বলেন ভয় ঘৃণা লোকলজ্জা আচারাদি পরিত্যক্ত, কেবল শূন্য নৈরাশ্র্য দৃষ্টিতে আবদ্ধ, পার্থিব সংসার বিফল করে নির্বাণ লাভ করা হয়।



প্রেট ১২ : আজদেব পা

আজদেব পা

ভণিতায় আজদেব কিন্তু টীকায় আর্যদেব পাদাঃ বলা হয়েছে; অনুমান করা যায় জীবনের প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধাচার্য হয়েছেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে সিদ্ধাচার্যদের তালিকায় আর্যদেব পাওয়া গেছে। তার সময়কাল অনুমান করে বলা যেতে পারে তিনি শেষ দিকে, অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন। তবে কয়েকজন পণ্ডিত তাঁর সময়কাল অষ্টম শতকের শেষভাগ বলে অনুমান করেন। তাঁর রচিত চর্যার ধারাবাহিকতায় কিন্তু সে কথা বর্তায় না।

চর্যা-৩২

রাগ দেশাখ

সরহ পা

নাদ গ বিন্দু গ রবি গ শশিমণ্ডল^১।
 চিঅরাঅ সহাবে মুকল^২ ॥ ফ্র ॥
 উজুরে উজ^৩ ছাড়ি মা লেহরে বন্ধ^৪।
 নিঅরি^৫ বোহি মা জাহরে লাক^৬ ॥ ফ্র ॥
 হাথে রে^৭ কাক্ষণ মা লেউ দাপণ^৮।
 আপণে অপা বুঝ তু^৯ নিঅমণ ॥ ফ্র ॥
 পার উআরে^{১০} সোই গজিই^{১১}।
 দুজ্জন সঙ্গে অবসরি জাই^{১২} ॥ ফ্র ॥
 বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
 সরহ ভণই বপা^{১৩} উজুবাট ভাইলা ॥ ফ্র ॥

পাঠান্তর

১. রবি শশিমণ্ডল। ২. মুকলাই। ৩. উজুরে উজ্জ, দুদুরে উজ্জ ছাড়ি। ৪. বান্ধ।
 ৫. নিয়ড়হি, নিঅহি। ৬. লঙ্ক। ৭. হাথের, হাথে রে কাক্ষণ। ৮. দপ্পণ, হাথের কক্ষণ মা
 লেই দপ্পন, হাথের কাআ বা লেউ দাপণ। ৯. বুঝতু। ১০. পার উআরে জোই সাঁঝই।
 ১১. জোই। ১২. অবরি জাই, দুজ্জনসঙ্গে অবস মরি জাই। ১৩. বাপা।

শব্দার্থ ও টীকা

নাদ—গর্জন। বিন্দু—ফোঁটা, লেশমাত্র; মুদ—‘পরমার্থবিদ্যাং চিত্তরত্নং নাদ বিন্দাদি
 বিকল্প’। রবি শশিমণ্ডল—রবিশশী নাড়িমণ্ডল। চিঅরাঅ—চিত্তরাজ, চিত্তরত্ন। সহাবে—
 স্বভাবে। মুকল—মুকুলিত, মুক্ত। উজু—সোজা। বন্ধ—বাঁকা। নিঅড়ি—নিকটে।
 বোহি—বোধি। জাহু—যাও। লাক্ষ—লঙ্কা, সিংহল। হাথে রে কাক্ষণ—হাতের কক্ষণ।
 লোউ—লয়া। দাপণ—দর্পণ। অপা—আপনা, নিজ। পার উআরে—পার উদ্ধারে, যোগীর
 বোধিচিন্তে গমন, মুদ—‘বোধিচিন্তাং যোগিবরৈরগুণম্যাতে’; অন্যত্র—‘মজ্জসি’-নিশ্চিন্তে
 আনন্দে পার। গজিই—গর্জন করে। দুজ্জসঙ্গে—দুইটির সঙ্গে, মোহাদি দুর্জন সঙ্গে।
 অবসরি—অবশ্য অপসৃত; পাঠান্তরে—অবশ মরি জাই—অবশ্য মরে যাবে। বিখলা—
 ডোবা। ভাইলা—ভাত কর, প্রতিভাত কর।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

নাদ নয় বিন্দু নয় রবি নয়, নয় শশিমণ্ডল।

চিত্তরাজ স্বভাবে মুকুলিত দল।

সোজারে সোজা ছেড়ে নিও না বাঁক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকটে বোধি না যাওরে লঙ্কা (ফাঁক)।
 হাতের কাঁকন দেখতে কে নেয় দর্পণ?
 আপনি আপন বুঝ তুমি নিজ মন।
 পার ও পারে সে তো গজায়।
 দুর্জন সঙ্গে অপসৃত হয়ে যায়।
 বাম ডান যে খাল বিখাল (দেখ)।
 সরহ বলেন বাপু সোজা পথ রেখো।

গদ্যে রূপান্তর

নাদ নয়, বিন্দু নয়, রবি শশিমণ্ডলও নয়, চিত্তরাজ স্বভাবে মুকুলিত হয়। সোজা, ওরে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না, নিকটেই বোধি, তার জন্য লঙ্কায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজেই নিজের মনকে বুঝে নাও। ওপারে গিয়ে উদ্ধার পাবে। বা সে আনন্দে পারাপার হতে পার, সঙ্গে দুর্জন থাকলে ধ্বংস অনিবার্য। বাম ডান দিকের যে খাল ডোবা (তা এড়িয়ে যাও), সরহ বলেন, বাপু সোজা পথ প্রতিভাত কর।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

সদগুরু বচন অমৃত লহরী প্রভাবে পরমার্থবিন্দু চিত্তবিন্দু নাদ বিন্দু আদি বিকল্প পরিহার করে স্বভাবে মুক্ত হয়। অনাদ্যবিদ্যা জ্ঞানপটী পুন অন্যথাভাবে প্রবিশ্ট হয়। তাই অবধূতীমার্গ বিহারে যোগী নানারূপ দেহভুক্ত পান। বোধিচিহ্ন গর্জন করে জিনপুরে সন্নিহিত হয়। যোগী চক্রমার্গ ভজন করছে না, পুন সংসারী হয়ে না। হাতের কাঁকন-দর্পণের কী উপযোগিতা রয়েছে? যোগী বজ্রপ্রসাদ নিজমন বোধিচিহ্নের স্বরূপ দেখ। সেই হল শ্রেষ্ঠ ধর্মসাক্ষাৎকারী ভবিষ্যৎ। পরপারে পরমার্থ বোধিচিহ্নে যোগীবর অনুগমন করে। তাতে গুরুপ্রসাদ মহামুদ্রা সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে। নতুবা ভবে পৃথক জনো অনুগমন হয়ে থাকে। ততো মোহাদি দুর্জনসঙ্গম সংসার সমুদ্রে নিমজ্জন অবধারিত। বাম ডান বিপথ থেকে সুগম পথ অবলম্বন কর তাতে করে অবধূতীমার্গ বক্রপথ এড়িয়ে যাওয়া যায়, সরহ পা বলেন, মহাসুখের পুনরাগম নিশ্চিত।

সমীক্ষা

নাদ বিন্দু রবি শশিমণ্ডলের উল্লেখ করে সিদ্ধাচার্য সরহ পা কবি সাধন পথের কতকগুলো মার্গ এবং আচার সংস্কারের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এ সব হল অর্থহীন, এ পরিহার করলে চিত্ত স্বভাবে মুক্ত হয়।

নাদ অর্থ হুঙ্কার বা ওঙ্কার; 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ করলেই সিদ্ধিলাভ হয়, কিংবা নাম কীর্তন বা নাম জপে অভীষ্ট লাভ হয় এবং সারাক্ষণ সে মন্ততায় দিন কাটে। তাকে কবি নাকচ করেন। ঠিক তেমনি বিন্দু বা স্থির দৃষ্টি-স্থির লক্ষ্যবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হওয়ার সাধনা, তাও কবি নাকচ করেন। বিন্দু সাধনা হল বৌদ্ধ শাসন বা সাধন মার্গের একটা দিক। দিন রাত্রির একটা নির্দিষ্ট সময়, এমনকি ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে কোনও বিন্দু লক্ষ্য করে স্থির থাকা। কেউ প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ সাধনা করেন, কেউ দেওয়ালে তাকিয়ে, তাতে সিদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু কবি বলেন এটাও কিছু নয়।

আবার রবিশশিমণ্ডলও কিছু নয়, তত্ত্বসাধনার এ দুটি মহাপ্রতীক। রবি হল ক্ষয় এবং চন্দ্র হল বীর্ষের প্রতীক। দেহস্থ নাড়ি ভর করে দেহতাত্ত্বিক সাধনায় পারঙ্গম হয়ে সিদ্ধিলাভ করার জন্য যারা এ দুটি প্রতীক অবলম্বন করেন তাদের জন্য কবি বলেন, এ সব মণ্ডলের কোনও ফলোদয় নেই। তাহলে কী? কবি বলেন সোজা পথ, বাপু সোজা পথ ধরে এগিয়ে যাও, তবেই সিদ্ধিলাভ হবে। এ সব আঁকাবাঁকা পথ নয়, তুমি যদি বোধি বা জিনপুর তালাশ কর তাহলে সেটা অনেক দূরে নয়, তোমার নিকটে, তোমার নিজের ভেতর তা রয়েছে, লঙ্কা যাবার দরকার নেই।

এখানে দূরের প্রতীক হিসেবে লঙ্কার উল্লেখ করার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। রামায়ণের লঙ্কার ধারণা এখানে নেই। সিদ্ধির জন্য কৈলাস কাবা কিংবা বেথেলহেমে যাবার লোক আচার রয়েছে, সেটা সিদ্ধাচার্যের ইংগিতে বোঝা যাচ্ছে, যতদূরে এবং যত কষ্টকর পথ হবে সিদ্ধি ততই পাকাপোক্ত হবে। বুদ্ধের সময়ে কিংবা তাঁর কিছু আগে বাংলার এক রাজপুত্র বিজয় সিংহ সিংহল বা লঙ্কায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাই বাঙালির কাছে সিংহল বা লঙ্কা অপরিচিত ছিল না, যদিও জানত যে লঙ্কা যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য, ব্যয়সাধ্য এবং সুখকর ব্যাপার নয়। তবে লঙ্কা যেতে পারলে অতীষ্ট উপনিবেশ স্থাপন করা যায়।

পরবর্তীকালে বাউল ও অন্যান্য সাধক যে উচ্চারণ করেছেন, 'কোথায় তোমাকে তালাশ করব, মন্দিরে, মসজিদে, না কৈলাসে, তুমি তো নিজের ভেতরেই আছ'। এ চেতনার পথনির্দেশক হলেন সিদ্ধাচার্য সরহ পা এছ তার এ চর্যা গীত। সরহ পা উপমা দিয়ে বলেন, হাতের কঙ্কন দেখার জন্য দর্পণের প্রয়োজন কী? বোধি তো নিকটে, নিজের কাছে, নিজের মনে; অন্য কোথা থেকে কী তার খবর জানা যাবে? আমার সম্বন্ধে আমি জানি, অন্য জানবে কতটুকু? তাই বলা হয়েছে নিজেকে চেন। যিনি নিজেকে চিনেছেন তিনি পৃথিবীকে চিনেছেন, সবকিছুকে চিনেছেন। সব পথের খবর তিনি রাখেন। কোনটা বাঁকা পথ আর কোনটা সোজা? নিজের বুদ্ধিতে বেছে নিতে তাঁর কষ্ট হয় না। এই আনন্দ নিয়ে সহজেই পথ অতিক্রম করা যায়, পথ উদ্ধার করা যায়, পারাপার হওয়া যায়। তবে সাবধান, সঙ্গে যদি দুর্জন থাকে তাহলে বিপদ, জীবনের শঙ্কা, সিদ্ধির শঙ্কা, দুর্জন সোজা পথ থেকে সরিয়ে বিপদের পথে নিয়ে যাবে।

বাম দিকের ও ডান দিকের যে সমস্ত খাল বিখাল ডোবা জঙ্গল রয়েছে তাদের এড়িয়ে যেতে হবে। বাম ও ডান বা বাম ও ডান নাড়ি, তাত্ত্বিক ইংগিতবহ, একথা আগেও বলা হয়েছে ৫, ৮, ১৫ নং ইত্যাদি চর্যার আলোচনা প্রসঙ্গে। সে ছাড়াও আধুনিককালে বামপন্থী ও ডানপন্থী কথাটা চালু আছে। এ ধারণা কিন্তু আন্তর্জাতিক, 'লেফটিস্ট এবং রাইটিস্ট'। প্রগতিবাদী এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধীদের সাধারণত বামপন্থী বা বাম মতবাদী বলা হয়। আর ডান হল তার বিপরীত, খয়ের খাঁ বা ডান হাতের লোক তারাই দক্ষিণপন্থী। অর্থাৎ দক্ষিণা নিয়ে যারা তুষ্ট। তবে 'রাইটিস্ট' অর্থ সঠিক পথ অবলম্বনকারীও বোঝায়, সেটা কায়েমি স্বার্থমুখী পশ্চিমি প্রচার; অর্থাৎ তারাই ঠিক পথে রয়েছে, লেফটরা বিপথে।

আমাদের কবি সিদ্ধাচার্য সরহ পা ডানপন্থী অথবা বামপন্থী কাউকে আমল দেন না এবং বাম-ডানের সকল পথকে ভ্রান্ত মনে করেন। তিনি বলেন, উজুপথ বা সোজা পথ বা মাঝখানের পথ। কিন্তু এ অর্থ মধ্যপন্থী সুবিধাবাদীদের পথ নয়; তাত্ত্বিক নিয়মের মধ্যপথ। অন্যপথ সবই খাল ডোবায় আকীর্ণ। সরহ তাই বলেন এ সব পথ এড়িয়ে সোজা পথে অগ্রসর হতে হবে।

চর্যা-৩৩
রাগ পটমঞ্জরী
চেচণ পা

চর্যা-৩৩। রাগ পটমঞ্জরী। চেচণ পা। ১। টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী। ২। হাডীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। ৩। বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাএ। ৪। দুহিল দুধ কী বেটে সমা এ। ৫। বলদ বিআএল গবিআ। ৬। পিঠা দুহিঅই এ তিনা সাঝে। ৭। জো ঝো বুধী সোধ নিবুধী। ৮। জো সো চোর সোঙ্গ সাধী। ৯। নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝ। ১০। চেচণ পাএর গীত বিরলে বুঝ।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাডীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। ৫।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাএ।
দুহিল দুধ কী বেটে সমা এ। ৫।
বলদ বিআএল গবিআ। ১০।
পিঠা দুহিঅই এ তিনা সাঝে। ১১।
জো ঝো বুধী সোধ নিবুধী। ১২।
জো সো চোর সোঙ্গ সাধী। ১৩।
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝ।
চেচণ পাএর গীত বিরলে বুঝ।

পাঠান্তর

১. পড়বেশী, পড়বেশী। ২. হাডীত। ৩. আবেশী। ৪. চেগা সংসার, বেঙ্গস সাপ। ৫. চড়ছিল। ৬. বেগে সংসার বড় হিল জাএ, বেঙ্গস সাপ চড়িল জাই। ৭. বেণ্ডে। ৮. সমায়, সামাই। ৯. বলদ। ১০. গবিআ, গাকী। ১১. সাঝে, পিটহ দুহিঅই এ তিনো সাঝে, পীরা দুহিঅই এ তিনা সাঝে। ১২. সোধ নি বুধী, সৌ ধনি বুধী। ১৩. সোহি। ১৪. সউ দুধাধী, সৌদুধাধী। ১৫. নিতে নিতে, নিতি সিআলা সিহে সম জুঝ এ, নিতে নিতে। ১৬. সিংহে, মিহে, মিহে। ১৭. জুঝ। ১৮. বিচিরলে।

শব্দার্থ ও টীকা

টালত—টিলাতে, টিলার ওপরে, ছোট পাহাড় পরে; মুদ—‘টিইতি টমালমসদুপং কায় বাক চিন্তস্য যষ্ঠ্যওরশত প্রকৃতি দোষং’। পরবেশী—পড়শী, মুদ—‘গৃহং পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্যোথমেব বজ্র জাপক্রমেণ তত্রৈবান্তলীনো’। নিতি—নিত্য। আবেশী—অতিথি; সং—আবেশ—প্রবেশ, আবেশিক—আগন্তুক, মুদ—‘নৈরাশ্বরূপং নিত্যং তমাবিশতি’। বেঙ্গ—ব্যাঙ, পাঠান্তরে বেঙ্গস সাপ—ব্যাঙের মাথায় সাপ। বেঙ্গ সংসার—ব্যাঙের সংসার, ব্যাঙ ও সাপের সংসার, কিন্তু নেই অঙ্গ সে হল ব্যঙ্গ, মুদ—‘বিগতাজ্য যস্যস ব্যঙ্গঃ। অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাস্বর বৌদ্ধব্যং’, এখানে ব্যঙ্গ ধর্মকায় অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিন্তের বিলোপ সাধনে প্রভাস্বর শূন্যতায় পৌছে; যোগীও এক প্রকারের অঙ্গহীন বা ব্যঙ্গ অবস্থায় উপনীত। এই অবস্থার বিষয় বিধে আচ্ছন্ন সর্পতুল্য এই সংসারকে পরাভূত এই প্রভাস্বর শূন্যরূপ ব্যঙ্গ সংসার ভুজঙ্গ গ্রহরী। বড়হিল—বেড়ে গেল। দুহিল দুধ—দোয়ানো দুধ; বোধিচিন্ত অর্থে, মুদ—‘কর্ম মুদা প্রসঙ্গাধিজ্ঞা গা গার্সতং যদ্বোধিচিন্তং’। বেটে—বাঁটে; কায়ায় অর্থে, মুদ—‘যোগিন্দস্য বেটমিতি’। বলদ বিআএল—বলদ বিয়াল; কায় বাকচিন্তের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

প্রতিভাসে রূপজগতের সৃষ্টিকারী বোধিচিন্তরূপ বলদ অর্থাৎ সক্রিয় মন, মুদ—‘বলং মানসাং দেহ বিগ্রহং দদাতীতি বলদন্তদেব বোধিচিন্ত আভাসত্রয় প্রস্তুতং’—এ বোধিচিন্ত বা সক্রিয় মন রূপ জগতের সৃষ্টি করে, তাকে বলদ বিয়াল বলা হয়েছে। গবিআ—গাভী, যোগের ভাষায় নৈরাশ্বারূপিণী শূন্যতা।

বোধিচিন্ত যখন জাগতিক মোহ অতিক্রম করে পার্থিব জ্ঞানশূন্য হয়ে নৈরাশ্বারূপিণী শূন্যতা লাভ করে, অর্থাৎ যখন তার দৃশ্য দর্শন ও তিরোহিত হয় তখন সে বক্ষ্যা, মুদ—‘গৃহিণী বংধ্যা নৈরাশ্বা’। পিঠা দুহিঅই—পাত্র দুয়ে দুয়ে; মুদ—‘দোহন মিতি নিঃস্বভাবীকরণং ক্রিয়তে’; দোহন করা অর্থে যাবতীয় দোষ নাশ করা। বোধিচিন্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায় বা নৈরাশ্বার সঙ্গে মিলিত হবার ফলে মহাসুখকারের সৃষ্টি হয়েছে তা তিন সক্ষ্যা বা অহরহ দোহন করা হচ্ছে। জো সো বুধী—যে সে বুদ্ধিমান, মুদ—‘যা বুদ্ধি: সবিকল্পকজ্ঞানং সা পরমার্থবিদং’। সোধ নির্বুধী—সে নির্বোধ; যে বুদ্ধিমান সে নির্বোধ, হাজার বছর অধিক আগে বাঙালি মনীষী যে কথা উচ্চারণ করেছেন এখন তা কত জীবন্ত, যেখানে সাপ ব্যাঙের অত্যাচার, সেখানে বুদ্ধিমানরা তো নির্বোধই, যেখানে সোনা আর পেতল এক দামে বিক্রি হয় চকচক করার কারণে—সেখানে বুদ্ধিমান কেউ একথা উচ্চারণ করলে তো সকলেই তাকে নির্বোধই বলবে। মৃত্যুশক্তি মাজারে গুয়ে গুয়ে যদি জীবিতদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিতে পারে, বুদ্ধিমান সেখানে প্রশ্ন তুললে নির্বোধ ছাড়া আর কী? ঠিক অনুরূপ যে চোর সেই তো সাধু, ‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আজ আমি চোর বটে’—এ কথা ছাড়াও যারা আন্দের গির্জা মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন কিংবা তাতে বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করেন, তার বেশির ভাগ অর্থ কিন্তু অসাধু উপায়ে উপার্জিত; সে অসাধু কাজসমূহ চাকার জন্য এসব ধর্মীয় কাজ করে থাকেন এবং বাহবা কিংবা পাপ থেকে উদ্ধার চান, তাহলে যারাই চোর তারাই প্রকৃত সাধু। তাই মুদ—‘অতোপি থ এব চিত্তরাজ্যচোর। অদত্তাদাণং কুরোতি স এব ভাববিচার্যমণ শতি’। সিআলা—শৃগাল। সিহে—সিংহে; যোগের ভাষায় সমাজচিন্ত শৃগাল; সিংহ যোগের ভাষায় সহজানন্দরস্বরূপ, মুদ—‘মরণাদিকে সর্বত্র বিভেতি ইতি কৃত্বা স এব সমান চিন্ত শৃগালতুল্যা। কল্যাণমিত্রাধিষ্ঠানাং প্রভাস্বর বিস্তুকো ভবতি। তদা যুগনন্ধসিংহেনৈহ স্পর্ধাং কুরোতি’। শৃগাল মরণাদির ভয়ে সর্বদা ভীত। কিন্তু সংবৃতি বোধিচিন্ত যখন বিষয় বাসনা পরিহার করে পরিশুদ্ধ অবস্থায় ধর্মকায় বা তথ্যতার সঙ্গে মিলিত হতে পারে তখন সদানন্দরূপ সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে পারে মহাসুখকারের আনন্দ লাভ করে সে অমর হতে পারে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

টিলায় আমার ঘর নেই পড়শী।

হাঁড়িতে ভাত নেই নিত্য অতিথি॥

ব্যঙ্গের সংসার বেড়ে যায়।

দোয়ানো দুধ কী বাঁটে সাক্ষায়॥

বলদ বিয়াল গাই বক্ষ্যা।

পিটায় দোহন হয় তিন সক্ষ্যায়॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ ।
 যে সে চোর সেই সাধু (খোদ)॥
 নিত্য নিত্য শেয়াল সিংহের সম যোঝে ।
 ঢেংঢণ পা'র গীত বিরলে বোঝে॥

গদ্যে রূপান্তর

টিলার ওপরে আমার ঘর তাই কোন প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই তবু নিত্য অতিথি আসে। ব্যাঙের সংসার বেড়ে চলেছে, দোয়ানো দুধ কী বাঁটে প্রবেশ করে? বলদ বিয়াল গাভী বাঁঝা, তিন সন্ধ্যা দুধ দুইয়ে পাত্রে ধরে না। যে বুদ্ধিমান সে আবার নির্বোধ, যে চোর সে সাধু অথবা যে চোর সেই পাহারাদার। নিত্য নিত্য শেয়াল সিংহের সমান যুদ্ধ করে। ঢেংঢণ পা-এর গীত বিরল লোকে বুঝতে পারে।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

কায় বাকচিন্তের ছিয়াত্তরশত প্রকৃতিদোষ যে সময়ে মহাসুখচক্রে বিলীন অঙ্গ সে রূপ আমার গৃহ পার্শ্বস্থ চন্দ্র সূর্য বস্ত্র পরিক্রম অবস্থান শূন্য। স্বীয় কায়াধার ভক্ত তার সংবৃত্তিবোধিচিন্তা বিজ্ঞান অধিরূপ নৈরাশ্যরূপে যোগীর সঙ্গে নিত্য প্রবেশ করে। বিগত অঙ্গ যার সে হল ব্যঙ্গ। অঙ্গ শূন্যতাবোধন প্রভাব, অঙ্গে ষড়ঙ্গ দ্বারা গমন করে সে বায়ুরূপ ব্যঙ্গ প্রভাবের বিজ্ঞান পরিশোধিত কর্মমুদ্রা প্রসঙ্গ বজ্রাগার নিসৃত বোধিচিন্তা যোগী হলেন বাঁট, মূল মহাসুখচক্র কী অদ্ভুতভঙ্গি গেল। বল মানসদেহ বিগ্রহ দায়ী বলদরূপ বোধিচিন্তা আভাস ত্রয় প্রস্তুত করে, গাভীকূপ যোগীর গৃহিণী বন্ধ্যা নৈরাশ্য শূন্যতায় রইল। আপন কুলিশঅগ্রে গুরুতর আভাস আশ দোহন দ্বারা নিঃস্বভাবীকৃত হয়, ত্রিসন্ধ্যা তথা অহর্নিশ যোগীকে তাই দুয়ে দিচ্ছে। যোগী যিনি বুদ্ধি বিকল্প জ্ঞানযুক্ত, তিনি পরমার্থবুদ্ধি। অতঃপর যে চিত্তরাজ চোর অদেয় দান করে সেই ভাববিচার্যমান সতত থাকে। তার বিপক্ষে থাকে পরমার্থ রূপ। অতএব যোগী দুঃসাধ্য পরমার্থ সত্য দুঃখে সাধ্যসাধিত করে। মরণাদির জন্য সর্বত্র ভীত-সন্ত্রস্ত সে সংসারচিন্তা শৃগালতুল্য। কল্যাণমিত্রাধিষ্ঠান প্রভাবের বিশুদ্ধ হল, তখন যুগনন্দরূপ সিংহের সমান স্পর্ধা রাখে। এ রকম ঢেংঢণ পা-এর চর্যাপদ বিরলে পক্ষিবিক্ষুব্ধ চিত্তদেশে কদাচিৎ মহাসত্য অর্থাগম করে থাকে।

সমীক্ষা

টাল বা টিলা হচ্ছে উষ্ণীষকমল বা মহাসুখচক্র, চারচক্রের অন্যতম চক্র এবং শেষ চক্র। তাতে ইন্দ্রিয়লব্ধ পার্থিব কোনও কিছুর অস্তিত্ব বা অবস্থান থাকে না, তাই সে প্রতিবেশী শূন্য। হাঁড়ি হচ্ছে ভাণ্ড বা ঘট যা মানবদেহ, যাকে দেহঘট বলা হয়। বলা হয় যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। এই দেহ ভাণ্ডে কামনা বাসনারূপ খাদ্য বা ভাত নেই বলে তা শূন্য। শূন্যতা অর্থ সহজানন্দ, নির্বাণ; তা নিত্য পরিবেশিত হচ্ছে (নিতি আবেশী), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বাসনা দিয়ে বেষ্টিত সর্পতুল্য এই ভবসংসার, যা অপরিণত বোধিচিন্তার ওপর শূন্যতা রূপ ব্যঙ্গ বা ধর্মকায় বিরাজিত রয়েছে। যে সংবৃত্তিবোধিচিন্তা (দুধ) ধর্মকায় রূপ বাঁট থেকে নির্গত হয়েছে, তা সাধনার ফলে আবার ধর্মকায় প্রবিষ্ট। হয়তো তা সম্ভব নয়, কিন্তু কী অদ্ভুত তাই তো বোধিচিন্তার রূপ।

অপরিশোধিত বোধিচিন্ত হচ্ছে বলদ—যা কামনা বাসনা যোগান দেয়, ইন্দ্রিয় মায়াজালে আবদ্ধ থাকে এবং রূপজগতের সৃষ্টি করে, লৌকিক সুখের কারণ হয়, তাই সে প্রসব করল। আর নৈরাশ্যরূপ শূন্যতা পার্থিব সকল বন্ধন, জ্ঞানশূন্য ছিল বলে সে রইল বন্ধ্য বা বাঁধা গবিআ। এ দিয়ে কায়বাকচিণ্ডের আভাসে গঠিত অবিদ্যা ত্রি সন্ধ্য বা অহর্নিশ পাত্রে দুধ ভরে দেয়, অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান দ্বারা যে বুধী (জ্ঞানী) সেই তো নির্বোধ। অপরিশুদ্ধ বোধিচিন্ত তখন বিষয়সুখ আহরণ করে তখন সে চোর। আবার যখন সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বাসনা পরিহার করে পরিশুদ্ধ হয় তখন সে সাধু। জরা মৃত্যু ইত্যাদি থেকে সব সময় শঙ্কিত সংসার চিন্তরূপ শেয়াল অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিন্ত যখন পরিশুদ্ধ হয় তখন সে সহজানন্দরূপ সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করে আপন আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা রাখে। তাই চৈতন্য পা-এর এ গীত সকলে বুঝতে পারে না।

এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে নির্গলিতার্থ ব্যাখ্যার সমন্বয় হতে পারে; তাও যৌক্তিক ও লৌকিক চেতনায় গৃহীত হতে পারে। ডোম্বী পা, সবর পা প্রমুখ সিদ্ধাচার্য সাক্ষ্যভাষায় এ রকম গূঢ়ার্থক শব্দ প্রয়োগ করে পদ রচনা করেছেন; তাঁরাও নগরের বাইরে অথবা লোকালয়ের দূরত্বে টিলা বা পর্বত আশ্রয়ের ইংগিত দিয়েছেন, অথবা সেখানেই তাঁদের মানস আশ্রম ছিল। টিলার ওপর বসবাস একটা রূপকধর্মী বক্তব্য; তাত্ত্বিক সাধনার অভিব্যক্তি। অধিবাসীরা এখনও টিলার ভেতরে কিংবা টিলার ওপর বাস করে। মানবজাতি ক্রমশ বন্য জীবন ছেড়ে সমতলে এসে সভ্য সমাজ গঠন করেছে। কিন্তু তাই বলে তাদের আদিম অভ্যাস জীবনধারণ মনোচেতনা থেকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। গভীর জঙ্গলে অবশ্য এখনও কেউ কেউ বাস করছে।

আদিবাসীদের বিশ্বাসে উঁচু স্থানে বসবাসের একটা উন্নত আধ্যাত্মিক ধারণা আছে, তারা অন্যদের চাইতে উন্নত মনে করে। কবি সিদ্ধাচার্য চৈতন্য পা এ বিষয়ে রপ্ত ছিলেন এবং প্রশংসাচ্ছলে নিজেকে এ ধারণায় নিয়োজিত করেছেন যে, যদিও বাস আমার খুব উন্নতমানের কিন্তু এমন উন্নত বাসের জন্য আমি প্রতিবেশী পাইনি। অর্থাৎ আমার মত আর কেউ এমন জীবন যাপন করতে আগ্রহী নয়। কিন্তু তাহলেও আমার ঘরে ভাত নেই, তবু আগন্তুক অতিথির কমতি নেই, প্রতিদিনই অতিথি। তত্ত্বের ভাষায় অতিথি বললে বোধিচিন্তকে বোঝায় কিন্তু লৌকিক আচরণে অতিথির অত্যাচারে অতিষ্ঠ গৃহী, হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ অতিথি, এটা জীবন বিরোধাভাবার্থক হলেও সে কালের জীবনচিত্র। মনে হচ্ছে লোকে প্রবজ্যা গ্রহণকারী শ্রমণ ভিক্ষুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ। জীবনের উঁচু মানে থাকলেও বিব্রত মানসিক বোধ অতিক্রম করতে পারেনি।

যারা লোক-দেখানো বা লোকের জন্য উঁচু মিনার নির্মাণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে মিনারে তারা বাস করে না, অর্থাৎ এই নির্মাণ ব্যয় মিটাতে পারলেও তারা জানে সে অর্থ সদার্থে অর্জিত নয়। জীবন বিরোধের এই নীতি সিদ্ধাচার্যরা তৎকালে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন।

তিনি বলেছেন এটা হচ্ছে আমাদের ব্যঙ্গের সংসার, তাত্ত্বিক ভাষায় 'ব্যঙ্গ' অর্থ যাই হোক, শাব্দিক অর্থ ভেক অথবা বিদ্রূপ বা শ্লেষ, এ জীবন যাপন করে চিন্তকে ব্যঙ্গ করছি। চিন্তকে বোধি দেওয়া আমাদের কর্তব্য, তা না করে অন্য কিছু দিয়ে তাকে তুষ্ট রাখার হলনা করছি। এটাই চিন্তের জন্য ব্যঙ্গ। আবার জনাহত জীবন নিয়ে বেঁচে আছি। দারা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র সংসার পেতে তাকে বাড়িয়ে তুলছি তাকে সামলানো যাচ্ছে না। ব্যাঙ থেকে যত ব্যাঙাচি সবই বোধিহারা চিন্তের মত বেড়ে চলছে। পাঠান্তরে রয়েছে এটা যেন সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি। তবে ইংগিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদি সাপ নিয়ে খেলছে ব্যাঙ রূপ চিত্ত। কোনও সময় চিত্তকে সাপ খেয়ে ফেলে আমরা টের পাই না। আর এভাবে জীবন হলে তাকে সামলানো অসম্ভব, কারণ একবার দুধ দোয়া হলে সে দুধ বাঁট দিয়ে আবার পালানে ঢোকানো যেমন যায় না, এ জীবন এমন করে অতিবাহিত হলে কিংবা এমন করে জন্মাশ্রিত হলে তাকে ফেরানো প্রায় অনুরূপ।

যে দুধরূপী জীবন দোয়ানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে গাভীর বাঁট থেকে এ জীবন আসে নি; বলদের থেকে; যেন বলদ বিয়াল। বলদ বিয়ানো কেবল আধ্যাত্মিক ধারণা নয়, লৌকিক ধারণায় তা স্পষ্ট; যার যা সাধ্য নেই তা করছে, রাষ্ট্র চালনার উপযুক্ততা নেই, স্কুলের গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়নি সে হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান। মামার জোরে কুমাওরা ভালো চাকুরি পেয়ে যাচ্ছে, যোগ্য গাভীরা চাকুরি না পেয়ে সারাজীবন বাঁজাই থেকে যাচ্ছে। একাডেমীতে অর্থ প্রবেশ করিয়ে একাডেমী পুরস্কার পাচ্ছে, প্রকৃত গুণীজন তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারছে না। কে জানে ধর্মকথা চিন্তে নেই অথচ ধর্মগুরু হয়ে থের, মহাথের হয়ে মঠাধ্যক্ষ হয়ে যাচ্ছে; তা হলে তো বলদই বিয়ালো। অনেক সময় প্রধান স্রোতে পড়েও বলদ বিয়ায়; সামান্য এক সৈনিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যেতে পারে, ইতিহাসে দাসও সুলতান হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। সে ক্ষেত্রে বলদের দুধও কম থাকে না।

এখানে কবি নিজের দেহরূপ বলদ আর চিত্তরূপ দুধের ইংগিতও দিতে পারেন, তিন সন্ধ্যা এ দুধ দোয়ানো হয় তিন বেলার ইংগিত জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে লক্ষ্য করতে পারেন, কারণ এই রূপ কথাগুলো সবই প্রাসঙ্গিক। তাহলে এ কথাগুলো যে বুঝবে সেই নির্বোধ; সত্যিই নির্বোধ; সত্য কথা অপ্রিয়; যারা জ্ঞানী তাঁদের অনেক সময় পাগল আখ্যা জুটে যায়। যে চোর সে অনেক সময় সাধু সেজে পার পেয়ে যায়। কত খুনি খালাস পেয়ে যায় আর বিচারকদের বিব্রত হওয়ার কারণে কিংবা টেলিফোনে প্রভাবান্বিত হওয়ার জন্য মারাত্মক অপরাধী নির্মল সাধু রূপে পরিগণিত হয়। তাছাড়া অনেক সময় অনেক লোক নিজেকে পাপী ভাবেন, কিন্তু কোনও পাপী নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করে না। এ সংসারের নিয়ম তাহলে কী? নিয়ম হল প্রতিনিয়ত শেয়ালরাই এখানে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা শেয়ালরা সিংহের সমান যুদ্ধ করে। সিংহ যদি পশু হয় বর্তমানে তার সেই ক্ষমতা নেই, সব শেয়াল ক্ষমতাবান হয়ে সিংহের সমান হয়েছে। ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করে কাক এখন কাকত্ব হারিয়েছে, অথবা কে কাক আর কে ময়ূর সে চেনার লোক কদাচিত্ দেখা যাচ্ছে। ঢেংঢেং পা এর গতি খুব বিরল লোকে বোঝে।

এ কবিতায় সমাজচিত্রের অনবদ্য আলোকপাত রয়েছে; তৎকালীন জীবনের হাঁড়িতে ভাত না থাকার কথা এসেছে, সাধারণ মানুষের জীবন অভাবমুক্ত ছিল না, প্রতিদিনের যা সংগ্রহ হয়তো বা দুঃসাধ্য ছিল। বাংলাদেশ খুব উর্বরা, অতি সহজে তাতে শস্য উৎপাদন হয়। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ এ শুধু স্বপ্নের প্রতিপাদ্য অথবা কথার কথা। আবহমান কাল থেকে বাংলার মানুষ নিরন্ন কিংবা অভাবগ্রস্ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন ফসলহানি হলে দুর্ভিক্ষে ভয়াবহ আকারে গিয়ে না খেতে পেয়ে লোক মরত। ভিন্ন অঞ্চলের দস্যুদের ওপর এবং দুরাচারের কারণে মানুষ কষ্টে ভুগত। এক কথায় লোকের দুঃখ-দর্দশার তত্ত্ব ছিল না। এখানে অতিথি অর্থে অপরের নিকট

পাঠান্তর

১. সুন করুণার। ২. অভিনচারে। ৩. কাঅবাকচিত্র। ৪. অলক্ষলখ, অলকখলকখ।
 ৫. চিত্রা। ৬. মহাসুখে। ৭. কসন্তে। ৮. তন্তে। ৯. কাণবখানৈ। ১০. অঙ্গ পইঠা।
 ১১. মহাসুখলীনে। ১২. ভুঞ্জহ, ভুঞ্জ। ১৩. লুয়ী,... লুই পাএ পসাএ। ১৪. দারিঅ।
 ১৫. ভুঅণে। ১৬. লাভা, লধা।

শব্দার্থ ও টীকা

সুণ করুণরে—শূন্য করুণ, সংবৃত্তিসত্যশূন্য করুণা। অভিনচারে—অভিন্ন আচারে, অভেদ উপচার। গঅণত—গগনে। পারিমকূলে—পরমকূলে, খুব সন্নিহিতে, পরপারে। অলকখলখ—অলক্ষ্যলক্ষ্য। চিত্তা—চিত্ত। কিস্তো—কিসের, কী হবে? মন্তে—মন্ত্রে। ঝান বাখানে—ধ্যান ব্যাখ্যান। অপইঠান—অপ্রতিষ্ঠান অপ্রতিষ্ঠিত। ভুঞ্জই—জ্ঞান করে। ইন্দি—ইন্দ্রিয়। সঅলানুত্তর—সকলই শ্রেষ্ঠ। রাআ—রাজা। অবর—পর। পাঅপএ—পাদপদ্মে। ভুঅণে—ভুবনে। দ্বাদশ ভুঅন—দ্বাদশ ভুবন, বৌদ্ধ মতে নির্বাণের দ্বাদশ অবস্থান। লাধা—লাভ হয়।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

শূন্য করুণার অভিন্ন আচারে কায়বাকচিতে (আধারমূলে)।
 বিলাস করেন দারিক গগনের পরম কূলে॥
 অলক্ষ্য লক্ষ্যচিত্ত মহাসুখে (মিষ্টে)।
 বিলাস করেন দারিক গগনের পরম কূলে॥
 কিসের মন্ত্র কিসের তন্ত্র কী হবে ধ্যান ব্যাখ্যানে।
 অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখ লীন দুর্লক্ষ্য পরম নির্বাণে॥
 দুঃখে সুখে এক করে ইন্দ্রিয় ভুঞ্জন করে জ্ঞানী।
 আপনাপর ভেদ না করে দারিক সকল শ্রেষ্ঠ মেনে নি॥
 রাজা রাজা রাজারে অপর রাজা মোহে বাঁধা
 লুই পা প্রসাদে দারিক লভে দ্বাদশ ভুবন (ধর্মধা)।

গদ্যে রূপান্তর

শূন্য করুণার অভিন্ন আচারে দারিক পা কায়বাকচিতে গগন অন্তরালের পরম কূলে বিলাস করেন। অলক্ষ্য লক্ষ্যচিত্ত হয়ে মহাসুখে দারিক পা কায়বাকচিতে গগন অন্তরালের পরম কূলে বিলাস করেন। অলক্ষ্য লক্ষ্যচিত্ত হয়ে মহাসুখে দারিক গগনের পারাপারে বিলাস করেন। কী হবে মন্ত্রে, কী হবে তন্ত্রে কিসেরই বা ধ্যান ব্যাখ্যান? অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখ লীন হলে পরম নির্বাণ তো দুর্লক্ষ্য। দুঃখ ও সুখকে একত্রিত করে ইন্দ্রিয়কে বোঝেন জ্ঞানী। আপনাপর ভেদভেদ না করে দারিক সকল অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) মেনে নিলেন। রাজা রাজা বাজারে অপর রাজা মোহে আবদ্ধ, লুই পা পদপদ্ম (প্রসাদে) দারিক দ্বাদশ ভুবন লাভ করেন।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

করুণা সংবৃত্তিসত্য শূন্যতা, তার নিষ্ঠিত রূপ হল পরমার্থ সত্য। উভয় ভেদ উপচারে গৃহীত গুরুপ্রসাদপ্রাপ্ত সিদ্ধাচার্য দারিক গগনের আলোকাদশন্য ত্রয়বোধক, তার পার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাস্বর মহাসুখে পরিশুদ্ধ কায়বাকচিহ্ন বিভাব নিয়মে বিলাস করেন। অনুৎপাদন লক্ষ্যে চিত্ত লক্ষ্য তেমন প্রভাস্বর চিত্তে বিলাস সুগমপর হয় না। মন্ত্রে নয়, বাহ্য মন্ত্র জপে যোগী কী তন্ত্রে তন্ত্র পাঠ করেন? ধ্যান ব্যাখ্যান বা কী? অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখ লীলায় তার নির্বাণ দুর্লক্ষ্য। দুঃখে সুখে পরমার্থসত্ত্বসহ একীভূত করে গুরুনির্দেশিত বিষয়ান্দ্রিয় ভোগ করে জ্ঞানী। এতদুপায়ে সকল অনন্তরগত দারিক সংসারে আপনাপর বিভাগ ভেদ লক্ষ্য করেন না। রাজা রাজা রাজা উজ্জিত্রয় নিজের ঐশ্বর্যাদি গুণসূচক। লুই পা-এর পাদ প্রসাদে প্রাপ্ত দ্বাদশ ভূমির জিনপুর দারিক লাভ করেন।

সমীক্ষা

কায়বাকচিহ্ন অভিনু আচারে সাধনা করেন বজ্রযানি যোগী; কিন্তু তাত্ত্বিক বাহ্য আচারকে অদ্বয় পরমতত্ত্ব জ্ঞান করেন তাঁরা। সর্বশূন্যতা যোগাবার বজ্রযানি পন্থায় বিজ্ঞপ্তিমাত্র নামান্তর। তা হল মহাসুখ সহজানন্দের মার্গ-অনিবার্য ও বাকপথাতে এটাই পরম বুদ্ধত্ব। কিন্তু মহাযানি বা বজ্রযানিরা বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা করেন না, করেন শূন্যতা অথবা বোধিচিহ্ন তাদের লক্ষ্য। সহজানন্দের অবস্থান সহজকায়। এই চর্যাপদ সহজকায় সাধনা এবং সমস্ত আচাররহিত বজ্রযানি মতবাদ। যদিও সহজ কায়ের কল্পনা বজ্রযানে নতুন, কিন্তু প্রাচীন চিন্তা-ত্রিকায় এতে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ১. নিম্নভিত্তে নির্মাণকায়, ২. হৃদয়ে ধর্মকায়, ৩. কণ্ঠে সন্তোগকায়। তাই কায়বাকচিহ্ন কথাটা সাধারণ সর্বপ্রকার সাধ্য সাধনার চাইতেও গভীরতর। বজ্রযানিরা বললেন মহাসুখ বা সহজানন্দ থাকে শূন্যতায় বা গগনে, শূন্যতা ও আনন্দ পৃথক যেমন, তেমনি অভিনুও বটে। শূন্য অতিশূন্য মহাশূন্য অতিক্রম করে গগনের প্রান্তে সহজকায় পৌঁছায় সর্বশূন্যে। অন্যান্য চর্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমানন্দ, পরমানন্দ ও তৃতীয়ানন্দ অতিক্রম করে সহজকায় যায় সহজানন্দ প্রান্তে। এখানে চিত্তের মহাসুখে শিথিলতা।

সিদ্ধাচার্য দারিককে মনে পড়ায় যায় নতুন পন্থার বজ্রযানি, যিনি তন্ত্র মন্ত্র কোনও কিছুই বিশ্বাস করেন না। তাছাড়া তিনি শূন্য ও করুণাকে অভিনু আচারে সাধনা করেন। শূন্য ও করুণার ভিন্নতা ও অভিনু বিষয়ে তত্ত্বের এখানে উল্লেখ বাহুল্য। তবে নিশ্চয়্যার্থ দারিক পা ভিন্ন ভিন্ন শূন্য মার্গ অতিক্রম করে সর্বশূন্যের পরমসুখে বিলাস করেন। তাই তিনি বলছেন, অলক্ষ্য লক্ষ্য চিত্ত মহাসুখে দারিক গগনে পরম সুখে বিলাস করেন।

তাত্ত্বিক মহাজন সাধকরা এতদিন ধরে যে সাধনা তপস্যায় কিংবা কায়সাধনে অভীষ্ট লক্ষ্য নির্বাণ বা মোক্ষ অর্জনের জন্য নানা উপচার তন্ত্র মন্ত্র কিংবা ধ্যান প্রাণায়াম জড়ো করেছেন, দারিক তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে বললেন, কী হবে মন্ত্রে, কী হবে তন্ত্রে কিংবা কিসেরই বা ধ্যান ব্যাখ্যান? এ সব তো সর্বশূন্যের জন্য কিছুই উপযোগী নয়, এ সব বাঁকা পথে খাল বিখাল ডোবায় হয়তো বা মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। মহাসুখ লীলায় এরা সব অপ্রতিষ্ঠিত, আর এটা জানা কথা যে লক্ষ্যবস্তুর অপ্রতিষ্ঠিত হলে পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য।

তাহলে কারা এ দুর্লক্ষ্য ব্যর্থ করে অথবা লক্ষ্য স্থির করে এগুতে পারে? তাঁরা নিশ্চয় জ্ঞানী, তাঁরা দুঃখ-সুখকে এক করে অনুভব করেন। তাঁদের কাছে দুঃখ যা সুখও তাই। জীবন যা মৃত্যুও তাই। জীবন মৃত্যু তাঁদের কাছে একাকার। সে জন্য বলা হয় জীবন্তে মরা। জীবন্ত ও মৃতের ভেদাভেদ তাদের নেই। এমন ইন্দ্রিয়াতীত বিজ্ঞ জ্ঞানী সব কিছু বোঝেন। দারিক পা বলেন, সেই জ্ঞানী, তিনি আপনাপর ভেদাভেদ শূন্য। অন্য সিদ্ধাচার্য বলেন, ভয়ঘৃণা তাঁর কাছে লেশমাত্র কিছু নেই। অর্থাৎ সকল লৌকিক ও পার্থিব বস্তুর

আকর্ষণ এবং আশ্রয়ের উর্ধ্বে তিনি। তাই তিনি নির্বাণ লাভ করার জন্য সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দারিক পা বলেছেন, রাজার গল্প এক রাজা অন্য রাজার সঙ্গে সম্পর্কিত আবদ্ধ, অন্য রাজা মোহে আকৃষ্ট, এ কথার অর্থ এই যে, রাজা বলতে আমরা বুঝি যে প্রভূত ঐশ্বর্য সম্পদের অধিকারী, তবু সম্পদের মোহে রাতদিন পলকহীন। কী করে অপরের রাজ্য ছলেবলে কলে কৌশলে করায়ত্ত করে নিজের ঐশ্বর্য বাড়াবেন এ জন্য তৎপর। তাঁর অধীনস্থ সকল জনকে এজন্য নিয়োজিত করে রেখেছেন। রাজা বলতে শুধু রাজ্যের অধিকারী রাজা নয়, বিত্তসম্পদের যে অধিকারী, হোক তার বিত্ত যৎসামান্য সে বিত্তকে আরও বাড়াতে দিনরাত প্রত্যেকে নিবেদিত প্রাণ, এ যে ইন্দ্রিয় উপভোগের ক্রীড়াক্ষেত্র। কে কাকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে খেলায় জিতবে সে প্রয়াস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এ ভোগ ঐশ্বর্যের লীলাখেলায় কেউ জিততে পারে না। একবার লড়ে পরাজিত হলে আবার লড়াইর জন্য মাঠে নামে, অর্থাৎ আবার পুনর্জন্ম ঘটে। নির্বাণ আর তাতে জোটে না। কিন্তু দারিক পা তাঁর গুরু লুই পা-এর পাদপদ্ম প্রসাদে দ্বাদশ ভুবন লাভ করেন। দ্বাদশ ভুবন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বোধিচিন্ত বস্তুত শূন্যতা ও করুণা কিংবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের বিভিন্ন প্রকার মিলনের অবস্থা। টীকায় বলা হয়েছে ‘চিন্তা সংজ্ঞা দ্বিবিধা লৌকিকী লোকান্তরা চ’। ছয় ভাগে লৌকিক বিকল্প লক্ষণযুক্ত লোকান্তরা নির্মল দৃঢ় অচ্যুত সারযুক্ত, নির্বিকল্প সুখযুক্ত, তাই নিস্তরঙ্গ বোধিচিন্ত কমলকুলিশ।



প্রেট ১৩ : দারিক পা

দারিক পা

টীকাকারদের উল্লিখিত দারিক পাদ, তিনি রাজা দেবপালের সময় বর্তমান ছিলেন। অর্থাৎ ৮১০ থেকে ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর; পণ্ডিতদের মত হল তিনি উড়িষ্যার অধিবাসী; রাজার উল্লেখ থাকার জন্য অনেকে মনে করেন তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক হল, ‘সপ্তম সিদ্ধান্ত’ ‘সহস্রনাম তত্ত্বোপদেশ’ ‘তথা’ দৃষ্টি ইত্যাদি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাদ্রে পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাদে বলেন অভাগ্য নিয়ে (মরি) ।
চিত্তরাজকে আমি আহাৰ করি॥

গদ্যে রূপান্তর

এতকাল আমি ছিলাম নিজের মোহে আচ্ছন্ন, এখন সদগুরুৰ উপদেশে তা কাটিয়ে উঠে জ্ঞানলাভ করে বুঝলাম, এখন চিত্তরাজ আমার বিনষ্ট হয়েছে। এবার আমি গগন সমুদ্রে বিচলিত হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম যে দশদিক শূন্য। চিত্ত বিচ্ছিন্নতায় বা চিত্ত অলগ্নতায় বা চিত্ত বিহনে পাপও নেই পুণ্যও নেই। বজ্রগুরু আমাকে লক্ষ্য ভেদ করার উপায় বলে দিলেন। আমি গগনে প্রবেশ করে গগনের পানি আহাৰ করলাম। ভাদে বললেন, আমি অভাগ্য, চিত্তরাজকে সঙ্গে নিয়ে আহাৰ করলাম।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

অনাদি সংসারে কল্যাণমিত্র সংসর্গপ্রাপ্ত মোহ বাহ্যবিষয়াসঙ্গে এতকাল (অধিক কাল) অবস্থিত থেকেছি। ইদানিং বুদ্ধানুভব প্রাপ্ত সদগুরুবোধ প্রসঙ্গে আমার চিত্তের স্বরূপ অবগত হয়ে দৃঢ় হয়েছি। ইদানিং পরিপক্ব সংযোগাক্ষর সুখে চিত্তরাজ্য আমার গমন বিনষ্ট প্রকৃতি প্রভাস্বরে প্রবিস্ট হয়েছি। সর্বধর্ম উপলক্ষ যোগে যে যে চিত্তের অংশ দেখি সে সে সর্বশূন্য প্রভাস্বরময় প্রতিভাত হয়। তাই চিত্তের অলগ্নতায় পাপপুণ্যাদি সংসার বন্ধন কী তা জানলাম। বজ্রকূলে বজ্রগুরুৰ লক্ষ্য ভাবমুক্ত চতুর্থার্দশ উপায় প্রদত্ত হওয়াতে আমি পুনরায় সাদর নিরন্তর অভ্যাসে গগনের প্রভাস্বর সমুদ্রে (পানি) আহাৰ করলাম। অনুৎপাদক ভাগ গ্রহীতা ভাদে পা অনাদি ভব বিকল্প ধার চিত্তরাজ সর্বধর্ম উপলভ্য সমুদ্রে প্রবেশ করলেন।

সমীক্ষা

আপন মোহে আবদ্ধ থাকার জন্য মানুষ আত্মপর চিনতে পারে না। আত্মাকে চিনে না। যে নিজেকে চিনতে পারে না, সে জগতকেও চিনতে পারে না। কবি ভাদে পা তাই খেদে বললেন, এতকাল আপন মোহে আপনাকে নিয়ে ছিলাম, আত্মসুখে আচ্ছন্ন ছিলাম, আত্মকারাগারে বন্দী ছিলাম। সদগুরু আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। অপরাধী শাস্তি পেয়ে কারাগারে বন্দী থাকে, একসময় তার বন্দিদশা ছিন্ন হয়। এই নির্দিষ্ট সময়ে সে যে অপরাধ করেছিল তার বিষয়ে অনুতপ্ত হতে পারে এবং সে যে একজন সৎ এবং বিবেকবান মানুষরূপে জীবন যাপন করতে পারে সেই আত্মজ্ঞান জন্মে। তাই কবি বলেন, সদগুরু আমাকে বন্দীদশা থেকে মোচন করে দিলেন। তাঁর উপদেশে অতঃপর জ্ঞান লাভ করলাম। জগৎ ও জীবনকে চিনতে ও বুঝতে পারলাম। আরও বুঝলাম যে আমার অপরাধ কী ছিল, আমার অপরাধ ছিল আমার চিত্তরাজ বিনষ্ট হয়েছিল।

মানুষের রাজা হচ্ছে তার চিত্ত। চিত্ত যা বলে তাই সবাই করে। চিত্তের শক্তি প্রকৃত শক্তি। চিত্ত অসমর্থ হলে দেহ কল্পরাজ্যে কিংবা মনোরাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কেউ কারও কথা শোনে না। ইন্দ্রিয় মলাদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে দেহকে অনিষ্ট করে চিত্তরাজকে বিনষ্ট করে। আত্মমোহে থাকার কারণে চিত্তরাজ যে বিনষ্ট হয়েছিল বোঝা যায়নি। তারপর শূন্যতায় বা গগন সমুদ্রে প্রবেশ করার সময় বিচলিত হয়ে বা টলে প্রবেশ করতে হল। টলে প্রবেশ করলেও সেখানে দেখলাম দশদিক শূন্য। দশদিক শূন্য কথার ধর্মীয় ব্যাখ্যা হল, নির্বাণের দশভুবন লাভ করা হল। দশদিক শূন্য যার তার কিসের পাপ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbot.com ~

আর পুণ্য? কোন্টা পাপ আর কোন্টা পুণ্য তাকে তখন স্পর্শ করতে পারে না, কারণ সে তো দেহচ্যুত।

অন্য লৌকিক ব্যাখ্যায় দশদিক হল পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি। এ কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত, চিত্ত যে দিকে যায় চিত্তের গতি নিয়ে যদি যেতে না পারে তবে তার বল নষ্ট হয়। দুর্বল সে, দশদিক তার শূন্য। দুর্বলের আবার কিসের পাপ পুণ্য? কোন্টা পাপ কোন্টা পুণ্য সেটা বোঝার ক্ষমতা তার থাকে না। মানসিক বোধহীন লোক নির্জীব, পশুতুল্য, তার পক্ষে পাপ পুণ্য কী? বাঘ মানুষ খায় এ কর্মটি বাঘের জন্য পাপ নয়; কিন্তু মানুষ যদি অযথা বাঘ মারে কিংবা বাঘের মাংস খায় সেখানে প্রশ্ন আসে, এ কর্মটি পাপ না পুণ্য? মানুষের পক্ষে বাঘের মাংস খাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্ষুধার্ত বাঘের জন্য মাংসের দরকার। সামনে মানুষ পেলেই সে খাবে। মানুষ ক্ষুধার্ত হলেও তার জ্ঞানের ফলে সে জানে জীবহত্যা পাপ, তাই ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুমাত্র সহ্য করে। প্রাণীহত্যা পাপ থেকে রেহাই পেতে অন্য আহাৰ্য গ্রহণ করতে পারে, বরঞ্চ এখানেই তার পুণ্য। কিন্তু চিত্ত বিনষ্ট হলে তো ক্ষুধার বা ইন্দ্রিয় বিষয়াদির আসক্তি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।

তাই কবি বলেছেন এ বিষয়ে বজ্রগুরু জানেন সব কিছু। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে কী তা বলে দিলেন। সে লক্ষ্যে অবিচল চিত্তে শূন্য গুণে প্রবেশ করে শূন্যতা আহাৰ করলাম। এখানে গগনের জলপান করার একটা ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে। জল সাধারণত আধারে স্থিত, সমুদ্র বা পাত্রাধারে। কিন্তু যখন বজ্রাভূত হয় তখন সে গগনে উত্তীর্ণ। মেঘের আধারে থাকলেও থাকতে পারে। আকাশে শূন্যে, শূন্যেও বায়ুর আধারে বিরাজ করে। তাই এ উপমা একটি অসাধারণ প্রয়োগ। চিত্ত জলপান করা মানে জলের মনোবিলীন হয়ে যাওয়া এবং নির্বাণ লাভ করা। ভাদে পা নিজেকে যদিও অভাগা বলেছেন, কিন্তু তিনি তো প্রকৃত ভাগ্যদান; তিনি চিত্তরাজকে জল পান করাতে পারলেন।



ভাদে পা

ভাদে পা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি, শাস্ত্রীও জানান নি; তবে তিব্বতিসূত্রে জানা যায়, মণিপুরে তাঁর জন্ম হলেও, পরে তিনি শ্রাবস্তীতে বসবাস করেছিলেন সম্ভবত নবম শতকে।

চর্যা-৩৬
রাগ পটমঞ্জরী
কাহু পা

সুগং বাহ তথতা পহারী।
মোহভাগর লই সঅনা অহারী ॥ ১ ॥
ঘুমই গ চেবই সপর বিভাগা ৩।
সহজ নিদালু ৪ কাহিলা লান্না ৫ ॥
চেঅন গ বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল ৬ করি সুহে সুতেলা ৭ ॥
স্বপনে মই দেখিল তিহুন সুন ৮ ॥
ঘোরিঅ ৯ অবণাগমণ বিহুন ১০ ॥
শাখি ১১ করিব জালকরি পাএ।
পাখি ১২ গ রাহঅ ১৩ ঘোরি পাণ্ডি আচাএ ১৪ ॥

সুগং বাহ তথতা পহারী।

মোহভাগর লই সঅনা অহারী ॥ ১ ॥

ঘুমই গ চেবই সপর বিভাগা ৩।

সহজ নিদালু ৪ কাহিলা লান্না ৫ ॥

চেঅন গ বেঅন ভর নিদ গেলা।

সঅল সুফল ৬ করি সুহে সুতেলা ৭ ॥

স্বপনে মই দেখিল তিহুন সুন ৮ ॥

ঘোরিঅ ৯ অবণাগমণ বিহুন ১০ ॥

শাখি ১১ করিব জালকরি পাএ।

পাখি ১২ গ রাহঅ ১৩ ঘোরি পাণ্ডি আচাএ ১৪ ॥

পাঠান্তর

১. সুগ, সুশ, সুন, সূণ। ২. লুই। ৩. সপর বিভাগা, স-পর বিভাগা। ৪. নিদালু।
৫. মুকল। ৬. বিহুন সুন, সূণ। ৭. ঘোরিঅ, ঘানিঅ, ৮. বিহল, বিহুন। ৯. শাখি।
১০. পারি, পাশি। ১১. পাণ্ডি আচাড়ে, পাণ্ডি আচাদে। ১২. নাই।

শব্দার্থ ও টীকা

সুগবাহ—শূন্যবাস বা শূন্যতায় বাস, এখানে শূন্য বাসনা বা শূন্য বাহ, মুদ—
'সংখ্যাজ্ঞানে আলোকোপলব্ধি : বাসনাগারং বোধ্যবাং, তথতা—প্রজ্ঞা পরিমিত অবস্থা,
তথাগত বুদ্ধ, চিন্তার পরিশুদ্ধতা। পহারী—প্রহারকারী। মোহভাগর—মোহভাগর দেহ,
অবিদ্যাগার, বিষয় আসঙ্গলক্ষণ। সঅলআহারি—সবই আহার করা হল, সকল বিনষ্ট করা
হল। চেবই—লক্ষ্য করে, এখানে চেতন। ঘুমই—নিদ্রা; চর্যাপদ যে বাংলা শব্দে রচিত এই
ঘুম শব্দ থেকে স্পষ্ট, হিন্দি হলে এ ঘুম অর্থ ঘোরাকেরা বোঝাত; সম্ভবত প্রাকৃত ভাষায়
'ঘুম্ম'। সপর বিভাগা—আপন পর বিভাগ। কাহিলা—কাহু+ইলা, তুচ্ছার্থে। লান্না—
উলঙ্গ। চেঅন গ বেঅন—চেতন না বেদন। সুতেলা—সুইল। তিহুন—ত্রিভুবন।
কোরিঅ—আবর্তন, ঘুরপাক। শাখি—সাক্ষী। পাখি—পক্ষে থাকা জন। পাণ্ডি আচাএ—
পণ্ডিত আচার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

শূন্যতা বাহুতে তথতা প্রহার করে।
 মোহভাগুর নিয়ে সকল আহাৰ করে॥
 ঘুমন্ত না জাগ্রত আপন পর ভঙ্গ।
 সহজ নিদ্রা প্রিয় কাহু পা উলঙ্গ॥
 চেতনা না বেদনার ভর নিদ্রা গেল।
 সকল সুফল করে সুখেতে শূল॥
 স্বপ্নে আমি দেখলাম ত্রিভুবন শূন্য।
 ঘুরে ফিরে আনাগোনা বিহীন (ধন্য)।
 সাক্ষী করব জালঙ্কারি পা কে।
 পক্ষে (যদি) আমার পণ্ডিত আচার্য না থাকে॥

গদ্যে রূপান্তর

শূন্যবাসে অথবা শূন্যতা বাহুতে তথতা প্রহারক, মোহের ভাগুর সব নিয়ে গিয়ে আহাৰ করলেন। আত্মপর বিভেদ ভাগ বা বিভেদভাব নিয়ে তিনি ঘুমন্ত, না জাগ্রত; সহজানন্দ নিদ্রাপ্রিয় কাহু পা উলঙ্গ (পাগল)! চেতনায়ুক্ত কী কৈদায়ুক্ত বিভোর নিদ্রায় মগ্ন, সকল সুফল করে সুখে সুপ্ত হলেন। স্বপ্নে আমি দেখলাম ত্রিভুবন শূন্য তাই আনাগোনার আবর্তন নিঃশেষ হল। জালঙ্কারি পাকে সাক্ষী করব, (যদি) পণ্ডিত আচার্য আমার পক্ষে না থাকে।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

আলোক উপলব্ধি বাসনাগারবোধক যোগী তথতা বাহুতে প্রহৃত (হয়ে) তাঁর বাসনা দোষ মোহ বিষয়াসঙ্গ লক্ষণ সকল দূরীভূত করলেন। সহজানন্দ যোগনিদ্রা যাওয়াকালে না চেতনা না ঘুমন্ত অবস্থা তাঁর, কাহু পা নিজে সহজানন্দযোগ নিদ্রাপ্রিয় তাই তাঁর জ্ঞান সকল ত্রিলোক পরিশোধ নির্ভর হল যা তার চিন্তা চেতনা বিকল্পে বোধিবেদন সূচক। পূর্বেজ্ঞক্রমের আনাগোনা চন্দ্রসূর্যমার্গ যাতায়াত ঋণিত হল, অবধৃতিকা পবন সহজানন্দ প্রবেশ করল। তখন তিনি স্বপ্নবৎ ত্রিভুবন দেখলেন শূন্য। গুরু জালঙ্কারি পা ধর্মে সাক্ষী তাঁর পদরেণু প্রসাদ যে যে গ্রন্থে (শাস্ত্রে বা তন্ত্রে) দৃষ্টিগোচর পণ্ডিত আচার্য সে সে তাঁর জ্ঞানে হস্তান্তর করবেন।

সমীক্ষা

প্রজ্ঞা পারমিত তথতা প্রহার করে, বাসনাদোষ মোহ বিষয়াসঙ্গ লক্ষণ থেকে যোগীকে মুক্ত করাই হল প্রহার। এখানে বশীভূত করার উপায় কিংবা শাসন নিয়ম হল তা। মোহের ভাগুর স্বরূপ দেহকে শূন্য করা হল, অর্থাৎ শূন্যতা আহাৰ করল। শূন্যতা সব সময় সজাগ, আত্মপর বিভেদ চেতনা তা নেই। এর তাৎপর্য হল সকল বন্ধন মুক্তি। এই মুক্তির সুফল হল সহজানন্দ স্বরূপ নিদ্রা। কাহু পার কাছ থেকে যখন মোহভাগুর ছিনিয়ে নেওয়া হল তাঁর দেহে আর কিছুই রইল না, এটা যেন আবরণহীন নয় এমন উলঙ্গ অবস্থা। তাই এই উলঙ্গ কাহু পা সহজানন্দে প্রবেশ করে সুগভীর সুপ্ততায় চলে গেলেন।

এ নিদ্রা হল জাগতিক অবস্থা থেকে মুক্তি, এতে চেতনা কী দুঃখ বেদনা শোকতাপ জরা-মৃত্যু ঐর কোনও প্রভাব নেই, অপার মহাসুখ। আবার দুঃখ ভোগ করার জন্য জন্ম নিতে হবে না, জীবন যাপন করতে হবে না, দুঃসহ জরাধ্বস্ত হয়ে মরবে না; এ সকল কষ্টকর অবস্থা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি—নির্বাণ। এটাই হল সুফল, এটাই হল সুখসুপ্তি।

নিদ্রায় স্বপ্ন এসে ভিড় করে, মৃত্যুর সঙ্গে নিদ্রার পার্থক্য হল মৃত্যুতে স্বপ্ন নেই কিন্তু সহজানন্দ যোগনিদ্রায় রয়েছে অপরূপ স্বপ্ন। নির্বাণ প্রাপ্তি হল সুগভীর সুখ নিদ্রা। যেহেতু আত্মপর ভেদহারা উলঙ্গ কাহু পা এ সুগভীর সুখ নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন ত্রিভুবন ব্যাপী শূন্যতা, ত্রিভুবন হল—দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবন-মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম। তাই স্বপ্নে কাহু দেখেন এই তিন অবস্থানে তিনি নেই। ত্রিভুবন ছেড়ে শূন্য অবস্থান নিয়েছেন, এখানে চেতনা বেদনাচিন্তা বলতে কিছু নেই। আর চন্দ্র সূর্য মার্গ গতায়ত বা যন্ত্রণার পথে ঘোরাঘুরি করবেন না। এই আনাগোনা আবর্তনের বিপাকে পড়ে কষ্টভোগ করবেন না। এমন জীবন তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেল। এই স্বপ্ন যে সত্য এবং কাহু পা'র জন্য নির্ধারিত সেটা জানেন জালন্ধরি পা। কারণ জালন্ধরি পা হয়তো তাঁর সদগুরু। তাঁরই নির্দেশে কিংবা তাঁর পদরেণু প্রসাদ খেয়ে তিনি এই ঘোরাঘুরি প্রক্রিয়া নিঃশেষ করতে সমর্থ হয়েছেন। অথবা জালন্ধরি পা হলেন অন্যতম সিদ্ধাচার্য গুরু, তিনি হয়তো বা কাহু পা'র সমস্থানীয় বা তাঁর সতীর্থ হতে পারেন। তিনি নির্বাণ সাধনসূত্রবর্ণন করছেন সমকক্ষ বা তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন। তাই কাহু পা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এখানে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনিও সহজানন্দ যোগনিদ্রায় ত্রিলোক পরিশোধ করেছেন। তা হলে কাহু যে সহজ সুপ্তি আনন্দ লাভ করেন এবং স্বপ্নবৎ ত্রিভুবন শূন্য দেখেন, একই ধারণার সাক্ষী হিসেবে জালন্ধরি পা সিদ্ধাচার্য রয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা দুজনে একই তাত্ত্বিক নিয়মে সাধনা করেন, তাই সাক্ষী হিসেবে জালন্ধরি পা রয়েছেন। কিন্তু পণ্ডিত আচার্য হয়তোবা তাঁদের এই মত সমর্থন করেন না কিংবা তাদের পক্ষে থাকেন না। মুনিদত্ত জালন্ধরি পা এবং পণ্ডিত আচার্য বিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। যেটুকু উল্লেখ্য তা এই 'শ্রীগুরুজালন্ধরীপাদাম যস্মি ধর্মে সাক্ষিণ কৃত্বা তেষা পাদাজরেণু গণপ্রসাদাৎ। যে যে পুস্তকদৃষ্টি গতাঃ পণ্ডিতাচার্যাঃ'। পণ্ডিত আচার্যের কী মতামত এখানে উল্লেখ থাকলে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সমাধান করা সম্ভব ছিল।

অন্য অনেক চর্যায় অন্য সিদ্ধাচার্যের উল্লেখ দেখা যায়। তাদের পদও আমাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু জালন্ধরি পা-এর কোনও পদ কিংবা তাঁর রচিত কোন পদের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম তিনি। এখানে সবেগে একটা সাধনচিত্রের বিভিন্নতা উদ্ভাসিত হয়েছে। ধারণা করা যায় জালন্ধরি পা এবং পণ্ডিত আচার্যের ভেতর বোধিচিন্তা বা নির্বাণ বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। ইতিপূর্বে বৌদ্ধ হীনযানি এবং মহাযানি পন্থায় নির্বাণ ধারণার আলোচনা হয়েছে; হীনযানি বোধিসত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে বুদ্ধত্ব অর্জিত হলেই কেবল নির্বাণ সম্ভব। কিন্তু মহাযানিরা একটু উদার, তারা মনে করেন বুদ্ধত্ব কেবল একজনই লাভ করেছেন—তিনি তথাগত বুদ্ধ। অন্যরা তা পেতে পারে না, তাঁর সমকক্ষ বোধিচিন্তা লাভ করলেই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যরা নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। এ চর্যায় কাহ্ন পা নির্বাণের পথকে আরও সহজতর করেছেন, তিনি বলেন—

ঘুমই গ চেবই সপরিবিভাগ।
সহজ নিদ্রালু কাহ্নিল লাক্সা॥
চেতন গ বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা॥

মুনিদত্তের ব্যাখ্যা—‘সহজানন্দযোগনিদ্রা যাত্তীতি ন চেতপতি। ন তত্র ভ্রষ্টো ভবতি। অতএব কৃষ্ণাচার্যসুন্দরো হি সহজানন্দযোগনিদ্রালুং। তথাচদ্বিকল্পে তস্যাং সহজানন্দনিদ্রায়াং ন চিত্ত চেতনা বিকল্পো বোধিনাদ্যতে। অতএব তেন জ্ঞানেন সকলমিতি ত্রৈলোক্যং পরিশোধ্য নিভরং যথাভবতি, যথা জ্ঞাননিদ্রাস্ততঃ’। দেখা যাচ্ছে নির্বাণ নির্দিষ্ট হয়েছে সহজানন্দযোগ নিদ্রা সর্বজ্ঞান ত্রিলোক পরিশোধ নির্ভরমুক্ত বোধি যা না চেতন না বেদন। তা হলে এমনও হতে পারে যে পণ্ডিত আচার্য এ তন্ত্র বিরোধী অথবা সমগ্র তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তিনি বলেন, যেমন দারিক পা বলেছেন,

কিস্তো মন্তে কিস্তো তন্তে কিস্তোরে বলি বাখানে।

তিনিও তন্ত্র মন্ত্র বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ পণ্ডিত আচার্য কিংবা দারিক পা সহজয়ানি বা মহাযানিভুক্ত নন। তিনি কাহ্নের নির্বাণ স্বপ্নকে সমর্থন করেন না।

পণ্ডিত আচার্য বলতে কেউ পণ্ডিত বিহারের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য-অধ্যক্ষকে বলা হয়ে থাকতে পারে। নালন্দা, মহাস্থানগড়, ময়নামতি চক্রশালার পণ্ডিতগণ ইত্যাদি বিহারে উৎকালে মতের বিভিন্নতা থেকে আচার্যরা সরে এসে বিভিন্ন স্থানে মঠ প্রস্তুত করেছিলেন। এ পণ্ডিত আচার্য হয়তোবা তাই করেছেন, অথচ সদগুরু হিসেবে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তা কাহ্ন পা সাধনমার্গ সমর্থিত নয়। ডান বা বাম এ ধারণা তখনই আকৃষ্ট হয়েছে, সিদ্ধাচার্য গুরুরা বার বার ডান বাম না গিয়ে ঋজু বা উজুপথের কথা বলেছেন। কিন্তু জালন্ধরি পা হয়তোবা পণ্ডিত আচার্যের সমকক্ষ, তাই কাহ্ন পা তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিয়েছেন। এ কথা থেকে দুজনের সাধনমার্গের ভিন্নতা স্পষ্ট।

এখানে লক্ষিতব্য যে, কাহ্ন পা-এর অন্যান্য পদের সঙ্গে এ পদের ভাবগত ভিন্নতা রয়েছে। এ চর্যায় উল্লিখিত বিভিন্ন রূপকল্প ও ভাবানুশঙ্গের প্রসঙ্গে অন্যান্য পদের ব্যাপক চিন্তাচ্যুত ব্যাপার থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এ চর্যা হয়তো কাহ্ন পা-এর রচনা নয়, ভনিতায় ‘কাহ্নিল’ থেকে কেউ কেউ এ নামের পদকর্তা আলাদা কেউ মনে করে থাকেন। তাছাড়া ভাব ভিন্নতা কারণে দ্ব্যর্থক চেতনা এ প্রশ্নের সমর্থক। তবে কাহ্ন পা কিংবা কাহ্নিল পা-এর কবি ব্যক্তিত্ব ও কাব্যরুচি প্রায় একই সমান্তরাল। তাই আলাদা কবির রচনা এ চর্যা নয়, বরং কাহ্ন পা হয়তো জীবনের কোনও এক সময় এই মতপার্থক্যের অবস্থানে ছিলেন।

চর্যা-৩৭

রাগ কামোদ

তাড়ক পা

অপনে নাই মো' কাহেরি সঙ্কা^১।
তাহা মুদারি টুটি গেলি^২ কংখা^৩ ॥
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোড়ি^৪।
চৌকোড়ি^৫ বিমুকা জইসো তইসো হোই^৬ ॥
জইসনে^৭ অছিলেস^৮ তইসনে^৯ অছ^{১০}।
সহজ পথক^{১১} জোই ভাতি মাহো^{১২} বাস ॥
বাও করুণ^{১৩} সন্তারে জাগী।
বাকপথাতিত কাঁহি বখানী ॥
ভগই তাড়ক এমু নহ' অবকাশ।
জো বুঝই তা গলে গলপাস ॥

পাঠান্তর

১. সো। ২. শঙ্কা, আপনে নাই মো' কাহেরি সঙ্কা। ৩. টুটাগেলী। ৪. কঙ্কা।
৫. চউকোড়ি, চৌকোড়ি, চউকোড়ি বিমুকা জইসো রইসো হোহি। ৬. হোহি।
৭. জইসন, জইসনি। ৮. ইছিলেসি। ৯. তইছা। ১০. অছ, আছ। ১১. পিথক।
১২. মা, মা হো। ১৩. করু, বাওকরু, বও করুণ।

শব্দার্থ ও টীকা

মহামুদারি—মহামুদার; ধ্যান আরাধনাকালে বিবিধ ভঙ্গিতে করাঙ্গুলি বিন্যাস দিয়ে সাধনার সাফল্য; যেমন—অভয়মুদা, বরমুদা, কিন্তু মহামুদার ভঙ্গি হল নির্বাণ লাভ বড়মুদা। কংখা—আকাজ্জা। চৌকোড়ি—চতুষ্কোটি, চার কোঠি, চার কোঠা, যথা—মুদ —‘চতুঃকোটিবিনিমুক্তভাবাৎ’। বিমুকা—বিমুক্ত। অছিলেস—ছিলে, আছিলে। পথক—পথে। ভাতি—ভুল, ভ্রান্তি। বাওকরুণ—পুরুষাঙ্গ ও অণুকোষ। গলপাস—গলায় দড়ি।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

আপনাতে নেই আমি করে বা শঙ্কা?
তবে মহামুদাতেই টুটে মোহ আকাজ্জা॥
সহজ অনুভব কর ভুলো না রে যোগী।
চতুষ্কোঠা (ভাব) বিমুক্ত যেমন তেমন হও (ত্যাগী)॥
যে রূপ ছিলে সে রূপই তো আছ।

সহজ পথের যোগী ভ্রান্তি না বাস॥
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষাঙ্গ অণুকোষ সাঁতারেই জানা যায় ।
বাকপথাতিত (জানা) কীরূপ ব্যাখ্যায়?॥
বলেন তাড়ক ঐর নেই অবকাশ ।
যে বোঝে তার গলে গলপাশ॥

গদ্যে রূপান্তর

আমি আপনাতে নেই তাই কাকেই বা শঙ্কা, তবে মহামুদ্রাতে টুটে গেল আকাঙ্ক্ষা । অনুভব কর সহজানন্দকে হে যোগী, তাতে ভুল করো না । চার কোঠা ভাব বিমুক্ত হওয়া যেমন তেমনি তুমি হও, যে রূপ ছিলে এখনও থেকে । সহজ পথের যোগী তুমি ভ্রান্তিতে অবস্থান করো না । সাঁতার কালে যেমন পুরুষাঙ্গ অণুকোষ কোথায় তা জানা যায় কিন্তু বাকপথাতিত কী রূপ ব্যাখ্যায় জানা যায়? তাড়ক পা বলেন এখানে (জানার) সে অবকাশ নেই, যে একথা বুঝবে তার গলায় ফাঁসি ।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

গুরুচরণেণু প্রসাদপ্রাপ্ত তথাগত বচনউপায় দ্বারে স্বকায় বিচরণাত্মক সম্বন্ধ লেশ আমার নেই । তাই আগন্তুক স্বল্প ক্রেশ মৃত্যু মার আদি থেকে শঙ্কা ভয় কিছু নেই । আত্ম বিস্তারদায়ী সে অর্থে বিকল্পভাবে আমার মহামুদ্রা সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পলায়ন করেছে । আত্মসংবোধ বলছে, হে তাড়ক পা, অনুভব দিয়ে সকলই সম্ভব, সে অনুভব সহজ কর, চতুষ্কোটি ভাববিমুক্ত পুনঃপুনঃ প্রকারে অবস্থান কর । উৎপাতকালে পরিধর নৈরাশ্র্য অভিসঙ্গ মহাসুখ তোমাতে উৎপন্ন হওয়াবজ্রধর সাদৃশ্য । পুনরায় বজ্রগুরুআশ্রিত সুদৃঢ় সহজপথ থেকে সিদ্ধাচার্য শত্রুক হও না । নিঃশঙ্ক সিংহরূপে ভ্রম জয় কর । পারাপারের সময় পারানি পানি দুই জনের কপর্দক অন্তেষণকালে পুরুষাঙ্গ অণুকোষ সুদূর হাতড়ে দেখে তেমনি ভীত সংবেদ লক্ষ্য সংযুক্ত ধর্মকথা লোকে বচনদ্বারে প্রতিপালন করে । তথা বাকপথাতিত ধর্মাধিগমের দ্বিগুণ মনে করে লোকে যোগী নিরূপণ করে । তাই সিদ্ধাচার্য তাড়ক পা বলছেন, যখন ধর্মে যোগী অবকাশমাত্র স্থাপিত নয় এমন পরমার্থবিদ তিনি যদি বলেন, আমিও ধর্মাধিগম করেছি, তাহলে স্বর্গীবায সংসারপাশ আবদ্ধ হয় ।

সমীক্ষা

এ চর্যার গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও অনুভূতি রয়েছে । আমি কে? আমার আমিকে চেনবার জন্য ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছ । নিজের এই যে স্বরূপ অস্তিত্ব আবিষ্কার করার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে চিন্তা করেছে, সাধনা করেছে, গৌতম বুদ্ধ ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করেছেন । এখানে আমাদের সিদ্ধাচার্য অনুরূপ ধ্যানমাধ্যম বাণীনিচয় সমর্থ সেই স্বরূপ অস্তিত্ব অনুসন্ধানী হয়েছেন । অথবা তাঁদের মতই বলছেন, আমার আমি বা আমার অস্তিত্ব এই বিশ্বপ্রবাহে কতটুকুই বা : যদি অস্তিত্ব বলতে কিছু নাও থাকে, বিশ্ব মায়াময় হয়ে থাকে আর আমিও নিঃস্ব হয়ে থাকি, অথবা আমার বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তো আমার কিছুরই শঙ্কা নেই, কাউকেই ভয় নেই, নিঃশঙ্ক নিরূপ । তাহলে আমার মহামুদ্রা লাভের আকাঙ্ক্ষা আর কেন? দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামুদ্রা ধ্যানযোগে নির্বাণ লাভ হয়, তাই এখানে মহামুদ্রা নির্বাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মসাধনা বা ধর্ম আরাধনায় বিভিন্ন ক্ষমতা অর্জিত হয়। সিদ্ধপুরুষ তিনি, যিনি তপস্যাতপের জপের অগ্নিতে নিঃশেষ না হয়ে ঘাঁটি হয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধপুরুষ তাঁর করাঙ্গুলির মুদ্রায় বিভিন্ন বর দান করতে সমর্থ হন। তাই মহামুদ্রা দিয়ে লাভ করা যায় সর্বশেষ বর, অর্থাৎ নির্বাণ বর। তাই কবি বলছেন, আমার অস্তিত্ব যখন নেই, পরম সাধনা-ধ্যান আরাধনায় আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি, তাহলে আর মহামুদ্রা প্রয়োগ করে নির্বাণ বর প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন হয়েছে।

পদকর্তা সিদ্ধাচার্য যোগী এই আত্মদর্শন নিয়ে সংশয়যুক্ত থাকলেও কবি যোগীচিন্তা তাঁকে বলছেন, যোগী সহজ আনন্দকে লাভ করার জন্য সোজা পথ অবলম্বন কর অথবা সোজা পথ ছেড়ে পৃথক পথে যেও না। তাতে নির্বাণ অনিশ্চিত। চতুষ্কোটি বিমুক্তি যেমন তেমনি হতে হবে। এই চতুষ্কোটি বিমুক্তি হল—‘চত্বারি অরিঅ সন্ধানি’—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ বিনাশ ও দুঃখে বিনাশের উপায়। এই চার কোটিতে প্রবেশ করে ‘অট্টাঙ্গিকমগগং’ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মকাণ্ড, সম্যক জীবিকা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এতেই রয়েছে বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভই জীবনের আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য। তাই কবি বলছেন, তুমি তাই হও।

কবি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না, যেভাবে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষায় জীবনযাপন করবে, সেই ইচ্ছায় নিয়োজিত ছিল সে ইচ্ছায় অটল থাকতে হবে। সহজ পথ ধরে বা সহজ পথ থেকে পৃথক না হয়ে চলতে হবে, এটা যেন ভুল না হয়। ডান বাম বিভিন্ন অবিদ্যা আকর্ষণে বিচলিত হলে চলবে না। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে কিংবা নিজের সম্পদ নিয়ে কবি প্রশ্ন তুলেছেন, জন্মাবধি তাঁর কী কী ছিল কিংবা আছে, কারা কারা তাঁকে সম্পর্কিত করে জীবনপ্রবাহে টিকে আছে। আসলে তারা কেউ নেই এবং কিছুই না। প্রমাণস্বরূপ যখন সাঁতারে পার হতে চায় তাহলে সে সময় কেউ তার সাঁতারসঙ্গি বা সাঁতার দ্রব্য থাকে না, কেবল পুরুষাঙ্গ অণুকোষ যে তার অস্তিত্বের সঙ্গে রয়েছে জানা যায়। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হল, পুরুষাঙ্গ অণুকোষ ইন্দ্রিয়াদি অবিদ্যার দ্বারা বিচলিত হয়। যে সাধনা সমুদ্র পার হতে অস্তিত্বহীন হয়ে নির্বাণ লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাকে পুরুষাঙ্গ অণুকোষ যে আছে তাও অস্তিত্বহীন করতে হবে।

মুনিদত্তের ব্যাখ্যায় এখানে সংগতি স্পষ্ট হয় না, পারাপারের সময় পারানি লোকের দেহ তালশ করে অর্থ আদায় করে যেমন কেবল পুরুষাঙ্গ অণুকোষ ছাড়া আর কিছু পায় না। এটাতে সে যুগের একটা চিত্র হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু এ চর্যার ভাবের সঙ্গে তা সুসংগত মনে হয় না।

কবি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই চিন্তাটাই বাকপথাতিত বাকপক্ষাতিত। এ জন্য যে আপন অস্তিত্ব অন্যের নিকট উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। অস্তিত্ব হল প্রজ্ঞা, এ তো হল বাকপথাতিত। বলে কয়ে ওনে বুঝে দেখে কোনও মতে প্রজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব নয়, প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। স্বীয় অস্তিত্ব রয়েছে প্রত্যেক জীবনে, বস্তুতে, আকাশে বাতাসে, অতীতে, ভবিষ্যতে সর্বত্র, আমার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্ব প্রকৃতি আছে, চন্দ্রসূর্য রয়েছে; নইলে তো এদেরও কারও অস্তিত্ব নেই। এ দর্শন বাকপথাভীত এবং ব্যাখ্যার অধীন নয়।

কবি তাড়ক এ বিষয়ে খুব সচেতন; তিনি বলছেন, এ ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে নেই, কারণ এর ব্যাখ্যা নিরর্থক; যেমন বলি আমার অস্তিত্ব রয়েছে সূর্যে। এর জন্য বিভিন্ন শব্দ হয়তো চয়ন করা যেতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ এতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নির্বাণ লাভ হলে অস্তিত্ব কোথায় থাকে? তা কি বাতাসে? আকাশে? সূর্যে? চন্দ্রে? না কোথায়? কেউ এর জবাব দিতে পারে না। তাই তা বাকপথাভীত। তাই এর ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। যে যে ভাবে বুঝবে তাই সত্য; কবি তাই শ্লেষ দিয়ে বলছেন, যে বুঝবে তার গলায় দড়ি। এ কথাও গভীর তত্ত্ব বটে।

বৌদ্ধধর্মতত্ত্বে নির্বাণকে শূন্য বলা হয়েছে (শূন্যবাদ)। শূন্যবাদী দর্শনের সঙ্গে এ তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট; ভগবানের অস্তিত্ব এখানে নেই, আর ভগবান থাকলে সকলে ভগবানের আশ্রয়ে যেত, তাই ভগবানহীন শূন্যেরই বা কী অস্তিত্ব?

মনে হয় তাত্ত্বিক কবি প্রতিবাদীরা তিনি একটি ভয়ংকর প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করেছেন—নির্বাণ বাকপথাভীত। তাড়ক আর কিছু জানতে চেয়ে না। চাইলে তুমি আর এ ধর্মের আশ্রয়ে থাকতে পারলে না, ধর্মবিচ্যুত হয়ে গেলে। অন্য ধর্মের বেলায়ও তেমনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ‘বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ’ বা ‘সৃষ্টিকর্তা সকলকে সৃষ্টি করেন’, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছেন এ কথা উচ্চারণ করা যায় না। এ চিন্তা বা জ্ঞান এ পর্যন্ত, এ হল বিশ্বাস, তা দিয়ে আর পারবে না; এর বাইরে গেলে ধর্মচ্যুতি ঘটবে।

লক্ষ্য করা যায়, বৌদ্ধ মহাযানি সম্প্রদায় যুক্তিবাদী এবং উদারপন্থী। এ পদে কবি সিদ্ধাচার্য তাড়ক পা আরও উদার এবং আরও যুক্তিবাদী। সে কারণে মনে হয় তাড়ক পা পরবর্তীকালের সিদ্ধাচার্য। পণ্ডিতরা তাঁর সময়কাল নির্ণয় করতে পারেন নি। তাঁর যথার্থ পরিচয়ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে যে চৌরশি সিদ্ধাচার্যের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেও তাড়ক পা-এর কোনও নাম নেই। সে তালিকাতে নাড়ক নাম থাকাকে কেউ কেউ তাঁর নাম নাড়ক পা বলেছেন, কিন্তু পদমধ্যে নাম রয়েছে তাড়ক এবং মুনিদত্তের ব্যাখ্যায় ‘জ্ঞান পান প্রমোদেন সিদ্ধাচার্যো হি তাড়কস্তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি’ উল্লেখ রয়েছে।

মিলে মিল সহজে যায় না অন্য (থা)॥
 পথেতে ভয় দস্যুও বলবান।
 ভর উতরোলে সকলই নিমজ্জমান॥
 কূল নিয়ে খর স্রোতে উজান বাও।
 সরহ বলেন গগনে সাক্ষাও॥

গদ্যে রূপান্তর

দেহখানি সুন্দর নৌকা, খাঁটি মন তার দাঁড়, সদগুরু বচন হাল বলে ধরে থাক। স্থির চিত্ত করে নৌকা ধরে রাখ, অন্য কোনও উপায়ে পার হতে পারবে না। নাবিক নৌকা পরিচালন করেন, লোকে গুণ টেনে নেয়। সহজ আনন্দের সঙ্গে মিলিত হও, অন্য কোনও উপায় পেতে যেয়ো না। পথে দস্যু-তরুর ভয়, তারাও বলবান। ভর উতরোলে সব কিছু নিমজ্জিত হয়। কূল ধরে খরস্রোত হলেও উজান বেয়ে যাও। সরহ বলেন, গগনে এভাবে প্রবেশ কর।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

আধার রাখার যোগ্য সম্বন্ধে স্বীয় কায়া নৌকা পরিত্যাগ না, মনোবিজ্ঞান হল হাল। সদগুরুবচন কাণারি, বজ্র জলজ সংযোগ ভব জলধিষেধ্য পঞ্চজ্ঞানাত্মক বিলক্ষণ শোধিত সংবৃত্তি বোধিচিহ্ন স্থির করে কায়া নৌকা রক্ষা করে। ভব সমুদ্র তত্ত্ব নানা উপায়ে প্রকাশিত। যেমন বাহ্য নৌকা কর্ণধার পরিচালনা করেন গুণটানিরা গুণটানে সেরূপ। বজ্রগুরু সহজানন্দ উপায় গ্রহণ করে নৌকা পরিত্যাগ কর। সদ্য মহাসুখ দ্বীপে অগ্রসর হও। বিষয়াসক্তি সাধে সর্বদা মার্গ ভ্রষ্ট হয়। চন্দ্র সূর্যদ্বয় বলবন্ত রয়েছে সে হেতু ভব সমুদ্র বিষয়োল্লাসে নৈরাশ্র্যের ধর্ম সর্ব প্রকরণ নিমজ্জিত। কূলে কুমার্গ কুশলবোধক চন্দ্রাদি যখন অবধূতি নিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি পরিপূর্ণাবধূতিকা মহাসুখ রাগ স্রোত আবর্তনে পরমার্থবিদ্ব যে বোধিচিহ্ন বজ্র তার উর্ধ্বাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে বৈমাল্যচক্রদ্বীপে অন্তর্ভুক্ত করায়।

সমীক্ষা

এ চর্যার ভেতর নৌকা এবং ভবনদীর রূপক প্রসঙ্গ এসেছে। অন্যান্য যেমন ৫, ৮, ১৩, ১৪, ৪৯ নং এ সব চর্যাতেও নৌকা, নদী, উতরোল জলতরঙ্গ প্রসঙ্গ রয়েছে, তাছাড়া এ সব চর্যাপদ প্রায় একার্থক। নৌকা নিয়ে ভবনদী পার হবার সমস্যা ও উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবি এ পদগুলোতে অসীম আলোতে ও রঙে রূপে প্রকাশিত হয়েছে। জীবন ও পরিবেশ ছাড়া ধর্ম অনুভূতিও ক্ষেত্র পায় না, ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে জীবন পরিবেশ সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়, সঙ্গে শিল্পবোধ সমৃদ্ধ হলে তা চিরায়ত ও মহান হয়, যেমন চর্যাপদগুলো। মরুভূমির ধর্মও সে পরিবেশ ও জীবন আশ্রয় করে প্রতিপালিত হয়। চর্যাপদের ধর্ম বাংলার নিসর্গকে প্রাণধর্ম করে এর রূপ ও সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য পদে যেখানেই নৌকা ও নদীর বর্ণনা আছে, এ পদে তাদের চাইতে অধিক সুচারু, সুষম এবং সুশৈলী রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, দেহখানিকে বলা হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র চমৎকার নৌকা, এই ক্ষুদ্র দেহ ঘিরেই তো সব কিছু, আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠান। দেহধর্মই প্রকৃতপক্ষে ধর্মসাধনার দুনিয়ার পাঠক গ্রন্থ হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল উপায় ও লক্ষ্য; দেহের ভেতর অবস্থিত মন দেহকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে; আসলে দেহধর্ম না বলে বলতে হবে মনোধর্ম, মনকে বিশুদ্ধ খাঁটি বিজ্ঞানী করতে পারলেই বিশুদ্ধ দেহ কিংবা খাঁটি ধর্মসাধনার উপায় হয়। কবি বলছেন, সদগুরুর বচন প্রসাদে মনকে বিশুদ্ধ করা সম্ভব আর তা হল একমাত্র উপায়। মন বিশুদ্ধ হলে স্থির চিত্ত দেহে অবস্থান করবে। স্থির চিত্তই বৌদ্ধমতে, দেহকে স্থির রাখে। দেহ নৌকা এলোমেলো বা ঘুরপাক জলে কিংবা বৈরি স্রোতে টেনে নিতে পারে না, ঘূর্ণিঝড়ের পরেও নৌকা উলটে যায় না। নৌকার হাল যদি দৃঢ়ভাবে ধরা থাকে তবে কিছুতেই বেহাল নৌকা হতে পারে না। সদগুরু বচনই হল দৃঢ়ভাবে ধরা হাল।

যেহেতু ভবনদী খুব খরস্রোতা এবং উত্তাল তরঙ্গ ক্ষুর, ওতে নিমজ্জিত হলে আর রক্ষা নেই, উদ্ধার পাবার কোনও উপায় নেই। তাই এ নদী পার হতে হলে তবে এ দেহ নৌকা সামাল দিতে হবে। দেহের মনকে খাঁটি করে নিতে হবে। তাছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই যে পার হতে পারা যায়। কীভাবে মনকে খাঁটি, দেহকে সুন্দর করতে হবে তাও সদগুরু বলে দেবেন।

বাংলাদেশের নদী অনেকগুলো খরস্রোতা, স্রোত যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে সহজে যাওয়া যেতে পারে। আবার বায়ুপ্রবাহ যে দিকে তার বিক্ষুব্ধিত দিকে পাল বা বাদাম তুলে নেওয়া যেতে পারে। আবার মাঝি হাল এবং বাদামের কৌশলে যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে নৌকার গতি ঠিক রাখতে পারে। কিন্তু খরস্রোতে উজান ঠেলে নিতে হয়, তখন কূলে কূলে গুণ টেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। লোকে কূল ঘেঁষে শক্ত রশি দিয়ে নৌকা বেঁধে টানতে থাকে আর মাঝি নৌকার স্পন্দন ধরে থাকে। তাই নানা কৌশলে নৌকা নিয়ে পার হওয়া বা গন্তব্যে যাওয়া যায়।

সহজানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এ দেহ নৌকা করে ভবনদী পার হতে হবে। নির্বাণ বা সহজানন্দ লাভ করার জন্য অন্য কোনও পথ নেই, উপায়ও নেই। যদি এ পথ সোজা এবং সদগুরুর উপদেশ পুষ্ট হয় তবে নিশ্চিত উপায়ে তা পার হবার সম্ভাবনা। তবু এ পথে দস্যু-তস্কর বলবানদের ভয় রয়েছে, তাদের হাতে খাণ্ডার বা খগড় রয়েছে তা দিয়ে আঘাত করে প্রাণহানি কিংবা নৌকা বিনষ্ট হতে পারে। দস্যু-তস্কর নিঃসন্দেহে এখানে ইন্দ্রিয়াদি কিংবা অধিবিদ্যারূপ বা চন্দ্র সূর্য নাড়ি দোষ ইত্যাদি। ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তা অনেক সময় সদগুরুর উপদেশের চাইতেও তারা শক্তিশালী হয়ে দেহে অবস্থান করে এবং মনের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। মনকে বিপথে চালিত করতে পারে।

তাছাড়া ভব সমুদ্র খুব উত্তাল, সেটা তো জানা কথা। দুঃখ যন্ত্রণা মোহমায়া জরা মৃত্যু মার দ্বারা খুব বেশি তাড়িত। এ সমস্ত উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ স্রোতে নৌকা চালানো কষ্টকর। এতে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা থাকে। যা কিছু উপার্জন সব কিছু নিয়ে তাহলে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। সরহ তাই বলেন, এসব সঠিক করে এভাবে গগনে প্রবেশ করতে হয়, গগন অর্থ শূন্যতায় অর্থাৎ নির্বাণে।

এ চর্যার ভেতর তৎকালীন বাংলার অমোঘ জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। নৌকায় গমনাগমন, নৌকায় গুণ টেনে নেওয়া, অনেক সময় নৌকায় জলদস্যুর আক্রমণ এসব তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বাংলাদেশের খরস্রোতা নদীর উজান বেয়ে যাওয়া জীবন অনুভূতি থেকে জনজীবনে কষ্ট সহ্য করার প্রতীকও অনুমান করা যেতে পারে। যা এখনও অহরহ দেখা যাচ্ছে।

[illegible]

পাঠান্তর

শব্দার্থ ও টীকা

দ্রুততার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

শূন্যে হস্ত স্থলিত রে নিজ মন তোরই দোষে ।
 গুরুবচন বিহারে থাকবি রে তুই ঘুরতে কীসে?
 আশ্চর্য হুঙ্কার উদ্ভূত গগন ।
 বঙ্গে জায়া নিয়েছিস পরে ভাঙল তোর বিজ্ঞান॥
 অদ্ভুত ভাব মোহ রে দেখায় পরকে আপন ।
 এ জগৎ জলবিষ্মাকারে সহজে শূন্য আপন॥
 অমৃত আছে বিষ গিলিস রে চিত্ত পরবশ নিজ (ভূম) ।
 ঘরে পরে কী আছে বুঝলে মেরে খাব আমি দুষ্ট কুটুম॥
 সরহ বলেন বরং শূন্য গোয়াল কী আমার দুষ্ট বলদে? ।
 একেলা জগৎনাশ করে বিহার করি স্বচ্ছন্দে॥

গদ্যে রূপান্তর

ওরে নিজ মন তুই শূন্যে হাত শিখিল করে দিয়েছ নিজের দোষে (তাই শূন্যে উঠতে পাচ্ছি না) । গুরুবচন বিহারে সর্বদা থাকবি (বার বার গুরুবচন অবধান কর বা গুরুবচন তীর্থ বার বার পরিদর্শন কর) ওরে তুই ঘুরবি আর কেন (শূন্যে ঘুরে আসা)? চেয়ে দেখ, আশ্চর্য হুঙ্কার উদ্ভূত গগন (গগন তোর জন্য আশ্চর্য হুঙ্কার দিচ্ছে) । বঙ্গে জায়া নিয়েছিস (এই ভুল) পরে তোর ভাঙল { যে জ্ঞান নিয়ে বঙ্গে জায়া (জন উৎপাদন করে যে) বসবাস করছিস যে জ্ঞান তোর ভাঙল } । অদ্ভুত ভাবমোহ, দেখায় পরকে আপন (জায়া পরিবার পর) । এ জগৎ জলবিষ্মাকার (টলমল এখনই আছে এখনই নেই) এখানে সহজানন্দ শূন্যতাই আপন । অমৃত থাকতে তুই কেন বিষ গিলিস? তুই নিজ থেকে পরবশ হয়ে রয়েছিস । ঘরে পরে (নিজের এবং পরের) কী আছে বুঝলে আমি এ সব দুষ্ট আত্মীয়দের মেরে খাব । সরহ বলেন, শূন্য গোয়াল বরং ভালো দুষ্ট বলদের চেয়ে (দুষ্ট বলদ আমার কী দরকার?) নিজেই এই (বাহ্য) জগত নাশ করে স্বচ্ছন্দে (শূন্যে) বিহার করি ।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

হে নিজমন চিত্তরাজ তোমার বিদ্যাদোষের কারণে সত্যরূপ গমন শিখিল হল । স্বপ্নে দ্রব্য অভিলাষ তুল্য গুরুবচনে ত্রৈলোক্য বিস্ফারিত, এ গুরুবচন স্থানে ঘুরে ঘুরে তোমার স্থিত হওয়া উচিত । আশ্চর্য গুরুপদ পদ্মপ্রসাদ হুঙ্কার বীজ উদ্ভূত গগন প্রভাস্বরে প্রবিষ্ট হও । বিদ্যাদোষে বিনাশকৃত এখন তোমার জ্ঞান ভঙ্গ হয়েছে । ভবসত্ত্ব সবই মোহময় অদ্ভুত, এখানে আত্মীয়কে পর ভেদ বিভাগ দেখায় । তাই অহংকারে মানস পরমার্থ চিত্তের উদয় হয় না । সহজানন্দ স্থিত সত্যরূপ বিপাক বিক্রিয়া হরণ করে । তা কর্মে বশ্যচিত্তের বিচারক । গৃহকৃষ্টতায় স্ফীতি রাগদ্বেষমোহাদিসমূহ তোমার গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাশ্র্য সমলিঙ্গ তাদের ভক্ষণ করে নিঃস্বভাবীকরণ কর্তব্য করে । সরহ পা বলেন, দুষ্ট বলদের মত দুষ্ট বিষয় বল প্রদায়ী দুষ্ট, বলদ চিত্তরাজ বোধক । একাকি সে দুষ্ট ত্রিলোক নাশ করে । সে দুষ্ট বলদে আমার কী কর্তব্য? সে গো ইন্দ্রিয় নিঃশেষিত, তার অবলম্বনে স্বকায় শূন্য প্রভাস্বর রূপ করে গুরুবচন প্রসাদপ্রাপ্ত স্বচ্ছন্দে ত্রিজগৎ বিহার করব ।

সমীক্ষা

বিষয়াদি মায়ামোহ সংসার আকৃষ্ট মনকে লক্ষ্য করে কবি সিদ্ধাচার্য সরহ পা বলছেন, আপন দোষে শূন্য টেনে নেবার হস্তকে তুমি শিথিল করে দিলে, নির্বাণের আকর্ষণ শিথিল বা বিনষ্ট হতে চলেছে। যে গুরুবচনকে তীর্থ করে বার বার তা প্রদক্ষিণ করে তা থেকে প্রসাদ নিয়ে সংসারে ঘোরাফেরা বা পুনর্জন্মের সূত্র ছিঁড়ে দিতে পারতে, তা তো করলে না। চেয়ে দেখ আশ্চর্য গুরুপাদপদ্ম প্রসাদ প্রাপ্ত হৃদয় উদ্ভূত গগন, অর্থাৎ গুরুপ্রসাদ উদ্ভূত হৃদয় গগন চিত্তকে আহ্বান করছে তাতে প্রবিশ্ট হওয়ার জন্য। লৌকিক অর্থে গগনের হৃদয় বজ্রঘোষিত, তার সঙ্গে সমন্বয় করে তাকে পারমার্থিক নাদ বা ওঙ্কার বলা হয়। এই ওঙ্কার উদ্ভূত গগন দেখে বলেন, তাকে আধ্যাত্মিক ভাষায় নির্বাণ সমাহিত আশ্চর্য ধ্বনি বলা যায়।

কবি বলছেন বঙ্গে জায়া সংসার নিয়ে বাস করছিস—এ মোহমায়া জ্ঞান তাতে (হৃদয় ধ্বনি) ভাঙল। ‘বঙ্গে জায়া নিয়েছিস’ এ কথাতে ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে, বঙ্গে কেউ জায়া নিয়ে যায় না, তুই নিয়েছিস তাই সে জায়া বঙ্গবাসীরা লুটে নিয়েছে, বঙ্গে জায়া নেওয়ার বুদ্ধি তাই তোর এবার নষ্ট হল। অন্য অর্থে বলা যায়, বঙ্গে জায়া নিয়ে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই, বঙ্গে প্রচুর জায়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে যে অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে তা এই, মাতৃভূমি বঙ্গে বা জন্মস্থানে (পুনঃ জন্মস্থানে) জায়া-সংসার-মায়া-মোহ নিয়ে আছিস, গগন হৃদয়ে সে মোহ ভঙ্গ হল। বঙ্গ কথা থেকে প্রাচীন কালেও এদেশের নাম বঙ্গ ছিল। এতে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্গ হয়েতো বঙ্গ কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল ছিল। এখানে বঙ্গ বলতে জন্মস্থান, এ দ্ব্যর্থপ্রয়োগ লক্ষিতব্য।

ভবমোহ নিদারুণ, সহজে এ মোহ থেকে উদ্ধৃত হতে পারে না। সংসার জীবন অনিত্য বটে, জীবনে সংসারের মোহমায়া বসেচেয়ে প্রবল। এই মায়ামোহ কারণে আত্মপর জ্ঞান করে সকলে, যার প্রতি যত মনোযোগ সেই সবচেয়ে প্রিয় এবং আত্মীয় আপন। সংসারের এ অনিত্য মোহ প্রকৃতপক্ষে আপন নয়, প্রকৃত আপন হল শূন্য। যদি আত্মসত্ত্ব সর্বস্ব দিয়ে, এমনকি নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও সংসারের মায়াকে আকৃষ্ট করে, এখানে সুখ উৎকৃষ্ট করতে চায়। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের ফলে এ মোহমায়া কাটিয়ে উঠতে পারে না। যা সুখকর মনে করে তা পরিণামে সুখ নয়, দুঃখেরই নামান্তর। দুঃখ বিনাশক মানুষের আপন হল তার নির্বাণ। কিন্তু মানুষ ভ্রান্তিবশত আপনকে লাভ করতে পারে না, অপরকে আপন করে রাখে। অথচ এ জগৎ জলবিন্দুর মত, একটু পরে তা নিঃশেষ হয়ে যায়, চিরস্থায়ী তাই গগন বা নির্বাণ। এ নির্বাণ অমৃতকে এড়িয়ে কেন যে মানুষ বিষ পান করে, বিষের প্রতিক্রিয়ায় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। অমৃত আর বিষ—এ উপলব্ধি অনেকের থাকে না। অনেক খাবার স্বাদে মিষ্টি কিন্তু স্বভাবে বিষ, তাতে মৃত্যু ঘটায়, তাও খায়। তিক্ত ঔষধ পরিণামে উপশম ঘটায়। গুরুবচনও তিক্ত হতে পারে, কিন্তু পরিণামে অমৃতের কাজ করে। কবি বলছেন, ঘরে পরে, অর্থাৎ নিজের এবং অপর কে কে কারা কারা কী কী বুঝতে হবে, বুঝতে পারলে এতদিনের সমস্ত প্রকার কুটুম্বদের হত্যা কর, কবি আরও বলছেন, এ দুষ্টদের দূর করে দাও, দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। শূন্য গোয়াল কথাটা দ্ব্যর্থক, দেহ নিঃশেষ মায়া মোহাদি এবং আত্মীয়-স্বজন হারা বোধিচিন্তা, অন্য অর্থ হল শূন্য বা নির্বাণ, সেখানে যে গোয়াল তাতে কোনও দুষ্ট বলদ নেই, সেটা নির্বাণ আলায়। সেখানে স্বচ্ছন্দে বিহার করবেন কবি।

কবি সরহ পা নিঃসন্দেহে একজন আধুনিক কবি বা গীতিকবি। তাঁর গীতিপ্রবণ প্রাণে প্রথমে দেখা দিয়েছেন যিনি যখন নিজ মনকে লক্ষ্য করলেন, অন্য চর্যায় আত্মসম্বোধন কদাচিৎ রয়েছে। এ পদে প্রাচীন বঙ্গের দু'একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। বঙ্গে দস্যু-তরুরের ভয় ছিল, কিংবা এখানে নারী সহজলভ্য ছিল। অন্য চর্যায়, যেমন—৪৯ নং 'বঙ্গালে'—ভইলী, ৪৩ নং 'বঙ্গাল'—বঙ্গাল রাগ-এর উল্লেখ দেখা যায়। তাতে বঙ্গ ও বাঙালির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তবে যারা মনগড়া ব্যাখ্যায় বঙ্গালকে দঙ্গল বা দস্যু বলে অভিহিত করতে প্রয়াস পান, তারা বঙ্গাল রাগের কথা ভাবতে পারেন। দস্যুরা সঙ্গীত আবাদন করে না, সঙ্গীতের ঘরানা সৃষ্ট করার মত গুণী বা পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা যা হওয়া উচিত, তাই।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালের প্রসঙ্গও ঐতিহাসিক। হয়তো চর্যার ভাষাতে এ প্রথম প্রয়োগ, তাছাড়া জনসমাজ তৎকালে শান্ত-পরিবেশই কামনা করত, দুষ্টকে দূর করার সমর্থনে এ উক্তিই যথেষ্ট।

চর্যা-৪০

রাগ মালসী গবুড়া

কাহ পা

জো মণগোঅর^১ আলাজাল^২ ।
 আগম পোখী^৩ ইষ্টামালা^৪ ॥ধ্রু॥
 ভণ কইসে সহজ^৫ বোল বা^৬ জাঅ^৭ ।
 কাঅবাক চিঅ জসু গ সমাঅ^৮ ॥ধ্রু॥
 আলৈ^৯ গুরু উএসই সীম ।
 বাকপথাতিত কাহিব^{১০} কীস ॥ধ্রু॥
 জে তই^{১১} বোলী তে ত বি^{১২} টাল^{১৩} ।
 গুরু বোল সৈ^{১৪} সীস কাল ॥ধ্রু॥
 ভণই কাল জিণ রঅণ বি কইসা^{১৫} ।
 কালৈ বোধ^{১৬} সংবোহিঅ জই সা ॥

পাঠান্তর

১. মণ গোএর। ২. আলা জালা। ৩. পোখা। ৪. ইটামালা। ৫. বোলবা। ৬. জায়।
 ৭. সমায়। ৮. আলৈ। ৯. কাহিব। ১০. জেতই। ১১. তেত বি, তেতবি। ১২. যে তই
 বোলী তেত বি টাল। ১৩. বোধসে। ১৪. বিকসই সা। ১৫. বোবৈ।

শব্দার্থ ও টীকা

গোঅর—গোচর। আলাজাল—আওলানো জাল; ইন্দ্রজাল, উলুঝুল। আগম—গুরু
 পরম্পরা গুরু উপদেশ। পোখী—পুঁথি। ইষ্টামালা—ইষ্টমালা, ইষ্টদেবতা জপমালা,
 পাঠান্তরে ইটামালা—ইটের স্তম্ভ। উএসই—উপদেশ। সীস—শিষ্য। টাল—বিচলিত।
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে—কাল। বোধ—বোবা। জিন রঅন—জিনপুর রত্ন। সংবোধিত—সংবোধিত, অনুধাবন করানো।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

যা মনগোচর আলাজালা।
 আগম পুঁথিও ইষ্টমালা॥
 বল কিসে সহজ বলা যায়?
 কায়বাক-চিন্তা যেখানে না সাক্ষায়॥
 বৃথা গুরুশিষ্যকে উপদেশ দেয়।
 বাকপথাতিত বলতে কী উপায় নেয়?॥
 যতই বলা হয় ততই বেতালা।
 গুরু বোবা সে শিষ্য কাল।
 কাহু বলেন জিনরত্নই বা কেমন?
 কালকে বোবার বোঝানো যেমন॥

গদ্যে রূপান্তর

যা মনগোচর তা আলাজালা ইন্দ্রজাল সদৃশ; আগম পুঁথি ইষ্টমালাও (যতই জপ না কেন) তাই। বল, কেমন করে সহজ (আনন্দ) কী বলা যায়? যেখানে প্রবেশ করে না, বৃথা গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়, বাকপথাতিত কে বলবে কী ভাবে? যতই বলি না কেন ততই তা তাল বিতাল, গুরু তখন বোবা আর শিষ্য কাল। কাহু বলেন জিন(পুর) রত্নই বা কেমন, কালকে বোবার বোঝানো যেমন।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

আমার ইন্দ্রিয় গোচর যে সকল বিকল্প জাল আগম মন্ত্রশাস্ত্রাদি জ্ঞান বা সর্বপ্রকার পুরাণাদিতেও সহজ দুর্লভ, বেদকথা সহজ মনোন্তর জ্ঞান অন্য জনের কায়বাকচিন্তে যেমন সহজে বোধগম্য নয়। গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দেয় তা নিষ্ফল। যদি সে কথা বেদ না বোধগম্য হয়। তখন গুরুর কী আর বক্তব্য থাকে। সেরূপ যা কিছু সহজ উদ্ভাবন বিদ্যা সবই টাল রূপ। বজ্রগুরু স্বধর্মে বাক দরিদ্র হন তবে তাঁর শিষ্য তাঁর বক্তব্য কিঞ্চিৎ শোনে বা শুনে কিছু বোঝে না, তাও বধির তুল্য। কাহু বলেন, তাহলে কী সাদৃশ্য জিন রত্ন? মনোন্তর সুখ রত্ন চতুর্থনান্দবোধক, যথা বধির সংকেত দিয়ে মুককে সংবোধ করে।

সমীক্ষা

কবি সিদ্ধাচার্য কাহু পা এ চর্যায় মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকা নিয়েছেন, তিনি বলেছেন যা মনগোচর তা আলাজালা বা ইন্দ্রজালিক। আগম পুঁথি বেদ জপমালাতে অতীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এ কথা মনোবিজ্ঞানের সম্মত, বিশ্লেষণ যেভাবে অপ্রযোজ্য চিন্তারাজ্যে তা কেবল ঘুরপাক খায়, চিন্তায় ধরা দিতে চায় না। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড যে ইড, ইগো এবং সুপার ইগো তত্ত্ব দিয়েছেন তাও কিন্তু ইন্দ্রজালিক এক অর্থে। মনে যা গোচরীভূত তাৎক্ষণিক অনুভূত বা দৃশ্যমান বিষয় বটে কিন্তু স্পষ্ট হয় না। মন যা করে সে সময়ই স্পষ্ট থাকে, একটু পরে মনের দৃশ্যান্তরে তা চলে যায়, ক্রমশ মনের গভীরে প্রবেশ করে। তা যদি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরণের তাড়া খায় আবার আলাজালা সৃষ্টি করে ভেসে উঠতে থাকে। পদকর্তা কাহ্ন পা মনগোচর আলাজালাকে ঠিক তেমনিভাবে দেখেছেন।

এই আলাজালা থেকে উত্তীর্ণ হতে চাই শিক্ষা, যোগাভ্যাস এবং বিচার-বিশ্লেষণ। এটা প্রত্যক্ষ—গুরুশিষ্য পরস্পরা যা গুহ্য তাই আগম। আগম লিখিত কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, অনেকটা হাতে কলমে বা স্বশিক্ষার মত। যারা গ্রন্থাদি পাঠে জ্ঞানলাভ করে তার বাইরে—ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদি দিয়ে ক্রমশ গুরুকে প্রশ্ন করে এ জ্ঞান লব্ধ হয়। সম্পূর্ণ অবচেতন মন হয়তোবা আগমে ধরা পড়ে না। তাই কবি বলছেন, সহজানন্দ বুঝিয়ে বলার কী সহজ উপায় আছে? যার কায়বাকচিন্ত তাকে ধরতে পারে না অথবা কায়বাকচিন্ত তাতে প্রবেশ করতে পারে না তখন গুরুর ব্যাখ্যা নিষ্ফল। সহজানন্দ বাকপথাভীত—বক্তব্যের অতীত অর্থাৎ বলে তা বোঝানো যায় না। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। আর যখন তা আলাজালাও না একেবারে টালমাটাল বা বেতাল—যতই বলা হোক না কেন? তখনকার দৃশ্য কী? গুরু যা বলেন তার কোনও অর্থ শিষ্য খুঁজে পায় না, তাই তো তিনি মূক সদৃশ, আর শিষ্য বধির সদৃশ। আবার গুরুর জ্ঞান যদি দরিদ্র হয় তাহলে এই দশা, জিনপুর কী যতই বলা হোক, মূক ইঙ্গিত দিয়ে বধিরকে বোঝানোর মত তা।

এখানে নির্বাণ চক্রের প্রসঙ্গ আসতে পারে। কী নির্বাণ চক্র? তান্ত্রিক ব্যাখ্যায়, নাভিতে অবস্থানরত চক্র তাকে ধর্মকায় বলা হয়, যা অতিক্রম করে হৃদয়ে অবস্থানরত চক্র সঙ্কোচ চক্র, তা অতিক্রম করে সহজ কায় চক্র বা মহাসুখ কমলে পৌঁছতে পারা যায়, এ সহজকায় চক্রের অবস্থান মস্তকে। চতুর্থানন্দ বা নির্বাণে পৌঁছতে পারা যায়। এই সম্পূর্ণ নাড়ি সম্পর্কীয় ধারণা হল বাকপথাভীত। যিনি যোগী কেবল তাঁর ধ্যানে বা যোগাভ্যাসে তা সংযোজিত থাকে, মহাসুখকারের আনন্দ বা সহজানন্দকে বলা হয়েছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত। কোনও ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না, সে কারণে এ অব্যক্ত অনুভূতি ব্যক্ত করতে গেলেই ভুল হবেন বোবা এবং শিষ্য কালা।

সহজতান্ত্রিকরা গুরুবাদী, গুরুবচন বা সদগুরু শিক্ষা তাদের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিভিন্ন চর্যাপদে গুরুবাদ প্রসঙ্গ রয়েছে, গুরুভজা আদর্শ এমনই স্পর্শকাতর যে তা অনেক সময় এবং অনেক স্থানে গুরু সর্বশক্তিমানের রূপ পরিগ্রহ করেছেন, এ সব পদ সংখ্যা হল ২, ৮, ১৪, ২১, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১ এবং ৪৫। গুরু মহিমার এই নির্দিষ্ট আঙ্গিকে এখানেও কাহ্ন বলেন, জিনপুর রত্ন লাভ করতে হলে গুরুকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রদানের সুযোগ থাকতে হবে, শিষ্যকেও তা গ্রহণ করার উপায় থাকতে হবে। তা হলে জিনপুর বা নির্বাণ কেমন তা জানা যাবে। তা না হলে তা অবাঙমনোগোচরে অবস্থান করে থাকবে।

এ কথার মর্মার্থ হল এই, মহাসুখের আনন্দ এমনই অনির্বচনীয় যে গুরু তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন না, তাই বলে তিনি বোবা এবং শিষ্যও তা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারে না, তাই বলে সে বধির। মহাসুখের আনন্দপুর অবলোকন করতে পারেন না, যদিও তিনি সর্বশক্তিমান। এ কথার অর্থ বচন ইন্দ্রিয় বা শ্রবণইন্দ্রিয় দিয়ে এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধ হয় না।

এই চর্যার গুরুর ও ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে, যা সহজযানি তন্ত্রের সপক্ষ নয়। এ কথা থেকে মনে হয় সহজযানিদের ভেতরও বিভিন্ন পন্থা ও মতপার্থক্য বিরাজ করছিল।

এ চর্যা গুরুবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগ কহু' গুঞ্জরী

ডুসুকু পা

[illegible]

আইএ^২ অণুঅনাএ জগরে ভাষ্টিএ^৩ সো^৪ পড়ি হাই^৫ ।
 রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাচে^৬ কি^৭ তঁ বোড়ো খাই^৮ ॥ ধ্রু ॥
 অকট জোইআ রে^৯ মা কর হথা লোনা^{১০} ।
 আইস সহাবে^{১১} জই জগ বুঝসি^{১২} তুটই^{১৩} বাসনা তোরা ॥
 মরুমরীচি গন্ধবনইরী দাপতিবিস্ব^{১৪} জইসা ।
 বাভাবন্তে^{১৫} সো দিট^{১৬} ভইআ অপে^{১৭} পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
 বাঁধিসুআ^{১৮} জিম কেলি করই খেলই বলবিহ খেড়া ।
 বালুআতেলে^{১৯} সসর সিংগে^{২০} আকাশে^{২১} ফুলিবা ॥ ধ্রু ॥
 রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅল আইস সহাব^{২২} ।
 জই তো মচা অচ্ছসি^{২৩} ভাষ্টি পুছত সিদধুরু পাব^{২৪} ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর

১. কহু গুঞ্জরী। ২. আই। ৩. ভাংতি হাউ। ৪. ঐসো। ৫. পড়িহাই। ৬. সাচে। ৭. কিং
তং। ৮. খাইউ, রাজ সাপ দেখি জো চমকিই সাচে কিং কিং বোড়ে খাইউ, রজ্জু সপ্ন দেখি
জো চমকিউ সাঁচে জিম লোণা খাইউ। ৯. অকট বিচারে রে, অকট জোইরে।
১০. লোণা, লোহ-হা, লোহা, হাথ লোণা। ১১. জইস বুজবাসি। ১২. তুট।
১৩. দাপণপড়িবিষ, দাপণ-পড়িবিষু, গন্ধকনঅরী দাপন পড়িবিষ। ১৪. বাতাবত,
বাতাবঁও। ১৫. দিউ। ১৬. বাক্টি গুআ, বাক্টি গুআ, বাক্টি সআ। ১৭. সদরু সিংগে।
১৮. আকাস, আকাশই। ১৯. সহাবা : রাউতু ভণই বঢ় ভুসুকু ভণই সঅলা সহাবা।
২০. আচ্ছসি, আচ্ছই। ২১. পাবা।

শব্দার্থ ও টীকা

আইএ—আদৌ, আদিতো। অনুঅনাএ—অনুৎপন্ন। ভাষ্টি এঁ—ভ্রাষ্টিতে। পড়ি হাই—প্রতিভাস। রাজসাপ—রজ্জু সাপ। অকট—আচর্য। জোইআ—যোগী। হথা লোন্হা—হাত লবণাক্ত। আইস—এই। সহাবে—স্বভাবে। জই—যদি। তুটই—টুটবে। গন্ধবনঅরী—গন্ধর্বনগরী, স্বর্গপুরী। দাপতিবিষ—দর্পণে প্রতিবিম্ব। অপেঁ—জল। বাঁধিসুআ—বন্ধ্যার পুত্র। কেলি—খেলা করে। বহুবিহ—বহুবিধ। খেড়া—খেলা। বালআতেল্—বালুর তেলে। সসর সিংগে—শশক শৃঙ্গে। ফুলিলা—প্রফুল্ল, প্রস্ফুটত। রাউতু ভণে—রাউত বললেন, রাউত বললেন, ভুসুকু বললেন’ এই বক্তব্যে কোনও প্রাসঙ্গিক ঘটনা আছে, ভাষ্যকাররা এই অর্থ দিয়ে যান নি। রাউত সম্ভবত অন্য কোনও সিদ্ধাচার্য হবেন, তিনিও সমর্থক বক্তব্য দিয়েছেন, অথবা তিনি বালযোগী; গুরু ভুসুকু প্রশ্ন করেছেন, উত্তরদান প্রসঙ্গে তাঁর নামও গুরু উল্লেখ করতে ভুলেন নি। রাউত নামের অন্য সিদ্ধাচার্য কোথাও পাওয়া যায় না।

নি। তবে রাউত যদি রাজপুত্র হয় এবং ভুসুকু তাঁর গুরু হন কিংবা ভুসুকুর কাছে রাজপুত্র কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করতে আসেন তখন দুজনের কথোপকথনের প্রসঙ্গে এ নাম উচ্চারিত মনে হয়।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

আদিতে অনুৎপন্ন এ জগত রে ভ্রান্তি তে প্রতিভাত (প্রায়)।
 রজ্জুসর্প দেখে যে চমকায় সত্যিই কী তাকে বোড়োতে খায়?
 আশ্চর্য যোগীরে, হাত করিস না লোনা।
 এই স্বভাবে যদি জগত বুঝিস টুটে তোর বাসনা॥
 মরু মরীচিকা গন্ধর্বনগরী দর্পণ প্রতিবিম্ব যেমন।
 বাতাবর্তে সে দৃঢ় হয়ে পানি পাথর যেমন॥
 বক্ষ্যার পুত্র যেমন খেলা করে খেলে বহুবিধ খেলা।
 বালুর তেলে শশক শৃঙা আকাশে ফুল মেলা॥
 রাউত বলেন আশ্চর্য, ভুসুকু বলেন আশ্চর্য সকলের স্বভাব এই।
 যদি তুমি মূঢ়, আছে ভ্রান্তি জিজ্ঞাসা কর সদগুরু চরণেই॥

গদ্যে রূপান্তর

আদিতেই এ জগৎ অনুৎপন্ন এবং ভ্রান্তিতে তা প্রতিভাত; রজ্জুরূপ সর্প দেখে ভ্রমে যেমন চমকে ওঠে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভ্রম বোড়ো কী কাউকে কাটে? আশ্চর্য হে যোগীবর, তোমার হাত লবণাক্ত করো না, জগতকে যদি স্বভাবে চিনতে পার তবে তোমার বাসনা ভঙ্গ হবে। এ জগৎ হল মরু মরীচিকা গন্ধর্ব নগরী দর্পণে প্রতিবিম্বের মত। বাতাবর্তে সে দৃঢ় হয়েছে, যেমন পালিত পাথর হয় (বরফ হয়ে)। বক্ষ্যার পুত্র খেলা করে, সেও বহুবিধ খেলা খেলে, বালির তেলে শশক শৃঙা আকাশে ফুল প্রফুল্লতায়। রাজপুত্র বলেন, তবেই তো আশ্চর্য, ভুসুকু বলেন আশ্চর্য বটেই তো, সকলের এ স্বভাব। যদি তুমি মূঢ় কিংবা ভ্রান্তিতে থাক তবে তুমি সদগুরু জিজ্ঞাসা কর অথবা সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে তা পাবে।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

জগৎ দৃশ্যত আদৌ অনুৎপন্ন ভাবযুক্ত নয় স্বয়ং পরমার্থযজ্ঞের অবগত অন্যথাভাবে। ভ্রান্তবিদ্যা তিমির লোচন উন্মীলনে নীল পীতাদি রূপে প্রতিভাত। তা রজ্জুসর্প অভিজ্ঞানের মত সন্ত্রাসযুক্ত। রজ্জুসর্পে কী সত্যিই খেতে পারে? আশ্চর্য হে বাল যোগী, এই রকম করে হাত মুছে থেকো না। এই স্বভাবে যদি জগৎ স্বরূপে প্রবেশ কর তবে অনাদি ভব বিকল্প বাসনাদোষ সংগ্রহ পলায়ন করবে। মৃগতৃষ্ণা গন্ধর্ব নগরী দর্শনাদি প্রতিভাস মাত্র, ভাবনায় যোগীবরে দেখে মায়াপঞ্চ স্বপ্ন। এই সর্ববিদ্যাবাসনাদোষ মিথ্যা বালবৈকল্যতে পর্যবসিত যথা বাতাবর্তে নীর প্রস্তরীভূত। বক্ষ্যা ভগবতী নৈরাশ্র্য তার পুত্র পরমার্থ সত্য বালুকাতে তৈলোপম, শশকশৃঙোপরি মঞ্চে এই অনুৎপন্ন স্বভাবসূচিত তার। তা হতে উৎপন্ন হল পরমার্থ সত্য; মহাসুখ পঞ্চজ্ঞানাত্মক। জগতের নানা প্রকারের ক্রীড়ারস অনুভব রয়েছে সেই পুত্র পঞ্চবুদ্ধাত্মক সর্বজ্ঞাত। ভুসুকু পা বললেন, ভাবনাশিষ্ট যে রূপাদির কথা বলা হল, বালযোগী, যদি তোমার তাতে ভ্রান্তির অবকাশ থাকে তবে সদগুরুর চরণ আরাধনা কর। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীক্ষা

সিদ্ধাচার্য ভূসুকু কবি ও দার্শনিক। তিনি সৃষ্টির তত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে ইংগিত দিয়েছেন। এ জগৎ কী সৃষ্টি, না আদিতে এমন ছিল। দার্শনিক-চিন্তাবিদরা ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বক্তব্য আছে। স্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টি করলেন এ জগৎ এবং তারপর পাহাড় সমুদ্র গাছপালা এবং প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করলেন। দার্শনিকরা মনে করেন যার যেমন জ্ঞান খেয়াল খুশি মর্জি মত সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করেছেন, সত্য কী-তা কেউ উদ্ধার করে দিতে পারেনি। কারণ জগৎ অজানা থেকে এসেছে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানীরা এ সৃষ্টির একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছেন, সেটাও তাদের যান্ত্রিক কৌশলগত জ্ঞান ও বুদ্ধির মত। তাহলে সিদ্ধাচার্য ভূসুকু যে বললেন জগৎ অনুৎপন্ন, অর্থাৎ জগৎকে কেউ উৎপন্ন করেনি, আদি থেকে এ জগৎ এমনিই ছিল এ বক্তব্য একেবারে নাকচ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় জগৎ যদি সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সূর্য কীভাবে সৃষ্টি হল? কোনও সৃষ্টিকর্তা যদি সূর্য সৃষ্টি করে থাকে তবে সে সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করল? এ রকম নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তার চাইতে সিদ্ধাচার্য সর্বজ্ঞ জ্ঞানী ভূসুকু সারতত্ত্বই সঠিক যে জগৎ অনুৎপন্ন।

সিদ্ধাচার্য বললেন জগতের সারতত্ত্ব কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন এ জগৎ নিরেট অনুৎপন্ন হলেও শুদ্ধ বা সং নয়, এ ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এটাই স্বাভাবিক, কোনও একটা বস্তু যদি যত্ন করে তৈরি করা হয় তাহলে তা সঠিক নিখুঁতভাবে তৈরি করার প্রয়াস থাকে; ঘটনাক্রমে কোথাও খুঁত পড়ে থাকে। কিন্তু তৈরি নয়, আদি থেকেই এমনি তাতে নানা অসংগতি, ভ্রান্তি এবং অপ্রয়োজনীয়তা থাকা স্বাভাবিক। যেমন মানুষের চিন্তা তা কারও সৃষ্টি নয়; আদি থেকে এভাবে। এ ভ্রান্তি থাকা চিন্তের ওপর যুগ যুগ ধরে ঘষামাজা চলছে, রঙ দেওয়া চলছে; কিন্তু সবই সঠিকভাবে চলছে তা নয়, সবই হয় তো ভ্রান্তি। ব্যাঘ্র গুহায় থাকে। তাকে সেখান থেকে তুলে এনে শ্বেত মর্মর প্রাসাদে রেখে এর সুস্বাদু খাদ্য এবং আরামের উপকরণ যুগিয়ে তার চিন্তের অবয়ব বদলাতে পারে না। আদতে যা ছিল তাই, বাকি সবই ভ্রান্তি, যদিও প্রতিভাত হচ্ছে ব্যাঘ্র খুব পোষ মানিয়ে ভদ্র মহাপুরুষ হয়ে গেছেন। না, তা হতে পারেন না। মানুষও পশু, স্বভাব পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু পশুর আচরণ ও অবয়ব সবটা তার পরিবর্তন হতে পারে না।

ভদ্র দেখে কাউকে সম্মান করা যেতে পারে, কিন্তু তার ভদ্রতার মুখোশ উন্মোচিত হতে দেরি হয় না। রজ্জু দেখে কালসাপ মনে করে কেউ চমকাতে পারে কিন্তু সে রজ্জু কখনও প্রকৃত সাপ নয়। সে কামড়াতে পারে না। জগৎটা কালসাপের মত ভয়ঙ্কর মনে করার হেতু নেই, এ জগৎ কারও দুঃখের কারণ নয়। জগৎ মায়াময় হতে পারে, জগতে হিংসা বিদ্বেষ থাকতে পারে, ইন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষেত্র পড়ে থাকতে পারে কিন্তু এ সব দেখে ভড়কে গেলে চলবে না। যার চিন্তা দৃঢ় তাকে এই রজ্জুরূপী সর্প দংশন করতে পারে না। সে জগতের এই মায়াজাল বিষয়ে, জগতের স্বভাব বিষয়ে সম্যক অবগত। কেউ যদি খুব বাসনা করে যে জগতের মায়ামোহ রঙিন আবরণ সজ্জিত হয়ে অতি সন্তোষে কালাতিপাত করব তবে অচিরে তার সে বাসনা ভঙ্গ হবে, কারণ জগতের এই ক্ষণস্থায়ী রঙিন আচরণ অচিরেই ঝরে পড়ে, তত্ত্বজ্ঞানী সেটা বুঝতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞানী জানেন জগৎ মরু মরীচিকা; মরুভূমিতে চলন্ত তৃষ্ণার্ত পথিক সীমাহীন তপ্ত বালুকারাশির পথ অতিক্রম করতে গিয়ে সম্মুখে দেখে অদূরে জল এবং বৃক্ষলতাদি স্থান, সে দিকে তাই ছুটে যায় কিন্তু মিথ্যা মায়া মরীচিকা তা, হয় তো চোরাবালির মৃত্যু যদি সেখানে লুকিয়ে আছে জগৎ গন্ধর্ব নগরী অর্থাৎ স্বর্গের সুন্দরী নায়িকা বা প্রেমিকা, পরিপূর্ণ নগরী। গন্ধর্ব সাধারণত কাল্পনিক প্রেমরাজ্য, যেখানে শিল্পী গায়ক গায়িকা এবং প্রেমিক প্রেমিকা পরিপূর্ণ, প্রেমাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট পূরণের অবকাশ যেখানে আছে। কেউ যদি জগতকে এমনই স্থান মনে করে তবে তা ভ্রান্তি বটে, জগৎ কী তাই? জগতে প্রেম এবং মিলনের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য, গন্ধর্ব লোকের মত চিরকালীন কোনও ব্যাপার নয়। দর্পণের ওপর প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেমন, যতক্ষণ বস্তু বা ব্যক্তি তার বিপরীত দিকে অবস্থান করে ততক্ষণ সে প্রতিবিম্ব থাকে, ব্যক্তি বা বস্তু অপসারিত হলে তা আর থাকবে না। জগৎ এমনি যতক্ষণ ব্যক্তি বা বস্তু তার ওপর অবস্থান করছে ততক্ষণ তার প্রতিবিম্ব রূপ অস্তিত্ব রাখে কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তু অপচিত হলেই তা আর থাকে না।

কিন্তু কবির ভাষায় যে এ মায়ামোহ ছিন্ন করে দৃঢ় চিন্তা হয়েছে সে প্রস্তরীভূত যেমন জল। জলের আকার নেই, যে পাত্রে রাখা যায় তার আকার ও বর্ণ ধারণ করে; কিন্তু জল যখন দৃঢ় হয় তখন বরফ হয়ে প্রস্তরীভূত হয়ে যায় তখন তার আকার বর্ণ এবং স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

বক্ষ্যার পুত্র খেলা করে বহুবিধ খেলা, এ কথা সকলে বুঝতে পারে না। বক্ষ্যার কখনও পুত্র হয় না; খেলা করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সকল বক্ষ্যার পুত্রকামনা সবচেয়ে অসীম। মানুষও তার কামনাগুলো বক্ষ্যার মত অসীম করে রাখে। কিন্তু সে যে এ কারণে বক্ষ্যা তা জানে না। তবে বক্ষ্যার পুত্র কথাটার রূপক অর্থ টীকাকাররা নির্ণয় করেছেন, বক্ষ্যা হল পরিতৃপ্ত বা সংবৃতি বোধিচিন্তা—নৈরাশ্ব্য রূপিণী শূন্যতা তার ছেলে পরমার্থসূত্র। অর্থ দাঁড়াল সংবৃতি বোধিচিন্তা কামনা বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে রূপজগতের সৃষ্টি করে বলে সে ছেলে প্রসব করে আর নৈরাশ্ব্য রূপিণী শূন্যতা পার্থিব জ্ঞানশূন্য বলে সে বক্ষ্যা। এই কামনা বাসনার মোহজাল সেও যেমন বালি থেকে তেল প্রস্তুত কিংবা শশকের শিং এবং আকাশ কুসুম সবই একই দশায় আবর্তিত বা বাতাবর্তে রয়েছে। অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে আবর্তিত রয়েছে।

রাজপুত্র এই তত্ত্ব শুনে বললেন, আশ্চর্য!

এই রাজপুত্র কে? অনেকের ধারণা রাজগৃহে ভূসুকু আচার্য ছিলেন। রাজপুত্রকে তিনি শিক্ষা দিতেন। সেটা স্বাভাবিক ও সাধারণ হলেও এখানে তারও একটা আধ্যাত্মিক ছবি পাওয়া যাচ্ছে। ভূসুকুর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুধাবন যে করতে পারে সে-ই তো রাজপুত্র! এ রাজপুত্র জন্ম রাজার ঘরে হবে কথা নেই; যার চিন্তা এবং চেতনা রাজপুত্রের মত সে দাসীপুত্র হলেও তাকে এই অভিধায় ভূষিত করা যায়। আর রাজার ঘরে কত নির্বোধ এবং দাসপুত্র জন্মায় সে তো জানা কথা।

রাজপুত্রের এই উপলব্ধির উত্তরে গুরু বললেন, আশ্চর্য তো বটেই, এটা হল জগতের সকলের স্বভাব। তুমি যদি এখনও তার সবকিছু বুঝতে না পার এবং ভ্রান্তিবশত সে মোহাচ্ছাদিত থাক তাহলে সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে সমস্ত বিষয় অবগত হতে পার।

ভবে যায় না আসে এমন কেউ ।

এই ভবে বিলাস করে কাহ্ন যোগী ও॥

গদ্যে রূপান্তর

চিত্ত সহজ শূন্যতা দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে তাই পঞ্চ স্কন্ধ বিয়োগে বিষণ্ণ হও না । বলছ যে কাহ্ন কিসে নেই? তিনি অনুদিন ত্রিলোকে প্রবেশ করেন (ত্রিলোকে বিরাজিত) যা কিছু দেখা যায় সবই ধ্বংসশীল, ধ্বংস দেখে মূর্খরা কাতর । তরঙ্গ ভঙ্গ কী সাগরকে শোষিত করতে পারে? মূর্খরা লোক (ত্রিলোক) থাকা দেখেও দেখতে পায় না, যেমন দুধের ভেতর সর যে আছে দেখা যায় না । এ ভবের কেউ যায় আসে না, কাহ্ন যোগে তাই এভাবে বিলাস করেন ।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

প্রকৃতি স্বরূপে সর্বদেব ষোড়শী শূন্যতা সম্পূর্ণ আমার চিত্তরাজ । আমার স্কন্ধ ভাববিষাদ নেই । বালযোগী বল কোথায় কাহ্ন পা নেই? ত্রৈলোক্যস্বরূপ অনুদিন স্কুরিত পরমার্থ জলধিতে ক্রীড়া করছেন । নীল পীতাদি বর্ণসংস্থানে যে ভাবভঙ্গের উদ্বেক করে মুগ্ধজন কী অর্থে কাতর হয়? মূর্খ দুগ্ধমধ্যে নবনীত দেখতে পায় না সেরূপ ত্রৈলোক্য দৃশ্যমান নয় । তরঙ্গভঙ্গ কী সাগর শোষিত করতে পারে? স্রোতরু পঙ্কজরজ নিষ্পন্ন ভব স্বভাব পরিজ্ঞানে কাহ্ন পা ভবপাত্রে ক্রীড়া বিলাস করেন ।

সমীক্ষা

সহজ শূন্যতায় প্রবেশ করে চিত্ত-প্রকৃতি সম্পূর্ণ হয় । জাগতিক সুখ দুঃখ জরা মৃত্যুর জন্য চিত্তচাক্ষুণ্য সৃষ্টি হয় । পঞ্চ স্কন্ধযুক্ত হলেই এই অবস্থান্তর, পঞ্চ স্কন্ধের সঙ্গে রয়েছে মোহমায়াদি আকর্ষণ বন্ধন, এর বিয়োগ ব্যথায় সবাই কাতর বিষণ্ণ হয়, কিন্তু শূন্যতা মহাসুখ । যোগী কাহ্ন এই সহজ শূন্যতায় অবস্থান করেন ।

কেউ প্রশ্ন করেন, কাহ্ন কোথায় তাহলে রয়েছেন? তিনি কোথায় নেই, সব কিছুতে আছেন, তিনি ত্রিলোকে বিরাজ করছেন, অনুদিন সবকিছু স্কুরিত বাতাবর্তে, কারণ সকলের উর্ধ্বে । তিনি জন্ম দেখে আনন্দিত হন না, মৃত্যু দেখে কাতর হন না, প্রতিদিন জীবন ঘটছে ভাঙছে, এ ক্ষণস্থায়ী বাতাবর্তে তিনি স্থিরচিত্ত । এই দৃশ্যমান ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি ধ্বংস দেখে মূর্খরা কাতর । তার চিত্ত সমুদ্রের মত বিশাল, তরঙ্গভঙ্গ দেখলে মনে হয় সমুদ্রের সব জল উথলে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে । কিন্তু পরক্ষণে সমুদ্র পূর্ব স্বরূপে অবস্থান করে । মূর্খরা ত্রিলোক দেখতে পায় না । তারা কেবল জন্ম-জীবন এবং মৃত্যু দেখতে পায় । জীবনের যন্ত্রণা এবং উপলব্ধি জীবনের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তি দেখতে পায় । কিন্তু এদের পরিণাম দেখতে পায় না । এর ভেতর কী সার আছে তা দেখতে পায় না । যেমন দুধের ভেতর সর বা ননী আছে তা দুধ দেখে বোঝা যায় না । দুধকে জ্বাল দিলে সর ওপরে পাতলা স্তরে জমতে থাকে । তাই মানব জীবনকে সিদ্ধ করলে সিদ্ধির ফল নির্বাণ, সেটা জীবনের সার । যারা সিদ্ধ যোগী তারাই কেবল এটা বোঝেন, এ জগতে কিছু আসে যায় না, জন্ম মৃত্যু সমুদ্রে জলতরঙ্গবৎ । সমুদ্র হল নিস্তরঙ্গ, বায়ুবেগে সমুদ্রের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.arnarboi.com ~

ওপর তরঙ্গ সৃষ্টি করে তখন সে তরঙ্গ দৃশ্যমান হয়। আবার মুহূর্ত পরে সে তরঙ্গভঙ্গ হয়ে সমুদ্রে মিশে যায়। এই সামুদ্রিক তরঙ্গ এবং তার ভঙ্গের জন্য দুঃখিত বা কাতর হওয়ার কোনও অর্থ নেই। একমাত্র মূর্খরা এ জন্য ব্যাকুল হয়। সিদ্ধ যোগী জানেন তা অনর্থক। জগতের আদি থেকে এমন হয়ে আসছে, যতদিন জগত বিরাজিত থাকবে কাহ্ন যোগীও জগতের সঙ্গে একই ভাবে থাকবেন মিশে। একই ভাবে সমুদ্র তরঙ্গের মত বিলাস করবেন।

‘ভব জাই ণ আবই এহ্ কোই’—

ভবে কেউ আসে যায় না। জীবন অবিনশ্বর—এই দার্শনিক সূত্র এখান থেকে উদ্ধার করা যায়। জন্মমৃত্যুর ছায়াপাতে জীবনের অবিনশ্বরতা ম্লান হয় না। মানুষের বুদ্ধিচেতনা দুঃখকষ্ট অনুভূতি অবিনশ্বর। মোটের ওপর ‘আমি’ নামক মানবটি যুগ যুগ কোটি বছর ধরে এ জগতে বিরাজিত। এর মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, সাগরের মত বায়ুর মত বিশ্বজয়ে আছি। কেবল তরঙ্গভঙ্গ বা ধ্বংসের সময় দৃশ্যমান। এ দর্শনতত্ত্ব সেদিন সিদ্ধাচার্যদের চেতনায় ধরা পড়েছিল।

চর্যা-৪৩

রাগ বঙ্গাল

ভুসুকু পা

সহজ মহাতরু ফরিঅ এ' তৈলোএ^২।
খসম সহাবে রে বাণত মুক^৩ কোএ^৪ ॥ক্ষ॥
জিম জিম পানিআ^৫ টলিআ ভেউ^৬ ন জাঅ।
তিম মরণ অণারে^৭ সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ক্ষ॥
জাসু গাহি^৮ অপপা তাসু পরেলা^৯ কাহি^{১০}।
আই অনুঅণারে^{১১} জাম মরণ ভব গাহি ॥ক্ষ॥
ভুসুকু ভণই কট^{১২} রাউতু ভণই কট সঅল এহ সহাব।
এথু জাই ণ আবয়ি রে ণ তঁহি ভাবাভাব^{১৩} ॥ক্ষ॥

পাঠান্তর

১. ফরিঅই। ২. তৈলোএ। ৩. বাণত কাকোএ, খমজ সভাবে রে বাণত কাকোএ।
৪. মূকা কোএ। ৫. পানিঅ। ৬. ভেড়। ৭. মণর অণারে, তিম মরণ, অণারে।
৮. যৎপুগাহি। ৯. অধ্যা তাসু পরেলা, অধ্যাতা স্বপরেলা, আত্মাতাসু পরেলা। ১০. স্বপরেলা কাহি। ১১. আই অন্তএঅ ণ রে। ১২. বট। ১৩. জাই ণ আবরি রে ণ তঁহি ভাবাভাব।

শব্দার্থ ও টীকা

ফড়িঅএ—ফেড়ে, স্কুরিত করে। খসম সহাবে—মহাসুখ স্বভাবে, মুদ—‘খসমো সুখ স্বভাবেন ত্রৈলোক্যে’। বান্ধণ ত মুকা—বন্ধন মুক্ত। ভেউ—আলাদা, প্রভেদ। মরণ অঅণা—মনোরত্ন। জাসু নাহি অণ্ণা তাসু পরেলা কাহি—যার আপন নেই তার পর কোথায়? —‘যত্র আত্মক নাস্তি তত্র পরঃ কর’। আই—আদি। অনুঅনারে—অনুৎপন্ন। জাম মরণ—জন্ম মৃত্যু। কট—আশ্চর্য। আবয়ি—আসা।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

সহজ মহাতরু স্কুরিত এ ত্রৈলোক্যে।
মহাসুখ স্বভাবের বন্ধনমুক্ত কে?
যেমন জলে পানি টললে ভেদ করা না যায়।
তেমনি মনোরত্ন সমরসে গগনে সাক্ষায়॥
যার নেই আপন, পর কে তার?
আদি অনুৎপন্ন রে জন্মমৃত্যুভব নেই যার।
ভুসুকু বলেন আশ্চর্য, রাজপুত্র বলেন আশ্চর্য সকলের এ স্বভাব।
যায় আসে না রে, নেই তাতে ভাবভাব।

গদ্যে রূপান্তর

সহজ (আনন্দরে) মহাতরু ত্রিলোকে স্কুরিত হয়েছে, মহাসুখ শূন্য স্বভাবে গিয়েছে; সংসার বা মায়ামোহ বন্ধন থেকে মুক্ত কে হতে পারে (মহাতরু হয়েছে)? পানিতে যেমন পানি পড়লে পানিতে মিশে যায় তাকে আলাদা করা যায় না, তেমনি মনোরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে (শূন্যে মিশে গেল)। যার কোনও আপন নেই তার পর কে? আদিতে অনুৎপন্ন যে তার জন্মমরণ ভব কিছুই নেই। ভুসুকু বলেন, আশ্চর্য! রাজপুত্র বলেন, আশ্চর্য, সকলের এই তো স্বভাব! কেউ যায় না আসে না, ভাবও নেই, অভাবও নেই।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

গুরুচরণ চরণরেণু প্রসঙ্গে পাদপদ্ম সংযোগ সুখকারবীজ গ্রহণ করে ত্রৈলোক্য ব্যাপি যোগীর সহজচিত্ত স্কুরিত। সহজোপম সুখস্বভাবে ত্রৈলোক্যবন্ধন মুক্ত নয় কেউ। যেমন মূর্খ দুগ্ধমধ্যে বিদ্যমান নবনীত দেখে না তেমনি ত্রিলোকও দৃশ্যমান নয়। বিকল্পে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে সুখে ব্যাপি জগৎ। যেমন বাহ্য নীরান্তর পতনভেদ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। তেমনি মনোবোধিচিন্তুরত্ন যোগী সমরসভুক্ত গগনে প্রভাস্বরে বিরাজ করেন। যে যোগীর আত্মীয় সম্বন্ধ ছিন্ন তার পর সম্বন্ধ আপন অপর কেউ নেই। যা অনুৎপন্ন তার উৎপাদন স্থিতিভঙ্গ নেই, যেমন সিদ্ধপুরুষ। ভুসুকু পা বললেন, সকলই ভাব অনিমেঘ স্বরূপ এই গম্ভীর সহজানন্দ অনুভব ভাবভাব বিকল্প নয়।

সমীক্ষা

তরু ছেদন করে শূন্য মহাতরুতে রূপান্তরিত হয়ে সহজ শূন্যতায় বিরাজ করছে। এই মহাতরু সহজ শূন্যে ক্ষুরিত। মহাসুখকার স্বভাবে মহাতরুর আর কোনও সংসার মোহ বা সংসার বন্ধন নেই, মুক্ত সে মহাতরু কে তাহলে? অর্থাৎ মহাসুখে বিরাজ রত শূন্যতাপ্রাপ্ত সব তরু তো একাকার মহাতরু। নির্বাণ প্রাপ্ত তরুরা মিলে মহাতরু গগন, তাই সামগ্রিকভাবে কোনও তরু মুক্ত নয়। যেমন পানিতে পানি পড়লে মিশে যায়, তখন কোনটা কোন পানি আলাদা করা যায় না। সমস্ত পানি মিলে পানি মহাসমুদ্র বা মহাপানি। দুধের ভেতর সর রয়েছে সেটা তো দেখা যায় না, দুধ আর সরের আলাদা সম্ভা নেই। তেমনি মনোরত্ন বা বোধিচিহ্ন গগন সমরসে প্রবেশ করে তখন তার আলাদা সম্ভা নেই। মনোরত্ন বলা হচ্ছে এ জন্য যে বোধিচিহ্ন প্রাপ্ত মন তো সাধারণ মন থাকে না, রত্নে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মহাতরুতে মিশে গেলে সে তরুর শাখা-প্রশাখা আত্মীয়-স্বজন বা আপন বলতে কিছু থাকে না, সবটা মহাতরুতে পরিণত, আপন তো আর কিছু নেই, তখন পরও তার কিছু নেই, আপন পর একাকার। হয়তো ভাবা যায় যে মহাতরুই তার আপন; কিন্তু না, মহাতরু তার আপন নয়, নিজেকে মিশিয়ে অস্তিত্বহারা হলে আপনত্ব তো আর কিছু রইল না। মহাতরু অনুৎপন্ন, আদিতো অনুৎপন্ন। চিত্তরত্ন গিয়ে সে আদি অনুৎপন্নতে মিশে অনুৎপন্ন স্বভাব এবং ভাবভার অনুৎপন্ন হয়। মহাতরুর উৎপাদন নেই স্থিতি নেই বিনাশও নেই। তাই জন্মমৃত্যু ভব ও তিন অবস্থাপ্রাপ্ত তরুরা পর্যায়ক্রমে জন্মান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু মহাতরু এর অধীন নয়। মহাতরু নিশ্চল নিস্তরঙ্গ; তার আদিও নেই, অন্তও নেই।

ভুসুকু তাই বললেন, এটা আশ্চর্য বটে, তাঁর শিষ্য রাজপুত্র গুরুচরণ প্রসাদ দ্বারা উদ্ধৃত হয়ে বললেন, সত্যিই আশ্চর্য! সকলের এই তো স্বভাব। কেউ যায় আসে না, ভাবও নেই, অভাবও নেই। জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ভব যন্ত্রণা নেই, শূন্যতা স্বভাবে ক্ষুরিত।

এই চর্যায় আত্মা ও পরমাত্মার অপূর্ব সমন্বয় রূপকল্প লক্ষ্য করা যায়। যদিও বৌদ্ধ বিধান মতে পরমাত্মার বিশ্বাস নেই বা পরমাত্মা বলতে কিছু নেই কিন্তু এ চর্যায় উল্লিখিত মহাতরুকে পরবর্তীকালে এই পরমাত্মা রূপ বিশ্বাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যে সকল আধ্যাত্মিক চেতনায় আত্মা পরমাত্মার বিষয় সংযোগ দেখা যাচ্ছে তারা সবই বৌদ্ধ এই শূন্যবাদ থেকে উদ্ভূত বলে অনুমান করা যায়। পানি পানিতে মিশে যাওয়া কিংবা মিথুনাদর্শে ভক্তভগবানে মিলন অথবা ফানাতত্ত্ব সকলই একই আদর্শভুক্ত ধরা যেতে পারে। অন্য সর্বেশ্বর আধ্যাত্মিক চিন্তায়ও এ শূন্যবাদ আদর্শ অনুপ্রাণিত, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

চর্যা-৪৪
রাগ মল্লারী
কঙ্কন পা

কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা
কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা
কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা
কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা কঙ্কন পা

সুণে সুণে^১ মিলিআ জবেঁ ।
সঅল ধাম উইআ^২ তবেঁ ॥ ফ্র ॥
আচ্ছহঁ^৩ চউখণ সংবোহী ।
মাঝ নিরোহেঁ^৪ অণুঅর বোহী ॥ ফ্র ॥
বিদুঁ গাদ^৫ গ হি এ^৬ পইঠা ।
অণ^৭ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥ ফ্র ॥
জখা^৮ আইলেসি^৯ তথা জ্ঞান ।
মাঝে^{১০} থাকী সঅল বিহাণ ॥ ফ্র ॥
ভণই কঙ্কণ কল এল সাদেঁ ।
সক বি চুরিল^{১১} তথতা^{১২} নাদেঁ ॥ ফ্র ॥

পাঠান্তর

১. সুণে সুণ। ২. উঅআ। ৩. আচ্ছই। ৪. নিরোহ। ৫. বিন্দু নাদ, বিদু গদ।
৬. নাই এঁ নহিঁ এ। ৭. আণ। ৮. জখা আইলেন্ সি। ৯. জবীং আইলেন্ সি। ১০. মাঝেঁ,
মাসঁ, মাসং। ১১. বিচ্ছুরিল, সপ বিচ্ছুরিল, সপ বিচুরিল। ১২. অধ থা।

শব্দার্থ ও টীকা

সুনে সুনে—শূন্যের সঙ্গে শূন্য, স্বাধিষ্ঠানের সঙ্গে বজ্র স্তারাধিষ্ঠান চতুর্থানন্দ শূন্যতা।
উইআ—উদিত হয়। আচ্ছহঁ—আছ। চউখণ—চতুঃক্ষণ, সারাক্ষণ। সংবোধি—সংবোধিত,
উপলভ্য, উপলব্ধ। নিবোহেঁ—নিরোধে। অনুঅর—অনুত্তর, শ্রেষ্ঠ। বোহী—বোধি। হি এঁ—
হৃদয়ে। বিণঠা—বিনষ্ট। আইলেসি—এলে। বিহান—বিধান, বিহীন। কল এল—কলকল।
সাদেঁ—শব্দে। চুরিল—বিচূর্ণ হল।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

শূন্যে শূন্য যখন মিলিত।
সকল ধর্ম তখন উদিত॥
আদি সারাক্ষণ সংবোধিতে।
মাঝে নিরোধে অনুত্তর বোধিতে॥
বিন্দু নাদ নয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট।
এক চাইতে অন্য বিনষ্ট॥
যেথা থেকে এলে তাকে জান।

মাঝ থেকে সকল বিধান।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঙ্কণ বলেন কলকল শব্দে ।

সব বিচূর্ণ হল তথতা নাদে॥

গদ্যে রূপান্তর

শূন্য যখন শূন্যে মিলিত হয় তখনই সকল ধর্ম উদ্ভিত হয়। তাই তো আমি আছি সংবোধিত হয়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বোধি নিয়ে। মধ্যেও রয়েছে নিরোধ অনুত্তর বা উৎকৃষ্ট বোধি। বিন্দু নাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হল না, এক চাইতে গিয়ে অন্য বিনষ্ট হল। যেখান থেকে এসেছে তাকে জান, মধ্য থেকে সকল বিধান মান। কলকল শব্দে কঙ্কণ বলেন, তথতা নাদে সকল বিনষ্ট হল।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

তৃতীয় স্বাধিষ্ঠান শূন্যে বজ্র স্তরাধিষ্ঠান চতুর্থপদ শূন্য স্বয়ং সে সময়ে মিলিত হয়। সর্বধর্ম যুগলন্ধ ফলোদয় দেখা দেয়। সেই বিচিত্র দিক ক্ষণে চতুর্থানন্দ সংবোধিত স্থিত হয়। তেমনি মধ্যমা নিরোধে সপ্ত প্রকৃতি দোষ সমাধিমল নিধান অনুত্তর বোধিলন্ধ হয়। দীর্ঘ হৃঙ্কার উপায়ে গ্রাহকজ্ঞান বিকল্প বিন্দু প্রজ্ঞা গ্রাহক বিকল্প নাদ এই দুই বিকল্পে সে সময় পরিত্যক্ত হয়। তারপর সর্বধর্মানুভব দৃশ্যত চিত্তবোধনমন্ত্রে প্রবিষ্ট, আমার উদ্বোধিত চিত্তের উৎপন্ন তখন নিজবোধিচিহ্নে চিত্তবিষয়বিকল্প বিরহিত হয়ে চতুর্থ সুখসংবেদনরূপে জানা যায়। কঙ্কণ পা কলকল, সাকার নিরাকারাদি কলকলসম তথতানাদে ভগ্ন হয়।

সমীক্ষা

শূন্যের সঙ্গে শূন্যের মিলন হল স্বাধিষ্ঠান শূন্যতার সঙ্গে মহাশূন্যের মিলন হল এবং এর ফলে নির্বাণ। নির্বাণ চক্রকে প্রযুক্তির রাজ্যে মিলিত করে উষ্ণীয় কমলে নৈরাশ্রা শূন্যতায় পৌঁছতে পারার নাম মহাসুখোপায়। জাগতিক বস্তুসমূহ মোহমায়া ইত্যাদি অনিত্যতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে অবিদ্যাকে ধ্বংস করে এই মহামিলন লাভ করতে হবে। শূন্য থেকে শূন্যতায় পৌঁছতে হবে। সহজানন্দে পৌঁছে এ জ্ঞান অমর ধামে অবস্থান করে অথবা সকল ধর্মের ভেতর (সকল হিত ধর্ম পালনের ও সিদ্ধির) উদ্ভিত হয়। ধর্ম মানে যা ধারণ করে, বস্তুত কিংবা জাগতিক দ্রব্যাদি এবং প্রাণিজগৎ বিশ্বচরাচর সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম আছে। মেঘের ধর্ম হল আকাশে ভেসে থাকা এবং ভূমিত পৃথিবীকে বৃষ্টি দান করা। মানবধর্ম হল সৎকর্মাদির ফলে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। তাহলে সকল ধর্মের অমর ধাম যে ধর্ম এই শূন্য থেকে শূন্যে মিলনের ফলে তা উৎপন্ন হয়।

কবি বলছেন, আমি চতুঃক্ষণ বা বিচিত্র দিক ক্ষণ চতুর্থানন্দ ক্ষণ এই সংবোধিতে রয়েছে। ক্ষণের বিভাজন চার মাত্রায় বলা হল, ভাষ্যকার বিচিত্র দিকক্ষণ চতুর্থানন্দ বলছেন অর্থাৎ চার নির্বাণ চক্রে অবস্থান, যেমন—ধর্মকায়, সত্তোগকায়, সহজকায় এবং মহাসুখকায়, এই অবস্থানে নির্বাণ নিবৃত্তি। তাই এই চরম অবস্থায় উপনীত হয়ে যোগী রয়েছেন। এই সংবোধিতে চিত্তের বোধি উত্তীর্ণ হয়ে এই সন্ধান তিনি পেলেন। কারণ বিন্দু নাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে আর অন্য সব বিনষ্ট হয়েছে, সর্বং অনিত্যম, সর্বং দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাত্মক—সকল অনিত্য সকলই অনাত্মীয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক সকল বস্তুই অস্থির এবং চিরস্থায়ী স্বভাব বিশিষ্ট নয়। তাই তাদের বিনষ্ট হওয়াই তাদের ধর্ম। কবি একদিককে চেয়েছেন, অন্যদিক তাই বিনষ্ট হয়েছে। তিনি চেয়েছেন মহাশূন্যতাকে, তাই স্বাধিষ্ঠান থেকে সকল বন্ধন মায়া বিনষ্ট হল।

কবি বলছেন, যা ফেলে এসেছি তার জন্য আর মোহ কেন? অর্থাৎ ভব চিন্তা কিংবা ভব মায়ামোহ ছিন্ন করেছি, তা দিয়ে পুনরায় জন্ম কাম্য নয়, এখন শুধু নির্বাণ, নির্বাণই একমাত্র কাম্য। নির্বাণ হচ্ছে অনুত্তর ধর্ম বা উত্তীর্ণ ধাম, তাকে শুধু জ্ঞানতে হবে। এই শূন্যতার ভেতর অবস্থান করে সকল রকম বিধানে থাকতে হবে অথবা সকল বিধান অবগত হতে হবে।

কলকল শব্দে কবি কঙ্কন বলছেন সব কথা, কলকলের মাহাত্ম্য হল নদী জল প্রবাহ বা জলপ্রপাতের কলকল ধ্বনির মত বলছেন, যার প্রবাহ নিঃশেষ হয় না, যা শুনতে মধুর, স্থায়ী এবং অতুলনীয় ধ্বনি। এ নাদ তথতা নাদের সমতুল, তথতা বা সুকৃতি, তথাগত বুদ্ধ যে আদর্শ রেখে গেছেন তা হল তথতা। তথতা দিয়ে অবিদ্যাসমূহ বিচূর্ণ হল।



প্রেট ১৫ : কঙ্কন পা

কঙ্কন পা

বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের অধিবাসী। কারও কারও মতে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। তার রচিত দোঁহা পাওয়া গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা-৪৫
রাগ মল্লারী
কাহু পা

মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা ।
আসা বহল^১ পাত ফল বাহা^২ ॥
বর গুরু বঅণে কুঠারে^৩ ছিজঅ^৪ ।
কাহু ভগই তরু পুণ ৭ উইজঅ^৫ ॥
বাটই^৬ সো তরু সুভাসুভ পাণী ।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥
জো তরু ছেব ভেবউ^৭ ন^৮ জাই গই^৯ ।
সড়ি পড়িআ^{১০} রে মূঢ় তা ভব^{১১} মানই ॥
সুতরু^{১২} গঅণ কুঠার^{১৩} ।
ছেবই সো তরু মূল ন ডার^{১৪} ॥

পাঠান্তর

১. বহণ । ২. পাত ফলাহা । ৩. ছিজঅ ছিজাই । ৪. উঅজই, উঅজগ । ৫. বাটই ।
৬. ছের, ছেবই । ৭. জাগই, জাইণ । ৮. জো তরু ছে ভেউ ৭ জানই—মনে হয় এটাই
সঠিক পাঠ । ৯. পরিআ । ১০. মূঢ়া না ভব, মুট ৭ ভব । ১১. সুগ্ন তরুবর । ১২. সুন তরু,
সুন তরুবর গঅ কুঠার । ১৩. ডার ।

শব্দার্থ ও টীকা

ইন্দি—ইন্দ্রিয় । সাহা—শাখা । আসাবহল—আশাবহুল । বাহা—বাহী । ছিজতা—ছেদন কর,
ছেঁড় । উইজঅ—উদ্ভিদজাত, উৎপন্ন । বিদুজন—বিজ্ঞজন, বিদ্বান । পরিমাণী—পরিমাণ,
প্রমাণে । ভেউ—ভেদ রহস্য । সড়ি পড়িআ—সরে পড়ে ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

মন তরু পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার শাখা ।
আশা বহুল পাতা ফলবহ (থাকা) ॥
বর গুরুবচন কুঠারে ছেঁড় (না কেন) ।
কাহু বলেন তরু পুন না গজায় (যেন) ॥
বাড়ে সে তরু শুভাশুভ পানিতে ।
ছিঁড়ে বিদ্বজ্জন গুরুর পরিমাণ (বাণীতে) ॥
যে তরু ছেঁড়া ভেড়া না জানে ।
সটকে পড়ে রে মূর্খ তাকে ভবমানে ॥
শূন্য তরুবর গণন কুঠার ।

ছিঁড় সেই তরু মূল ভাল না (যার) ॥
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্যে রূপান্তর

মনরূপ তরু আর পাঁচ ইন্দ্রিয় হচ্ছে তার ডাল, সে আশাবহুল পাতা ফল বহনকারী। গুরু বচন বরকুঠার দিয়ে তাকে ছেদন কর। কাহু পা বলছেন, এ তরু যেন আর গজাতে না পারে। এ তরু শুভাশুভ পানি পেলে বৃদ্ধি পায়, গুরুকে সাক্ষী রেখে বিজ্ঞজন তাকে ছেদন করে। যে তরু ছেদনের ভেদরহস্য বোঝে না সে মূর্খ, সে ছিটকে পড়ে ভব সংসারকে মেনে নেয়। শূন্য তরুর গগন কুঠার, ছেদন কর সে তরুকে যাতে তার মূল ডাল আর কিছু না থাকে।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

অনাদি ভবভাবনাপল্লব আশ্রয়প্রাপ্ত স্বচিন্তুরত্নে উৎপ্রেক্ষিত যোগী তার চিন্ত তরু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আশা শাখা পত্র ফলস্বরূপ তরুর। কবি বলছেন, গুরু বচন বরকুঠারে তার বাসনা ছিড়ে ফেলুন যাতে এই চিন্ততরু ভূমিতে পুনরুৎপন্ন না হয়। চিন্ততরু শুভাশুভ পানি পেয়ে স্বমনাদি সংসার ভূমিতে বৃদ্ধি পায়। গুরুর বচন অনুভব করে বিজ্ঞজন চিন্তবৃক্ষকে ছেদন করে। যে যোগী চিন্তবৃক্ষের ছেদন নিঃস্বভাবীকরণ জানে না তিনি সংসার দুঃখ বারিধিতে সত্ত্বর পতিত হন। সেইরূপ অবিদ্যা শূন্য তরু প্রকৃতি প্রভাস্বর কুঠারে ছেদন করুন যেন ডাল মূল ও পুনঃ ইন্দ্রিয়াধীন না হয়।

সমীক্ষা

মন হল তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় হল তার শাখা পত্র ফল। চর্যা নং ১, লুই পা কায়াতরু পাঁচ ডালকে নিঃশেষ করতে বলেছেন। সর্বমের অনুশাসন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদির বিলুপ্তি দ্বারা দেহকে নিঃস্বভাবীকরণ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, বোধিচিন্ত অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। বোধিচিন্ত ধর্মকায়েরই নামান্তর; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা-বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বোধিচিন্ত অপরিশুদ্ধ হয়ে কায়াকে অপচিত করে; কিন্তু সাধনার ফলে এবং সদগুরুর উপদেশে সহজ পথে অগ্রসর হলে বোধিচিন্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন নৈরাত্মারূপিণী শূন্যতায় বা গগনে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে।

এ চর্যায় কাহু পা বলেন, মন তরু সর্বদা ইন্দ্রিয় মোহজালে আবদ্ধ, তার পাঁচ ইন্দ্রিয় ডালপাতা গগনকে আচ্ছন্ন করে ভব সংসারের বন্ধন দিয়ে বোধিচিন্তকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই পাঁচ ডাল বা পাঁচ ইন্দ্রিয়কে ছেদন করতে হবে, পরে তরুকে ছেদন করতে হবে সদগুরুবচনের কুঠার দিয়ে। ইন্দ্রিয় ডালপাতাবহুল ফলযুক্ত, তারা বহুবিধ কামনাবাসনা যুক্ত। কামনা বাসনা অবিদ্যারূপে দেহ বা মনকে আবিষ্ট করে বিনষ্ট করে। তাই কুঠার সদৃশ ছেদন যন্ত্রের প্রয়োজন, তেমনি কুঠারধারী সদগুরুও হতে হবে যাতে গুরুবচন এমনই ধারালো কঠিন হওয়া চাই যে বৃক্ষ যত প্রকাণ্ড এবং ডালপালা পাতা যত বিস্তৃত গগন আচ্ছাদনকারী হোক না কেন, সমূলে বিনষ্ট করে শূন্যে মিলিয়ে দিতে পারে। কারণ বৃক্ষের যে স্বভাব, কোথাও ডালপালা কেটে দিলেও কাটার চারপাশে আবার নতুন ডালপালা দেখা দেয়। খরতাপে বৃক্ষ শুকিয়ে গেলে বারিপাতের ফলে আবার নতুন করে সজীব হয়ে ডাল গজায়, শিকড় রস সঞ্চয় করতে পারে। তাই এইরূপ কোনও শুভাশুভ জল যেন বৃক্ষ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শুভ জলের ফলে বৃক্ষের নিজের বৃদ্ধি, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা অবশ্য অশুভ। আবার অশুভ জল হল বৃষ্টির ছত্রছায়ায় আগাছার বৃদ্ধি, কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে—অবিদ্যা ও নৈরাশ্রার টানা পোড়েন। খরা বর্ষা শীত বা বসন্তের প্রভাব। কবি আরও বলছেন, কেউ যদি একথা বিশ্বাস না করে তবে গুরু সাক্ষী, বিজ্ঞজনেরা এমন বৃক্ষ ছেদন করে থাকে এবং শুভ ফল লাভ করেন। 'গুরু সাক্ষী' এ কথাটার ভেতর মহাযানি তাত্ত্বিকদের গুরুবাদী শিক্ষা শপথ রয়েছে; কারণ গুরুই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তির আধার। তিনি যদি সাক্ষী থাকেন তাহলে আর কিছু অসত্য হতে পারে না। এটা তাত্ত্বিকদের দিবিয়া বা কসম।

যে ব্যক্তি বৃক্ষছেদনের রহস্য জানে না সে মূর্খ। সে যদি মনে করে কুঠার আঘাতে ব্যথাবেদনা বা মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে এবং তা মনে করা মূর্খতা বা সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। বিজ্ঞজন তা মনে করে না। শরীরে যদি কোথাও বিষফোঁড়া উঠে তবে তাকে শল্য চিকিৎসার সাহায্যে ছেদন করে নির্মূল করতে হবে, নচেৎ তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। তাকে ছেদন করতে গিয়ে যদি ব্যথা বেদনা হয় তা তো পরিণামে কিছুই না, সে কথা বিজ্ঞজন জানেন, মৃত্যু তাতে চিৎকার করে কাতর হয়। কিন্তু উপশম লাভ করার রহস্য তো সে উপলব্ধি করতে পারে না।

সে কারণে বিজ্ঞজনের দৃষ্টান্ত এড়িয়ে, গুরু নির্দেশ অমান্য করে কোন যোগী তাত্ত্বণিক সুখান্বেষণের জন্য সংসারকে আঁকড়ে ধরে যায়, সাধনমার্গ নির্বাণের পথ থেকে সরে পড়ে এবং ইন্দ্রিয়সুখকে মেনে নেয়। তাই কবি বারবার বলছেন, এ মোহ তরুকে ছেদন কর, নির্মূল করে দাও শূন্য কর দিবে অর্থাৎ গগনে মহাসুখে তাকে প্রবেশ করিয়ে নির্মূল কর। সঙ্গে তার ডালপাতাও যেন আর না গজাতে পারে।

চর্যা-৪৬

রাগ সবরী

জয়নন্দী পা

জয়নন্দী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকটিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি পাঠ্য পুস্তক নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি পাঠ্য পুস্তক নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

পেখু^১ সুঅনে অদসে^২ জইসা।অন্তরালে সো^৩ হব^৪ তইসা ॥ ৫ ॥মোহ^৫ বিমুক্তা জই মা গা^৬।তবে^৭ তুটই অবণা গমণা^৮ ॥ ৬ ॥গই^৯ দাটই^{১০} গই তিমই^{১১} ন চ্ছিজই^{১২}।পেখ মাআ^{১৩} মোহে বলি বলি বাবই^{১৪} ॥ ৭ ॥

ছাআ মাআ কায় সমাণা।

বেগি^{১৫} পাখে^{১৬} সোই বিণাণা^{১৭} ॥ ৮ ॥চিঅ তথতা স্বভাবে সোহিসই^{১৮}।ভগই জঅনন্দি ফডঅন^{১৯} গ হোই ॥ ৯ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠান্তর

১. পেখই, পেখ। ২. অদশ, পেখু সুইনে অদশ জইসা, পেখু সুঅনে অদশে জইসা।
 ৩. মোহ, মোদ, মোহব। ৪. ভাবি, ভব। ৫. মোদ। ৬. মণা, মানা। ৭. অবণা গবণা,
 অবনাগমনা। ৮. নৌ, নো। ৯. দাড়ই। ১০. বিমই, নৌ দাড়ই নৌ তিমই। ১১. ছিজই,
 ছিজুই। ১২. মোঅ, মোঘ। ১৩. বাঝাই। ১৪. বিণি। ১৫. বিণা, বিনানা। ১৬. মোহিঅ।
 ১৭. ফড়অণ, ফুডঅন।

শব্দার্থ ও টীকা

পেখু—দেখ। সুঅনে—স্বপ্নে। অদসে—অদৃষ্ট, অদৃশ্য, আদর্শ। বিমুক্তা—বিমুক্ত হওয়া,
 বিমুক্ত। দাড়ই—দাহ করে। তিমই—ভিজে, সিক্ত। ছিজই—ছিন্ন হয়। বলি বলি—বার
 বার। বাঝই—বন্ধ। পাখৈ—পক্ষে, পাখায়। বিণানা—বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। মোহিঅই—
 শোধন করে। ফুড়—স্পষ্ট।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

স্বপ্নে দেখা অদৃষ্টে যেমন।
 অন্তরালে মোহ হল তেমন॥
 মোহ বিমুক্ত যদি মন।
 তবে টুটে গমনাগমন॥
 না দাহ না ভিজে না ছিন্ন হয়।
 দেখ মায়া মোহে কায়ার বন্ধ রয়॥
 ছায়া মায়া কায়ার সমান।
 দুই পক্ষে সেও বিশেষ জ্ঞান॥
 চিত্ততথতা স্বভাবে শোধিত হয়।
 জয়নন্দী বলেন স্পষ্ট অন্য নয়॥

গদ্যে রূপান্তর

স্বপ্নে প্রতিভাসিত চিত্তরূপ যেমন অন্তরালে অবস্থিত মোহ তেমন। মোহ বিমুক্ত মন যখন
 হয় তখন আনাগোনা বন্ধন টুটে যায়। দন্ধ নয়, সিক্ত নয়, ছেদিত হয়েও নয় দেখ সে
 মায়ামোহে বার বার আবদ্ধ হয়। ছায়া বল মায়া বল, কায়ার বল সব সমান। দুই পক্ষে
 জড়িত আছে নানা বিজ্ঞান। চিত্ত তথতা স্বভাবে শোধিত যদি হয়, জয়নন্দী বলেন, স্পষ্ট
 এ অন্যথা কিছু হবার নয়।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

যেমন স্বপ্নে স্বপ্রতিভাস আদর্শে প্রতিবিম্ব সেরূপ আমার অন্তরে ভব বিজ্ঞান দৃশ্য।
 জলমধ্যে যেমন চাঁদ। সে অনাদিগত মার্গও যদি সেই বিজ্ঞান সংক্রমণ কালে সদগুরুবচন
 মার্গ অনুসরণ করে তাতে স্বচিত্ত মোহ বিমুক্ত হয়। সে ভাবে সংসারে যাতায়াত টুটে যায়।
 সদগুরুবচন পঙ্কজ বজ্র প্রসঙ্গ প্রাপ্ত সংসার মন মোহ বিমুক্ত হয়। অগ্নিতে দন্ধ হয় না,
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

জলে পচে নষ্ট হয় না, অস্ত্রে অচ্ছেদ্য পরমার্থ চিন্তা নিশঙ্ক আপাত হলেও তথাপি কুউপাদেয় মোহে বার বার আবদ্ধ হয়। মোহ বিমুক্ত যে পরমার্থবিদ সে ছায়া মায়া সম স্ববিগ্রহজ্ঞান লোচনে দেখতে পায়। পক্ষবিপক্ষ বিভিন্ন খণ্ডে প্রতীয়মান হয়। প্রজ্ঞা পারমিতার্থ মহারসে চিন্তা বাসনাদোষ বিশোধন ক্রিয়া বুদ্ধস্বরূপ হয়। তাই জয়নন্দী পাবলছেন, তথতা বিশুদ্ধ চিন্তের অন্যথা ভাব হয় না।

সমীক্ষা

স্বপ্ন কখনও সত্যি নয় অবাস্তব বটে, তবে স্বপ্ন বাস্তবের প্রতিরূপ-প্রতিভাস। মনোবিজ্ঞানী বলেন, যা জীবনে পূরণ করা হয় না বা যায় না, তারই আকাঙ্ক্ষিত রূপ হল স্বপ্ন। মনোবিশ্লেষণে স্বপ্নের নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। কেন মানুষ স্বপ্ন দেখে? সকলে সকল সময় স্বপ্ন দেখে না। নিস্তরঙ্গ মনে স্বপ্নের প্রভাব তেমন থাকে না। যখন কোনও সমস্যার উদয় হয় কিবা আশা-আকাঙ্ক্ষার সাধ মেটে না, স্বপ্নে এসে তা ভিড় করে, অনেক সময় তা বিকল্পে মেটাবার প্রতিরূপ প্রতিভাসিত হয়। কবি বলছেন, মানব জীবন বা কায়াতে আমি মানুষটা সংসার মোহে আবিষ্ট হয়ে গেলে তা থেকে মুক্ত এবং কোনও অন্তরালে অবস্থিত স্বপ্নের দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকি। মোহগ্রস্ততা এমনই হয় সে অবাস্তব স্বপ্ন যেন জড়িত বাধিত করে রেখেছে। যদি কোনও ক্রমে এই মোহমুক্তি ঘটতে পারে তবে অবশ্য আনাগোনা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। মোহমায়ার দরুন একবার জন্ম হলে জীবন যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচতে হয়, আবার মোহমায়ার জীবনে জড়িত হয়, মৃত্যু হলেও অন্য বার জগতে জন্ম নিয়ে আসতে হয়। স্বপ্নের স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কামনা বাসনা পোষিত হতে হয়, তা অপূর্ণ রেখে জীবন যাপন করতে হয় এবং মরতে হয়, আবার আসতে হয়; এমনই চক্র চলতে থাকে। এই যে গমনাগমন, এর থেকে কীভাবে মুক্তি? মুক্তির উপায় রয়েছে, সেটাই অবলম্বন করতে হবে।

এই দেহ তরু আর মনতরু মিলে যেটা, এটা যদি দঙ্ক না হয়, তপের অনলে—জ্ঞানের অনলে; রুচি শুচি সভ্য ভব্য শিক্ষা দীক্ষা নিষ্ঠা প্রয়াস শিষ্ট বিনয় কিংবা যা অন্তরকে বিকশিত করে এমন আলো বা তাপের দ্বারা দঙ্ক না হয়, তবে তো এটা অপরিচ্ছন্ন অকাট রইল। সিদ্ধ বা সিদ্ধি লাভ হল না। খনি থেকে সোনা যখন তোলা হয় সেটা কাদাযুক্ত থাকে। তাকে আগুনে পুড়ে, মেজে-ঘষে পিটে তবে তার থেকে খাঁটি সোনা নিষ্কাশন করা হয়, তখনই তার মৃত্যু নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, তখনই তা মূল্যবান হয়। কাদায় নিষিক্ত বা নিমজ্জিত সোনার কী মূল্য? তা কী কোনও অলংকার করে পরা যায়? না কোনও কোষাগারে দেশের সম্পদের বিকল্পে জামানত হিসেবে কিংবা হাটবাজারে বিকোতে পারা যায়? সিদ্ধপুরুষরাও খাঁটি সোনার মত, পুড়ে না কিংবা দঙ্ক যা হয়েছেন তার অধিক দঙ্ক হলেও নিঃশেষ হন না। সে সিদ্ধির জ্যোতি আছে, মূল্য আছে, মহিমা আছে। এমনি খাঁটি আবার জলেও অপচিত হয় না, জলে ফেললেও জল তার ভেতর প্রবেশ করতে পারে না। অথবা স্নাত হয়ে পরিচ্ছন্ন পবিত্র কিংবা অশ্রুসিক্ত হয়ে চিন্তা পরিশ্রুত। যে অনুতাপে দঙ্ক হতে জানে না কিংবা অবগাহনে স্নাত হতে পারে না তার জন্ম ও মৃত্যু অপরিচ্ছন্ন, তার চিন্তাকোষ ও দেহমন কখনও নিষ্কাশিত নয়। সে জীবন ও দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের অপরাধ থেকে বেরিয়ে এসে কোনও চেতনা হতে পারে না। কোনও অন্যায় বা পাপ করার পর যদি তার মনে এ জন্য অনুতাপ সৃষ্টি না হয় সে নিজে পাপী রয়ে গেল; জন্ম অপরাধে তাকে শাস্ত্রমতে বার বার জন্ম নিতে হবে। বার বার কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাই দেহকে ছেদন করতে হবে, এর আগে দেহ ছেদনের কারণগুলো বিধৃত হয়েছে। ছেদন ছাড়াও দেহ বা জীবনকে মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যায়। দেশের জন্য ফাঁসিতে দেহ ঝুলিয়ে প্রাণ উৎসর্গিত করে, সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এভাবে দেহ ছেদন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এভাবে যারা দেহ ছেদন করেন তারা তো সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ। আর এমনি দেহমনকে মহত্ত্বের উপযোগী বা নির্বাণ উপযোগী যে করতে পারে না, সে নিরেট অকেজো অপরিচ্ছন্ন আনাড়ি কিংবা মনুষ্যদেহধারী পশুর মত। জীবন ধারণ করেও তার মূল্য নেই, তার মুক্তি নেই, সে স্ববিগ্রহ জ্ঞানলোচনে অবলোকন করতে জানে না। সে ইতরজনের আনাগোনাতে জীবনপাত করতে থাকবে। তার দ্বারা কোনও ভালো কাজ আশা করা যাবে না, তার বিশ্বাস করারও কোনও সূত্র পাওয়া যাবে না। সামান্য অর্থের বিনিয়োগে তার দ্বারা কঠিন কাজ আদায় করা যাবে অবশ্য যেমন মাটি কাটার মত কঠিন কাজ করিয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু কাজের মর্ম বোঝে না সে।

মাটি কাটার মত কাজ মানে একটা পুঁজি, অপরিপুষ্ট চিত্তধারীদেহ দৈহিক শ্রম দিয়ে সারাদিনে দশ টাকার মত রোজগার করে, আর একজন জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ সদৃশ কর্তব্যাক্তি অফিসে বসে মাত্র একটি বা কয়েকটি দস্তখত দিয়ে এক লক্ষ টাকার মত দৈনিক রোজগার করেন, পার্থক্য হল সেখানে যারা সিদ্ধপুরুষ তারা অবাস্তব ছায়া মায়া কায়া, অর্থাৎ স্বপ্ন বা সংসার মায়া বা দেহকে মূল্য দেন না। দেহকে বড় করেন না, যোগী জ্ঞানে দেহহীন বা তুচ্ছজ্ঞান করেন, মহৎ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন; যোগী নির্বাণের জন্য তাঁর সকল বন্ধন ছিন্ন করেন। অন্যভাবে বললে, বিশ্বের উন্নতির জন্য—প্রগতির জন্য নিজের স্বার্থজ্ঞানকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারেন। তাঁদের কাছে জীবন ও মৃত্যু দুই পক্ষ সমান।

এ পদে অবশ্য দু পক্ষ বলতে 'পক্ষাপক্ষভিন্মুং চাকলয়তীতি'—বিভিন্ন পক্ষের খণ্ড বিখণ্ড রূপকে ধরা হয়েছে, বিশেষ জ্ঞান বা জ্ঞানলোচনে তার সবই দৃশ্যমান—এ কার পক্ষে সম্ভব, যিনি তথ্য স্বভাবে পরিপুষ্ট। বুদ্ধের নির্দেশিত আদর্শ এবং সুকৃতির নাম হচ্ছে তথ্যস্বভাব; কবি জয়নন্দী এ কথা জানেন এবং এর অন্যথা হবার নয়।

জয়নন্দী

এই সিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্ণ রত্নাকরে যে চৌরাশি সিদ্ধার নাম রয়েছে সে তালিকায় জয়নন্দীর নাম আটান্ন নম্বরে রয়েছে।

চর্যা-৪৭
রাগ গুজরী
ধাম পা

কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিতলী।
সমতা জোএঁ জলিঅ চণালী ॥৫॥
ডাহ ডোষী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পানী ॥৬॥
নউ খর জালা ধূম ন দীসই।
মেরুশিখর লই গঅণ পইসই। ॥৭॥
দাটই হরিহর বামহ ভট্টা।
দাটই নবগুণ মাসন পট্টা ॥৮॥
ভগই ধাম ফুড় লেহু রে জাণী।
পঞ্চ নালেন উঠি গেল পানী ॥৯॥

পাঠান্তর

১. ভমই লেলী, ভবই লেলী, ভইঅ মিতলী, ভই ম মিতলী। ২. জলিল। ৩. দাহ।
৪. আগি, আগী। ৫. সহবলি, সসহর। ৬. সিঞ্চহ, সিঞ্চহুঁ। ৭. নউখরে, নউখড়ে।
৮. ফাটই, ফাটই। ৯. বাস্কভরা, বাস্কভরা, বাস্ক ভড়। ১০. দাটা, ফীটা, স্কীটা
হই। ১১. পড়া, শাসন পাড়া। ১২. ফীটা হই গবগুণ মাসন পড়া। ১৩. লেগরে, লেহুরে।
১৩. উঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

কমল কুলিশ—কমলরূপ যোনী এবং কুলিশরূপ পুরুষাঙ্গ, তন্ত্র মতে ললনা, রসনা
অবধূতীর সঙ্গে মিলনচক্রে মিলিত করে দেহের বীৰ্য বা চন্দ্রকে জাগ্রত ও উর্ধ্বগামী করে
ধর্মচক্রে ও সন্তোগচক্রে ভেদ করে উষ্ণীষ কমলে নৈরাশ্বরূপ শূন্যতায় পৌছলে মহা সুখকায়
বা নির্বাণ লাভ হয়; এখানে তাই বীৰ্যবাহী কুলিশ উষ্ণীষ কমল নৈরাশ্বা মিলনকে বলা
হচ্ছে (চর্যা নং ৪ দ্রষ্টব্য)। ভইঅ মিতলী—মিত্রতা হল, মিলল। জোএঁ—যোগ। জলিঅ—
জুলে উঠল। ডাহ—দাহ। আগি—আগুন। সসহর—শশধর। হরিহর বামই—হরিহর ব্রহ্মা।
ভট্টা—ভট্টারক, ভট্টাচার্য। ফুড়—স্পষ্ট। পঞ্চনাল—পঞ্চ কন্ধ বা পঞ্চতথাগত; পঞ্চ কন্ধ—
পঞ্চইন্দ্রিয়; পঞ্চ তথাগত—বুদ্ধের পঞ্চশীলা।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

কমল কুলিশ মাঝে হল মিতালী।
সমতা যোগী জ্বলল চণালী॥
দঙ্ক ডোষী ঘরে লাগল বহি।
শশধর সলিল সিঞ্চনে পানি॥
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না ঘর জ্বালা ধূমও না দেখা যায়।
 মেরুশিখর নিয়ে গগনে প্রবেশ পায়॥
 দক্ষ হরিহর ব্রহ্ম ও ভট্টা।
 দক্ষ নবগুণ শাসন পাট্টা॥
 বলেন ধাম পা পষ্ট নাওরে জানি।
 পঞ্চ প্রণালীতে উঠে গেল পানি॥

গদ্যে রূপান্তর

কমল কুলিশের ভেতর মিলন হল, সমতা সঙ্গমে যোগী জ্বলল, চণ্ডালীও জ্বলল। ডোয়ীর ঘর দক্ষ হয়ে গেল (মিলন আগুনে), ডোয়ী দক্ষ। শশধর সলিলে আছে সেখান থেকে জল সিঞ্চন করল। খর তাপ কিন্তু জ্বালা নেই, ধূম দেখা যায় না, মেরু শিখর নিয়ে (বেয়ে) গগনে প্রবেশ করল। হরিহর ব্রহ্ম এবং ভট্টারক দক্ষ হল, নবগুণ (ভট্টার চৈতন ও অন্যান্য) এবং শাসন (করার অধিকার) পাট্টন দক্ষ হল। ধাম পা বলেন, (এ থেকে) স্পষ্ট কথা জেনে নাও, পঞ্চনালে পানি উঠে গেল।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

প্রজ্ঞাপায় সমতা সত্যাক্ষর মহাসুখ রাগ নির্বাণ চক্রে চণ্ডালী জ্বলছে। মহাসুখ রাগদাহ যুক্ত অগ্নি ডোয়ী পরিশুদ্ধা অবধূতিকা গৃহে লগ্ন। প্রেমহাসুখ রাগ অগ্নিতে আমার সকল বিষয়বৃন্দ আশ্রয় দক্ষ হয়েছে। সদগুরুপ্রসাদ বিজ্ঞান পরিশোধিত সংবৃতি বোধিচিন্তা নিয়ে তার বহি নির্বাপিত কর। যেমন বাহ্যস্তবে জ্বলন ধূমাদি দৃশ্যমান সেরূপ জ্ঞানবহিও দেখা যায়। কিন্তু ভাবাভাব দক্ষ সমেরুশিখরপ্রাণে গগন মহাসুখ চক্র রয়েছে। ব্রহ্ম বিটনাড়িকাবোধক, হরি মূত্র নাড়িকা, হির গুত্র নাড়িকা এতে দক্ষ হল। নব পবন শাসন চক্ষু ইন্দ্রিয় বিষয়াদিও দক্ষ হল। কুলিশানলে নিঃস্বভাবীকরণ করা হল। ধাম পা বলেন, গুরু চরণ উপায়ে সম্যক কুলিশ সংযোগ স্ফূট করে যোগী মূর্ধা অঙ্গুলি সংকেতে স্থিত ত্রৈলোক্যে কায়বাকচিন্তের আভাষ দোষমুক্ত মহাসুখ জিতেন।

সমীক্ষা

জাগতিক মোহমায়ার কারণ হল অবিদ্যা; অপরিশোধিত বোধিচিন্তকে বিষয়াদির প্রতি আকৃষ্ট করে ভব যন্ত্রণা ও পুনর্জন্মের হেতু অবিদ্যা দোষ নির্বাণের অন্তরায়। নৈরাশ্র সাধনাও বোধিচিন্তের জাগরণের জন্য তাত্ত্বিক মতে কুলিশ কমলের মিলনের ফলে নির্বাণ চক্রে বা গগনে প্রবেশিত হয়। নারী পুরুষের মিলনের রূপকে তাত্ত্বিকরা রূপকভাবে কমল কুলিশ বা মিলন বলেছেন, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল, তন্ত্র মতে ললনা রসনা-অবধূতিকার সঙ্গে মিলিত করে দেহের বীৰ্য বা চন্দ্রকে জাগ্রত ও উর্ধ্বগামী করে ধর্মচক্র ও সঙ্গোগচক্র ভেদ করে উচ্চীষ কমলে নৈরাশ্র রূপ শূন্যতায় পৌছতে পারলে মহাসুখকায় বা নির্বাণ লাভ হয়। অনুরূপ ৪ নং চর্যাতেও আছে।

তিয়ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কমালী।

কমল কুলিশ ঘান্টে করহুঁ বিআলী।।

তাত্ত্বিক সাধনামার্গের এমনই রূপ অথবা এটা রূপক। তাত্ত্বিকরা সাধারণত বামাচারী, মহা নির্বাণতন্ত্রম নামক তন্ত্রগ্ধ্রে এ ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেহতত্ত্ব দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ের বর্ণনা এই, জীবগণের শরীরে ললনা রসনা অবধূতি (ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুমা) এই তিন নাড়ি মূলাধার হতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ললনা চন্দ্রস্বরূপ—শরীরের বাম দিকে অবস্থিত; রসনা সূর্যস্বরূপ ডান দিকে রয়েছে এবং মধ্যস্থলে বা মূলাধারে অগ্নিস্বরূপ অবধূতি (সুষুমা) নাড়ি বিদ্যমান। বিভিন্ন চর্যায় চন্দ্র সূর্য ও মধ্যপথের কথা রয়েছে, মূলাধার পদ্ম বা কমলকে ত্রিবেণী বা ত্রিভুজা বলা হয়েছে। তাহলে কমল কুলিশের মিলন এবং সমতা যোগ আচরণ সৃষ্টিকারিণী চাণ্ডালী অর্থাৎ সঙ্গমের উপযোগী নৈরাশ্রা উদ্দীপনাকারিণী চাণ্ডালী তখন জ্বলে ওঠেন। নৈরাশ্রাপিণী চাণ্ডালী কমল কুলিশা মিলনে প্রজ্বলিত হল। এই চাণ্ডালী বা ডোম্বীর ঘরে দাহ, তাতে আগুন লেগে। এই ডোম্বীর ঘরে (কমলে) কুলিশ স্বরূপ যোগী প্রবেশ করলে সর্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়মলাদি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। ভবসংসারের মায়ামোহ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

শশধর পানি সিঞ্চন করছেন সে আগুনে, অর্থাৎ চন্দ্রস্বরূপ নাড়ি তাতে আনন্দ সঞ্চয় করছে অথবা শীতল করছে। এই পানি বা অগ্নি নির্বাপক কারণ থেকে অবিদ্যার প্রভাব মুক্তি। তার থেকে সুখ বা মহাসুখের সৃষ্টি। ফলে আগুনে দহন হলেও তাতে জ্বালা নেই। বিশেষভাবে বলে তাকে বিদগ্ধ বলা হয়। এ বিদগ্ধতা থেকে সিদ্ধি বা সিদ্ধি লাভ ঘটে। এই আগুনের যেমন জ্বালা নেই, তেমনি তার ধূমও নেই। কেউ দেখতে পায় না এ আগুন। সাধারণ আগুনের জ্বালা আছে, ধূম আছে, প্রজ্বলনও দেখা যায়। কিন্তু ডোম্বী বা যোগিনীর ঘরের আগুনের প্রজ্বলন অন্য কেউ দেখে না। আগুনের শিখা উর্ধ্বগামী, গগনে মিলিয়ে যায়। সুমেরু শিখর ধরে সিদ্ধশিখর গগনে প্রবেশ করেন। আগুনের শিখাকে এখানে সুমেরু শিখর বলা হয়েছে, যেহেতু সুমেরু হল পর্বতসিঁড়ি, যা অতিক্রম করে নির্বাণে যেতে হয়।

হরিহর ব্রহ্মা ভট্টাও এই আগুনে পোড়েন। অন্যত্র 'ব্রাহ্মণনাড়িয়া' প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম বা হিন্দু সংস্কার আকৃষ্ট ছিলেন সিদ্ধাচার্যরা—বক্তব্যে টেনে এনেছেন। একই প্রাসঙ্গিক উপায়ে হরিহর ব্রহ্মা এবং ভট্টা বা ভট্টারক বা ভট্টাচার্য (ব্রাহ্মণ) এখানে উপস্থিত। হরি হল বিষ্ণু, হর হল শিব, ব্রহ্ম—এই তিন দেবতার উপস্থাপক হল ভট্টা, এরাও পুড়ে গেল, এর অর্থ এদের শাসন বা প্রভাব বিনষ্ট হল। নৈরাশ্রাপিণী ডোম্বী এদেরও পুড়ে মারলেন। তাদের ধারা সৃষ্ট নবপ্রথা বা জাতিভেদ বিলুপ্ত এবং এ কারণে যে তাম্র শাসন তা কার্যকর রইল না। শাসন পাট্টা নবলক্ষণ বা নবগুণ বিশিষ্ট, যথা—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আকৃতি, তপ এবং দান, এই নয় ব্রাহ্মণ-লক্ষণ থেকে কৌশিক বা কুল লক্ষণ। কুল লক্ষণের চিহ্ন ব্রাহ্মণ চৈতন্য দিয়ে প্রকাশ করে। কবি তাই মনে করেন এই কৌলীন্য বা ভট্টার বুজরুকিও পুড়ে ছাই।

ধাম পা স্পষ্ট করে বললেন, এ কথা জেনে নাও, এর কোনও অন্যথা হবে না। পঞ্চনাল দিয়ে সুমেরু শিখর হয়ে নির্বাণে উঠল যে পানি, সে পানিতে নৈরাশ্রার দ্বারা দহন করা বিদগ্ধ পুরুষকে অভিষিক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি বোধিচিহ্ন প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি নির্বাণ লাভ করলেন। পঞ্চনাল হল পঞ্চ স্কন্ধ বা পঞ্চ তথাগত।

এ চর্যায় যথেষ্ট কাব্যগুণ রয়েছে, 'মেরুশিখর লই গঅন পইসই'—এ রূপকল্প চমৎকার, এমনিতে হিন্দু ও বৌদ্ধমতে মৃতদেহ দাহ করলে হোমাগ্নি শিখা থেকে হিন্দুমতে স্বর্গে, এবং বৌদ্ধমতে নির্বাণ লাভ হয়। এখানে কবি আগুনের শিখার মেরু যা পৌরাণিক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম অনুশাসনের রূপ তুলে ধরেছেন। আগুনের শিখার বিভিন্ন সিঁড়ি বেয়ে নির্বাণচক্রে যাওয়া যায়।



প্রেট ধাম পা

ধাম পা

সিদ্ধাচার্য ধাম পা বিগ্রহ পাল এবং সরায়ণ পালের (৮৫০-৮৫৪, ৮৫৪-৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সময় বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবত ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর ভেতর সুগত সৃষ্টি গীতিনা, হঙ্কার চিত্তবিন্দু ভাবনাক্রম এবং কালিভাবনা মার্গ-এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন ধারণা করা হয়।

চর্যা-৪৮

রাগ পটমঞ্জরী

কুকুরি পা

2 and 20 rd no poem is also
by same poet

এই চর্যাপদটিও পাওয়া যায় নি, সঙ্গে প্রাপ্ত টাকাও বিলুপ্ত, মনে হয় সঠিক পদটি গ্রন্থ থেকে আলাগা করে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি, কিন্তু এ পদের তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া গেছে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে তিব্বতি অনুবাদ অনেক চর্যার মূল পাঠের অনেক স্থলের অর্থের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। সে কারণে কেউ কেউ তিব্বতি অনুবাদের অনুকরণে বিলুপ্ত চর্যার পাঠ কিংবা ব্যাখ্যা রাখলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। পূর্বে কুকুরি পাএর দুটি চর্যা, ২ নং এবং ২০ নং আলোচিত হয়েছে, তাছাড়াও তিনি সিদ্ধাচার্য ধাম-পা-এর সদগুরু ছিলেন মনে হয়, কারণ ধাম পা এর পদের টীকা তুলতে গিয়ে বলা হয়েছে—শ্রীগুরু চরণোপায়েন সম্যক কুলিশাজ সংযোগো স্মৃৎ কৃত্বা স কুকুরীপাদেন। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা-৪৯
রাগ মল্লারী
ভুসুকু পা

বাজ^১ গাব পাড়ী^২ পঁউআ^৩ বালৈ বাহিউ ।
আদঅ দঙ্গালে^৪ দেশ লুড়িউ^৫ ॥
আজি ভুসু^৬ বঙ্গালী^৭ ভইলী ।
নিঅ ঘরনী চাগুলী^৮ লেলী ॥
দহিঅ^৯ পঞ্চপাটন ইন্দি বিসঅ^{১০} গঠা ।
ণ জান-মি^{১১} চিঅ মোর কহি গই পইঠা ॥
সোণ তরুঅ^{১২} মোর কিম্পি ণ থাকিউ ।
নিঅ পরিবারে মহাণেহেঁ থাকিউ^{১৩} ॥
চউকোড়ি ভগুর মোর লইআ সেস^{১৪} ।
জীবন্তে মইলৈ নাহি বিশেষ ॥

পাঠান্তর

১. রাজ, রাজা । ২. পাড়, পাড়া । ৩. পদ্মা, পদ্মা । ৪. বঙ্গালে, জঙ্গালে । ৫. লড়িউ, লুটিউ । ৬. ভুসুকু । ৭. বঙ্গালি । ৮. চাগুলে, চাগুলে । ৯. ডহি জে, উডি জো, ডহিঅ । ১০. পঞ্চপাটন ইন্দি বিনঅ, পঞ্চ পাট নই দিবি সংজ্ঞা, পঞ্চরাত শ ইন্দিবিসঅ । ১১. জানসি । ১২. সোণতরুঅ, সোণ অরুঅ, সোনত রুঅ । ১৩. বুড়িউ, মহাসুহে থাকিউ । ১৪. লই অসেষ ।

শব্দার্থ ও টীকা

বাজ—বজ্র, পাঠান্তরে রাজ বা রাজা । গাব—নৌকা । পঁউআ—পদ্মাখাল, তাত্ত্বিকমতে প্রজ্ঞাপদ্ম, মুদ—প্রজ্ঞারবিন্দু কুহরুহদে' । অদঅ দঙ্গালে—অহুদয় দাঙ্গাকারী, নিষ্ঠুর জলদস্যু, পাঠান্তরে—অদয় বঙ্গালে—নিষ্ঠুর বাঙালি; পদ অভ্যন্তরে 'অদয় দঙ্গালে দেশ' বা 'অদয় বঙ্গালে দেশ' এ অর্থ থেকে বাঙালিরা দস্যু বা বঙ্গাল দস্যুদের দেশ ব্যাখ্যা করা যায়; মুদ—'শব্দোহীত্যাদি অক্ষরসুখাদয় বঙ্গালেন'—শব্দকারী বা দস্যুদের হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে আক্রমণ বা সশব্দে আক্রমণকারী বঙ্গাল থেকে বাঙালি চরিত্র হনন চলছে; অক্ষরসুখাদয় বঙ্গাল যে নিষ্ঠুর বঙ্গাল এ কথাও অর্থবোধক হতে পারে না; তবে বাঙালিদের ভেতর এমনও কেউ রয়েছে যারা বাঙালি বা বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা পোষণ করেন, 'সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ণ জানি' কিন্তু কবি ভুসুকু বঙ্গাল ঘরানায় সংগীত রচনা করেছেন, বাঙালির মহত্ত্বকে খর্ব করতে এ কথা লিখেছেন মনে হয় না, কারণ পরেই তো বললেন, 'আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলি'—তবে এ কথা থেকে এও বোঝায় যে ভুসুকু সেই দাঙ্গাকারী হলেন । লুড়িউ—লুট করে নিল । নিজ ঘরনী চাগুলী—নিজ গৃহিণী চাগুলী, চাগুলীকে নৈবাত্তা বলা হয়েছে এখানে নিজ ঘরনী চাগুলী অর্থ তাই, তবে দঙ্গাল বা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বঙ্গালের ঘরলী এখানে স্বাধিষ্ঠান প্রকৃতি বা অপরিশুদ্ধ নিজ প্রকৃতি, কিন্তু মুদ—‘নিজ গৃহিণীহ্যপরিশুদ্ধাবধূতী বাকুরূপা। চণ্ডালেনেতি। স্পর্শ প্রকৃতি প্রভাস্বরেণ নীতা’। দহিঅ—দগ্ধহল। পঞ্চপাটন—পঞ্চ স্কন্ধ, মুদ—‘পঞ্চস্কন্ধাশ্রিতাহং কারমমকারাদিকং দগ্ধং ইন্দ্রিয়বিষয়ঞ্চ’-পঞ্চইন্দ্রিয়ের অহংকার। গঠা—নষ্ট। সোনিরুআ—সোনা রূপা। কিম্পি—কিছুই। চউকোড়ি—চতুষ্কোটি, চারচক্র বা নির্বাণের চারচক্র, চার কোঠা বা চারকোটি আনন্দ, পরমানন্দ, বিরামানন্দ ও সহজানন্দ, বিকল্পে পঞ্চতথতা কিংবা রূপ বেদনা সংজ্ঞা বিজ্ঞানদি। ভিন্মতে ‘সং, অসং, নসং ন অসং, সদসং’ বিকল্পভাবে—‘ভাবাভাব দুঃখসুখাদি লোক্যানম’।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

বজ্র নাও পাড়ি পদ্মখালে বেয়ে।
 অদয় দস্যুতে দেশ (গেল) লুট হয়ে।
 আজ ভুসুকু বাঙালি হল।
 নিজ ঘরনি চাণ্ডালী নিল।
 দগ্ধ যে পঞ্চপাট ইন্দ্রিয় বিষয় নষ্ট।
 জানি না চিত্ত আমার কোথা গিয়ে প্রবেশ করল।
 সোনারূপ আমার কিছুই থাকল না।
 নিজ পরিবারে মহা স্নেহে থাকলাম (কেন না)।
 চারকোটি ভাগুর আমার বিশেষ শেষ।
 জীবন্তে মৃত্যে নাই বিশেষ

গদ্যে রূপান্তর

বজ্র নায়ে পাড়ি দিয়ে পদ্মখালে বাওয়া হল, নিদয় দস্যু দেশ লুট করে নিল। আজ ভুসুকু তাই বাঙালি হল, নিজ ঘরনিরূপে চাণ্ডালীকে বেছে নিল। দগ্ধ হল পঞ্চপাট, ইন্দ্রিয় বিষয় সব নষ্ট হল। জানি না এর পর চিত্ত কোথায় গিয়ে প্রবেশ করল। সোনা আমার কিছুই রইল না, তবু নিজ পরিবারে মহাস্নেহে থাকলাম, আর চারকোটি ভাগুর নিঃশেষ করল, জীবন্তে মৃত্যে আমার ইতর বিশেষ নেই।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

প্রজ্ঞা অরবিন্দ কূহর হৃদে সদগুরু বচন উপায়ে প্রবেশ করে তথায় আনন্দাদি শব্দাচ্ছাস দ্বারা অক্ষর সুখ অদয় বঙ্গালে বাহিত ভুসুকু পা আত্মবোধন করে বললেন, প্রাণ পরিপাক অবস্থা বিয়োগ অদৈব বাঙালি নিজ গৃহিণী পরিশুদ্ধা অবধূতীবায়ু রূপ চণ্ডালী স্পর্শ প্রকৃতি প্রভাস্বরকে নিয়ে গেল। সে মহাসুখ কালে পঞ্চ স্কন্ধ আশ্রিত অহংকার মকারাদি ইন্দ্রিয় বিষয় মাত্র দগ্ধ হল। তাই সংকল্প পরিহার চিত্তরত্ন কোথায় জানা গেল না। সোনা রূপ শূন্যতাগ্রহ, রৌপ্যরূপ ভাবগ্রহ উভয় বিকল্প স্বরূপ পরিচর্যাতে সতত কিঞ্চিৎ স্থিত। তাই নির্বিকল্প পরিহারে মহাসুখকর রত্ন নিমগ্ন হল। তারপর চতুঃকোটি বিচার ভাগুর আমার সেই অদয় বঙ্গালে গ্রহণ করল। অতএব আমার আত্মা জীবন মরণধ্যানাদি বিকল্প শূন্য হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীক্ষা

তাত্ত্বিক সহজিয়া সিদ্ধাচার্য রচিত চর্যাপদ বা চর্যাগীতিগুলো সাধন সঙ্গীত এবং তা গুহ্য বা রূপক আকারে গৃহীত বিষয়। বজ্রযানিদের আকাজক্ষা ও শেষপ্রাপ্তি অদ্বয় জ্ঞান। এই মতের শূন্যতা বা তথ্যতা সুকৃতিকে অদ্বৈতাবস্থা বলা যায়। বোধিসত্ত্ব-বোধিচিন্তের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ—নিত্য, অপরিবর্তনীয় এবং প্রজ্ঞানন্দ বা প্রজ্ঞানঘন অদ্বয় বজ্র সংগ্রহে বলা হয়েছে, 'অচ্ছেদ্যাভেদ্য লক্ষণ আদাহী ও অবিনাশী—বৌদ্ধ সহজযান যা বজ্রযান যোগাচারের এটাই পরিণাম। নির্বাণরূপ মহাসুখের জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে অদ্বয়চিন্ত তরু অরহ গই বিদুবনে বিথার'—অর্থাৎ, অদ্বয়চিন্ত একটি বিরাট তরু ত্রিভুবনে তার বিস্তার। অদ্বয়জ্ঞানে জন্মমৃত্যু থাকে না, চর্যা নং ২২,

জইসে জাম মরণ বি অই সো।

জীয়ন্তে মইলে নাহি বিসেসো।

অর্থাৎ, যেমন জন্ম, তেমনি মরণ, জীবন এবং মৃত অবস্থার কোনও ইতর বিশেষ নেই।

এখানে ভুসুকু পা বলেছেন, 'জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ' এটাই সহজ পথ এবং মত, এটাই সহজ স্বভাব, বজ্রযান। এই সহজ স্বসংবেদ্য। এই অবস্থায় জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বোট লুপ্ত হয়ে যায়। চর্যার বিভিন্ন পদে দৃষ্টান্ত রয়েছে এই 'অবাজনসগোচর' অবস্থা কী? যেমন—চর্যা নং ২৯। 'উদক চন্দ্র জিম সাব ন মিচ্ছা—জলের ভেতর চাঁদ দেখলে তা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। চর্যা ৪১, রাজসঙ্গ দেখি জো চমকই—রজ্জুসর্প দেখে যে চমকিত হয়, এই মহাজ্ঞান হল বজ্রজ্ঞান প্রজ্ঞাযোগী তাই জীয়ন্তে মরা।

এই বজ্র সাধনার নৌকা বেয়ে পদ্মখাল অতিক্রম করা হচ্ছে। পদ্মখাল হল প্রজ্ঞা কমল; এখানে তাত্ত্বিক নিয়মে-বজ্রনৌকা পদ্মখালে তাত্ত্বিক দেহ বা কুলিশ প্রবেশ করানো হল, এটা নরনারীর সঙ্গম সূচক রূপক। বৌদ্ধমতে উষ্ণীষ কমল চৌষট্টি পাপড়িযুক্ত, চর্যা নং ১০, একশো পদমা চউসহিটি পাখুড়ি'। তখন সাধনার মূল ভিত্তি তাই গুহ্য যৌগিক উপায়ে শূন্যতা ও করুণার মেলবন্ধন বা রহস্যময় স্ত্রী পুং সংযোগ, চর্যা নং ৪৭, বিজ্ঞানঘন চরম শূন্যতা অবস্থানে বলা হচ্ছে বজ্রসত্ত্ব বা প্রজ্ঞাপদ্ম, যা দৃঢ় সার নিশ্চল অবিকল্প এবং বজ্রের মত কঠিন, শাস্ত্রমতে—

দৃঢ়ং সারং অসৌবীর্যম অচ্ছেদ্যাভেদ লক্ষণম

আদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র মচ্যতে।

কিন্তু এ বজ্রখাল পাড়ি দেবার সময় অদ্বয় দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হলে দস্যু সম্পূর্ণ লুটে নিয়ে নিল। অদ্বয় দস্যু মানে বজ্রসত্ত্ব বা বোধিসত্ত্ব, তাতে করে আপন দেশ বা আপন অবস্থান লুপ্তি হল। নিজের বিষয়বস্তু বা সম্পদ কিছুই আর বাকি রইল না। নিজের বিষয় বলতে ইন্দ্রিয় এবং ভবসংসারের মায়ামোহ বন্ধনকে বোঝাচ্ছে।

এর পর আজ ভুসুকু নিঃস্ব বাঙালি হলেন। এর বিকল্পে বলা হচ্ছে, পদ্মখাল দিয়ে বজ্রনৌকা করে নিজ গৃহিণীসহ যাবার কালে বঙ্গালি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত, তারা নির্দয় নির্মম, সে কারণে আজ ভুসুকু বাঙালি হলেন এবং নিঃস্বভাবী হলেন। সে যাহোক, ভুসুকু বাঙালি হওয়ায় ঐতিহাসিক চিত্র হল তৎকালে বাঙালিরা ঘন জঙ্গলে বাস করতেন বলে দঙ্গলে বা দাঙ্গাবাজি দস্যু, তারা ভদ্রলোক বিবর্জিত অঞ্চলে বাস করত, চণ্ডালেরা যেমন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগীরা হয়তোবা অধিকাংশ বাঙালি ছিলেন, বাংলা অঞ্চলের জীবনচিত্র জাতি ও চরিত্র অভিজ্ঞ ছিলেন। 'চণ্ডালেরাও বঙ্গে বাস করতে পারে। তাই বলে সবাই দস্যু বা চণ্ডাল ছিলেন না, সিদ্ধাচার্যরা রূপক সৃষ্টির জন্য চণ্ডাল চরিত্র বা কোন চণ্ডালীকে এনেছেন, তেমন চণ্ডাল জীবন কদাচিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়া এবং তান্ত্রিক কাপালিকদের ভিড় ছিল এখানে, কারণ এ অঞ্চল ছিল তাদের নিরাপদ সাধনার পীঠস্থান বা সেই উপযোগী দেশ, তারা বামাচারী, দস্যুতাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, নারী সংগ্রহের জন্য এ রকম দস্যু তারা হতেও পারে। তাই ভুসুকুর যুগেও বঙ্গাল বা বাঙালি হওয়া কোনও মতেই গৌরবান্বিত ব্যাপার ছিল না। চর্যা ৩৯ নং, বঙ্গে জায়া নিলেসি'—এখানে বঙ্গে জায়া হরণ করে নেবার কথা আছে। ব্যাখ্যাকাররাও বঙ্গালদের দঙ্গাল বা দাঙ্গা সৃষ্টিকারী দস্যু বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ বঙ্গাল তন্ত্রমতে বোধিচিত্তের রূপক, যারা জায়া হরণ করে বা নৈরাত্মাকে ছিনিয়ে নেয়। ভুসুকু একটু বেশি করে বলেছেন তাঁর আপনকে বা তাঁর আপন দেশ হরণ করে নিল তারা, অথবা বাংলাদেশের পদ্মাখাল পথে নৌকা নিয়ে যাওয়ার কালে বঙ্গাল কর্তৃক লুণ্ঠিত হলেন। বাংলাদেশে লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার একটি সামাজিক চিত্র তাতে করে পাওয়া গেল, দ্বিতীয় বিষয় অদ্বয়রূপ বোধিচিত্ত (বাঙ্গাল) তার মোহমায়া ইন্দ্রিয় সংসার ভব সম্পদ লুট করারও একটি বিকল্প চিত্র রয়েছে, অর্থাৎ ভুসুকু নিজ গৃহিণী হারালেও পেলেন সুন্দরী নৈরাত্মা বা কামচণ্ডালী, বঙ্গাল তাঁকে এই উপহার দিয়েছেন। তাও হতে পারে বঙ্গাল কর্তৃক তিনি তাদের ডেরায় আনীত যেখানে কিছুদিন থাকার পর ভুসুকু বঙ্গাল হলেন এবং দস্যুদের ধর্মকথা শিক্ষা দেওয়াতে তাঁরা তাকে সুন্দরী নারী দক্ষিণা বা উপহার দিল। এখানে এই কষ্টকল্পনার অবকাশ নেই, কিন্তু বঙ্গালরা নির্বিচারে দস্যু এ জন্য এ অবতারণা। চণ্ডালী লাভ করে বঙ্গাল ভুসুকু বা চণ্ডালীর কারণে ভুসুকু পঞ্চ স্কন্ধ দণ্ড করলেন, তার পর বললেন, জানিনি চিত্ত আমার কোথায় গেল? চিত্ত প্রবিষ্ট হল গগনে।

সোনারপার রূপক হল শূন্যতা এবং স্বভাবস্বরূপ, বোধিচিত্ত অর্জিত হলে ভুসুকু নিঃস্ব, তাঁর মায়ামোহ সংসার রূপআগ্রহ কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু তিনি মহাসুখ অবস্থায় রইলেন। চতুঃকোটি বা চার অবস্থা—ভাব অভাবাদি চিত্ত চাঞ্চল্য রূপ ভাণ্ডার নিঃস্ব হল, তাই তিনি জীযন্তে মরা। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক এবং বাউলদের সাধনা জীযন্তে মরার সাধনা, জীবনেও কামনাবাসনা নেই, ইন্দ্রিয় অনুভূতি নেই, মায়ামোহ সংসার নেই, ক্ষুধাতৃষ্ণার জন্য কাতর নয়, (বায়ুভুক বলে বাউলদের বিকল্প নাম তাই), যেমন একটা মৃতের কোনও চাহিদা নেই, এ ধরনের সাধকরা তেমনি তাদের সাধন ভজন করে থাকেন। মৃতের যেমন কোনও আপন নেই, কেউ তার পরও নয়, ঠিক তেমনি।

এ চর্যাপদ নানা দিক থেকে আকর্ষণীয়, বাঙালি ও পদ্মানদীর বর্ণনা থেকে তৎকালীন বাংলার ভৌগোলিক এবং জীবন ছবি উদঘাটন করা যায়। পদ্মা নদীর নাম অনেক আগেও পদ্মা ছিল কিনা সেটা বলা মুশকিল, কারণ এখানে পদ্মাখাল বলা হয়েছে। হয়তো পদ্মাখাল নামে কোনও ছোট নদী ছিল। আধুনিক বিশাল পদ্মাও তৎকালে সে খাল আকারে ছিল। পদ্মানদীর উপরিভাগ গঙ্গা নামে খ্যাত, গঙ্গা খুব প্রাচীন নাম, এই বহুতা গঙ্গা বাংলাদেশে এসে বিশাল আকার ধারণ করার পর পদ্মা হয়েছে, চর্যায় গঙ্গা যমুনারও উল্লেখ আছে। অনেকের ধারণা বঙ্গ নাম হাল আমলের এবং বাঙালি জাতিও। কিন্তু এ ভুল ধারণা ভাঙ্গার জন্য চর্যার এ পদই যথেষ্ট, যে অর্থে বলা হোক বঙ্গাল এবং বাঙালি খুব পুরানো নাম ও জাতি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে একজন বঙ্গ সন্তান সমুদ্রগামী দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে সিংহল দ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। সিংহলি ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে, তার নাম বিজয় সিংহ, তার নামানুসারে সিংহলের নাম, কিছু ইতিহাসে উল্লেখ্য যে মোগল আমলে বঙ্গের ভূমিতে প্রথম রাজত্ব নির্ধারণের জন্য 'আল' প্রয়োগ করে সীমানা করা থেকে বঙ্গ + আল = বঙ্গাল, কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

চর্যা-৫০

রাগ রামজী

সবর পা

১৫ বিজয়সিংহের পুত্র সিংহল দ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। সিংহলি ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে, তার নাম বিজয় সিংহ, তার নামানুসারে সিংহলের নাম, কিছু ইতিহাসে উল্লেখ্য যে মোগল আমলে বঙ্গের ভূমিতে প্রথম রাজত্ব নির্ধারণের জন্য 'আল' প্রয়োগ করে সীমানা করা থেকে বঙ্গ + আল = বঙ্গাল, কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী^১ হিএ কুরাডী^২।কঠে নৈরামনি বালি জাগন্তে উপাড়ী^৩ ॥ ৫৫ ॥ছাড় ছাড়^৪ মাআমোহা বিষমো^৫ দুন্দোলী।মহাসুহে বিলসন্তি^৬ শবরো লইআ সুন মেহেলী^৭ ॥ ৫৬ ॥হেরি সো মোরি তইলাবাড়ি খসমে^৮ সমতুলা।সুকড়^৯ এ সেরে^{১০} কপাসু^{১১} ফুটিলা^{১২} ॥ ৫৭ ॥তইলাবাড়ির পারসেরি জোহা^{১৩} বাড়ি উএলা^{১৪}।ফিটেলি অকারী রে আকাশ ফুলিলা^{১৫} ॥ ৫৮ ॥কঙ্গুরি গা^{১৬} পাকেলারে শবরাশবরী মাতেলা^{১৭}।অণুদিন সবরো কুস্পি গ চেবই মহাসুহে ভেলা^{১৮} ॥ ৫৯ ॥চারিবাসে ভাই লা^{১৯} রে^{২০} দিআ চঞ্চলী।তহি তোলা শবরো ডাহ কএলা^{২১} কান্দই^{২২} সগুণ শিআলী^{২৩} ॥ ৬০ ॥মারিঅ^{২৪} ভবমত্তারে দহদিহে দিধলি বলী^{২৫}।হের সে^{২৬} সবরো গিরেবণ^{২৭} ভইলা ফিটিলি সবরালী^{২৮} ॥ ৬১ ॥

পাঠান্তর

১. বাড়ী, বাড়ী, বাড়ী। ২. হেঞ্জে কুড়াডী। ৩. সুঘাড়ী। ৪. ছা ছাড়, ছাড় ছাড়।
৫. বিষম, বিষমে। ৬. বিলাসন্তি। ৭. সুনমে হেলী। ৮. খসমে, হেরি থে মেরি তইলাবাড়ি
- খঃসমে সমতুলা। ৯. যুকড়, যুকড় এ সেরে, যুকড় এ মেরে। ১০. এসে রে। ১১. কপাস
- এ বে রে যুকড় ফটিলা। ১২. সকুল এসে মো কপাসু ফুটিলা। ১৩. জোহা। ১৪. তাএলা,
- তইলা বাড়ির পারসের জোহা বাড়ী তা এলা। ১৫. আকাশ ফুলিআ।
১৬. কঙ্গুচিনা। ১৭. কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা, শববাবরি মাতেলা।
১৮. ভোলা। ১৯. চারিবাসে গড়িল। ২০. তা ভলা রে, 'রৈ'। ২১. হক এলা।
২২. কান্দশ। ২৩. শিআলি, তাই তোলা শবরো হক এলা কান্দশ সগুণ শিআলী।
২৪. মারিল, মরিল। ২৫. দিই লিবলী। ২৬. হে রসে, হেরি সে। ২৭. শবরী নিব্বাণ,
- সবরো নিব্বন্তে। ২৮. সবরালী।

শব্দার্থ ও টীকা

গগনত—গগনে। তইলা—তদলগ্ন, তৃতীয়া। হিএ—হৃদয়ে। কুরাড়ী—কুঠার। বালি—বালিকা। উপাড়ী—উপড়ে ফেলা। দুন্দোলী—দ্বন্দ্ব। বিলসন্তি—বিলাস করে। সুন মেহেলী—শূন্যতা মেয়ে। খসমে—শূন্যতা। সুকড়—সুন্দর। কপালু—কার্পাস। জোহা—জ্যোৎস্না। উএলা—উদয় হল। ফিটেলি—প্রস্ফুটিত। অকাশ ফলিলা—আকাশ ফুল, আকাশ কুসুম। কঙ্গুরিণা—কঙ্গুরি ফল। মাতেলা—মাতল। চেবই—চেতন পায়, টের পায়। চারবাঁশে—চারটা বাঁশ দিয়ে খাট, শব বাহী খাট। চঞ্চলী—চৈতানি। সগুণ সিআলী—শকুন শিয়াল। ভবমত্তা—ভবের জন্য মত্ত। দিধলি বলী—দশ দিকে শ্রদ্ধা পিণ্ড। সররালা—শবরত্ব।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

গগনে গগনে ত্রিতল বাড়ি হৃদয়ে কুঠার।
কঠে নৈরামণি বালা জেগে উপড়ে আর।
ছাড় ছাড় মায়া মোহ বিষম দ্বন্দ্বকারী।
মহাসুখে বিলাস কর শবরী নিয়ে শূন্য নারী।
দেখি সে আমার তৃতীয় বাড়ি শূন্য সমতুল।
সুন্দর এই সেই রে ফুটল কার্পাস ফুল।
তৃতীয় বাড়ির পাশের জ্যোৎস্নাবাড়ি উদ্ভিত হয়।
আঁধার দূর হল রে আকাশ ফুলময়।
কঙ্গুরিনা পাকল ফল শবর শবরী মত্ত হল।
অনুদিন শবর কিছুই টের পেল না মহাসুখে রল।
চার বাঁশে তৈরি হল চৈতানি দিয়ে (খাট)।
তাতে তুলে শবরকে দাহ করল কাঁদল শকুন শিয়াল।
মারল ভব মত্ততাকে দশ দিকে পিণ্ডি পেল।
দেখ সে শবরের নির্বাণ হল শবরত্ব ঘুচে গেল।

গদ্যে রূপান্তর

গগনে গগনে তেতলা বাড়ি বা তৃতীয় বাড়ি, হৃদয়ে কুঠার। কঠে নৈরামণি বালিকা জেগে আছে বা জেগেছে, উপড়ে ফেল (অন্যসব)। ছাড় ছাড় মায়া মোহ (সবই) বিষম দ্বন্দ্ব কারী, মহাসুখে বিলাস কর এ শবরী নিয়ে সে শূন্যতা নারী। দেখি যে সে তৃতীয় বাড়ি শূন্য সমতুল, কী সুন্দর আমার কার্পাস (ফুল) ফুটল। তৃতীয় বাড়ির পাশে জ্যোৎস্নাবাড়ি উদ্ভিত হল, অন্ধকার দূর হল আকাশের ফুল ফুটল। কঙ্গুরিনা ফল পাকল, শবর শবরী মত্ত হল। অনুদিন শবর কিছুই জানল না, সে মহাসুখে কাটাল। চার বাঁশ দিয়ে তৈরি হল (খাট) চৈতানি দিয়ে (বেঁধে)। তাতে তুলে শবর কে দাহ করল শিয়াল শকুন কাঁদল। ভব মত্ততাকে মেরে দশদিকে বলি (পিণ্ডি) পেল, দেখ সে শবরের নির্বাণ হল তার শবরত্ব ঘুচল।

গূঢ়ার্থে রূপান্তর

গগন গগন দ্বিরুক্তি শূন্যতা শূন্য বোধক। তার সংলগ্নবাড়ি তৃতীয় মহাশূন্য হৃদয়ে প্রভার চতুর্থ শূন্য কুঠার ঘাতে এ লোকাদি শূন্যত্রয়ের দোষ ছেদন করল। কণ্ঠে সঞ্জোগচক্রে নৈরাশ্রা ধর্মাধিগমন অনুদিন জাগ্রত, যোগী ত্রৈলোক্যে সান্নিধ্য হলেন। মায়ামোহ বিষম দ্বন্দ্ব মায়ী কর্মাক্ষণ মোহ ত্যাগ করে মহামুদ্রা সিদ্ধি হলেন। শবর মহাসুখে ভাব নৈরাশ্রাজ্ঞান মুদ্রা গ্রহণ করে ক্রীড়া বিলাস করেন। তৃতীয় শূন্য পাশ্বে জ্যোৎস্নাবাড়ি জ্ঞানেন্দু মণ্ডল উদয় সদ্য দেখা দিল। সকল ক্রেশ অন্ধকার বিস্ফারিত হয়ে আকাশে পলায়ন করল। সুখ সংবৃন্তি বোধিচিন্তা সেই অঙ্গচিহ্ন চতুর্থ প্রকৃতি প্রভাস্বরূপ গুরু প্রসাদ প্রাপ্ত যোগী অভয় পরিকল্পিত শবর চিত্তবজ্র শবরী জ্ঞানপাল প্রমত্তা জ্ঞান মুদ্রা লাভে অনাসংজ্ঞানানন্দ প্রমোদে অনুদিন কোনও কিছুতে চেতনা সংযুক্তি না থেকে অতঃপর মহাসুখ শর্যায় বিহ্বল সুপ্ত রইলেন। চতুর্থ সঙ্ক্যায় চতুরানন্দ বোধক কর্মমুদ্রা সঙ্গ রচনা করে যোগী স্থির হলেন। জাগতিক সত্তা সেই ধ্যান রাগ বহিতে ভস্ম বিলুপ্ত হল ফলে ভবে পুনর্জন্ম আর হল না। অবিদ্যার প্রভাব ইন্দ্রিয়াদি এতদিন যারা তাকে সঙ্গ দিয়েছিল তাঁর ভব বিয়োগে মায়াকান্না জুড়ে ছিল। কিন্তু যোগীকে ভবমুক্ত মুক্ত দশবলের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল, তার শবরত্ব ঘুচে নির্বাণপ্রাপ্ত হলেন।

সমীক্ষা

গগনে গগনে ত্রিতল বাড়ি বা তৃতীয় বাড়ি অর্থাৎ হৃদয়ে 'কুঠার'। এ গভীর ব্যঞ্জনাময়; তৃতীয় বাড়ি হল শূন্য শূন্যতা, নির্বাণপ্রাপ্তির স্তর অতিক্রম করে তৃতীয় বাড়ি প্রবেশ করতে অর্থাৎ তৃতীয় মহাশূন্যে প্রবেশ করতে হলে হৃদয়ে কুঠার স্বরূপ আঘাত করার অস্ত্র থাকতে হবে তা দিয়ে লোক স্বরূপের ভাববিষয় বন্ধন এবং কায়াতরু ছেদন করা যায়। তাতে করে আর কোনওদিন ভবে ফিরে আসা যাবে না, অর্থাৎ পুনর্জন্ম হবে না। বোধিচিন্তা প্রাপ্ত হয়ে তৃতীয় বাড়িতে যাওয়া যাবে। শবর স্বরূপ কবি চিন্তা নৈরাশ্রা জ্ঞানমুদ্রা দিয়ে শবরীরূপা নৈরাশ্রাকে লাভ করল। কণ্ঠলগ্ন প্রিয়তমা বালিকার মত তার প্রতি আসক্ত হয়ে মোহমায়ী বিষয়াদি উপড়ে বিসর্জন দিলেন শবররূপ সিদ্ধাচার্য এবং নৈরাশ্রাকে লাভ করলেন। এ সব মায়ামোহ ভব বন্ধন বিষম দ্বন্দ্বকারী, নির্বাণের অন্তরায়। ভবসংসারের দুঃসহ অবস্থা তার থেকে মুক্তি পেয়ে ত্রৈলোক্য অবস্থান করে চতুর্থ প্রকৃতি প্রভাস্বর সংবৃন্তি বোধিচিন্তা প্রাপ্ত হলেন। এবার কবির স্থির চিন্তা, শূন্য নিরামণিকে নিয়ে অনুদিন সুখ সুপ্ত রইলেন।

তৃতীয় বাড়ির শূন্যতা সমতুল চতুর্থ প্রকৃতিতে কার্পাস ফুল ফুটে গগনে মিশেছে, কার্পাসের মাহাত্ম্য হল নির্মল শুভ্র পবিত্র হৃদয় আলো, তা থেকে প্রভাস্বর জ্যোতি নির্গত হয়। গগন ভরা কার্পাস তাই পবিত্র মহাসুখের নিধান, আমার কার্পাস কথার ব্যঞ্জন হচ্ছে আমার বোধিচিন্তার কারণে আকাশে কার্পাস ফুটল।

তৃতীয় বাড়ির পাশে কবি শবরের যে অবস্থান তার পাশে আবার জ্যোৎস্নাবাড়ি উদ্ভিত হল। এ কথার তাত্ত্বিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল চন্দ্র প্রভাবিত ললনারূপ নাড়ি পথে উত্তীর্ণ ইচ্ছা। তাতে অন্ধকার বিদূরিত। এটা বৌদ্ধ ধর্মীয় বিধান পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংগিত। বৌদ্ধ পূর্ণিমা যেমন পবিত্র, তান্ত্রিকদের কাছে তার অবদান অন্যত্র, নাড়ি সম্বন্ধীয়। কিন্তু কবির কাছে উৎসবের আনন্দ, কারণ তাতে কঙ্গুরিনা ফল পাকল; উৎসবে মত্ততা বয়ে আনল।

মাদকতার জন্য শবর বা আদিবাসীরা মহুয়া পানের দ্বারা আনন্দ উৎসব করে, কঙ্গুরিনা হয়তো বা মহুয়া হতে পারে, এ ফলজাত মদ্য পানে এ মত্ততা বা উপভোগ সৃষ্টি হয়। আদিবাসীরা নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে নৃত্য করে। নৈরাখ্যার সঙ্গে মিলনের ফলে শবরী রূপ নৈরাখ্যা আর কবি শবর একইভাবে আনন্দ নৃত্য করছেন কঙ্গুরিনা পান করে। জ্যোৎস্না বা পূর্ণিমা প্রভাবিত হয়ে অনুদিন মহাসুখে সুপ্ত রয়েছেন। তাতে ভবসংসার দেখতে পাচ্ছে যে শবর দেহ ত্যাগ করেছে, কিন্তু শবর কোথায় সুপ্ত সেটা তারা জানে না। তাই তারা শবর দেহ চার বাঁশের চাঁচাড়ি গড়ে খাটে করে শাশানে ভস্ম করতে নিয়ে গেল এবং তাকে দাহ করা হল। কিন্তু এ দাহ চিরকালের জন্য বিলুপ্তি দাহ, ভবে ফিরে না আসার দাহ, তাই অবিদ্যারূপ শেয়াল ইন্দ্রিয়রূপ শকুন ইত্যাদি মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। এতদিন তারা মিথ্যা মায়াপাশে কবিকে আবদ্ধ রেখেছিল ভবসংসারে। এখন তাঁর বিয়োগে মায়াকান্না হলেও যোগী কবি মুক্ত, তার ভবমত্ততা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত, তিনি মায়াকান্নাতে আর ভুলবেন না, আর ভবসংসারে ফিরে আসবেন না। তিনি নির্বাণে অবস্থান করবেন।

মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন, যদিও কবি তাদের শেয়াল শকুন বলেছেন তবু তারা কাঁদে এবং সদগতির জন্য শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান করে থাকে, দশজনকে এ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে, তারা মরণভোগ ভক্ষণ করতে আগ্রহ করে। কিন্তু কবি শবর বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর দশজনকে নিমন্ত্রণ না করে দশদিকে পিণ্ড ছড়িয়ে ফেলতে, তান্ত্রিক অর্থ হল দশ বলের উদ্দেশ্যে কবিকে বলি দিয়ে বলেছেন। দশজন তো মায়ামোহ দ্বারা তাকে পুনরায় ভবে আকর্ষণ করবে, কিন্তু দশ মহাবল তাঁকে নির্বাণ দান করবে।

লৌকিক অর্থে মানুষের মৃত্যুর পর বেওয়ারিশ হলে লাশ কাক শকুন শেয়াল ভক্ষণ করে কিংবা দেহ ভক্ষণ করার অধিকারী তারা। কাক শেয়াল শকুনী যথাক্রমে কাণ্ডারি ভাণ্ডারি এবং অধিকারী, যোগের ভাষায় কাক শেয়াল শকুনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রবৃত্তিসমূহ ধরা হয়ে থাকে। কায়া যদি সাধনার ফলে পরিশুদ্ধ না হয় তবে তা প্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা ভক্ষিত বা বিনষ্ট হবে। নির্বাণ তখন হবে না।

এ চর্যার ভেতর প্রাচীন বাংলার একটা ছবি আসছে, এখানে কার্পাস চাষ হত, এখান থেকে বস্ত্র তৈরি হয়ে বাইরে যেত। ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন মিহি মসলিন বস্ত্র তখন এখানে তৈরি করা হত, এটা যোগীদের জাত পেশা ছিল। এখনও যোগীর বা যুগীর কাপড় বলতে হস্তে তৈরি কাপড়কে বোঝায়।

চর্যাপদ চরিত্র

বাংলার প্রথম প্রগতির নিদর্শন চর্যাপদ। সমকালে সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও উপমহাদেশীয় ভাষায় এতটা উন্নত সাহিত্যসমৃদ্ধ বৌদ্ধগান চর্যাপদ তথা ‘আচর্য্যচর্য্যচয়’ মত আর কিছু অনুপ্রাণিত ছিল না। রাজা হাল তাঁর গাঁথা সপ্তশতীতে এর আগে তৎকালীন সাহিত্য মানের একটা সংকলন নিষ্কাশিত করেছেন, সমাজ ও জীবন যুক্তির তাতে অভূতপূর্ণ রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু এই পদসাহিত্য বৌদ্ধগান যে রত্নাশ্রিত বজ্রসংগীত বাংলা ভাষার শব্দে প্রধূনিত তার তুলনা কিসে? সে থেকে সিদ্ধান্ত তাড়িত হয়ে ত্বরিত সংস্থাপিত হতে পারে যে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় আরও চন্দনাদি বৃক্ষের বনরাজি ছিল, যাদের জীবাস্থের এখনও সন্ধান মেলেনি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। আর কোনও অজ্ঞাত দরবারে হয়তোবা বাকি চর্যারা সুপ্ত রয়েছে।

চর্যাপদ বাংলার একাধারে সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ফলিত বাসনা, সিদ্ধাচার্যরা নির্লোম শুদ্ধতায় উচ্চারণ করেছেন সাটির অভ্যন্তর থেকে অথবা সবচেয়ে উঁচু মিনারে দাঁড়িয়ে; এ জন্য চর্যাপদ সাধারণ সাপেক্ষে প্রকাশিত নয়। সব ধারালো চেতনার, বুদ্ধির উপলব্ধির প্রবাল সোপান মহাসমুদ্রের গভীরে আলোড়িত হয়েছে, তাই বোধগম্যতার অপ্রাচুর্য বর্তমান কিন্তু অবোধ্য নয়, যাকে মনে করা হয় শ্রেষ্ঠ কাব্যিক আদর্শ। সিদ্ধাচার্যরা একটা গভীর বিশ্বাস এবং একটা চরম শিল্প রুচির কৌশলের আশ্রয়ে ছিলেন যাকে ধর্মের নাটমন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেন ভেতর থেকে কেউ তাদের বলিয়ে দিচ্ছেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে, ভেতরে বসে আছেন তথ্য আর দর্শক হচ্ছে ললনা রসনা অবধূতিকা প্রভৃতি বত্রিশ বা সহস্র ধারা প্রকাশের নাড়ি নক্ষত্র যারা কলাকৌশলবাজিতে সিদ্ধহস্ত হতে পারে। টীকাভাষ্যে যার নাম অসংবৃত্তবোধিচিত্তের জন্য সূক্ষ্ম নালি, যা দিয়ে মদ্য নিসৃত হতে পারে। তারপর গগনে বা শূন্যে তথা নির্বাণে বিমোচন। এ ত্রিরত্ন কায়বাকচিৎ বা ত্রিশরণ আসন মানব জীবন অবনাগমন পথের সর্বশেষ শান্তির আশ্রয়। এখানে বুদ্ধ নাটকের যবনিকা। প্রত্যেকটি পদের উদ্দেশ্য এবং তথ্য এই একটাই, কিন্তু শৈল্পিক আদর্শ ভিন্ন, সেটাই আমাদের উল্লাস। সাহিত্যরুচি ও সমাজ নির্মাণের যত গাঁথুনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ রেখায় উপার্জিত ওখানেই।

চর্যাপদ আবিষ্কৃত হবার পর প্রথম বিতর্ক ছিল ওর ভাষা ও আঞ্চলিক আবেষ্টনীর উল্লেখ থেকে। আর্য্যবর্তের আধুনিক কোনও ভাষার সাজু্য্য এর নেই, কিন্তু এ সব ভাষার

গোড়াকে ধরে চর্যাপদ নাড়া দিচ্ছে। তারপর স্থান নাম এবং প্রাণ আদর্শের বাস্তবতার নিরিখ প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতীক সম্মেলনে ঠাই পাচ্ছে, তাই বাংলা কি বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এমনকি দিল্লি পর্যন্ত টান পড়েছে। সমস্ত বৌদ্ধ শাসিত চৈত্য রাজ্যের বিতাড়িত এই তান্ত্রিক রাজপুত্ররা কোনও গুহায় যেন তপ্ত হয়ে আক্ষেপে বা সক্রোধে এ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। যদি বলা যায় এ সমূহ অঞ্চলকে ধরেছিল তাঁদের বাসনা, শেষ অবধি হিমালয়ের চূড়ায় সেখানে গিয়ে এ গান স্থান পায়, এ কল্পনাও অলীক নয় কিছুতেই। কিন্তু কাব্যের ভাষা রাজপুরুষোচিত, সে পুরুষরা বাংলাভাষী ছিলেন এটা ধরা পড়ল এখনই, অথবা বাংলা ভাষা শাসিত ছিলেন যারা। স্থান নাম, নদীনালা, জাতি নামের মাহাত্ম্য বা এখানে কেন? যমুনা নদীর নাম রয়েছে। বাংলা অঞ্চলে তো যমুনা ছিল না, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কারণে বৈষ্ণব যুগে যমুনা এসেছে। সিদ্ধাচার্যদের যুগে রাধাকৃষ্ণের জন্ম হয়নি, আর বাংলায় যেটা যমুনা তাও অর্বাচীন যমুনা, ১৭৮৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা ভেঙ্গে উত্তরবঙ্গে নতুন যে নদী রূপ পেল তাকে বলা হচ্ছে পদ্মা। পদ্মা নিতান্ত খাল আর বঙ্গালরূপ দঙ্গাল বা ডাকাতের নামও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই শুদ্ধাচারে স্বকীয় বর্ণনা থেকে অঞ্চল সর্বস্বতার প্রমাণ মেলে না, আর যারা সিদ্ধাচার্য তাঁদের আপন নিবাসও ছিঁটেফোঁটা বাংলা, এমনকি আর্ষাবর্তের বাইরে থেকে এসেও এই তথাকথিত বঙ্গীয় নিদর্শনের সাধনায় প্রাণিষ্ঠ ছিলেন। তাহলে বৌদ্ধগানকে সর্বাংশে বাংলা বলার প্রবৃত্তি বাহ্যিক ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে বাংলা ভাষার প্রভাব-বিন্যাস চর্যাপদে কেন লক্ষণীয়? হয়তো বাংলার জনপদ অন্যত্রের চাইতে সমঝদার মুখর ছিল, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবি আপন ভাষা ত্যাগ করে কেন ব্রজবুলি বাংলায় কাব্য করছেন? এখন বঙ্গজ সন্তান ইংরেজি ভাষায় বঙ্গজ চিত্র তুলে বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যেমন। বিশেষজ্ঞরা বের করছেন সচেষ্টিত যে চর্যাপদের শব্দ, বাক্য বিন্যাস বা পদক্রম ব্যাকরণসম্মত প্রাচীন বাংলা এমনকি প্রাচীন হিন্দি অহমিয়া ইত্যাদি ভাষারও জোরালো দাবি অস্বীকার করার উপায় নেই; অথবা যদি বলা যায় ঐ সময় সমগ্র অঞ্চলে প্রায় সম-উচ্চারিত এ ভাষাই লৌকিক ভাষা ছিল।

বৌদ্ধধর্মের আকর ভূমি হল মগধ; মগধ এবং বঙ্গ একে অন্যের আপনটানে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। নালন্দা যেমন মহাস্থানগড় বা ময়নামতি বৌদ্ধ সুকৃতির বক্ষস্কীতি আদর্শ চারপাশে প্রবাহিত করে রেখেছিল। তাই চর্যাপদের চারণভূমি এ অঞ্চলকেই লক্ষ্য করা যায়। ‘আলিএঁ কালিএঁ’ যা লোকজ্ঞান লোকাভাস যে বায়ুমণ্ডলকে কূজিত করেছে তাই। আর এসব অঞ্চলে বাংলা ভাষা যে পরিলক্ষিত হয়েছিল নিম্নলিখিত কারণে বলা যাচ্ছে, প্রথম এর শব্দ প্রাকৃত থেকে বাংলায় রূপ পেয়েছে তাদের মধ্যবর্তী, নঞর্থক শব্দ ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহার-‘ধরণ ণ জাই’, নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার রুখ—বৃক্ষ, সাক্ষম—সেতু, নাঠা—নষ্ট, উজাএ—উজান, সামায়—টোকে, বুড়াইল—ডুবা, উভায়—দণ্ডায়মান, সুতেলা—শোয়া ইত্যাদি। তাছাড়া উজু, বপা, নই, টাকলি, বহল, গোহালি, টাঙ্গি, কেডু য়াল শব্দ বঙ্গ ভাষায় বঙ্গীয় জীবণ যাত্রার প্রভাবসম্মত, ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তি ‘এ’, দ্বিতীয়া লোপ, তৃতীয়া ‘এ’, চতুর্থী ‘ক’, ষষ্ঠী ‘র’ এবং সপ্তমি ‘এ’ এর ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়া ‘হ’, ভবিষ্যৎকালে ‘ম’ এবং অতীতকালে ‘ল’ এ সবই বাংলা—আসামির দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণাক্রান্ত (হালে অহমিয়া ভাষা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন)। তবে আধুনিক বাংলার সঙ্গে নিয়ম রক্ষা করেছে না যা তা এই, হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘস্বরের পার্থক্য নেই, ‘য’ শ্রুতি ও ‘ব’ শ্রুতির প্রভাব এখনকার মত নয় আদি—যাএ-যায়, জাগএ-জাগে, অকারের ও ও কারের প্রবণতা-তোড়ি, মোড়িউ, ‘ত’ ও ‘ট’ বর্ণের বর্ণের ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ আগম-কেড়ু আল-কেড়ুয়াল, দৃঢ়>দিট>দিঢ়; বহুবচন বোধক-‘উচা উচা পাবত, বিভক্তির চিহ্নহীন কারক-দিঢ় করিআ মহাসুখ পরিমাণ, স্ত্রী লিঙ্গের অতিরিক্ত ‘নি’ প্রয়োগ-শুণিনি, তবে ডোম্বী। চর্যার ছন্দ বাংলার পয়ার ছন্দকে প্রসারণ দিয়েছে’-‘কাআ তরুবর। পঞ্চবি ডাল’ সর্বশেষ ‘পদ’ কথাটা বাংলা কবিতা ও গানের জন্য পরবর্তীকালের উত্তরাধিকার।

পঞ্চাশটি চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভেতর তিনটি হাতছাড়া এবং একটি ছিন্ন। কেউ কেউ চর্যাপদের ভাষাকে অহেতু সন্ধ্যা বা আলো আঁধারি ভাষা আখ্যায়িত করেছেন যার কোনও যুক্তি হয় না, কিন্তু সাক্ষ্য ভাষার অন্য অর্থ টীকাকার মুনিদত্ত বলেছেন যা আধ্যাত্মিকভাবে বোধগম্যতার জন্য, কিন্তু চর্যাপদের প্রতি প্রসঙ্গ খুবই স্পষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক, রবীন্দ্রনাথের ‘গানের ভেতর দিয়ে দেখি ভুবনখানি’ ঠিক যেমন বোঝায়। তৎকালীন জীবন নির্মাণ প্রসঙ্গে এমনি ভাষা প্রয়োগ ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাধনমার্গীয় রূপক। পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নত কবিতা ভাষায় এমনটি ছিল, ফার্সি কবিতায় ‘মদ্য’ এবং ‘সাকি’ ইয়োরোপ বুঝতে পারেনি কলি ওমর খৈয়াম হয়েছেন ভোগবাদী।

প্রাচীন ইরানীয় বা সেমিটিক অঞ্চলে সূর্য্যবাসী ছিলেন রূপ সংগীতের জাদুকর। তাদের ম্যাগিন বা মার্জি (ইংরাজিতে ম্যাড্রিগালিয়ান যা থেকে এসেছে) শায়ের বলা হত। অনুরূপভাবে বলা যায় প্রাচীন বাংলায় এই রাজপুত্র বা জাদুকররা ছিলেন সিদ্ধাচার্য। সকলের পক্ষে পদ এবং সংগীত সৃষ্টি করা সম্ভবপর ছিল না এবং অধিকারও ছিল না। সিদ্ধাচার্যরা ছিলেন বোধিচিন্তের অধিকারী। সিদ্ধ অর্থাৎ তাদের মন থেকে সকল রকম ইন্দ্রিয়াদি মল পুড়ে নির্মল, কোনও রকম বিষয় বাসনা নেই এমন। সিদ্ধপুরুষ বা সাধু যে কেবল বৌদ্ধদের ভেতর ছিল তা নয়, সে আদর্শই জৈন, নাথ এবং হিন্দুদের ভেতর সিদ্ধপুরুষ তেমনই ছিল, তবে তাঁরা সাধারণত তান্ত্রিক। বৌদ্ধগান রচয়িতারাও ছিলেন তান্ত্রিক। বৌদ্ধদের মহাযান সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত এই বজ্রযানি বা হেবজ্র যানি তান্ত্রিকদের নিয়ম আচরণ পরবর্তীকালে সহজিয়া ও বাউল রূপ নিয়েছে, যা চর্যাপদের ভাষানুশঙ্গে উপলব্ধ হয়।

চর্যাপদ সৃষ্টিকারী সিদ্ধাচার্যরা এখানে পঞ্চাশটি পদ রেখেছেন, কিন্তু আরও বহু পদ হয়তোবা থাকতে পারে, তবে চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ এবং কয়েকটি টীকাভাষ্য খুঁজে পাওয়া গেছে, তাতে চর্যাপদ পঞ্চাশটি বলা হয়েছে এবং এই পঞ্চাশটি চর্যা রচনা করেছেন তেইস জন সিদ্ধাচার্য, তাঁদের নাম কাহু পা-বারাটি পদ, ভুসুকু পা-আটটি পদ, সরহ পা-চারটি পদ, কুকুরী পা, লুই পা, শবর পা, শান্তি পা—প্রত্যেকে দুইটি করে পদ, বাকি কঙ্কন পা, আজ পা, কঙ্কলাস্বর পা, গুগুরী পা, চাটিল পা, জয়নন্দী পা, ডোম্বী পা, ঢেন্‌টন পা, তাড়ক পা, দারিক পা, ধাম পা, বিরূপা পা, বীণা পা, ভাদে পা, মহি পা একটি করে পদ রচনা করেছেন। তাদের সময়কাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক। আবার

বিশেষত তাঁরা বাংলার পাল রাজাদের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন ধারণা করা যায়, রাজাদের সাংগ্ৰহ সম্মানে হয়তোবা ভূষিত ছিলেন।

সংস্কৃত টীকাভাষ্যে সিদ্ধাচার্যদের সংস্কৃত নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন কাহু পা-কে কৃষ্ণপাদানাম, কেউ কেউ সেই অনুকরণে কাহু পা-কে কাহু পাদ উল্লেখ করেছেন। তবে এর ভেতর কয়েকজন পদকর্তার নাম সঠিক নয় বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁদের ভেতর কুকুরী, বীণা, কঙ্কলাঙ্ঘর পা, তাড়ক পা, তান্ত্রী পা এবং ঢেন্‌টন পা। ঐরা হয়তোবা সমাজে খুব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নিছক তাত্ত্বিক মতে গান রচনা করলেও তখলুস বা কলমি নাম হিসেবে এমন ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন।

সিদ্ধাচার্যদের নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, চৌরশি সিদ্ধার কথা বহু তাত্ত্বিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সেই উল্লিখিত চৌরশি সিদ্ধান্ত অন্তর্গত এই তেইস চর্যাকার সিদ্ধাচার্য রয়েছেন কিংবা এ পর্যন্ত যে মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তালিকাভুক্ত সিদ্ধাদের ভেতর একই নামে সিদ্ধা চর্যাপদের রচয়িতা হতে পারেন, তবে চৌরশি সিদ্ধাদের প্রায় সকলেই নাথপত্নী বা গোরক্ষনাথের অনুসারী বলে দাবি করা হয়েছে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও তালিকাবদ্ধ চৌরশি সিদ্ধার নাম উল্লেখ করা গেল, যেমন—লুই পা (মৎস্যেন্দ্র পাদ বা মীনমাথ), লীলা পা, বিরূপা, ডোয়ী হেরুক, শাবর পা, সরহ পা, কঙ্কালি পা, বজ্র পা, গোরক্ষ পা, চৌরঙ্গী পা, বীণা পা, শান্তি পা, তন্ত্রি পা, চর্যা পা, খড়্গ পা, নাগার্জুন পা, কাহু পা, আজ পা, স্থগণ পা, নাড় পা, শৃগাল পা, তৈলিক পা, ছত্র পা, ভাদে পা, দ্বিখণ্ডী পা, যোগী পা, কড় পা, ধোবী পা, কঙ্কর পা, কঙ্কল পা, টেঙ্কি পা, ভাদে পা, তঙ্কী পা, কুকুরী পা, কুজি পা, ধাম পা, মহী পা, অচিন্ত্য পা, বভহি পা, কলিন পা, ভুসুকু পা, ইন্দ্রভূতি পা, মেঘ পা, কুঠারী পা, কমার পা, জালঙ্ঘরী পা, রাহুল পা, দ্বিতীয় ধাম পা, টোকরী পা, মেদিনী পা, পঙ্কজ পা, ঘন্টা পা, দ্বিতীয় যোগী পা, চলুক পা, বাগুরী পা, লঙ্ঘুক পা, নির্গুনশ্রী পা, জয়নন্দী পা, গাঢ়ল পা, চম্পক পা, বিমান পা, দ্বিতীয় তৈলিক পা, কুম্ভকার পা, চর্পটি পা, মনিভদ্রা পা, মেঘল পা, কওখলা পা, কলকল পা, কঙ্কড়ি পা, দৌড়ি পা, উড্ডীয় পা, কপাল পা, কিল পা, পুঙ্কর পা, সাভিক্ষ পা, নাগবোধি পা, দারিক পা, পওলী পা, উপনাহী পা, কোকিল পা, অনঙ্গ পা, লক্ষীঙ্ঘরা পা, সামুদ্র পা এবং ব্যাডি পা—(এ গ্রুয়েন ওয়েডেল)-এর ভেতর চর্যার রচয়িতার নাম সাজুয্য রয়েছে—লুই, কাহু, ভুসুকু, বিরূপা, কঙ্কল, সরহ, শবর, দারিক, ভাদে, ঢেন্‌টন, বীণা, আজ, জয়নন্দী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মাত্র ৭৬টির নাম সংগ্রহ করেছিলেন—

১. মাননাম, ২. গোরক্ষনাথ, ৩. চৌরঙ্গনাথ, ৪. তন্ত্রি পা. ৫. হালি পা, ৬. চামরী পা, ৭. কেজারি পা, ৮. ধোঙ্গ পা. ৯. দারি পা, ১০. বিরূপা, ১১. কপালি, ১২. কমারি, ১৩. কাহু, ১৪. কজখল, ১৫. মেঘল, ১৬. উন্নুন, ১৭. কান্তলি, ১৮. ধোবি, ১৯. জালঙ্ঘর, ২০. টোঙ্গি, ২১. মবহ, ২২. নাগাজ্জল, ২৩. দৌলি, ২৪. ভিষাল, ২৫. অচিতি, ২৬. চম্পক, ২৭. ঢেঙ্গিস, ২৮. ভঙ্ঘরী, ২৯. বাকলি, ৩০. ভুজীক চপ্পটী, ৩২. ভাদে, ৩৩. চান্দন, ৩৪. কামরী, ৩৫. করবৎ, ৩৬. ধর্মপাপতরু, ৩৭. ভদ্র, ৩৮. পাতালভদ্র, ৩৯. পলিছিহ, ৪০. ভানু, ৪১. মীন, ৪২. নির্দয়, ৪৩. সবর, ৪৪. সান্তি, ৪৫. ভব্‌বহরি, ৪৬. ভীষণ, ৪৭. ভটী, ৪৮. গগণ পা, ৪৯. গমার, ৫০. দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০. মেডুরা, ৫১. কুমারী, ৫২. জীবন, ৫৩. অঘোসাধক, ৫৪. গিবিবর, ৫৫. সিয়ারী, ৫৬. নাগবালি, ৫৭. বিভবৎ, ৫৮. সারঙ্গ, ৫৯. বিবিক্তিধজ, ৬০. মগরধম, ৬১. অচিত, ৬২. বিচিত, ৬৩. নেচক, ৬৪. চাটিল, ৬৫. নাচন, ৬৬. ভীলো, ৬৭. পাহিল, ৬৮. পাসল, ৬৯. কমল কঙ্গারি, ৭০. চিপিল, ৭১. গোবিন্দ, ৭২. ভীম, ৭৩. ভৈরব, ৭৪. ভদ্র, ৭৫. ভমরী ও ৭৬. ভরাকুটী।

এক কালে বাংলার পূর্বাঞ্চলে নাথ ও বৌদ্ধধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত ছিল, উভয় ধর্মই ছিল নিরীশ্বরবাদী, বিশ্বাসী অন্ধ চেতনা ততদিন বাংলার আকাশকে আক্রমণ করতে পারেনি, বিশেষত ব্রাহ্মণ্যবাদী পীড়ন ও তুর্কি আক্রমণের ফলে জীবন আচ্ছন্ন বোধমুক্ত মনে সহজতর জীবন অনুভূতি প্রবাহে হয়তোবা জীবনযাত্রায় সহজ সুখের পরিপন্থী ছিল না।

চর্যাপদ এবং সিদ্ধাচার্যরা বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জীবনের আদর্শ এবং ঐতিহ্য। বাঙালির গৌরব করার শ্রেষ্ঠ পিরামিড বলতে হবে চর্যাপদ, বাণী সৌন্দর্য এবং বিষয়বিভূতি এখনও চমৎকৃত। কিন্তু সে ওজনের গবেষণা ও আলোচনা বাংলা ভাষা বা বিশ্ব ভাষায় এখনও অনুরূপ নিবেদিত নয়। আমাদের ধারণা কয়েকজন বিজ্ঞজন এর প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাঁদের ভাষায় বাংলায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রদীপকুমার বাগচী (বাংলা), রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন (হিন্দি) প্রমুখ, কিন্তু স্থির নিশ্চিত চর্যায় আরোহণসোপান তৈরি এখনও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি। সংস্কৃত ভাষায় যুদ্ধিগুণ প্রমুখের বর্ণনার ভেতর যত দৃশ্য তারই উল্লেখ দিয়ে সামগ্রিকতাকে এড়িয়ে গেছেন। আমাদের ধারণা কয়েকটি পদে লৌকিক বিষয়বোধ প্রসূত হওয়ায় তাঁর বিশ্লেষণ অনীহা সন্দেহাতীতভাবে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ চর্যাকাররা ধর্ম করলেও জীবনের কাছে মাঝে মাঝে পরাজিত হয়েছেন, এ পরাজয় টীকাকার মেনে নিতে পারেন নি।

চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ থেকে কাব্যের রসগ্রাহিতার দুরূহতা দূরীভূত হয়নি, তবে অনেকাংশ চর্যার শুদ্ধতা বা সঠিক শব্দের বিকৃতিরোধক উপায় উদ্ভাবন করা গেছে। তবু অজস্র পাঠান্তর অর্থ আনুকূল্যের লাঘব করা যায়নি। এটি নিশ্চিত যে পদকর্তার যদি কোন লিপিতে এ পদগুলো প্রথমে আবদ্ধ করেন তা বাংলা লিপি—যার নমুনা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, কারণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলো পেয়েছেন নেওয়ারি বা নেপালি হরফে। নেপালি লিপি বর্তমান বাংলা লিপি (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রেক্ষিত) থেকেও অর্বাচীন, আর এর কারণ হল পদ ও গানের রস গ্রহণের অনুরোধে আঞ্চলিক লিপিকরদের এ সুকৃতি সেটা আমরা মনে করতে পারি। তাই তাতে হয়তো তরলীকরণ এবং বিকৃতি এমনকি আধুনিকীকরণের সুযোগ সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে সিদ্ধাচার্যরা তো নামেই আছেন, লিপিকররা আছেন বেঁচে।

বেদমন্ত্র অপৌরুষেয় দাবি করে তার বিকৃতিরোধক আবরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আগম ও নিগম সে রকম হয়নি। আগম অর্থ হল মহাদেব গৌরীকে যে মন্ত্র বা সৃষ্টি তথ্য অবগত করান, নিগম হল গৌরী যে প্রশ্ন উত্থাপন করে শিব থেকে তা আদায় করেন, একথায় গুরু শিষ্য পরম্পরা সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান রহস্য উদঘাটন তার আবরণ নিরোধক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবধানতা ছিল না; গোরক্ষনাথ কিংবা তান্ত্রিকতার শক্তি শিব শক্তিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে 'নিতান্ত' আগের ওঝাও তার দেহাতি শব্দে মত্ত ঝাড়ে। সিদ্ধাচার্যদের এই যে মত্ত যা দিয়ে নিমজ্জমান বৌদ্ধ সমাজকে মত্তবলে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন, সে বজ্রকঠিন মত্তও নিতান্ত সাপের ওঝার মুখ নিসৃত হয়ে নেপাল জনপদে অর্বাচীন কালে লোক বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হত, এখনও যা হচ্ছে। তাকে বোঝা যায় কত শক্তিপ্রবরই না ছিল সিদ্ধাচার্যদের এ মত্ত, মানুষের চিত্ত চেতনার গভীরে উদ্দীপ্ত হয়েছিল গিরি শৃঙ্গে আরোহণ করে আর প্রবাহিত হয়েছিল নিম্ন মূর্ধ্বে জলধারার নিয়মে। কিন্তু নিজ অঞ্চলে কেন এখন নেই বারি বিন্দুও তা বলি দিতে হবে না, ব্রাহ্মণ্য অথবা তুর্কি আক্রমণের ক্রুদ্ধ জটায় সমস্ত গঙ্গা নিঃশেষিত। তবে ধর্মবোধ জটায় থাক, আমরা চাইব শিল্প সাহিত্য ও জীবন মৌলিকের জয়গান, কতটা চর্যাপদ তখনকার বাঙালি জীবনে কিংবা জনজীবনে বিদ্যমান এবং পরিশ্রুত নির্ভেজাল ছিল সেটাই আমাদের আগ্রহ। এই আদি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাঙালির অনাদি অনন্তকালের পাথেয় এবং সঞ্চয় হয়ে রয়েছে।

চর্যাপদের ব্যাখ্যা হস্তি দর্শন তুল্য হয়েছে অনেকেরই, সে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যায়। তবে যত সিদ্ধান্ত অন্বেষণ যদি হয়, জমা পড়ল কালের হালখাতায়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এ দেশীয় ধর্ম কিন্তু এক ধর্ম নয়, এর তান্ত্রিকতাও অভিন্ন নয়। মধ্যযুগে মুসলমান তান্ত্রিকের অভাব ছিল না, তাই বলে মূল ধর্মের সার তা কিংবা বুদ্ধ অবতার আর বৌদ্ধ জনজীবনে ব্রাহ্মণ্যপ্রীতি তৎকালীন জীবনযাত্রার ব্যাখ্যার মাপকাঠি হতে পারে না, বিশেষত বৌদ্ধধর্ম প্রতিবাদীরূপে বিদ্যমান ছিল। চর্যাপদের ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী বাউল দর্শন ও গান, যাবতীয় সংগীত ঘরানা ও পদ রচনা উত্তরাধিকার হিসেবে বর্তে আছে।

চর্যাপদে বৌদ্ধ সাহিত্য ও তাত্ত্বিক চরিত্র

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্য কিংবা ইসলামি সাহিত্য নামকরণ রয়েছে, কিন্তু চর্যাপদ যে সত্যিকারের বৌদ্ধ সাহিত্য এ কথা কেউ উচ্চারণ করে না। এ দেশে বৌদ্ধ বলতে কেউ নেই বা যৎসামান্য কয়জন আছেন তাঁদেরও সাহিত্যচেতনা বলতে কিছু নেই বলে এ দাবি উত্থাপিত হয়নি। এ দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) মূলত এক সময় বৌদ্ধ অধ্যুষিত ছিল। ইসলাম ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য আচরণে একটা বন্ধনসূত্র রয়েছে। ফলে মুসলমানগণ এদেশে এসে রাজ্য বিস্তারের সাথে ধর্ম বিস্তার করতে চাইলে বৌদ্ধগণ সহজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হুমায়ুন কবির তাঁর বাঙলার কাব্য গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্য সমৃদ্ধ সাহিত্য; বৌদ্ধজাতক, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ এক সময়ের প্রাচ্যের আদর্শ, এমনকি ইয়োরোপ পর্যন্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। 'এসোপস ফেবেলের' অনেক গল্পের উৎস বৌদ্ধজাতক, একে পৃথিবীর প্রথম গল্প সাহিত্য বলে উল্লেখ করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ উপমহাদেশ থেকে বিলুপ্ত হলে বিদ্রোহপরাণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং আক্ষিপাদ আদর্শ সমুদয় বৌদ্ধ সুকৃতিকে আঁতাকুড়ে নিষ্ক্ষেপ করে। উপমহাদেশের সবচেয়ে উন্নত ধর্মীয় আদর্শ হলেও বৌদ্ধধর্ম শান্তির ধর্ম এবং অহিংস আচরণে অভ্যস্ত জনজীবনের ওপর যখন জবরদস্তি পড়ল, দুর্বল জনসাধারণ তা আর ধরে রাখতে পারল না। বৌদ্ধ ভারত থেকে শংকরাচার্য পরিচালিত ব্রহ্ম ব্রহ্মবাদী সনাতন ধর্মের সঙ্গে স্বার্থবাদী আর্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলিত স্রোত পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে সারা উপমহাদেশে ক্ষিপ্ত আক্রমণের কারণে বৌদ্ধরা দৃশ্যান্তরে চলে যেতে বাধ্য হল। বর্ণবাদী আর্থ ধর্ম আবার হত স্থান দখল করল। তবু পূর্ববঙ্গে মুসলমান আগমন পর্যন্ত বৌদ্ধরা হিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল কিন্তু সর্বশেষ মুসলমানদের তলোয়ার সে অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিল, তবু চট্টগ্রাম অঞ্চলে মগদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কিছু বাঙালি বৌদ্ধ ক্ষীণ ধারায় বেঁচে রইল। মগদের সংস্কৃতি আরাকানি এবং বর্মি হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক রইল না।

কিন্তু এটা সত্য যে চর্যাপদ বৌদ্ধ সাহিত্য এবং বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন এ অঞ্চল থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের বাইরে চলে গিয়েছিল। পরে নেপালে পাওয়া গিয়েছিল। এই উৎক্ষিপ্ত হবার কারণ উপর্যুক্ত দুটি সমস্যা, হিন্দু ও মুসলমান মানসিকতা। বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও স্থাপত্য ধ্বংস করেছে মুসলমানরা, হিন্দুরাও কম করেনি; মহাস্থানগড়,

পাহাড়পুর ও ময়নামতির পুরাকীর্তি এখন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু চর্যাপদ কিংবা আরও যেসব সাহিত্য বৌদ্ধবিহার কিংবা তাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে চর্চিত হত এটা বলা বাহুল্য। তাই ঘটনাচক্রে চর্যাপদ পাওয়া গেলেও আরও অন্যান্য কারণ এই যে হয়তো সিদ্ধাচার্যরা লোকালয় ফেলে দূরে তাত্ত্বিক সাধনমার্গে ধর্ম আচরণের পরিণতি হিসেবে তা রচনা করেছিলেন আর গুরু ভাবে তা চর্চা এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল শিষ্যদের, সাধারণের নাগালে তা ছিল না। মুসলমানদের একটা নীতি ছিল বিরুদ্ধবাদীদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সমূলে বিনষ্ট করা, মুসলিম পূর্ব ইরান তার দৃষ্টান্ত। এর আওতায় বৌদ্ধ সাহিত্যও হয়তোবা পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাংলার স্বাধীন সুলতানদের কেউ কেউ সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যকে উৎসাহিত করেছিলেন রাজনৈতিক কারণে। স্বাভাবিকভাবে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি হবার কোনও কারণ ছিল না।

চর্যাপদ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত তাঁদের সাধন সংগীত; নাচগান ও বাদ্য সহকারে তা গীত এবং ধর্মীয় উপলব্ধিতে তা আত্মাদিত হতো; অবশ্য তাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ কতটা নিশ্চিত তা জানা যায় না, মনে হয় প্রবেশ অধিকারও তাতে সংরক্ষিত ছিল। কারণ সাধারণের বোধ ক্ষমতার তেজ তখন তা ছিল না, সম্পূর্ণ গূঢ় এবং রূপক ভাবপ্রিত ভাষায় তা উচ্চারিত ছিল। এ ভাষা কেন সিদ্ধাচার্যরা গ্রহণ করেছিলেন তা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু তা যে উন্নত চিন্তা চেতনার জাগরণ তা অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য বলা যায় বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন এ চর্যাপদগুলো খুব উন্নত সাহিত্য আদর্শ। কিন্তু হঠাৎ করে তারা এই পথেরে উত্তীর্ণ হয়েছে একথা মনে করার আগে ভাবতে হবে এজন্য অনেক পথ এ সময় বাংলা সাহিত্যকে অতিক্রম করতে হয়েছে আর সে অতিক্রম পথের ছবি আমাদের হাতে নেই। তবে চর্যাপদ যে শিখরে তুলে রেখেছে যেসব অদৃশ্য পাহাড় তাদের বিষয়ে আমরা কেবল কল্পনা করতে পারি। অর্থাৎ অনেক স্থূল অথবা উর্বরা শক্তি-চিন্তা চেতনার ওপর চর্যাপদ পুষ্পিত ছিল।

সুতরাং সম্পূর্ণ বৌদ্ধ সাহিত্য এবং তাদের কালক্রম এবং বাংলা ভাষায় তাদের প্রত্যেক দৃশ্য কিন্তু আমাদের হাতে নেই ঐ কয়েকটি ফুল ফল (চর্যাপদ) ছাড়া। আমরা জানি যে আর্য সভ্যতার বাহন হল সংস্কৃত ভাষা; গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময় কিন্তু ঐ সংস্কৃত ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় কেউ বাক্যালাপ করছে না, কেবল সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। জনসাধারণের বা প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা আলাদা, বুদ্ধের সময়ে তা ছিল পালি ভাষা। বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পালি ভাষায় রচিত হলেও বুদ্ধ কিন্তু পালি ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা বলে যান নি। তিনি বরং নির্দেশ দিয়েছিলেন ধর্মীয় উপদেশাবলী প্রাকৃতজনের যে ভাষা তাতে সংরক্ষণ করবে। পালি ভাষাও প্রাকৃত ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষাও সমস্ত অঞ্চলে এক ছিল না, সমগ্র আর্যাবর্ত বা যাকে আর্য অঞ্চল বলা হয়ে থাকে—আফগানিস্তানের কান্দাহার (গান্ধার) থেকে প্রাকজ্যোতিষপুর (আসাম) এই সমগ্র অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক আচরণ যুক্ত প্রাকৃত ভাষা (আর্য ভাষার বিবর্তিত রূপ) ব্যবহৃত হতো, তার ভেতর উৎকৃষ্ট ও সাহিত্য সংবলিত শৌরসেনি মাগধি, পৈচাশি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য; তাদের ভেতর থেকে আবার অবহটটি এবং অপভ্রংশ ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। শৌরসেনি এবং মাগধি অপভ্রংশ থেকে আধুনিক

হিন্দুস্থানি বা হিন্দি-উর্দু ভাষা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা, এমনি করে আধুনিক উপমহাদেশীর আর্য ভাষাগুলোর জন্ম। কিন্তু বাংলা ভাষা গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বিবর্তিত এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। চর্যাপদের চরিত্রের কারণে, চর্যাপদকে যেমন আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলছি, এটা জোরজবরদস্তি কারণ কোনও হিন্দি ভাষার পণ্ডিত স্বীকার করেন না যে চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন, বরং তাঁরা তা হিন্দি ভাষার আদি নিদর্শন না হলেও অন্যতম আদি নিদর্শন বলেন। কিন্তু উড়িয়া, মৈথিলি, নেপালি ভাষার পণ্ডিতবর্গ একইভাবে চর্যাপদ তাঁদের স্ব স্ব ভাষার আদি নিদর্শন বলে এসেছেন। অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ওডিবিএল গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে চর্যাপদকে বাংলা বলেছেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে তা গৃহীতও হয়েছে। তবে রাহুল সাংস্কৃত্যায়নও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পণ্ডিত, তিনিও ভাষা বিশ্লেষণ দিয়ে চর্যাপদকে হিন্দি ঘোষণা করেছেন, তাঁর বিশ্লেষণও উপেক্ষণীয় নয়। তার আগে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে চর্যাপদ যখন রচিত হয়েছে (৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ, রাহুলের মত) সে সময় উত্তরসুরি ভারতের ভাষারূপ কী ছিল? এ অঞ্চলটা তখন বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ছিল সন্দেহ নেই, তবে অন্য ধর্মশ্রয়ীদের প্রবল আক্রমণ ও বিদ্বেষও ভয়াবহ ছিল। তবু বৌদ্ধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো উজ্জীবিত ছিল—যেমন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, মহাস্থানগড় (বিশ্ববিদ্যালয়), বঙ্গ অঞ্চলে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। হয়তো বঙ্গ বলতে এ সমগ্র ভূভাগকে বোঝাত, যদিও অঙ্গদ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ছিল। রাজা শশাঙ্ক সমগ্র ভূভাগ জয় করে বঙ্গ সাম্রাজ্য পত্তন করেন, পাল রাজাদের রাজ্যসীমাও যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল, ধর্মপাল ও দেবপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেহেতু ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চর্যাপদ রচনাকাল বঙ্গ হচ্ছে সে সময়ে প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ রূপের প্রান্তিক সময়, এ অপভ্রংশ রূপ ভাষা আচরণ লেখ্য ও কথ্যে নেপাল থেকে আসাম পর্যন্ত একই ছিল, এটা অনিবার্য না হলেও ধারণাতীত নয়, অপভ্রংশে ভাষার—

নইউরসচ্ছহে জোবনন্দি অইপবসিএসু দিঅসেসু।

অনিঅন্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দডচমানেন।—গাহা সত্তসঈ

অর্থাৎ, নদীর পানির উচ্ছলতার মত হল নারীর যৌবন; যে দিনগুলো চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে, রাতেও আর ফিরে আসবে না। এ অবস্থায় আমার এ পোড়া হৃদয়ের মান অভিমান প্রয়োগ করে কী হবে (কেন প্রেমিককে ফিরিয়ে দিলাম!)।

আর প্রান্তিক কালের রূপ হল,

অর রে বাহহি কাণহ গাব

ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি

ওই ইথি নইহি সংতার দেই

জো চাহসি সো লেহি।—প্রাকৃত পৈঙ্গল

অর্থাৎ, ওগো কৃষ্ণ, তুমি নৌকা বাও, নৌকার ডগমগ কুগতি (ঝারাপ উদ্দেশ্যে চালিত করা) দিও না। তুমি এই নদীটি ভালোভাবে পাড়ি দাও, পরে যা চাইবে তা নিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ভাষারূপের ভেতর নিহিত আছে উল্লিখিত অঞ্চলের ভাষা ও জনজীবনের ছবি। এ ভাষারূপের ভেতর বাংলা ভাষার রূপটি চোখ বুঁজে আছে দল মেলে একদিন প্রকাশিত হবার জন্যে। এর সঙ্গে প্রাচীন একটা চর্যার তুলনা করলেই বোঝা যাচ্ছে

জাহের বানচিহ্ন রূব গ জানী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখানী।।
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছ।
উদক-চান্দ জিম সাচ গ মিচ্ছ।

অর্থাৎ, যার বর্ণরূপ কিছুই জানা যায় না, তাকে কেমন করে আমি আগম (বেদ) দিয়ে ব্যাখ্যা করব? আমি কাকে প্রশ্ন করে এবং কাকে কী বলে উত্তর পাব (দেব)? পানিতে প্রতিভাত চাঁদ সত্য? (নাকি আকাশে প্রতিভাত চাঁদ) নাকি মিথ্যা?

প্রায় আটশ বছর ধরে এই তার রূপ এ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবে ছিল অর্থাৎ সাহিত্য ভাষা হিসেবে (অবশ্য সংস্কৃত ছিল আসল সাহিত্যিক ভাষা, বঙ্গ অঞ্চলে জয়দেবের গীতগোবিন্দ দ্রষ্টব্য) ব্যবহৃত হত কথ্যরূপ হয়তো আলাদা ছিল। এই ভাষারূপ উদ্ধার করলেও এ ভাষায় একমাত্র চর্যাপদ ছাড়া আর কোথাও বৌদ্ধ সাহিত্য পাওয়া যায় নি। সেটা আসল কথা নয়, চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন এ মতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে চর্যাপদ এ সময়ের বৌদ্ধ সাহিত্যের অবশিষ্ট নিদর্শন। হোক সেটা আদি বাংলা অথবা আদি হিন্দি।

চর্যাপদকে বৌদ্ধ সাহিত্য বললেও বৌদ্ধ ধর্মের সামগ্রিক কোনও আবেদন এর ভেতর নেই, একটা খণ্ডিত বা তাত্ত্বিক (বিকৃত বা বেদাত) চেতনা থেকে এর সৃষ্টি। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের হয়তোবা প্রকৃত বৌদ্ধ (শরিয়ত মত) বলা যাবে না। জ্ঞানীর চোখে বৌদ্ধ ধর্মকে তারা অপবিত্র করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতির বিষয়ে অতি সামান্য আলোকপাত করেছেন, অথচ বৌদ্ধ ধর্মের নিষিদ্ধ বিষয়ে নারী (মার) চিন্তা, ভোগ লালসা, হিংসা বৃত্তিকে রূপকভাবে হলেও এখানে উত্থাপন করে ধর্মদ্রোহী হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের বর্ণবাদহীন নীতির বদল সিদ্ধাচার্যরা বর্ণবাদকে স্বীকার করে ব্রাহ্মণ্যবোধকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের নিরুপদ্রব ও স্বাভাবিক জীবনের পরিবর্তে অতি কঠিন-কঠোর দুঃখের ভীতিপ্রদ জীবন আদর্শ স্থাপন করেছেন। অথচ অজ্ঞানতা গুহা চিত্রের ভেতর জীবন আদর্শ কত মহৎ, তার কিছু মাত্র প্রতিফলন চর্যাপদে নেই।

সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নির্যাতন, ব্রাহ্মণদের শোষণ অত্যাচার তার সঙ্গে জীবনযাত্রার দুঃখ যাতনা জরা মৃত্যু। রাজা শুদ্ধধন মা গৌতমীর পুত্র সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ থেকে এক বছরের শিশুপুত্র ও অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী পরিত্যাগ করে মানুষের জীবনের এই দুর্গতিকে লাঘব করার জন্য গৃহ ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন এবং বোধিদ্রুম তলে ধ্যান করে অবশেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। জীব হত্যা মহাপাপ, অহিংসা পরম ধর্ম; সংকর্ম, সং চিন্তা, সংজ্ঞান হল জীবনের আদর্শ; এর দ্বারা দুঃখ জরা মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নির্বাণ লাভ হল জীবনের লক্ষ্য। বৌদ্ধ ধর্ম তিনটি স্তরের ওপর স্থাপিত, বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি, সংঘ শরণং গচ্ছামি। অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ এ ত্রিরত্নকে জীবন আদর্শ করতে হবে। বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম ও সহৃদয়তা দুনিয়ার প্রাথমিক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

জেগে উঠেছে, মানবাধিকারের প্রথম স্বীকৃতি হল তা। সমস্ত জীব বা জীবনের প্রতি বাধাহীন হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য অমোঘ বন্ধন বা মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রার্থনা রয়েছে, সর্বের সত্তা সুখিতা হোক, অবেরা হোক, অন্তর পরিহরত্ব। সর্বের সত্তা দুঃখাপম্পবদন্তু। সর্বের সত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তি বো বিগচ্ছত্তু। অর্থাৎ, সকল জীব সুখ লাভ করুক, শত্রুহীন হোক, অবধ্য হোক, সুখী জীবন কাল অতিবাহিত করুক। সকল জীব দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করুক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে কখনও বঞ্চিত না হোক। এই করুণার বাণীর ভেতর বিশ্ব মানবতার জন্য চিরশান্তির উৎস নির্দেশ রয়েছে।

হিন্দুধর্ম তথা অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের আচরণগত পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে ভগবানের কোনও অস্তিত্ব নেই, হিন্দুদের মত এক ব্রহ্ম বা জীবাত্মা-পরমাত্মার কোনও বিশ্বাস নেই, দেব-দেবীর প্রভাব নেই। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা একথা বুদ্ধ বলেন নি, তবে তিনি কর্মফলের দরুন জীবনের বার বার গমনাগমনের বিশ্বাসের কথা বলে গেছেন, সৎকর্মের ফলে জীবনের পরিসমাপ্তি বা নির্বাণ। বুদ্ধ নিজেকে ভগবান ঘোষণা করেন নি এবং পূজার জন্য কোনও বিধান রেখে যান নি; তাঁর ধর্মপ্রচার কালে বিভিন্ন সময়ের উপদেশগুলো নিয়ে ত্রিপিটক গ্রন্থিত হয়েছে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর উপদেশাবলী নিয়ে, বিশেষত নির্বাণতত্ত্ব নিয়ে তাঁর অনুসারীদের মতদ্বৈততা দেখা দেয়। সাধারণ মানুষদের জন্য হিন্দু ধর্মের অনুকরণে বুদ্ধ পূজার ধারণাটি বাতিল করা হল না, সে কারণে ধর্মের মৌল আদর্শটি বিঘ্নিত হল, বুদ্ধকে দেবতার স্থানে রাখা হল। দ্বিতীয়ত নির্বাণ নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টি হল, এর মধ্যে পঞ্চবিধে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল। নির্বাণটা কী? হিন্দু ধর্মের ধর্মার্ধকামমোক্ষ এর মোক্ষ, না অন্য কোনও ধারণা? নির্বাণ কি? ধর্ম কাম অতিক্রম করা দুঃখময় জীবনের দুঃখের পরিণতি, নাকি তার শেষে অস্তিত্ব? এক জীবনের অন্তে নির্বাণ, নাকি বোধিসত্ত্বের মত বিভিন্ন জন্মের শেষে? জীবনের অভাব, জন্মমৃত্যুর বাধা অতিক্রম করে স্থূল দেহের বিনাশের লক্ষ্য?

এই বিতর্কের জন্য প্রথমত বৌদ্ধ ধর্ম দুটি মতবাদে বিভক্ত হয়ে গেল, হীনযান এবং মহাযান, বিদেশি উচ্চারণে হিনিয়ান এবং মহিয়ান। এই দুই সাধনপন্থের ভেতর ধর্মীয় বিরোধ নেই, অনেকটা মুসলমানদের সুন্নী ও সুফী মতে ধর্মপালনের মত। হীনযান মতে জীবন ও ধর্ম পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্বাণ লাভ এবং সেই নির্বাণ হবে বুদ্ধ নির্দেশিত সরল পথে। সেই সরল পথ হল সৎকর্ম, ধ্যান এবং অন্যান্য সং চিন্তা যুক্ত নৈতিক আচরণের নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার সোপান অতিক্রম করার পথ। এই সাধনার সোপানগুলো শূন্যতার ভেতর, অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্ব স্তরে অবশেষে বিলীন করে দেওয়া।

কিন্তু মহাযান পন্থায় এ ক্রম-অগ্রসরমান পথ অর্থাৎ অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্ব শূন্যতায় বিলীন হওয়া ভ্রান্ত পথ, নির্বাণ লাভ করার সাধনাটাই বড়ো, অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করাটা আসল। বুদ্ধত্ব বলতে জ্ঞান ও চেতনা অর্থাৎ বোধিচিন্তা অর্জন করা। এই বুদ্ধত্ব লাভ হলেই শূন্যতা এবং করুণার সমন্বয় ঘটে থাকে। মহাযানীরা অনেকটা সরে আসেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আওতায়। বুদ্ধপূজা প্রথম তারা আরম্ভ করেন, অবশ্য হীনযানীরাও তা করতে বাধ্য হন পরবর্তীকালে। মহাযানীরা ওঁদের মত নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মচার ও নিরন্তর সং কর্ম সাধনার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতর নির্বাণ ধরে রাখেন না, যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র পূজা, বলিদান, স্নান, ধ্যান তর্পণ ইত্যাদি প্রথাগত ধর্মীয় বিধানকে সংশ্লিষ্ট করলেন। শ্রমণ আদর্শের সেলিবেসি বা ব্রহ্মচর্য অনেকেই ক্ষুণ্ণ করল, বরঞ্চ ধর্ম সাধনাকে অনেক আচার সর্বস্বতায় পর্যবসিত করল, এ আচরণ পরায়ণতার কারণ (সংঘং গচ্ছামি) ভেঙে ব্যক্তিগত সাধন উপলব্ধি ও সিদ্ধিকে আশ্রয় করল। তারা বলল, গণ্ডীবদ্ধ নিষ্ঠার (সংঘ জীবন) চাইতে ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তি শ্রেয়তর। তাই মহাযানী ধর্ম সাধনায় নিয়ম নিষ্ঠা বিচ্যুত হল, বস্তুতাত্ত্বিক আচার পরায়ণতা মুক্তি পেল।

এই মুক্তি থেকে ফল ভালো হল না, মহাযানী সাধন পদ্ধতিতে বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ হারিয়ে অন্যান্য ধর্মীয় আচরণ ও বিধি সংশ্লিষ্ট হতে লাগল, বিরাট স্রোতে অন্য ধর্মের ধারা বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে ধর্মের মূল আদর্শের পরিবর্তন ঘটাল। বৌদ্ধ ধর্মে তাত্ত্বিকতার আশ্রয় হল। এ মহাযান সম্প্রদায় থেকে ক্রমশঃ বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি সাধনমার্গী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছে। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা বজ্রযানী সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে কেউ কেউ সহজযানীও হতে পারেন।

গৌতম বুদ্ধ সকলের জন্য সঙ্ঘে প্রবেশ অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন, নারী-পুরুষের ভেদ বিচার ছিল না, ফলে বহু মাতৃতান্ত্রিক জাতি তাদের আচরিত বিধানসহ মহাযানীদের সহায়তায় সঙ্ঘে আশ্রয় পেয়েছিল। ফলে ধর্মের ভেতর লৌকিক আচার প্রবিশ্ট হল। হীনযানী রক্ষণশীলতার অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা অষ্টাঙ্গিক মনগং—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক জীবিত্ত্ব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধির ফলে যে বুদ্ধত্ব তার বিপরীতে উদারপন্থী মহাযানীদের মতাদর্শ জগৎ কল্যাণ অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

বঙ্গসহ আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হয়ে ওঠে। মহাযানীদের তাত্ত্বিকতার বিভিন্ন রূপ, নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক সাধনায় 'স্বভাবশূন্যতাই একমাত্র সত্য; উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কর্ম নেই, কারণ নেই, পরমার্থ বলেও কিছু নেই এবং এই স্বভাবশূন্যতা হল নির্বাণ।'

'যোগাচার সাধনায়' বিজ্ঞপ্তিমাাত্রতা হল স্বভাবশূন্যতার নামান্তর, এ মতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই শূন্যতা স্ববিজ্ঞান দুর্লভ্য বা অব্যবহাতিগোচর এবং নির্বিকল্প। বহির্মুখি চিন্তকে প্রতিলোম গতিতে পরাবৃত্ত করে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনাই যোগাচারের মূল উদ্দেশ্য। এই দু'শাখা থেকে বজ্রযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। পাল আমলে যেসব বিহার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উৎকর্ষ লাভ করেছিল তাতে বজ্রযানদের প্রভাব ছিল। বজ্রযানের এক শাখাকে আবার মন্ত্রযান বলা হয়। মন্ত্রযানের প্রকারভেদ হল সহজ ও কালচক্রযান। এদের মন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি নিয়ে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয়েছে। চর্যাপদের টীকায় বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন সমাজতন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্র, হেরুকতন্ত্র, আগম, সম্পূটোদ্ভব তন্ত্র, রতিবজ্র ইত্যাদি। এ সকল তন্ত্র তালিকা গ্রন্থ ও বৌদ্ধ তাত্ত্বিকতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চর্যাপদের টীকায় উল্লেখ আছে, তাছাড়া তন্ত্রসাধকদের আরাধ্য দেবী, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডপ ও পূজাপদ্ধতিরও পরিচয় মেলে। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ভেতর হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যবোধ অনেকখানি এগিয়ে আসে।

হিন্দু তান্ত্রিকতার ষটচক্র কিন্তু বৌদ্ধদের চারটি যথা—নির্মাণকায়, ধর্মকায়, সঞ্জোগকায় ও সহজকায়। মুদ্রা গ্রহণ এবং মদ্যপান উভয় ধর্মের তন্ত্রে রয়েছে। তবে বৌদ্ধদের বাহ্যমুদ্রার সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম শূন্যতা লাভের উপায় রয়েছে।

বজ্রযান শাখার সাধনার মূল ভিত্তি গুহ্য যৌগিক উপায়ে শূন্যতা ও করুণার মেলবন্ধন (পুং স্ত্রী যোগ)। বিজ্ঞানঘন চরম শূন্যতাকে তাঁরা বলেন 'ব্রজসত্ত্ব'—যা হল দ্বার, সার, নিশ্চল, অবিকল্প ও বজ্রের ন্যায় কঠিন। তাঁরা মনে করেন বোধিচিত্ত গঠনে মন্ত্রসাধন একটি উপায়—মন্ত্র দ্বারা শূন্যতা ও করুণার যোগ সাধন সম্ভব।

চর্যাপদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মমতের এই খানিকটা মিলের তান্ত্রিক মত ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহিত্যিক আদর্শপুষ্ট। এই চর্যাচর্যবিশিষ্টের আলোচনায় সহজযানের, মন্ত্রযানের, বজ্রযানের এবং কালচক্রযানের বিভিন্ন বিশদ রূপ হচ্ছে বাংলাদেশের এক সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যিনি এই চর্যাপদ উপহার দিয়েছেন, তিনি মনে করেন বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতের এই বাংলা গান বাংলার প্রাণ আদর্শ। বিভিন্ন সিদ্ধাচার্যের ধ্যানের ছবি এবং বাংলার মধুরতম সময়ের স্বরূপ এর থেকে ফুটে উঠেছে। চর্যাপদের ভেতর যে সমস্ত লৌকিক জীবন ও জগতের বস্তুনিচয় ধর্মীয় প্রতীকে হলেও নির্গত হয়েছে তাতে মিলিত হওয়া যায় যে বৌদ্ধ ধর্মে সেটা লৌকিক আচরণ অর্থাৎ বজ্রযানী চিন্তা বাংলার দিকে তা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। তবে এ কথাও সত্য যে কেবল বজ্রযানী মাগধের সঙ্গে নয় অন্যান্য যান যেমন সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি সাধনতত্ত্বের রূপও চর্যাপদে আশ্রয় করেছে; আবার কোনও কোনও চর্যাপদে দেহবাদী তত্ত্বও প্রকটিত। দেহবাদ বা দেহ সাধনা বাংলার প্রাচীন প্রথা, 'যা আছে ভাঙে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে' এর সাধনা পরম্পরায় দেহের নাড়ি নক্ষত্র বিভিন্ন কেন্দ্র তাঁদের হঠযোগে সমন্বিত হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রসাধনা এবং বজ্রযোগ কিংবা কাপালিকদের সাধনাও এসে মিশেছে। তাই শুধু একটি যানের অভিব্যক্তি চর্যাপদ নয়। তবে এটা সত্য যে হিন্দু ধর্মীয় আচারের ও তান্ত্রিকতার প্রভাবে মূল বৌদ্ধ ধর্মের চরিত্র স্থলিত এ সব যানধর্মী প্রথা আশ্রম সাধন আচরণ হচ্ছে চর্যাপদ, সেজন্য চর্যাপদকে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ সাহিত্য বলা যাবে না।

তবে এটা ঠিক যে চর্যাপদের মাধ্যমে বজ্রাচার্যরা যে ধর্মসাধনার কথা বলতে চেয়েছেন তা ব্যক্তিগত ও বস্তুতান্ত্রিক অনুভূতির অমোঘ প্রয়াস, সেজন্য তাঁরা রূপক এবং রহস্যময়তার আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণ বুদ্ধির অতীত চেতনার অন্ধকারে অথবা আলোছায়ার ভেতরে বিভিন্ন রূপকল্পের চেনা অচেনা দীপ্তির স্পর্শ দিয়েছেন। সাধারণ ধর্মনীতিতে যখন ক্লাস্ত অপরিপাক অনুভূতি আর কাজ করে না তখন গুহ্য তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত ধর্মপদ্ধতি ও নীতির আশ্রয় এমনি দেখা দেয়। এটা শুধু বৌদ্ধ ধর্মের জন্য নয়, প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাত্তাগে এই তান্ত্রিকতা বিরাজিত। কোনও রাজনৈতিক আদর্শকে যেমন গুপ্ত বৈপ্লবিক শাখা তাদের সন্ত্রাসধর্মী আচরণ দিয়ে গতিসম্পন্ন করতে চায়, কোনও জীবন্ত ধর্মের ম্রিয়মাণ অবস্থায় ঠিক তেমনি তান্ত্রিকতার আদর্শও ধর্মকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস প্রায় (বর্তমানে জঙ্গিবাদ ও উগ্র ধর্মীয় আঘাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ আক্রান্ত হবার সর্বশেষ প্রয়াস আদর্শ দেখা যাচ্ছে।) সে কারণে উপমহাদেশীয় ধর্মগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে এই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাত্ত্বিকতা যুক্ত হয়েছে; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এমনকি হিন্দুস্থানের ইসলাম ধর্মেও এই অবস্থা দৃষ্ট হয়েছে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখায় এই তাত্ত্বিকতার বিভিন্ন নাম যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সহজিয়া ইত্যাদি, বৌদ্ধ ধর্মের মহাযানীদের বিভিন্ন শাখা; তেমনি ইসলাম ধর্মে সুফীবাদ ও তার বিভিন্ন শাখা, বাউল, ফকিরি ইত্যাদি। মূলধর্ম আচরণের সঙ্গে এই তথাকথিত তাত্ত্বিক আচরণকে আধ্যাত্মিকতার অন্যতম বিকাশ মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছে। মূলধর্মের চেতনার যেটুকু সাহিত্য সংস্কৃতি সৌন্দর্য যদিবা প্রকাশিত থাকে কিন্তু তাত্ত্বিক বোধে তীব্র অভিব্যক্তির জন্য তা ধারালো অনুভূতিতে এবং তীক্ষ্ণ বেগে ধাবিত থাকে, যেমন চর্যাপদ কিংবা সুফী কাব্য।

চর্যাপদে চিন্তার জগৎ সীমাবদ্ধ, অনেকের মতে বাঙালি জীবনের বাইরে নয়; এর কারণও সংক্ষিপ্ত, বাংলা থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বিলীন হওয়ার মুহূর্তে সিদ্ধাচার্যরা জনচেতনাকে তত্ত্বমন্ত্র দ্বারা দৃঢ় করতে চেয়েছেন। কাছে থেকে যখন ব্যর্থ তখন দূর থেকে বাণটোনার মত এ বিশ্বাসবোধ তাদের অভিভূত করেছে। সাপের মস্ত্রে সাপ বশীভূত হয় এর ভেতর সত্যতা কিছু নেই কিন্তু সাধারণের বিশ্বাসের ওপর ওঝা যখন এটা ঝাড়তে থাকে লোক সমাগম কম হয় না। মূলধর্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার জন্য সিদ্ধাচার্যদের এই শেষ প্রয়াস।

চর্যাপদকে বাংলা ভাষার রচনা বলার অন্যতম কারণও এর ভেতর নিহিত। বাঙালি চরিত্রের ভেতর কুসংস্কারাচ্ছন্নতা বিশ্বাসবোধ ও বিশ্বাস বোধগম্য নয় তাই মহৎ এই ধারণাপেক্ষী মনোযোগ ভাসিত। তবে সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য, তা নয়। সিদ্ধাচার্যরা অনেকে সংস্কার মুক্তি ও মানবিকতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, সেটাও সংস্কারবাদী বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা। অথবা সিদ্ধাচার্যরা যে মোটেও লোকসম্মুখে প্রকাশের মূল্য আরোপ করেন নি এটাও বলা যেতে পারে। কারণ তাদের জপতপ আচার-অনুষ্ঠানের সাধন সংগীত হিসেবে এগুলো ভোক্তা পাখির কুজনের মত সৃষ্টি, নিজেদের আনন্দে নৃত্য বাদ্য সহকারে গাইতেন, যার কোনও অর্থ নেই। অর্থ খুঁজে কেউ না পেলে তাঁরা বলতে পারে এগুলো শোনার জন্য কেউ অনুরুদ্ধ নয়। তাই ধর্ম সাধনার চাইতে তাঁদের হৃদয় সাধনার দ্বারা তাঁরা দেখতে চেয়েছেন চারপাশের পরিবেশকে। সে কারণে চর্যাপদ বাংলা গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ধরনের গীতিময়তা রয়েছে তার চাইতে ঘনীভূত রূপ চর্যাপদে বর্তমান।

নেপালের রাজদরবার থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই চর্যাপদ আবিষ্কার করেন, আক্ষরিক অর্থে তাই। তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথির ভেতর এটিকে শনাক্ত করেন এবং দীর্ঘক্ষণ গবেষণা দিয়ে অবশেষে ঘোষণা করেন চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন। অবশ্য তা তিনি প্রথমে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নাম দিয়েছিলেন, তাতে দুটো বিষয়াকৃতি ছিল ধর্ম বিষয় কিছু গান ও অন্যগুলো দোহা, ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোর নাম দেন চর্যাচর্যবিশিষ্ট বা চর্যাপদ। নেপালে বৌদ্ধধর্মের গতি নিঃসরণ সত্ত্বেও এ পদাবলী তৃতীয় মার্গে ভক্তি আপ্নত চিন্তে আস্থাদান হয়ে থাকে। ঠিক বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুভূতিতে নয়, সার্বজনীন আধ্যাত্মিক রসানিবেশ সহকারে। একই ভক্তি চিন্তে এগুলো নেপাল ছাড়া অন্যত্রও গীত হতো, প্রাথমিক যুগে বৌদ্ধবিহার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে এগুলো আচরিত হতো। কিন্তু চর্যার চরিত্র থেকে মনে হয় এগুলো লোকালয়ে বা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণের সমক্ষে অপ্রচলিত ছিল। সমবেত সংগীত আদর্শে নৃত্যবাদ্য সহ আশ্বাদন ছাড়াও এই চর্যাপদ ধর্মীয় আচারে এবং শাস্ত্রীয় আচারে ব্যবহৃত হয়েছে। চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাও পাওয়া গেছে। টীকাকারদের ভেতর মুনিদত্তের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ, তাছাড়া তিব্বতি অনুবাদ ও জাপানি অনুবাদ পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাথমিক অবস্থায় সাতচল্লিশটি পদ আবিষ্কার করেন। একটি পদ অসম্পূর্ণ। পরে তিব্বতি অনুবাদ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় মোট পদ রয়েছে একান্নটি। সিদ্ধাচার্যরা কী লিপিতে এ পদগুলো রচনা করেছিলেন, প্রাথমিক স্তরে কোন ভাষার লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তুলট কাগজে নেপালি হরফে লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেন, লিপির চংগু অনেকটা আধুনিক। তাতে বোঝা যাচ্ছে যে চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপি কিংবা পরবর্তীকালের অনুলিপি বহু ব্যবহৃত, বিশেষত নৃত্যগীতের সময়। কিন্তু এর ভাষার ছাপ্পদময় অবস্থারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কারণ পরবর্তীকালের লিপিকররা ক্রমশ তাকে আধুনিকীকরণ করেছেন, তবুও তার প্রাচীনত্ব দেদীপ্যমান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায়, 'চর্যাপদে পরবর্তীকালের ব্রজবুলির বিশেষ বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পদে সর্বত্রই কোমল ও মধুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পদগুলির ভাষা, শব্দচয়ন ও বিন্যাস এবং ছন্দ কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।'

চর্যাপদ একজনের রচনা কিংবা একটা সময়ের রচিত পদ নয়, তেমনি এক সুর, এক রাগ, এক তালে গেয় গীত নয়। মোট চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্যের রচিত, এঁদের জন্ম অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক। চর্যাপদ বাংলা গান ও কবিতার পূর্বসূরি; পদ কথাটির মধ্যে বাংলা কবিতার গীতময়তার স্মারক, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল আধুনিক রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত একই ধরনের গান বাঁধা উত্তরাধিকার।

চর্যাপদের সমাজ চরিত্র

চর্যাপদে বাঙালি সমাজ বিধৃত। তবে এটা ঐতিহাসিকভাবে নির্ণীত হয়নি যে চর্যাপদে উল্লিখিত জনজীবন, জনপথ কিংবা তাদের আচার-আচরণ সর্বদা বাংলা ও বাঙালি জীবনকে লক্ষ্য করে উৎকীর্ণ হয়েছে। এবং ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত নয় যে চর্যাপদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্যরা সবাই বাঙালি ছিলেন, তবে চর্যাপদের অনেক শব্দে এবং রূপকল্পে বাঙালি পরিবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তার পরিধিও বর্তমান ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম, তবে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে তৎকালীন উত্তর-পূর্ব ভারতের বাইরে নয়। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি এবং প্রসার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম লৌকিক ধর্ম, অলৌকিক ও ভগবানে বিশ্বাস নেই, তবু জন্মান্তরবাদ ও আত্মার বিশ্বাসে অলৌকিকত্ব রয়েছে, যা থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার পক্ষে জীবনকে নিয়োজিত করতে হয়। সে কারণে বৌদ্ধ জীবন সমুত্তীর্ণ একটা লোকাযত দর্শন হয়েও ধর্ম। চর্যাপদ বৌদ্ধ ধর্মীয় আদর্শে রচিত সাধন-সম্পন্ন, আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণ হল এর সম্পূর্ণ চরিত্র, অন্য কোনও সামাজিক হিতসাধন কিংবা ব্যক্তিগত চিত্তমর্মিতা কিংবা চিত্র নির্মাণের কোনও অবকাশ এর নেই। বৌদ্ধ চর্যাপদ রচয়িতারা সকলেই সিদ্ধাচার্য বা ধর্মনির্ভর কর্মকাণ্ডের বাইরে এক চরিত্র-চালিত নন। এমন সাধক হলেও তাঁরা শিল্পী, দৃষ্টি তাঁদের জগত ও জীবনের বরপেচন নয়। সমাজ বাস্তব ও প্রাকৃত নির্দেশ বেদনার জারক রস থেকে তাঁদের কবিতার ভাব, ভাষা ও সংগীতের সুর উৎসারিত, অর্থাৎ তাঁদের তপোব্রীষ্ট চতুর্পাশ তাঁদের মনন সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছে, সেখানেই আধ্যাত্মিকতা ভেদ করে জীবন সত্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবু বলতে হবে সিদ্ধাচার্যরা পলায়নবাদী, প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষে তাঁদের ব্যঞ্জনার বাতাবরণ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই সুন্দর রঙিন আলো আঁধার থেকে এখনই আমাদের বের করে নিতে হবে বিশ্বস্ত সব আকাঙ্ক্ষিত সমাজ চরিত্র, তাঁদের ব্যক্তি অভিনিবেশের ভেতর থেকে গণমানসের সেদিনের পরিবেশ। তাঁরা ছিলেন কবি, তাঁরা নিরঙ্কুশ সময়ের রাজপুত্র, সত্য উদ্ধারে সাহসী ও সাক্ষী। তবু তাঁরা তান্ত্রিকতার বিশ্বাসের ভর থেকে শব্দ উচ্চারণ করেছেন। তাদের শব্দের রূপকল্প সৃষ্টিও সেই বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুপ্রাণিত। সেটাই আমাদের কাছে বিশ্বয়ের বটে।

চর্যাপদের সময়কাল অষ্টম-নবম-দশম শতাব্দী, সে সময় বাংলা অঞ্চলে পাল রাজাদের রাজত্ব ছিল খুব গৌরবোজ্জ্বল, বৌদ্ধ-শিক্ষা-সংস্কৃতি সমাজ কাঠামো ছিল উন্নত কিংবা তুঙ্গে, তবে পড়ন্ত বেলায়। পড়ন্ত বলা হচ্ছে এইজন্য যে বৌদ্ধ জনবিশ্বাসে এবং

আচরণে হয়তো বা ক্রান্তি প্রশ্ন পেয়েছিল, প্রথমত ধর্মাচরণে বিভিন্ন বিভাজন—হীনযান ও মহাযান তাদের বিভিন্ন যানসুয়ারি প্রতিক্রিয়া, বিশেষত হীনযানীদের রক্ষণশীল জবরদস্তি আর এ অঞ্চল ছিল হীনযানি অধ্যুষিত, মানুষ হাঁফিয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম লোকাযত আচরণ ছেড়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত আচারসর্বস্ব গতিবিধিতে ভুগছিল, বুদ্ধ পূজা-বুদ্ধকে ভগবান উপাধি একই হিন্দু আদর্শ, তার ওপর ব্রাহ্মণদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে মানুষ হিন্দু ধর্মের প্রতি ঝুঁকেছিল। অথচ জাতি-বর্ণহীন বৌদ্ধ ধর্ম তাদের সাম্য আদর্শ ক্রমে হারিয়ে ফেলল। সুযোগসন্ধানী হিন্দুরাও বুদ্ধদেব তাদের দশম অবতারের অন্যতম বলে বৌদ্ধদের প্রতারিত করে হিন্দুত্বের দিকে টানল। জনসাধারণ (গৃহী বৌদ্ধ) সজ্জের বা বিহারের জন্য নিজেদের উপার্জনের এক-তৃতীয়াংশ এবং তিন পুত্র থাকলে এক পুত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে উৎসর্গ করতে হতো এ থেকে বাঁচল, বরং হিন্দু ব্রাহ্মণদের তার চাইতে কম দান দক্ষিণা পুত্র উৎসর্গ দিয়ে উদ্ধার পেয়ে স্বস্তি পেল। স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি সিদ্ধাচার্যদের রোষ উচ্চারিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উদারতা ক্রমে অবলুপ্ত হল। তার সঙ্গে চলল শংকরাচার্যের চেলাদের আক্রমণ, জবরদস্তিমূলক হিন্দুকরণ; চেলারা বৌদ্ধ মঠ অনেক ধ্বংস করে দিলে সিদ্ধাচার্য গোপন আশ্রয়ে বা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। মূল অঞ্চলে সে কারণে বৌদ্ধ আচার্য কখনও সুকৃতি বা সাহিত্য রইল না, পরিত্যক্ত কিছু থাকলেও ধ্বংস করা হয়েছিল, সিদ্ধাচার্যরা যে যে অঞ্চলে আশ্রয় পেয়েছিলেন সেখানে তার কিছু সুকৃতি চিত্র খুঁজে পাওয়া গেল, যেমন—নেপালে, তিব্বতে। এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পুরাতন হিন্দু জীবন আদর্শ ও আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, তাদের ভেতর পুনরায় বর্ণবিন্যাস ও বুদ্ধ পূজার সঙ্গে দেবদেবী পূজার প্রথা প্রবর্তিত হল। ডোম্বী, মহামায়া, বুদ্ধযোগিনী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য সে কারণে বর্ণবিন্যাসের চার স্তর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছাড়িয়ে আরও অবনতি দেখা গেল, ডোম্ব বা ডোম, শবর, নিষাদ, হাড়ি, কাপালিক ইত্যাদি অস্পৃশ্য বর্ণ বিভাজন দেখা গেল। ফলে গৌতম বুদ্ধ যে সমাজআদর্শ ও মানবতার ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছিলেন সেটা অবশেষে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অবশ্য এই অধঃপতন একদিনে কিংবা দু এক শতাব্দীর জীবনচর্যার গতিনিঃসরণ নয়, বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদের অবিম্শ্যকারিতা ও বহুধা মতবাদ বিভক্তি এর জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের সমসাময়িক কালে এ অঞ্চলের জনজীবনের পরিস্থিতির ঐতিহাসিক আলোকপাত প্রয়োজন।

বুদ্ধের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে উপমহাদেশে আর্যদের আগমন ঘটে, সে সময় এ অঞ্চলের সভ্যতার অধিষ্ঠান এবং লোকচেতনা কত দূর অগ্রসর ছিল জানা যায় না। তবে পণ্ডিতদের ধারণা কোথাও কোথাও আর্য সভ্যতার চেয়ে অনার্য সভ্যতা অনেক অগ্রসর ছিল, যেমন মহেনজোদারো এবং হরপ্পার নিদর্শন, তবে বাংলা অঞ্চলে হয়তো এমনটা ছিল না, দ্রাবিড়, কোল, ভীল, মুণ্ডা এমন জন জাতি এখানে বাস করত, তারা আর্যদের হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় কিংবা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবে আর্যরা যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ছিল, ওরা তাই ছিল না। আর্য গ্রন্থে তাদের খুব অবহেলা ভরে উচ্চারণ আছে ‘ব্যাংসি’ পক্ষী জাতীয় কিচিরমিচির শব্দকারী মৎস্যজীবী, তবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আর্য প্রভাবান্বিত থাকলেও বাংলা অঞ্চল অবধি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকরণ বিলম্বিত ছিল, খুব সম্ভব বুদ্ধের সময়েও এ অঞ্চল 'পাণ্ডব' বর্জিত দেশ হিসেবে পরিগণিত ছিল। তবে অশোক কিংবা গুপ্তরাজাদের সময় থেকে এখানে আর্য আদর্শিক জীবন যাত্রা শুরু হয়, গুপ্তরাও ছিলেন বৌদ্ধ। পাল রাজাদের সময়ে অধিকরণ প্রায় পুরোপুরি কার্যকর হল। অনার্যরা লোকালয়ের বাইরে চলে গেছে। বৌদ্ধ ধর্ম আর্য ধর্মের বিরোধী ধর্ম নয়, বরং আর্য ধর্মের সংস্কারপন্থী অন্যতম ধর্ম। কিন্তু তারা বেদ বিরোধী, তবে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর আঘাত দেন নি। সে পরিণতিতে পাল রাজাদের উদারনৈতিক শাসন সুবাদে আর্য সনাতন ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। হিন্দুধর্মের তান্ত্রিকতাও এ সময় বৃদ্ধি পায়, ফলে বৌদ্ধ ধর্মেও তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই টানা পোড়েনের ভেতর ক্রমশ বৌদ্ধরা হিন্দুঘেঁষা হয়ে উঠল, পাল রাজারাও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ইত্যাদি এবং তাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে গৌরব আসন প্রদান করেন। ক্রমে বৌদ্ধদের ভেতর জাতিভেদ নীতি আশ্রয় পেল। এমনকি সিদ্ধাচার্যরা বৌদ্ধ ধর্মের স্তম্ভ হলেও তাঁদের পরিচয় কেউ ব্রাহ্মণ বংশীয়, কেউ শূদ্র, কেউ শরব যা কখনও অভিপ্রেত হতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্মের ভেতর শ্রমণ, থের বা মহাথের এঁরাই সর্বজন পূজনীয়। এমনকি পুত্রও যদি প্রবজ্যা গ্রহণ করে থাকে পিতা তার প্রতি প্রণত হয় কিন্তু ডোম বর্ণের কেউ প্রবজ্যা গ্রহণ করলে তার পদপ্রান্তে প্রণত হওয়া কোনও ব্রাহ্মণ স্থানীয় কারও পক্ষে প্রশস্ত নয়।

এছাড়াও সামাজিক স্তরবিন্যাস অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল তীক্ষ্ণ, ধনীদের প্রাধান্য এবং গরিবের দুর্গতি সর্বকালে সর্বদেশে একই রূপ, কিন্তু বাংলা অঞ্চলে হঠাৎ তার তারতম্য বেশি দেখা গিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা কোনও একটা দুর্ঘটনার পর বাংলা জনজীবনের ওপর নেমে এসেছিল অভিশাপ, ফলে নানা কারণে অনেককে পেশা পরিবর্তন করতে হয়েছিল, কৃষিকার্যে পেশা থেকে কৃষিকার্যের প্রতি ঝুঁকেছিল অথবা মৎস্যজীবীতে পরিণত হয়েছিল অনেকেই, ফলে তাদের সামাজিক সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তবে তাঁতি, তেলি, কুমোর ইত্যাদি পেশার লোকদেরও সামাজিক সম্মান ছিল না।

এদিকে ব্রাহ্মণদের সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া মানে বর্ণবাদী শ্রেণীব্যবস্থা কঠোর হয়ে যাওয়া। এটা আর্যদের সৃষ্ট অবদান বা অভিশাপ, কারণ আজও সুদৃঢ়ভাবে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। চারটি প্রধান বর্ণের ব্রাহ্মণ সৃষ্টি ব্রহ্মের শির বা মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈশ্য শরীর এবং শূদ্র পা থেকে, অবশ্য বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শ্রেণীবিন্যাস রূপ ধরা পড়ত না, ফলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যরা শূদ্র হিসেবেই গণ্য হতো, আবার শূদ্রের ভেতরও শ্রেণীবিন্যাস ছিল, অচ্ছুৎ বা জল অচল শ্রেণীর শূদ্রদের লোকালয়ে বা ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকতে হতো, চর্যাপদে বর্ণিত অচ্ছুৎরাও। তাই এদেশের লোক। প্রাচীন কালে ইতিহাস রচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত না, তাই ব্রাহ্মণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্মৃতি ও শ্রুতি শাস্ত্রই একমাত্র সম্বল, তাতে অন্যদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে চর্যাপদের যুগে বাঙালি সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল শ্রেণীবৈষম্য এবং বর্ণাশ্রম বিধানকে কঠোর থেকে কঠোরতর করা হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায়; তখন সমাজে ধনী লোক বেশি ছিল না, যারা ছিল তারা গরিবদের সহজেই পদতলে নিষ্পেষিত করেছিল, ব্রাহ্মণরা তার সহযোগিতা যুগিয়েছিল। ফলে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনজীবনে দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, চর্যাপদের প্রায় প্রতিটিতে তার ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এ নির্যাতন ছুঁ মার্গতা বা অস্পৃশ্যতা থেকে এসেছে বেশি। যেমন লোকালয়ে বিভিন্ন ছবি চর্যাপদে দেখি, নিতান্ত অবজ্ঞাত, অবহেলিত এবং আর্থিক দিক থেকেও অসচ্ছল লোকেরা সাধারণ জীবন যাপনে ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত,

নগর বাইরি রে ডোষী তোহোরি কুড়িআ।

ছোই ছোই জাই সি ব্রাক্ষণ নাড়িআ॥

—নগর বাইরে ডোষীর কুড়ে, ব্রাক্ষণনেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

এখানে দুটি বিপরীত চিত্র রয়েছে, ডোষীকে লোকালয়ের বাইরে বাস করতে হয় কিন্তু কারণবশত বা বাধ্য হয়ে সে ব্রাক্ষণ নেড়েকে ছুঁয়ে দেয়। ব্রাক্ষণ নেড়েকে ছুঁয়ে দেয় অর্থ ডোষীকে বাধ্য হয়ে লোকালয়ে আসতে হয় তেল নুনের জন্য বা অন্য সামাজিক কারণে আর যে পথে ব্রাক্ষণ হেঁটে যায় বা তার দৃষ্টি পড়ে সে পথে ডোষী হাঁটে।

অন্য একটি চর্যায়—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী

হাড়ীত ভাত নাহি গিতি আবেশী

—টিলার ওপর আমার ঘর কোনও প্রতিবেশি নেই, হাড়িতে ভাত নেই নিত্য উপোস দিতে হচ্ছে।

শুধু অস্পৃশ্যতার জন্য দুর্ভোগ জীবন এখানে লোকালয়ের বাইরেও স্থান হয়নি, ব্রাক্ষণ চলিত পথ মাড়ানোও নয়, একেবারে টিলার ওপর ঘরে বাস, এখানে কেউ যেতেও পারে না, আশেপাশেও কেউ নেই। তাহলে তেল নুন সংগ্রহ চলে না, টিলার ওপর পানি সংগ্রহ করা কষ্টকর। অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্য একসঙ্গে জীবনে নিপাতিত দেখা যাচ্ছে।

ঠিক অনুরূপ আর একটি চর্যায়—

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী

—উঁচু পর্বতের ওপর শবর বালিকা বাস করে।

তাহলে যারা অস্পৃশ্য, তারা তো দরিদ্র বটে। তাদের বাস করতে হয় লোকালয় ছেড়ে দূরে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। ফলে তাদের কী যে জীবন সহজে অনুমেয়। তবু তো তারা বেঁচে থাকে, কিন্তু কী উপায়ে? তার ইংগিত চর্যাকার যা দিয়ে গেছেন।

গিঅ ঘরগী নামে সহজ সুন্দরী

—নিজ গৃহিণী নামে নিরামণি নাগরীর সঙ্গে প্রেম রাত কাটাল।

কিংবা—

আলো ডোষী তোএ সম করিবো মো সাক্ষ

—ওহে ডোষী তোর সঙ্গে আমার সাক্ষা (পিরীত বা বিয়ে) হবে।

দিনের আলোতে কিংবা লোকসমক্ষে ডোষী অস্পৃশ্য বটে কিন্তু রাতের আধারে লোকচক্ষুর অন্তরালে ডোষীকে দেহ উপভোগ অপূর্ব। তাই বলে ডোষী এমনভাবে ব্রাক্ষণ নেড়েকে দেহ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান করে না, যৌন কর্মী হিসেবে ন্যায্য পাওনা কিংবা তারও বেশি উসূল করে নেয়, কিংবা ডোষী নিজে লোকালয়ে গিয়ে তেল নুন কিনতে পারে না, ব্রাহ্মণ নিজে কাঁধে বয়ে রাতে নিয়ে যায়।

চর্যাপদে ডোষী কিংবা শবর (ব্যাধ, পাখি শিকারী) জাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক ছাড়াও আরও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের উল্লেখ আছে, যাদের বৃত্তি কিংবা সামাজিক অবস্থান এদের চাইতে একটু উন্নত হলেও জীবন সচ্ছলতার হেরফের ছিল না। যেমন তাঁতি, চাঙেড়ি প্রস্তুতকারী, নৌকার মাঝি, জাল দিয়ে মাছ ধরা (অবশ্য জেলেদের জীবন অতটা খারাপ ছিল না, অনেকেই মৎসালী এবং এ কাজে ব্যাপৃত ছিল বলে মনে হয়। মদচোয়ানো, ধুনুরী, কাঠুরে এবং লোকের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীতে অভ্যস্ত নটনটদের উল্লেখ আছে, প্রাসঙ্গিকভাবে দু'একটা চর্যার উল্লেখ করা যায়, যেমন—মাছ শিকারের জন্য ছড়া জাল ফেলা হয়েছে,

পাঞ্চ কেড়ু যাল পড়ন্তে সাজে পীঠত কাছি বাকি

গঅণ দুখোলে সিঞ্চু পানী গ পইসই সাকি

—পাঁচটি বৈঠায়ুক্ত নৌকা থেকে কাছি (জালের কাছি) টেনে নিয়েছে, গগন সেচনির দ্বারা জল সেচ, যেন (মাছ) কোনও ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

মাস্ত চড়হিলে চউদিস চাহঅ

কেড়ু যাল নাহি কে কী ব্যাবসে পারঅ

—নৌকার গলুইয়ে থাকলে চারদিকে ভীকানোর সময় থাকে না, দাঁড় না থাকলে কেউ কি বাইতে পারে?

মালির ও কামলার (কামলি) কাজ আবশ্যকীয় ছিল, কারণ সময়মত পার করে দেওয়া, জোয়ার-ভাটা দেখে, ঝড়-তুফান সম্বন্ধে সতর্ক থাকা ইত্যাদি। নদীমাতৃক বাংলাদেশে একমাত্র নৌকাই ছিল এক স্থান হতে অন্য স্থানে আসা-যাওয়ার উপায়।

মাঝ বেণী ভরঙ্গ ম মুণিআ

—মাঝ নদীতে ঢেউ বুঝতে পারলাম।

বাংলাদেশে পদ্মা বা মেঘনার বিশাল স্রোতধারার মাঝখানে নৌকা নিয়ে যায় যে মাঝি তার জীবন উপলব্ধি হল তাই।

কইসনি হালো ডোষী তোহোরি ভাবরী আলী।

অন্তে কুলীন জন মাঝে কাবালি।।

—ওগো ডোষী, এ তোমার কী ধরনের ছিনালিপনা, কুলীনকে এড়িয়ে কাপালিককে ঘরে ঠাই দিয়েছ?

কাপালিক তো চাহিদামত অর্থ যোগাতে পারে না, কাপালিক হল শ্মশানবাসী কিন্তু কামাচারী নির্মম তান্ত্রিক। তাকে সকলে ভয় পায়। কুলীনরা যে ডোষীর ঘরে—এটাই সমাজগ্রাহ্য ছিল।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাধদের শিকারের কলাকৌশলের কথা রয়েছে, যেমন—

বেটিল হাক পড়অ চৌদীস

—চারদিক বেষ্টিত হাঁক পড়েছে (হরিণ শিকারের জন্য)।

অন্য চর্যায়—

মাআজাল পসিরি উরে বাঁধেলি মাআ হরিণী

—মাআজাল জড়িয়ে সে মায়া হরিণীকে বেঁধে ফেলল।

চারদিক ঘিরে পরে জাল ছড়িয়ে হরিণ শিকার ছিল ব্যাধের কৌশল ও জীবিকা। মনে হয় বাঙালি জীবনে মাংস ভক্ষণ তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, বিশেষত হরিণ মাংস। তবে গৃহপালিত পশুর মাংস খেত কিনা জানা যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের রীতি অনুসারে প্রাণী হত্যা মহাপাপ, কিন্তু ব্যাধরা প্রাণী মেরে দিলে খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু গৃহপালিত পশু ব্যাধরা মারত না। ব্যাধরা নিষিদ্ধ এ কাজ করত বলে তারা সমাজে ঠাই পাওয়ার যোগ্য ছিল না।

মদ্য প্রস্তুতকারী বা গুঁড়িদের বাড়িতে অনেকেই যেত মদ বিক্রি করত মেয়েরা

এক সে গুঁড়ি দুই ঘরে সাক্ষঅ

চীঅণ বাকলঅ বাকলীবাক্ষঅ

—সে এক গুঁড়ি দুই ঘরে প্রবেশ করত চিকন বাকলের সাহায্যে মদ চোলাই করত।

মন চোলাইতে যে বাঙালিরা নিপুণ এবং এখানে উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হত, সে কারণে বাংলার এক নাম গৌড় অর্থাৎ গুড় থেকে মদ চোলাই করা হত আর মদের নামই ছিল 'বাংলা'। অর্থনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়, 'বাংলা মদ' সমগ্র উত্তর ভারতে জনপ্রিয় ছিল। মদ্য ব্যবসায় অনেকে নিযুক্ত থাকত, গুঁড়িবাড়িতে মদ্য পান চলত, মেয়েরাই মদ্য পরিবেশন করত।

বাংলা অঞ্চলে কার্পাস চাষ, তুলা থেকে সুতো, তুলাধুনার কৌশল এবং সবচেয়ে সূক্ষ্মবস্ত্র মসলিন দেশ বিদেশে আদৃত ছিল, বাংলার মসলিনের জবাব নেই। রেশমপথ বা সিল্ক রোডে যে সব বাণিজ্য উপাদান ছিল তাতে মসলিন অন্যতম। তুলো ধুনির একটি চিত্র—

তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু

আঁসু ধুনি ধুনি গিরবর সেসু

—তুলো ধুনে ধুনে আঁশ আঁশ করা হল, আঁশ ধুনে ধুনে কিছুই রইল না।

তেমনি কুঠার ফেলে কাঠ চেরা কিংবা আসবাব ও জ্বালানি তৈরি করার ছবি আছে,

ফাড়িঅ মোহতর পটি জোড়িঅ

আদঅ দিড়ি টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ

—মোহ তরুকে ফেড়ে ফেলা হয়েছে, (ফেড়ে ফেলা) পাটিও জোড়া দেয়া হয়েছে। অদ্বয় (চেতন্যরূপ) টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণ নিশ্চিত করা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথার ইংগিতে মনে হয় কাঠের আসবাবপত্র অতি সুচারুভাবে নির্মাণের কৌশল 'কাঠ কামলা'দের জানা ছিল, কাঠ জোড়া দেবার কৌশলও।

বর গুরু বঅচন কুঠারে ছিছঅ

—সদগুরু বচনের দ্বারা কুঠারে তাকে ছেদন কর।

কুঠার তৈরি করে কর্মকার, লোহা পিটিয়ে ধারাল করে কাঠ ছেদন উপযোগী করা হয়। এই কুঠার কথা থেকে কাঠ লৌহজাত অস্ত্রাদির কথা আসছে, গৃহস্থালির সামগ্রী ছাড়াও তারা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করত। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে লৌহ পাওয়া যেত, তা থেকে লৌহকে অস্ত্রাদি উপযোগী করার কৌশলও জানা ছিল। কুঠার মানবসভ্যতার আদিম অস্ত্র, পাথরের কুঠার থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কুঠার ব্যবহার হয়ে আসছে, তীর ধনুক অস্ত্র এখন খেলনা হয়ে গেলেও কুঠার কখনও খেলনা হবে না।

চর্যাপদ স্বয়ং গীত সংগীত, নৃত্যবাদ্য ধ্বনির সহযোগে গায়, রাগ-রাগিণীর উল্লেখ এর শুরুতেই। যারা এই গান গাইত তাদের পেশা হয়তো তাই নয়, এটা ছিল সাধন সংগীত, কিন্তু চর্যাকাররা সমাজের এমন পেশার ইংগিত দিয়েছেন যারা নাচগান কিংবা অভিনয় করে জীবিকা রাখত, তাদের এক কথায় নটন বলা যায়, তাদের নাচের মুদ্রা, নাচের কলা কৌশল সম্বন্ধে জানা যায়।

এক সে পদ্মা চৌষষ্টি পাখড়ি

তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বপড়ি

—সে এমন এক পদ্মার চৌষষ্টি পাখড়ি রয়েছে, যার ওপর চড়ে ডোম্বী নাচছে।

তান্ত্রিক সংকেত চৌষষ্টি যদিও রচয়িতার উদ্দেশ্য, কিন্তু নাচের মুদ্রার চৌষষ্টি ভঙ্গির কথা আমাদের মনে আসে, তাছাড়া যে মঞ্চে নাচ তাতে পদ্মদল কল্পনা যুক্ত।

এ তো গেল চর্যাকারকের বিভিন্ন পেশার লোকদের উল্লেখ, এই কাজের নিরিখে অবশ্য তাদের জীবন দৃশ্যও সম্যক উদ্ঘাটিত, প্রতিনিয়ত তাদের শ্রমের প্রেক্ষিতে ঘাম রক্ত ঝরে পড়ছে সে কথাও আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে না। শ্রম হল জীবন স্থাপনা এবং তার প্রগতির উপায়। যে কোনও সমাজকে বিচার করতে হলে সে সমাজের শ্রমের মান এবং তার সূক্ষ্ম কৌশলের চরিত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে। মাটি কাটার একটি শ্রমিকের সঙ্গে কম্পিউটার নির্মাণ শ্রমিকের মান এক হতে পারে না, কম্পিউটার নির্মাণও সব সমাজে সব দেশে হয় না। সাহিত্য সে ছবিটা তুলে রাখে, ছবিটা সুন্দর না হলে সাহিত্যও সুন্দর হয় না, অবলুপ্ত থাকে। চর্যাপদ স্বদেশ থেকে হারিয়ে গেলেও অবলুপ্ত হয়নি, এই যে এর সাহিত্যিক মান ও ছবি তোলায় কৌশল—অন্যান্য যেসব অঞ্চলের বা যে দৃশ্যের ছবি আছে এতে তা মানসমৃদ্ধ।

কোনও একটা সাহিত্যে সে অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার ছবি সংবিদিত থাকে, চর্যাপদও তার ব্যতিক্রম নয়। যে উদ্দেশ্যে চর্যাপদ লিখিত হয়ে থাক না কেন, তাতে জীবন চিত্র সম্যক প্রকাশিত দুঃখ যন্ত্রণা, ভোগ আসক্তির কথা যে ভাবে লেখা

থাক একটি তরঙ্গক্ষুর কিংবা ব্যথাবিধুর জীবন অবসন্নতার কথা আমাদের স্মরণে দিচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাল থেকে, যেমন—

আপনা মাসে হরিণা বৈরী—

তাই তো নিজেকে নিয়ে আমার বিপদ, নিজের জন্যই আমি জগতের শত্রু; কারও কাছে 'ঠাই নেই, কারো কাছে আত্মপ্রকাশ করা যাচ্ছে না, হৃদয় প্রকাশ করতে গেলে হৃদয়ে মারা পড়ছি। এই হরিণকে বাঁচাবার কে আছে? সকল স্তর থেকে নিষ্পেষণ—রাজা বা তার প্রতিনিধি, ধর্ম বা ব্রাহ্মণ, সমাজপতি বা কর্তব্যাক্তির চৌদ্দী সাব, বাজারে চালওয়ালা, মাছওয়ালা-তরকারিওয়ালা এমন কি রিক্সাওয়ালা খাবলে নিচ্ছে, অফিসে ঘুষ স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাতে গেলে সকলেই তো জাল ফেলে হরিণটাকে জবাই করতে চাচ্ছে। যতক্ষণ শরীরে মাংস আছে ওদের লোভের অন্ত নেই। চর্যাকাররা জীবন যন্ত্রণার এই চিরন্তন দৃশ্যটি তুলে দিতে ভুল করেন নি, যদিও তাঁরা সে দিনের নিরন্ন নিরাশ্রয় দুঃখময় জীবনকে বেশি করে বলছেন, কিন্তু এ দুঃখ কার নয়? এখনও কী তা নয়?

বেঙ্গ সংসার বড়ছিল জাঅ

—ব্যাঙের সংসার কেবল বেড়েই চলেছে।

আমি ব্যাঙ বটি, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাঙের মত লাফানো, এ লাফিয়ে কী পায়? অথচ ব্যাঙের বাচ্চা কেবল বাড়ছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়ছে, দুঃখ-দারিদ্র্য বাড়ছিল, হাঁড়িতে কিন্তু ভাত নেই। কান্না হাঁড়িতে ভাত আছে? এমন কোনও লোককে বলতে শুনলাম না, ভালো আছি বন্ধুত্ব। যে কোনও ব্যবসায়ী বলে না ব্যবসা ভালো যাচ্ছে, চাকুরিজীবী তার উর্ধ্বতন কর্তার ওপর ক্ষুব্ধ, স্ত্রীর যুদ্ধ স্বামীর ওপর, স্বামী সন্তুষ্ট স্ত্রীর যন্ত্রণায়, ছেলেমেয়ে জ্বালাচ্ছে আরও। চর্যাকার কী সাধে এ কথা বলেছেন, তিনি যে ছবি তুলেছেন, ছবিটার ঠিক সে সময়ের জন্য হলে নিমেষে নিঃশেষ হতো, কিন্তু এ তো চিরন্তন।

বলদ বিআঅল গাবিআ বাঁঝে

—বলদ বিয়ায় গাই বন্ধা।

সমাজে এখনও কেবল বলদরা বিয়াচ্ছে; উপকে প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে; দেশের অধিপতি হচ্ছে। এড়িয়ে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হলে চাকুরি মিলছে না, গুণীজ্ঞানী হলেও সফলকাম হচ্ছে না। দাস্তাবাজ কালোবাজারী সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সৎ লোকের স্থান কোথাও নেই। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন চর্যাকাররা কেবল সেদিনের ছবি আঁকেন নি, তারা তাই বলেছিলেন, 'জো সো বুধী সো নিবুধী'—যে তা বোঝে সেই আসলে নির্বোধ। ভোটের দিন শতকরা নিরানব্বই ভাগ ভোট দেওয়া হয়েছে বলা হয়, আর সেটা কেউ যদি বোঝে অবশ্যই নির্বোধের মত ঘরে গিয়ে সিটকিনি আটকে লুকিয়ে থাকতে হবে—কাউকে বলা যাবে না। শেষ পর্যন্ত সেদিনের গৃহবধূর মত বলতে হবে,

হাঁউ নিরাসী খমন সাই

—আমি আশাহীন কারণ স্বামী আমার রূপণক (শ্রমণ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিনি আমাকে চালাবেন তিনি তো ঠকাচ্ছেন বা ঠকছেন কেবল, তাই কী আশা আছে আমার? কারণ যিনি স্বামী তিনি অন্যের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে জানেন না কিছুই। এক লোক এক গণকে বলল, তুমি কি অপরের ভাগ্যের কথা বলছ? তাড়াতাড়ি ঘরে যাও তোমার ভাগ্য কী হল দেখ (স্ত্রী পালিয়েছেন?) এই যে দুঃখ তার শেষ কোথায়? চর্যাকার বলেন,

দিবসই বহুতী কাগ ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ

—দিনের বেলায় কলা বধু কাকের ডাক শুনে ভয় পায় আর রাত হলে কাম ডাকলে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বের হতে যায়।

চর্যাকারের দুঃখ কলার মোচার মত ঘোমটা দিয়ে লজ্জাবতী বধু দিনের বেলায় অবনত, রাতে তার এত কামাবেগ কেন? বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার তিমিরাভিসার আমরা জানি; চর্যাকার কি রাধাকে লক্ষ্য করলেন? না, সে কথা নয়, জীবন দুঃখ তাঁর অন্যত্র; সংসারে বুজরুকদের তো অভাব নেই, লোকের সামনে বা লোক দেখানো কত ভালো তারা, কিন্তু রাতের বা অন্য কোনও সুযোগের আশ্রয়ে প্রবৃত্তিটা সেরে নেয়। অথবা তৎকালীন নারী জীবনে পাতিব্রত অত জরুরি ছিল না; এখন কি জরুরি? শিশু নিষ্পাপ হিসেবে জনগ্রহণ করে। কিন্তু যদি সে পিতৃমর্তির ভালোবাসার সৃষ্টি, তবে কয়টা শিশু এমন ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি?

বাংলাদেশ চিরকাল দস্যু আক্রান্ত জলদস্যু প্রাচীন যুগে বেশি ছিল, বর্তমানে যেখানে সেখানে; দস্যু লুটে নান্দ্যাদেশ, মাটির ওপরে যা আছে তা তো নিচ্ছেই, মাটির অভ্যন্তরের সম্পদ, এ দুঃখ নিষ্ঠুরতার কখনও যাবে না, সেদিন চর্যাকাররা দেখতে পেয়েছিলেন,

বাজণাব পাড়া পউআ খালে বাহিউ
বদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ ।।

—বজ্র নৌকা পাড়ি দিয়ে পদ্মা খালের পার হতে গেলাম, নির্দয় দস্যু দেশ লুট করে নিয়ে গেল।

এরপর ‘চউকোড়ি ভগ্নর মোর লইআ সোম’, জীবন্তে মইলেন নাহি বিশেষ’- চতুষ্কোণ ভগ্নর আমার নিঃশেষ হল, এখন আমি জীয়েন্তে মরা। এই ‘জীয়েন্তে মরা’ সত্যিই তো; নদীমাতৃক বাংলাদেশ; মা যে কোলে নিয়ে রয়েছে সে মাই যদি আমার প্রাণ লুট করে। তা হলে বেঁচে থেকেও মরা। জলদস্যুদের তৎকালীন অত্যাচার, বিশেষত মগ জলদস্যুর কথা জানা যায়। পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বোম্বটে হার্মাদ বা পর্তুগিজ জলদস্যুদের উৎপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা নদীপথে এসে গ্রাম আক্রমণ করে দল বেঁধে নারীপুরুষ বেঁধে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে বিক্রি করত। নদীপথে দস্যুবৃত্তি ছাড়া চোর ডাকাতির হাঙ্গামাও কম ছিল না,

—অর্ধেক রাতে চোরে কানের অলংকার নিয়ে গেল।

জৌ সৌ চৌর সৌই সাধী

—যে চোর সেই হল সাধু।

এ কথা রূপক হলেও মনে হয় চোর ধরা তখন সহজ ছিল না, অথচ চুরি করলেও তাকে শাস্তি দেওয়া কঠিন ছিল। কারণ যে শাস্তি বিধান করবে সে-ই তো চোর। যা বর্তমানে পুলিশ বা দারোগা সাহেব। তৎকালে তালাচাবি ব্যবহারের কথা দেখা যাচ্ছে,

সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল

—শাশুড়ির ঘরে তালাচাবি পড়ল।

পোয়াতি নারীদের সমস্যা জটিল ছিল, আঁতুড় ঘর নামক দুঃখ ঘরে তাদের সন্তান প্রসব করতে হত, কিন্তু এ পোয়াতির ভাগ্যে তাও নেই, অস্বাস্থ্যকর প্রসবের জন্য অনেক মা ও শিশুর মৃত্যু হত, এখানে তার ইংগিত,

ফিটলেসু গো মাএ অন্তউড়ি কাহি

—সন্তান প্রসব করলাম মা গো আঁতুড় ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

তাই সন্তানের নাড়ি খুঁজতে গিয়ে ‘নাড়ি বিআন্তে দেবু বায়ুড়া’—বায়ুশূন্য, অর্থাৎ সন্তান মরে আছে। এ সব দুঃখভোগের জীবন চর্যায় জীবিত ধরা পড়েছে। তাই বলে সুখ বোধ যে একেবারেই নেই তা নয়, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রতিচ্ছবিও চর্যায় রয়েছে কিন্তু তা সব দুঃখবোধের মত হৃদয়ে নথি বিঁধে দেওয়ার মত নয়। প্রতি চর্যায় জীবনের ছবি কোনও না কোনও রূপ আছে, নৌকা পারাপারের দৃশ্য,

গঙ্গা জউনা মারোঁ যে সহই নাই।

তাই বুড়িলী মাতঙ্গী যোইতস লীলে পার করেই॥

—গঙ্গা ও যমুনার মাঝখানে নৌকা বয়ে যায়, তাতে ডুবন্ত মাতঙ্গী খুব সহজে পার করে দেয়।

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উচ্ছলিআঁ।

কাহু ডোঙ্গী বিবাহে চলি আ।।

—দুন্দুভিতে জয় জয় ধ্বনি উচ্ছলিয়ে উঠল, কাহু ডোঙ্গীকে বিয়ে করতে চলল।

বিবাহ যাত্রার সেই চিত্র এখনও বদলায় নি।

মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিন সবরী গীবন্ত গন্ধরী মালী

—শবরী ময়ুর গুচ্ছ পরেছে। গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা—এ তো সহজ সরল একটি বালিকা। তার প্রতি প্রেম নিবেদন বা আসক্ত হওয়া যে কারও পক্ষে স্বাভাবিক।

রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং বোড়ে ঝাই

—রজ্জুসর্প দেখে যে ভয় পায় তাকে কি সত্যি বোড়ে সাপে কামড়ায়?

দুধ মারোঁ লড় চ্ছন্তে ণ দেখই

—দুধের মাঝে সর আছে তা দেখতে পাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব স্বাভাবিক বোধ ও জীবন আরোপ চর্যাগীতের সৌন্দর্যকে অমূল্য করেছে। বাঙালি জীবনে আর যেসব সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র চরিত্র রয়েছে সে সবও অতি ঘনিষ্ঠ যেমন,

মারিঅ শাসু গনন্দ ঘরে শালী।

মাআ মারিআ কাহু ভইল কবালি॥

—শাশুড়ি ননদ শালিকে মেরে মাকে হত্যা করে কাহু কাপালিক হল।

শ্রাশানচারী নারী ঘাতক কাপালিকের পক্ষে এমন দুষ্কর্ম করা খুব কঠিন ছিল না। বিয়েতে যৌতুক প্রথা তখনও ছিল—

জউতুকে কিঅ আনুতু ধাম

—যৌতুক নির্দিষ্ট করা হল অনুত্তর ধাম।

এ কথা মনে হয় যৌতুকের জন্য কন্যাপক্ষকে খুব জোর জবরদস্তি করা হত, যা আজকালকার অবস্থা, সমাজ মোটেই বদলায় নি।

মৃতকে দাহ করার ছবি এখনকার প্রায় অনুরূপ—

চারিবাসে গড়িল রে দিআ চঞ্চালী।

তহি তোলি শবরো ডাহ কএনা কান্দই সন্তণ শিআনী॥

মারিল ভবসন্তা রে দহ দিহে দিখলি মলী।

—চার বাঁশের ভাটি দিয়ে (শবের খাটিয়া) গড়া হল, চৈঁচারিও দেওয়া হল, তাতে শবরের শব তুলে দাহ করা হল, কাঁদিল শবরী শিয়ালি। যে শবর সংসার মত্ত করেছে সে মরে গেল, দশ দিকে শ্রাদ্ধপিণ্ড দেওয়া হল।

মদ্যপান খুব স্বাভাবিক ছিল, শুড়িনির গৃহে গিয়ে লোকে মদ খেত, দাবা খেলার প্রচলন ছিল, নৃত্যগীত ও নাটকের অনুষ্ঠানে বিনোদনের চিত্রও দেখা গেছে। গৃহপালিত পশুর ভেতর গরু ও তার দুধ দোহনের চিত্র আছে, যদিও কচ্ছপ দুয়ে ভাঁড়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না বলা হচ্ছে, বলদ কথাটা খুব প্রাচীন মনে হয়। সেকালেও চাষ করার জন্য বলদের ব্যবহার ছিল আর বলদ হল অণুকোষ ছিন্ন ষাঁড়। ষাঁড় খুব দুরন্ত, বলদ হল শান্ত। ঘোড়া, ছাগল, কুকুরকে পালনের রেওয়াজও থাকতে পারে, অথবা ঘোড়া নাও থাকতে পারে কারণ অশ্বারোহণ ও স্থলপথে অশ্বচালনার সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না, তবে গজের উল্লেখ দেখা যায়

জিম জিম করিয়া করিনিরে রিসঅ।

তিন তিন তথতা মঅগল বরিসঅ।।

—যেমনি তেমনি হস্তী হস্তিনীকে আসক্ত অবস্থায় কেলি করে, যেমনি তেমনি মদকল তথতা বর্ষণ করে।

একাধিক স্থানে ছিনালি নারীর উল্লেখ রয়েছে। তাতে মনে হয় দাম্পত্য জীবনে এটাই বড় দুঃসহ ব্যাপার। মাদুরের ব্যবহারের কথা আছে। ‘অনহা বেমকট বয়ণ’—অনাহত মাদুর তাঁতে বোনা: কর্দমাক্ত পথের বর্ণনা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহল বাট দুই আর গ দিশঅ’—কর্দমাক্ত রাস্তা তার দুধার কিছুই দেওয়া যায় না।
পান খাওয়ার রেওয়াজও ছিল—

হিঅ তাঁ বোলা মহাসুখে কাপুর খাই

—হৃদয়-তাম্বুল মহাসুখে কাপুর খেল।

বাংলা অঞ্চলে পানের ভেতর কর্পূর দেওয়া ইংগিতবহ, কাউকে প্রেম প্রস্তাব প্রেরণ করা, বড় চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রাধাকে বড়ায়ি মারফত কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল প্রেরণ করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত কনের কাছে বিয়ের সম্মতির জন্য পান-পাঠানো হয়ে থাকে।

গৃহস্থালির ব্যবহৃত আসবাবপত্র এবং অন্যান্য তৈজসপত্রের উল্লেখ করেছে, আয়নার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে

‘হাথে রে কান্ধন মা লাউ দাপন’—হাতে কান্ধন আর দর্পণ নিও না।

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে, তার ভেতর পটহ, মাদল, করণ্ড, কাঁশি, ডমরু, বীণা, লাউ (একতারা) ইত্যাদি।

অলংকার হিসেবে সোনা রূপার ব্যবহার ছিল, তবে গরিবদের পক্ষে গুজ্জামুলের মালাই যথেষ্ট। কানেট বা কানের অলংকার, কান্ধন, মজিহার, নূপুর, কুণ্ডল-এর উল্লেখ দেখা যায়।

বাসনপত্রের ভেতর পিঠা বা দুধ দোহনের ভাঁড়, ঘড়ুলি, ঘড়া, হাঁড়ির উল্লেখ আছে।

সামাজিক জীবনে পুরুষের একচ্ছত্র স্বতন্ত্রতা নারীর ওপর ছিল না, অন্তত নিম্ন শ্রেণীর নারীরা স্বৈরিণী ছিল, তারা মদ বিক্রি করত, ছিনালি, ডোম্বীরা একাকি লোকালয়ের বাইরে বাস করত। দাম্পত্য জীবন অনেকাংশে এর জন্য দংশিত হত না তা বলা যাচ্ছে না। তবে সাধারণ নারীরা উপেক্ষিত ছিল, ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে তাদের বন্দী করা হত হয় তো। নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে চর্যাকার ‘নিরামণি’ বললেও ‘বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ গ মেলঙ্গ’—জ্ঞানীরা তোমাকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না, কথাটা রূপক হলেও বিদুষী নারীর প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। প্রসবকালীন অবহেলা যৌতুকের বলি ইত্যাদি থেকে নারীর সাধারণ পরিচয় সম্মানজনক ছিল না। এজন্য ধর্মীয় কারণও যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে খুব অবহেলিত করা হয়েছে, তাদের মার বলা হয়েছে, নারী সকল অনিষ্টের মূল। চর্যায় যানবাহন হিসেবে নৌকার বার বার উল্লেখ, বিভিন্ন রূপকে নৌকা এসেছে, নদীর প্রসঙ্গ এসেছে, নৌকার বৈঠা, গলুই, সিঁউতি ইত্যাদি, খেয়া পারাপারের দৃশ্য, কড়ি দিয়ে মাসুল আদায় ‘কবড়ি গ লেই বুড়ি গ লেই’—কড়িও নেয় না, বড়িও নেয় না। চলাচলের জন্য খালের ওপর সাঁকো তৈরি করা হত,

ধামার্থে চাটিল সাক্ষম গড়ই।

পারগামী লোঅ নিভর তরই।।

—পারগামী লোক যাতে নির্ভয়ে পারাপার করতে পারে চাটিল সে উদ্দেশ্যে সাঁকো মজবুত করে তৈরি করে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুগভীর জীবনদর্শন ও চেতনা আলোতে সিদ্ধাচার্যরা এ কুসুমগুলো ফুটিয়েছেন, একদিনে এ সবগুলো চর্যা রচিত হয়নি, দীর্ঘদিনের সাধনা ও প্রবহমান চিন্তাধারায় এগুলো ভেসে এসেছে। যদিও তাঁরা পলায়নি, জীবনের রজ্জু ধরে ছিলেন তবু ব্যক্তি জীবন এবং সামাজিক দায়িত্ব থেকে একেবারে নিরাসক্ত ছিলেন না; বরং দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে গেছেন। তবু এ কথা মনে রাখতে হবে তারা ধর্মীয় কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করার জন্য যতটা নিষ্ঠা ছিলেন ততটাই তারা আর আমরা যা চাইছি সেটা আমাদের উপরি পাওনা, কারণ তাঁরা তো আমাদের এ জীবন আর অপর জীবনের সাক্ষ্য মজবুত করতে এ চর্যা সৃষ্টি করেছেন। বরং তা থেকে কতটা ধর্মসিদ্ধ উপায় আমাদের হস্তগত হল সেটাই আসল কথা নয়, আসল সমাজ চরিত্র কতটা পাওয়া গেল সেটা।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তাদের জীবনের তিন শ বছর একই গতিপথে মানব জীবন চালিত, একই স্থির চিত্রে নিবদ্ধ তাদের মনন ও চিন্তা, তাহলে সমাজ অগ্রগতি কিছুই হল না এ সময়টা ধরে? চর্যা ভাষা ও শব্দের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ লিপিকর এবং রসাস্বাদকদের আগ্রহে তা না হয় একাকার হয়ে গেছে, কিন্তু জীবন অনুভূতি তো একাকার হয়ে যেতে পারে না। যে রাধা কৃষ্ণ বড় চণ্ডীদাসের যুগে ছিল তাঁরা তো দ্বিজ চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের চোখে আলাদা। যে লুই পাকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে পদ রচনা করতে দেখছি অথচ শান্তি পা সে একই মননের ডোম্বীর চরিত্র নির্মাণ করেন ১০৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। তিনশত বছরের ধারাবাহিক জীবন কাম্য আলাদা।

চর্যাপদের আধ্যাত্মিকতা ও লোকাযত চরিত্র

চর্যাপদ ষোল আনা বৌদ্ধতাত্ত্বিক বজ্রযানি সহজিয়াদের সাধনমার্গীয় সংগীত এবং মন্ত্র। মন্ত্রের কথা সাধারণ লোকের বোঝার কথা নয়, তাই বলে মন্ত্রের শব্দের কোনও অর্থ নেই কিন্তু সাধক বা সাধন পন্থী ছাড়া অন্য কেউ এর অর্থ ভেদ করতে পারবে না সে কথা ঠিক নয়। তবে মন্ত্রের ধ্বনি ও শব্দ প্রতীকধর্মী, রূপক এবং ইংগিত সর্বস্ব। বৌদ্ধগান চর্যাপদ ঠিক তাই। কিন্তু মন্ত্র হোক তন্ত্র হোক, ভগবানের বাণী বলে যত রকম আগুবাণ্য হোক সবই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের জীবন অনুভূতি ও উপলব্ধির বাইরে কিছু নয়। তাই চর্যার মানবিকতা অস্বীকার করা যাবে না। যদিও 'চর্যাকাররা এ মন্ত্র সৃষ্টি' করেছিলেন নিজেদের ধর্মদায় মোচন বা নির্বাণ নিশ্চিত করার জন্য, তবু এ মন্ত্র দিয়ে ধর্মবিমুখ জনসাধারণকে কোনও একটা অদৃশ্য বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আকর্ষণ করে নিজেদের বশে রাখার একটা উপায় মনে করেছিলেন। মানুষ তৎকালে ক্রমশ বৌদ্ধ থেকে হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল কিংবা অন্য ধর্ম যেমন—নাথ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদিতে সরে যাচ্ছিল। এই জনমানস যেন—এ রজ্জুতে বাঁধা পড়ে তারই মত সাধনা চর্যাপদ।

বস্তুতাত্ত্বিক চিন্তায় যে কোনও ধর্মবিশ্বাস ছিল বুজরুকি অর্থাৎ মূর্খ বা অবুঝ লোকদের ভুলিয়ে স্বীয় মতে আবদ্ধ রেখে স্বার্থ উদ্ধার করার উপায়। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কোনও ধর্ম প্রচার করেন নি। বৌদ্ধ ধর্ম হল একটা দর্শন; কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা ক্রমশ এতে ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করেছেন, আধ্যাত্মিকতা বা বুজরুকি জুড়ে দিয়েছেন। শেষপ্রান্ত ব্রাহ্মণ্য প্রতারণাধর্মী ধর্মের অনুরূপ এই সিদ্ধাচার্যদের ধর্ম দর্শন ও আচরণ প্রতিপন্ন হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়া থাকলেও বাস্তবতার সমিধ এ গানে, সুরে এবং অনুভূতিতে বিরাজ করছে, তাছাড়া এর উপমা ও রূপক জনজীবনের নির্যাস থেকে আহরণ করা হয়েছে। চর্চার প্রতিটি শব্দ, রূপকল্প, বিষয়অনুভূতি অতিশয় দুর্বোধ্য; দুরূহ উপলব্ধি যা তাদের নির্বাণ লাভ এবং গৃহ ভেবে তাতে বসবাস করা চলে। তাঁরা প্রত্যক্ষের চাইতে অপ্রত্যক্ষকে লক্ষ্য করেছেন আর এজন্য তাঁদের সমস্ত জীবনাবেগ ও মেধার স্কুরণ ঘটানো, লোক জীবনের বাইরের অলৌকিক বিষয় বিপত্তিকে আঁধার আলোর লীলাখেলায় প্রমত্ত করিয়েছেন। তবে ভাব চেতনার মগ্ন রূপ অরূপে, উপমা রূপকে সে কথার ইঙ্গিত বহন করে। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন সিদ্ধাচার্যগণ নিম্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কিংবা উচ্চবর্ণের জীবন যাপনের ওপর আঘাত দিয়ে এ পদ রচনা করেন। এ কথা মোটেই সত্য নয়, তাঁরা ডোঙ্গী কিংবা শবর ইত্যাদিকে রূপক হিসেবে নিয়েছেন, বাস্তবিকপক্ষে সিদ্ধাচার্যরা ছিল সম্পূর্ণ সমাজ প্রতিভূ

অথবা তাই প্রত্যাশিত, তাঁরা শ্রমণ বা থেরো-মহাথেরো, জনগোষ্ঠী তাঁদের চরণে অবশ্য প্রণত ছিল। তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হয়তো অন্তর্জ শ্রেণী পর্য্যবসিত ছিল, তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখ চেয়ে চর্যাপদগুলো রচিত হয়ে থাকতে পারে। সে কারণে চর্যার ভাষা এবং ভাব অনেকটা প্রাকৃত জনের ব্যবহৃত ভাষা, তৎকালে স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল সংস্কৃত, কিন্তু চর্যাকারগণ সংস্কৃত ভাষায় এবং পালি ভাষায় মহাপণ্ডিত ও পারদর্শী হলেও এই লোকভাষায় চর্যা রচনা করার কারণও ধর্মীয় নির্দেশ। বুদ্ধ আদেশ করেছিলেন জনসাধারণের ভাষায় ধর্মোপদেশ দিতে কিংবা ধর্মকথা লিপিবদ্ধ করতে। বুদ্ধের সময়ের লোকভাষা ছিল পালি, তাই তিনি পালি ভাষাতে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পালি ভাষা অবশেষে দৃশ্যান্তরালে চলে যায় এবং কেবল বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষা হিসেবে টিকে থাকে। বুদ্ধের নির্দেশ স্বরণে রেখে চর্যাকাররা নিজেদের লোক জীবনের ভাষা বাংলায় মতান্তরে হিন্দি বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ‘প্রাকৃত’ ভাষায় এ চর্যা রচনা করেন। অবশ্য চর্যার খাঁটি ভাষারূপ অর্থাৎ চর্যাকারদের সমকালীন ভাষারূপ, তা পড়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। তবে তাঁরা সংস্কৃত ভাষার গভী এবং শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন সে কথাও সত্য। সংস্কৃত কবিতার রূপ, ভাষাবিন্যাস, ছন্দ সবকিছু ভেঙে দিয়েছেন এবং একটা জীবন্ত ভাষার জীবন্তরূপ তাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে যুগের এ অঞ্চলের মন মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষার মনন অভিব্যক্তি বা প্রাণ শক্তির আশ্চর্য রূপ পাওয়া গেল। সাধারণত বুদ্ধের ভাষা হয়ে থাকে ধর্মীয় ভাষা, অথচ এ মন্ত্রের ভাষা তা নয়, লোকবিশ্বাসের একটা স্বাধীন ভাষা রূপকের মাধ্যমে ব্যবহৃত। লোকজীবনের ইন্দ্রিয়আসক্তি ভোগবাসনকে পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ সহজসাধ্য হয়েছে।

প্রত্যেকটি পদ বা গান কতটা ধর্মীয় আচরণ ও অনুধাবনের প্রক্রিয়া লব্ধ আধ্যাত্মিক ভাব রস মিশ্রিত, অলৌকিক প্রেরণা সম্ভব অথচ বস্তুজগৎ থেকে তার উৎস প্রতীক আহৃত। যেমন তরু, তাকে প্রতীক করে চর্যাকারের মোক্ষ উদ্দেশ্যও শেষ পর্যন্ত তরু কিন্তু তার মাঝে বক্তব্যটা আধ্যাত্মিক পোশাকে ঢাকা,

কাঅ তরু বর পঞ্চ বি ডাল ।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ।
দঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই ।
সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই॥
এড়ি অই ছান্দ বান্ধ করণ কপটের আস ।
সুণ পাখ ভিড়ি লেছ রে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝানে দীঠা ।
ধমন চমন বেনি পিন্তী বইঠা॥

অর্থ, কায়া তরুর পাঁচটি ডাল, চঞ্চল চিঙে কাল প্রবেশ করেছে। দঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর, লুই বলছেন, (সে জন্য), গুরু যে জিজ্ঞাস করে জেনে নাও। সকল সমাধি কীভাবে করবে, সুখ দংশ নিশ্চিত করে মর। ছন্দ বন্ধনের দ্বারের আশা এড়িয়ে যাও, শূন্য দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখা উড়িয়ে (চেপে) পাশে (তাকে) ধর। লুই বলছেন, আমি ধ্যান থেকে দেখছি ধমন চমন দুই পিঁড়িতে বসে।

এখানে তরুটা প্রতীক, মানুষের দেহ, তার পাঁচটা ডাল, তার ভেতরে চিত্ত। এই তরু ও চিত্ত নিয়ে সমস্যা চিত্ত চঞ্চল হয়, বৌদ্ধমতে অগ্রমস্ত চিত্ত চাই, সকল কামনা বাসনার অতীত স্থির চিত্ত; (যিনি এমন স্থির চিত্তের অধিকারী তিনি হলেন স্থবির<থেরো), দুঃখ যন্ত্রণা মুক্ত শূন্য পাখায় উড়ে যেতে হবে, তারপর এ তরুকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে যেন এ তরু আর না গজায়। (শেষে নির্বাণ)।

অতি সহজ রূপক-ধর্মোপদেশের লম্বা ব্যাখ্যান, ছেড়ে চোখের সামনের একটা গাছ দেখে তার দু হাত দুপা ও মাথা—এ পাঁচ শাখা, বাকল পরিচ্ছদ, পত্রপল্লব ফুল ফল-আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ তৃষ্ণা এবং বংশবিস্তার—এর সবকিছু ছেদন করতে হবে, তা না হলে মরে গেলে তবু গজাতে দুঃখ কষ্টের জীবনে আবার ফিরে আসবে। ফিরে না আসার একমাত্র উপায় হল এ বৃক্ষ সমূলে ছেদন। তাহলেই নির্বাণ। সেটাই মহাসুখ।

তাহলে এখানে আধ্যাত্মিকতা বোধ কী? নিজকে তরু প্রমাণ করা—তরুর মত নির্জীব হয়ে যাওয়া। তরুকে ছেদন করলে মহাসুখ অনুভূতি লাভ করা। ধর্মবোধ হয়—আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল, নির্বাণ লাভ। সেভাবে চর্যাকারের আঁটি, আকাশ, ফুল, নদী, গঙ্গা, যমুনা, নৌকা, নদীর স্রোত, হরিণ-হরিণা, ডোম্বী কুমার, সোনারূপা এমনকি ব্রাহ্মণ শবর কাপালিক সবাইকে রূপকার্থে আধ্যাত্মিক ভাববৃত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

আরেকটি চর্যায় আধ্যাত্মিকতাকে নিষ্পেষিত যেন যেখানে সেখানে যে রূপকের ব্যবহার তা সাধারণ জীবনে ব্যবহৃত নয় কিন্তু জৈব ধরন ঠিক অনুরূপ, যেমন—

দুলি দুহি পিঠা ধর খাই।

রুখের তেঁতুলি কুমিরে খাই।।

অর্থ, কচ্ছপ দুইয়ে দুধ পাত্রে ধরা খাচ্ছে না, গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়।

এই চর্যার শব্দের স্বাভাবিক অর্থ কিছু নেই, কারণ কখনও কচ্ছপ দোহন করা যায় না আর কুমিরে তেঁতুল খায় না। এক সময় যদি বলত মানুষ আকাশে ওড়ে, চাঁদে হাঁটে তবে সেটা যেমন এটিও তেমন। কিন্তু মানুষের আকাশে ওড়া এখন স্বাভাবিক এবং চাঁদে হাঁটাও। কিন্তু কচ্ছপ দোহাটা কিংবা সে দুধ পাত্রে রাখা সেভাবে নয়। একশ রকমে এ কথায় অর্থ বের করা যায়, কচ্ছপের কঠিন খোলসের ভেতর ওর শরীর—এ শরীর হচ্ছে চর্যাকারের লক্ষ্য, একটু আগে শরীরকে তরুতে লক্ষ্য করা হয়েছে। কচ্ছপের খোলস তাকে নিরাপদে রাখে। ওখান থেকে মুক্ত করতে হবে। কচ্ছপের খোলস তাকে কত যত্নে বাঁচাচ্ছে, এ যত্নে বাঁচানো হচ্ছে দুধ (শিশুকে দুধের যত্নে বাঁচায়) আর পিঠা মানে শিশু বা দেহ। দেহতত্ত্ব এখানে তাই জানতে হবে, দেহের ভেতর কী আছে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ইত্যাদি নাড়ি নক্ষত্র কিংবা ৩৬ প্রকারের পীঠ অবস্থান; আবার তেঁতুলের বাঁকা ফল—বোধিচিহ্ন রূপ। বোধি তো সহজে অর্জন করা যায় না আর তেঁতুল সহজ খাদ্য নয়; যে পেড়ে খেতে পারে না তার জন্য টক (আঙ্গুর ফল টক) আর কুমির রূপ শূন্যতা (নির্বাণ) সব খেয়ে নিচ্ছে। এখানে সবটাই অলৌকিক বা আধ্যাত্মিকতা। মুখের ফুঁ দিয়ে একটা গাছ পুড়ে ফেলা কিংবা তাবিজ গলায় পরে গাড়ির তলে পড়েও অক্ষত থাকা (সমস্ত রকম দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভীষ্ট সাধন) যেমন এটা ঠিক তেমনি। তা হলে এর লৌকিক রূপটি অস্বীকার করা যাচ্ছে না, গাই দোয়া এবং গাছের ফল খাওয়া এবং কুমিরের আক্রমণ—এ সব স্বাভাবিক। কুমির সবটা গিলে খেতে দেরি করে না, বাংলাদেশে তৎকালে কুমিরের খুব উৎপাত ছিল। আবার ভিন্ন অর্থে ধরা যাক, কচ্ছপের মত যারা গুটিয়ে থাকে, শরীর বা সম্পত্তি দেখায় না, কাউকে কিছু দেয় না; যে ব্যক্তি হঠাৎ করে এমন বিলোতে লাগলো যে কেউ গ্রহণ করে কুলোতে পাচ্ছে না। লৌকিক অর্থে বাঙালি অতি প্রাচীনকাল থেকে কারও কাছ থেকে কিছু আদায় করাকে দুধ দোহনের সাথে উপমা দিয়ে আসছে। ‘এখন বৃদ্ধ বয়সে দুয়ে তার কাছ থেকে কিছু পাবে মনে হয় না’। তাই চর্যাকাররা শুধু যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তা নয়, সে মন্ত্রের ভেতর লোক চেতনা জুড়ে দিয়েছেন।

চর্যাকারগণ ধর্মের বিধান মতে রিপু বা ইন্দ্রিয়ের অবলুপ্তি সাধনের কথা বলেছেন, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মোহ বিলাস থেকে জন্ম নেয় জীবন অগ্রহ, এটা দূর করে চঞ্চল চিত্ত থেকে, দৃঢ় স্থিরচিত্ত অবশেষে নির্বাণ লাভ করে মহাসুখে পর্যবসিত হবে। কিন্তু চর্যাকারগণের যে সমস্যা তা হচ্ছে দেহ ও মন। দেহ ও মন সতেজ থাকলেই ইন্দ্রিয় আসক্তি ও অন্যান্য মার রূপ মোহ চারদিকে ক্রিয়াপাত করে। এ সতেজতা এবং ইন্দ্রিয় ‘মার’ কে এড়াতে হবে, লুই বলছেন,

ভাব ন হোই অভাব ন জাই

আইস সংবোধে কোপতি আই

অর্থাৎ, ভাব হয় না, অভাব যায় না; এমন সংবোধ (সজীব জীবনধারণ) কে কে বিশ্বাস করে? আর এই অবস্থাকে এড়াতে হবে

এড়ি এউ ছান্দক বন্ধ করণ কপাটের আশ

শুধু পাখ ভিড়ি লাহ রে পাস

অর্থাৎ, ছন্দের (জীবন ছন্দ-কামনা বাসনা) বন্ধন ও করণ (ইন্দ্রিয়) পারিপাট্যের আশা ত্যাগ কর। শূন্য পাখা নিজের পাশে চেপে ধর।

জীবনে ইন্দ্রিয়ের পরিচর্যার মাধ্যমে আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করা যাবে না, জীবনের সার্থকতা চরিতার্থ কখনও হবে না।

তাহলে নিরুদ্যম ইন্দ্রিয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রমিথিউসের মত পাহাড়ে বেঁধে রাখলে একদিন তার চিত্ত রক্ত পথে বিদ্রোহ অনল প্রকাশিত হয়, অথবা তাকে অপরিসীম ব্যথা-বেদনার সংকুচিত গতিপথে মুক্ত হবার উপায় করতে হয়। চর্যাকারগণ হয়তো সে জন্য সচেতন ছিলেন না, আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করতে গিয়ে ইন্দ্রিয় বেদনার রূপকে ডোষীর সঙ্গে আলিঙ্গন চুষন মিলন কিংবা সম্মোগ প্রেরণা উদ্ভূত আচরণকে উসকিয়ে দিয়েছেন, ডোষী বা করুণা নির্বাণরূপ প্রেয়সী নারীর আধ্যাত্মিক রূপক হলেও মানবিক আকর্ষণ তাতে কম পড়েনি। তাই অবরুদ্ধ চেতনা এই গোপন পথে বের করে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। তুলনায় বলা যায়, মুসলমানদের জন্য সংগীত নিষিদ্ধ, কিন্তু আযানের স্বরে বা সুরে, মিলাদের সমন্বরে হৃদয়ের সেই অবরুদ্ধ অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাই দেহ ও মনের দাবি না মিটিয়ে ধর্ম সাধনা যথার্থ সার্থকতা পায় না বলে হিন্দু ধর্মের এক আদেশে ধর্মার্থকামমোক্ষ-এর কথা উল্লেখ আছে, মোক্ষ লাভ করতে ধর্ম, অর্থ ও দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কাম অতিক্রম করে আসতে হবে। পিপাসার্ত চিন্তা কখনও সিদ্ধি পায় না। বৌদ্ধ ধর্মে এ নিদারুণ সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই রত্নপথে তা প্রকাশিত হতে গিয়ে মহাযানীদের প্রশ্নে সহজ ধর্মাচারের রূপ ধরে কামাচার পর্যন্ত তাত্ত্বিকদের জন্য ধর্মাচারের বিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর এই ভোগতৃষ্ণার রূপকে রূপকাশিত আধ্যাত্মিকতার রং ঝাল লেপন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে লোক অনুভূতি টানার প্রয়াস বলে মনে করা যেতে পারে। সেজন্য তাদের এই তথাকথিত আধ্যাত্মিক বোধে জীবন চেতনা সদাজাগ্রত, সুখ দুঃখ আনন্দ সবই কাম্যবস্তু, ইন্দ্রিয় অনুভূতি সেও সহজ গ্রাহ্য, অর্থাৎ চাওয়া পাওয়ার কোনও রকমফেরও স্পর্শাভীত নয়। তবে সিদ্ধাচার্যদের সাধনা কিন্তু তা নয়, এই দৈন্য ও কলুষতাকে ছিন্ন করে পূর্ণতা, লক্ষ্য যা কিছু মহাসুখ আনন্দের শূন্যতা লাভ করতে হবে।

নির্বাণ লাভের সুখ পরিকল্পনার যে পরিবেশ, আনন্দের পূর্ণতা তাকে ডোষী না শবর শবরী মিথুনজনিত অবস্থান বোধ-যা বাস্তব জীবনের ইন্দ্রিয় পরিকর আনন্দন পিপাসু মনের অভিব্যক্তি মাত্র, কিন্তু জগতের আর কোনও বিধান বা সমস্যার নিরিখে তাকে বিচার না করে তাঁরা শুধু একদিকে ধাবিত ছিলেন, তবু বেহুলার নাচের সময় যেমন সারা বাংলার ফুল পাখি নদী আশ্বিনের মাঠ তার নৃপতির সঙ্গে বেজেছিল, এও ঠিক তেমনি। আশ্চর্য্য নিবিড় এক ভাব জগত, অনাবিল আনন্দ শূন্যতা বটে কিন্তু ভোগতৃষ্ণা সম্পদ নিয়ে আসা সে মনোজগৎ। অথচ বলা হচ্ছে এ মন এবং তাকে ধারণ করা দেহকে মুক্ত রাখতে হবে—এই যে দেহ দেওয়া হল আর যা যা আছে তাদের দেহ থেকে দেহকে দূরে রেখে দিতে হবে। তাহলে প্রকৃত মুক্তি দুঃখ থেকে মুক্তি, জরা থেকে মুক্তি, জীবনের আর যা যা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। তাই মুক্তি কিংবা মুক্তিপথের ভাব পরিকল্পনা সবটাই লৌকিক আচরণ পেয়ে গেছে, অতীতে যেটুকু আধ্যাত্মিকতা তা চুপসে গেছে। আর এটা সত্যিই যে সুশীল সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে, দুঃখ বেদনা অভিজ্ঞতা কাটিয়ে পবিত্র মানস লোকের চৈতন্য নির্মাণের জন্য তাদের মন কেঁদে উঠেছিল, বিরুদ্ধ স্রোতের কলুষ পথে সমাজ ধাবিত দেখে তাঁরা এটা করেছিলেন। আর এটাও স্বীকৃত যে মূর্ত পিপাসা সমসাময়িক কালেরই জনচেতনার পরিশীলিত রূপ, যেমন কলুষ হরণের প্রহরিরাত্তি সচেতন ছিলেন।

তবে সিদ্ধাচার্যরা যে নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতির উর্ধ্বে থেকে কেবল এ ভাব পরিমণ্ডল নির্বাণ করেছেন তাও নয়। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও এখানে যুক্ত করে দিতে পেরেছেন, অমূর্ত নির্বাণের ধারণাও তাঁদের সুস্পষ্ট ছিল, পৃথিবীর লৌকিক পরিবেশের চারপাশ থেকে তার দৃশ্যরূপ আহরণ করেছেন; কোনও কোনও সিদ্ধাচার্য একেবারে পৃথিবীর মাটিতে তার মূর্তি গড়ে চারদিকে নৃত্য করেছেন। মনে হয় সরহ পা আধ্যাত্মিক নির্বাণ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, তিনি নির্বাণ মনে করতেন নিজের দেহের ভেতর,

আপনে রচি রচি ভব নির্বাণ

মিছেঁ লোঅ বন্ধাব এ আপনা।

অর্থাৎ নিজের মনে ভব নির্বাণ রচনা করে মিথ্যাই লোক নিজেকে বাঁধে, যা অচিন্ত্য তাকে তো আমরা জানি না।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহ রে বন্ধ
নিঅড়ি বোহি মা জাহরে লাঙ্ঘ
হাতের কাকন মা লেউ দাপন।

অর্থাৎ, ঋজুপথ ছেড়ে বাঁকাপথ অনুসরণ করো না, বোধি (বা নির্বাণ) লাভ করার জন্য লঙ্ঘ্য যেতে হয় না। হাতের কাকন দেখার জন্য দর্পণের দরকার হয় না।

সরহের মত চাটিলপাও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী।
দুআস্তে চিখিল মাঝে ণ থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাক্ষম গাঢ়ই

... ..

সাক্ষমত চড়িলে দাহিল বাম যা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি মা দুর মা জাহী।

অর্থাৎ, ভবনদী গহণ এবং গম্ভীর, সবেগে তা প্রবাহিত হচ্ছে। দুই ধারে তার কাদা, মাঝখানে খেই পাওয়া যাচ্ছে না। ধর্ম সাধনার জন্য চাটিল তার ওপর একটা সাঁকো গড়ে দিয়েছে... সাঁকো চড়ে ডান দিক বাম দিক করো না। বোধি (নির্বাণ) তোমার নিকটে, দূরে যেতে হবে না।

চর্যাকারদের আত্মোপলব্ধি খুব প্রখর, কিন্তু কেউ মনে করেন তাঁরা উপনিষদাচারী, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন

য আত্মা অপহত পাপে বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকহ বিজিৎ
মোহ পিপাসা : সত্যকাম : সত্যসংকল্প : সোহম্বেষ্টব্য

অর্থাৎ, যে আত্মা আমার মধ্যে বিরাজ করছে, যে জরা মৃত্যু শোক ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যে সত্যকাম, তাকে অন্বেষণ করতে হবে।

তাহলে সিদ্ধাচার্যদের তত্ত্ব অনুভূতি ছিটকে এসেছে পরমাত্মার স্বরূপ থেকে, বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতির সঙ্গে যার সম্যক মিল পাওয়া যাচ্ছে না, বৌদ্ধ ধর্মে আত্মার বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু পরমাত্মা নেই, উপনিষদের আত্মা জরা মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিশাল সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু চর্যাপদের শূন্যতা সে সাগর নয়। তবে যে সিদ্ধাচার্যরা ব্যতিক্রমি আত্মদর্শন স্থাপন করতে চাইলেন, সেটাও লোকচেতনার অনুকূল। তবে ভিন্ন অভিমতে এ জীবনই নির্বাণ আর জীবনের যে পরিবেশ সংস্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর তলাশে আচ্ছন্ন ক্লীষ্ট তা দেহে অবস্থিত। এ দেহকেই তো সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, দেহস্থিত আত্মার নির্দেশে দেহ দুঃখ জরা মৃত্যুতে ক্লান্ত, তাহলে সে আত্মারও বিনাশ হবে। আত্মাকে বিশাল করতে হলে তাকে জয় করতে হবে। তাকে সাধনা করে জয় করতে হবে।

সিদ্ধাচার্যগণ এই আধ্যাত্মিকতার সঠিক রূপ দেয়ার জন্য দেহকে বিভিন্ন বস্তুর আঙ্গিকে ও রূপকে রেখেছেন, যেমন দেহকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করে ভবনদী পার, দেহকে তরুর সঙ্গে তুলনা করে সে তরুকে সমূলে ছেদন, দেহকে তুলো খুনো করা, দেহকে হরিণীর সঙ্গে তুলনা করে শিকার করা, দেহকে ভোগতৃষ্ণার আধার করে নৈরাশ্র্য

দেবীকে আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। চরম লক্ষ্যের এই যে গতিপথ তার পরিক্রমণ এবং পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা, আনন্দ আন্বাদনের কল্পনা সবই আধ্যাত্মিক আবার সবই দেহের সীমার মধ্যে। এমন কি যৌন সংযোগের যে বিধান ও তৃপ্তিটার কথাও অনেক পদে দেখা যাচ্ছে তাও তার বাইরে নয়; অনেকটা সুফীদের আশেক-মাশকের মিলনের মত। কিন্তু সুফীদের যৌন সংযোগের উল্লেখ নেই। আর যৌন সংযোগের ইঙ্গিত লোক আদর্শ ও লোকবিশ্বাসের অনুকূল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ও লিঙ্গতান্ত্রিক লোকাচারে জীবন দৃশ্য থেকে এ অনুভূতি নিয়েছেন।

অনেকে কৌতুক করে আবার সিদ্ধাচার্যদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন ব্যতিচার আসক্তি ও তাকে ধর্ম সিদ্ধ করে নেবার রত্নপথও তা বিবেচনা করেন; সে কথাও একেবারে খারিজ করা যাবে না, কারণ তাদের সহজযানি আচরণের ভেতর এই ফলশ্রুতি সমীকৃত। তা না হলে শ্রমণ জীবনের কৃষ্ণতা (ব্রহ্মচর্য) ধ্বংসী ইন্দ্রিয়ের বাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয় আসক্ত বস্তুর মোহশক্তি বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা আসতে পারে না। বরং তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে এমন সুউজ্জ্বল ইন্দ্রিয় সন্তোষ চিত্র এঁকে এঁকে বস্তুর মণ্ডলের আকর্ষণ বোধ ও ভাব জগতের একটা সমন্বয় সাধন করেছেন। এ জগৎ সম্বন্ধে তাই তাঁদের এক ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা জেগে উঠেছে।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ নিম্ন কর্মশ্রমের ব্যক্তির না হয়েও নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কেন, এখানে তার উত্তর নিহিত (অনেক সমালোচক মনে করেন চর্যাকাররা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত)। তবে তাঁরা যে সবাই উচ্চবর্ণের জন্মগত স্থানাভিষিক্ত এ ধারণাও করা যায় না; তবে তাঁরা বর্ণশ্রম বিরোধী অথবা উচ্চবর্ণের লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন এই অনুভূতি প্রতীয়মান হয়েছে তাঁদের ভাব ও ভাষায়। তাঁরা বর্ণশ্রম স্বীকার না করলেও উচ্চবর্ণের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রথায় বর্ণশ্রম সচল ও সজীব ছিল। তাই সিদ্ধাচার্যদের পক্ষে জনজীবনশাসিত বর্ণশ্রমকে তাদের সাধন সংগীতের ভাববস্তু করতে বাধ্য হতে হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সংঘাতও অনিবার্য হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রিক ও সমাজ শাসনের স্রোতে তাঁরা প্রতিপক্ষ এবং দুর্বল ক্ষমতা নিয়ে লড়াই করেছেন। সে প্রেক্ষিতে এ চর্যাপদ বাংলার সে যুগের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে, সমাজ জীবনের সর্বচেতনা, সম্ভবত গণতান্ত্রিক ধারাকে সম্মুখত রাখার সেটাই সুপ্রাচীন প্রয়াস মনে করা যেতে পারে। অবশ্য পাল রাজাদের গণতান্ত্রিক চেতনার কথা শোনা যায়, সে ক্ষেত্রে সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের পেছনের শক্তি রূপে ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে।

বজ্রকার সিদ্ধার্থরা এমন শব্দ ও রূপকল্প নির্মাণ করে জনমানুষের ওপর ছেড়েছেন যে এটা শুধু তাদের সীমাআকৃষ্ট রূপ নয়, তার প্রতিকল্প অথবা অভেদার্থক, যেমন—

এক যে শুভিনী দুই ঘরে সাক্ষ্য।

চীঅন বাকলঅ বাকলী বাক্সা॥

সহজে থির করি বাকলী বাক্স

জে অজরামর হোই দৃঢ় কাক্স॥

দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।

আইল গরাক আপনে বহিআ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ, এক শূঁড়িনি দুই ঘরে ঢোকে, সে চিকন বাকল দিয়ে মদ চোলাই করে। (হে শূঁড়িনি) সহজে স্থির করে মদ তৈরি কর যেন অজর অমর এবং দৃঢ় স্বক্ক হতে পারে। আর দমশি দুয়ারের চিহ্ন দেখে গ্রাহক যেন নিজে তোমার মদের লোভে চলে আসে।

এটা খুব সহজ এবং হয়তো বাঙালি সমাজের দৃশ্য, মদ প্রস্তুতকারিণীর মদ তৈরি ও বিক্রির কৌশল; কিন্তু সিদ্ধাচার্যরা এখান থেকে তা রূপকার্থে গ্রহণ করেন। এখানে আধ্যাত্মিক অর্থে শূঁড়িনি নির্বাণ, যে মদরূপ প্রেরণা বা নির্বাণ শক্তি যোগান দেয়। তত্ত্বটা দুর্লভ অথচ খুব সহজ। যেমন চর্যাকারদের ব্যবহৃত 'দুধ' শব্দ, কোথাও কচ্ছপ দুয়ে, 'কোথাও দুহিল দুধ কি বেস্টে সামায়'-দোয়া দুধ কি বাঁটে ফের ঢোকে? দুধ এখানে 'বোধি'-যা শূঁড়িনির 'মদ' আর যারা মদ পান করতে যায় তারা হল বোধিচিহ্ন। সচেতনমন থেকে বোধিচিহ্নের উদয় হয় সেটা একটি সূক্ষ্মনলের ভেতর দিয়ে যাবে, শূঁড়িনি মদ চোলাই করে। শূঁড়িনি দুই ঘরে থাকে মানে দুই নাড়িতে আর দশমি দয়ার হল মানব শরীরের রয়েছে নয়টি দ্বার, তার অতিরিক্ত আর একটি দুয়ার সেটি, আর চৌষটি পীঠের রূপক, চৌষটি 'পাখুড়ী' যে পাপড়ির ওপর এই নির্বাণ নাচে, তা হলে দশমি দুয়ারের চিহ্ন যুক্ত ঘরে যেখানে শূঁড়িনি মদ চোলাই ও বিক্রি করে।

গ্রাহক আসে আর চৌষটি ঘড়াতে ঢালা সর্ব নলের ভেতর থেকে মদ পান করে। মদের নেশা এমনই যে তা থেকে নিষ্কমণের কোণও উপায় নেই। অর্থাৎ নির্বাণ নিশ্চিত।

এমনি করে প্রত্যেকটি চর্যায় এই রূপক ও আধ্যাত্মিক চেতনা নীলা করছে। প্রত্যেক চর্যাকে আলাদা বিশ্লেষণ করাও যেতে পারে, কিন্তু সকল রূপক ও রূপাকান্বিত বস্তুর ব্যবধান যতই থাক লক্ষ্য কিন্তু একটাই, সেই ডোহী, শবরী, হরিণী, করুণা—এরা নির্বাণ বা নৈরাশ্বাদেবীর প্রতীক, ওকে খোঁজে হবে। এর জন্য দেহ তরু ছেদন, গুরু নির্দেশে নদীপার, সোনারূপা পার্শ্ব পদ মোচন করে—ঘুরে ফিরে সেই একই দৃশ্য। বৈচিত্র্যহীনতার ভেতর বৈচিত্র্য রূপকের ওপর রূপক; শব্দের, ভাষার এবং ভাবের অবিমিশ্রিত কলা কৌশলতার পরিচয় অস্বীকার করা যায় না। সে কারণে লৌকিক ভাষায় লিখিত হয়েও চর্যাপদ অলৌকিক বাণীর চাইতে পারঙ্গম স্নেহ স্বরূপা উপাদানে ভূষিত। সিদ্ধাচার্যরা সহজযানি হয়েও দুর্লভ ও দুষ্কর বুদ্ধি ও বিষয় অবলম্বন করেছেন, তবে লৌকিক জীবন ও জগৎ বস্তু থেকে দূরে সরে থাকেন নি, দুর্বোধ্য অলৌকিক কোনও কিছুই হস্তান্তর করেন নি। তাদের চারদিকের রূপ রঙ শব্দ গন্ধ স্পর্শ কল্পনায় ঠাই অপরিচিতের থেকে পরিচিত, অব্যক্ত থেকে ব্যক্তনায় উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রত্যেকটি ছোট ছোট জিনিস যেন তথাগতের মত কথা বলে গাছ পাখি ফুল নদী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র কিন্তু প্রত্যেকেই সিদ্ধাচার্যদের দাবি মেটাতে সারিবদ্ধ রূপ ধরেছে। চর্যাকাররা পৃথিবীর মানব জীবনকে অদৃশ্য করে চোখ বুজে অন্য কোনও পৃথিবীর অদৃশ্য জীবনের অথবা জীবন-হীনতার কথা বলেছেন কিন্তু ভোগাকাজ্জা নিয়ে এই পৃথিবীর জীবন নির্দিষ্ট কোনও লোকে বা স্থানে স্থাপন করবেন না বললেও আমরা বুঝতে পারি যে তাঁদের দৃষ্টিতে রয়েছে এ পৃথিবীটাই। নিজেকে অস্বীকার করা, সমাজকে অপচিত মনে করার কিন্তু সে সীমা থেকে চর্যার গতিসীমা ছিল সুদূরে। তাই লৌকিক জীবনের প্রান্ত থেকে সিদ্ধাচার্যদের জাগরণ। সে কারণে চর্যাপদ বাংলার রাজনৈতিক দর্শন বটে।

চর্যাপদ বাঙালি সংস্কৃতির উৎস

চর্যাপদ আমাদের পদসাহিত্য বা কবিতার প্রথম সুকৃতি; ভাষা, ভাব সমীক্ষা ও কবিতা নির্মাণ আদর্শে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ অঞ্চলে অবশ্য চর্যার আগেও সাহিত্য কর্ম ছিল, এখনও কোথাও লুকিয়ে আছে অথবা সব হারিয়ে গেছে। শুধু শুধু লাফ মেরে শিখরদেশে গিয়ে বসে এ যুগের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারেনি, কেউ তাকে মই বা সোপান বেয়ে উঠবার পথ করে দিয়েছিল। যতক্ষণ সেই ভিত্তি চিহ্ন আবিষ্কৃত না হবে ততক্ষণ চর্যার ফুল কেবল আমাদের দেখতে হবে; সুগন্ধ, রঙ এবং রূপ নিয়ে কথা বলতে হবে আর এটাই আমাদের মাতৃগর্ভের জরায়ু বলতে হবে। যারা চর্যার আগে ছিল, চর্যাকে সহায়তা দিয়েছে তাঁদের চেহারা মসৃণ ছিল না, দুর্বল ছিল তাদের বাকসুকৃতি হয়তোবা একেবারে আগাছার মত ছিল এবং প্রথম উর্বরাতে জন্মে চর্যাকে মহীরুহ হতে সাহায্য করেছে। একদিনে দুম করে সিদ্ধাচার্যরা এ জীবন হাতে পায়নি, প্রতি শব্দের গঠন কৌশলে, ভাবাদর্শের টানে সাহিত্যের অনেকটা পথ অতিক্রম করা হয়েছে এটা অনস্বীকার্য। তাছাড়া চর্যাকে বৌদ্ধ সাহিত্যপদ্ধতি হচ্ছে বটে কিন্তু আর আর বৌদ্ধ সাহিত্যে আর আর গতি নিরিখ অবস্থানে চর্যার মত চরিত্র আর নেই, সে কারণে চর্যাপদ বৌদ্ধদের রচিত গান হয়েও যথার্থ বৌদ্ধ নয়, বরং ‘মাতৃ সাধক’ অর্থাৎ বাংলার প্রকৃত সুকৃতি। যেহেতু বাংলাদেশের আদি পুরুষ সবাই-বাঙালি বৌদ্ধ, উদাসি বৌদ্ধ চেতনা আমাদের মনন গঠনে সহায়তা দিয়েছে আর চর্যাপদের মানসও সে ইংগিত দিয়ে কথা বলছে। এই বৌদ্ধ জীবন ও চেতনার ওপর জবরদস্তি পড়েছে, ব্রাহ্মণ্য এবং পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্মের এবং জীবনের চাপও এসেছে। সে কারণে রক্ষণশীলতা বা সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা বাঙালি জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে, অহিংসার ভেতর রক্তপাতের সূত্রপাত হয়েছে। সে ক্রম ঐতিহ্যের নিরিখেও এ কথা সত্যতা মেলে। হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য বৌদ্ধরা তাদের জীবনের সাম্যের অনুকূলে আশ্রয় মনে করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল, রামাই পণ্ডিতের পুঁথি থেকে তা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু উত্তপ্ত কটাহ থেকে যে অগ্নিকুণ্ডে সে কথা লেখার সব পুঁথিগুলো আর পাওয়া যায়নি। তবে ছিটেফোঁটা হিন্দু প্রভাবিত বৌদ্ধ জনজীবন ছিল, তারাই আশ্রিত ছিল নির্যাতিত বৌদ্ধগানে, কেবল তাদের কথা রয়েছে। সে কারণে এ চর্যাপদ মুসলমানদের আগমনের পূর্বে আর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শাসনেরও আগে কিংবা গতিমূলে রচিত, এটা নির্দিষ্ট বলা যায়। আর মুসলিম

সাম্যবাদের মায়াজালে সকল বৌদ্ধ আবদ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই এ অঞ্চলে এখন মুসলিম প্রাধান্য। তবে তৎকালীন বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুধর্ম, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের প্রসার ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক, সে কারণে এ অঞ্চলের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় অথবা ময়নামতির মত বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ওখানে তেমন মেলে নি। তাই বৌদ্ধগানগুলোর ভাষার ঐ শর্ত কেবল তৎকালীন বঙ্গের এ অঞ্চলই দাবি করতে পারে। আর বৌদ্ধরা গতিবেগে পড়ে ধর্মান্তরিত না হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক দৃশ্যপাত হয়তো এ রকম থাকত না। বৌদ্ধগানে যে ভাষা পেয়েছি সেটা অনেকটা ভাষাশূন্য অর্থাৎ সিদ্ধাচার্যরা একটি সংস্কৃতি-অশারূপ এই চর্যাপদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন, যে গাছের কেবল কাণ্ড আছে, তার মূল এবং ডালপালা কিছুই নেই। এই কাণ্ড দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে কত সাফল্য ও ঐশ্বর্যময় ছিল এ অঞ্চলের ভাষারূপ ও কাব্য সাধনা। চর্যার কবিতাগুলো বিশ্ব সাহিত্যের তাকে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

চর্যাকারদের ভাষার কাল অষ্টম শতক থেকে একাদশ, প্রায় তিন শত বছরে কোনও অঞ্চলের ভাষা একই রূপ-রাজত্ব করে না, কেন চর্যাপদ একান্নটি একই ভাষা রূপে পাওয়া গেছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, এটা লিপিকর ও গায়কদের কারসাজি, হয়তোবা লিপিকরের কালের ভাষা তা; কিন্তু চর্যার প্রাণবায়ু ভাষাকার নানা বিশ্লেষণে বের হয়েছে। তবু এ জনপদের ভাষা রূপের ইংগিত তাতে আছে আর চর্যাপদ ছিল পরিশীলিত লৌকিক ভাষায় রচিত। এর পদ বা গানের সুর ও ছন্দভাব ও রূপকল্প, বিষয় ও চরিত্র অভিনিবেশে প্রথমে মনে হয় যে এ সব গুণ চিত্র কিংবা হয়তোবা কোনও পয়গম্বরের জন্য প্রেরিত এসব গুণাবলী; অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টিতে সংস্কৃতি প্রদত্ত বলে দুর্বোধ্য এবং স্বাভাবিক মনে হয়, গুণের আধারে ক্রমে আলোর প্রসার ঘটলে বিভ্রম কাটতে শুরু করে। খুব নিবিষ্টচিত্তে সমাধান চাইলে মনে হয় সমগ্র কবি তার নিজের দিকে চেয়ে কবি ব্যক্তিত্ব ও শৈল্পিক রূপ শুধু মোচন করে গেছেন,

নানা তরুণের মৌলিল রে গঅণত লাগিল ডালি।

একেলী শবরী এ বণ হিওই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥

তিআ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে তেজি ছাইলি।

সবরো ভূজঙ্গ গইরামণি দারী পেক্স রাতি পোহাইলী॥

হিঅ তাঁকেলা মহাসুখে কাপুর খাই

সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুখে রাতি পোহাই॥

অর্থাৎ, নানা ফুলে তরু মুকুলিত, আকাশে তা গিয়ে ঠেকেছে শাখা, একলা শবরী বালিকা এই বনে বিহার করে, তার কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী। তিন ধাতুর খাট পাতা হয়েছে, শবর তাতে মহাসুখ রূপ শয্যা পাতল। শবর হল ভূজঙ্গ রূপ, তার নৈরামণি রমণী নিয়ে প্রেম-রাত কাটাল। হৃদয় তাম্বুল মহাসুখে কর্পূর (যোগে) খেল, শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখে রাত পোহাল।

এই শাব্দিক অর্থের চাইতেও সিদ্ধাচার্যদের সাধন নিবেদিত অন্য অর্থসমূহ রয়েছে, তার ভেতর এটি একটি বলে মনে করা যায়, অবিদ্যা বা মার। সেখানে নানা ফুলে তরুণা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুকুলিত সারা গগন যেন সে ফুল আর পত্রপল্লবে ছেয়ে গেছে; অবিদ্যার প্রভাবে শবর ইন্দ্রিয় রূপ পত্রপল্লব জালে নির্বাণ আকাশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবু সে দেহের ভেতর একাকি বাস করছে। এই ইন্দ্রিয় সম্বোধনের তীব্রতা এত বেশি যে তা থেকে সহজানন্দ পেয়ে গেছে, মিলনের খাট এবং ফুলশয্যা, তাম্বুল প্রদান সমাপ্ত-এখন রতি বা মিলন হবে তাতে মহাসুখে রাত্রে কেটে যাবে।

প্রায় প্রত্যেক চর্যার ঠিক অনুরূপ তার বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থকে ঢেকে রাখতে পারে না, অপূর্ব কৌশলে লীলা মাধুর্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঠিক যেন আধুনিক কবিতা। সাধন সংগীতের লীলা গভীরতা ছিনিয়ে কবিতার বেদীর পাদদেশে নিবেদিত এ উচ্চারণ, ভক্ত কি বৌদ্ধমন্ত্র পড়ছেন, নাকি ব্যক্তি জীবনের প্রেম আকাঙ্ক্ষার উন্মত্ত ভাব প্রকাশ করছেন এর মধ্যে তারতম্য থাকে না। অথচ সাধন সংগীত তো সে চরিত্র পায় না, একে জৈবিক অর্থে অর্থাৎ নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনায় নিয়োজিত করা যেতে পারে না। তাছাড়া বৌদ্ধ শাসনে নারী হল মার অর্থাৎ নারীর সংশ্রব থেকে দূরে থেকো নারী চিন্তা থেকেও। সে পরিস্থিতিতে সিদ্ধাচার্যরা অপেয় বস্তুকে কবিতায় বা সংগীতের পদে আশ্রয় করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর এই ভিন্নটাই কবিতা ও গান, সেখানে ধর্ম আগলে রাখতে পারেনি। তবে সম্পূর্ণ ধর্ম থেকে সিদ্ধাচার্যরা বেরিয়ে এসেছেন এটা ঠিক নয়, তারা ধর্মের ভেতরে একটা ধর্মে-বিধানে এ গান করেছেন, সে বিধানটা হল তান্ত্রিকতা। গান শ্রোতাকে আকর্ষণ করে, একটা সুর দিয়ে নৈবেদ্য রাখে। সে কারণে সিদ্ধাচার্যরা জন-মানসকে বেঁধে রাখার জন্য মন্ত্র তৈরি করেছেন।

শুধু মন্ত্র কার্যকর হচ্ছে না, তখন মন্ত্রকে গানে রূপান্তরিত করলেন, এতে হয়তো কিছুটা কার্যকর হয়েছিল। বিভিন্ন মন্ত্র জানা যায় এই মন্ত্র বা পদ বা গান নৃত্য বাদ্য সহযোগে গীত হত; এখনও সে রেওয়াজ কোথাও কোথাও আছে। সে কারণে শিল্পিত রূপও অনিবার্য ছিল, অর্থাৎ পদগুলো ছন্দবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সুর, রাগ-রাগিণীর সূত্রে বাঁধা হয়েছে; শ্রোতা বা আশ্বাদনকারীর হৃদয় অনুকূল ভাব, ভাষা ও শব্দ পেয়েছে।

যেহেতু এ চর্যাপদে তান্ত্রিক আদর্শ আছে, অর্থাৎ যাঁরা তান্ত্রিক তাঁরা ব্যাপক আকারে বিভিন্ন আচার থেকে যোগবল আহরণ করে থাকেন, তার ভেতর নারী সম্বোধন বা নারী আচার অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিক আচারের কথা বলেছেন, নারীদেহের ওপর বা নারী শবের ওপর বসে তাঁরা সাধনা করেন। তাই নারী নামে আশ্বাদনীয় শবরী, নৈরামণি ইত্যাদি সেই তান্ত্রিক পদ্ধতির রূপক ভাব চর্যাপদে রয়েছে। তান্ত্রিকরা ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে কবিতার ভেতর গীতিরস অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন; সিদ্ধাচার্যরা তো কবিতা সৃষ্টি করতে বসেন নি, এমন কি তাঁরা পদ রচনা করতেন সে কথাও হয়তো বা জানতেন না, এ গানকে সাধন সংগীত চর্য্যচার্য্যবিনিশ্চয় নাম দিয়েছেন টীকাকার ও বিশ্লেষকরা, টীকাকাররাও অনেকে এদের পদ বলেন নি। ধরা পড়ল এসে অনেক পরে, সংগীতের আলাপ ও ধ্রুপদ সৃষ্টি করতে পদ আবশ্যিক, আর চর্য্যচার্য্যবিনিশ্চয় তার অভাব মোচন করল। সংগীতের ঘরানায় পদ বাঁধা বা গদবাঁধা নিয়ম তাই চর্য্যাকাররাই সৃষ্টি করলেন। আধুনিক কবিতা যে জন্য বিশিষ্ট অর্থাৎ তার গীতিপ্রবণতা, সেটা শুধু আক্ষরিকভাবে নয়, কবিতার চরিত্র এবং ভাবানুশঙ্গ চর্য্যাপদে আগাগোড়া জড়িত। এর কারণ হয়তো এটা যে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

বাঙালি জীবনে রহস্যময়তা এবং জীবনানুভূতির বিচিত্র গতি আদি কাল থেকে ছিল; এই রহস্যময়তাই চর্যাকাররা পদে রেখেছেন—

দুলি দুহি পিঠা ধরণ ৭ জাই।

রুখের তেতুলি কুস্তীরে খাই॥

অর্থাৎ, কচ্ছপ ধুয়ে পায়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না, গাছের তেঁতুল সব কুমিরে খেল।

এ জগৎ জলবিশ্বাকারে সহজেঁ সুণ আপনা।

অমিয়া আচ্ছন্তে বিস গিলেসি সে চিঅপর বস অপা।

খরে পরে কা বুঝঝিলে ম রে খাইব নই দুঠ-কুণ্ডুবা॥

অর্থাৎ, এই জগৎ জল বিশ্বাকার, সহজে শূন্য হয় আত্মা। অমৃত আছে, তবুও বিষ পান করে, চিত্ত পরবশ হয়ে যায়। ঘরে পরে কী আছে তা বুঝতে পারলে আমি দুষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে খাব।

জাসু নাহি অগ্ন তাসু পরেলা কাহি।

আই অনু অগারে জামমরণ ভব নাহি॥

অর্থাৎ, যার আত্মা নেই তার পরও নেই, আদৌ সে অনুৎপন্ন বা জন্ম মরণের অধীন নয়।

আধুনিক কবিতায় যা আকাশের ভেতর অকিঞ্চিৎ, চর্যাপদে তাই শব্দের ভেতর শব্দের আড়াল, কচ্ছপ ধোয়া যায় না, কিন্তু বাঙালি কচ্ছপ ধোয়া কী তা জানে, জানে যে অমৃত পেলেও লোকে বিষ খেতে কেউ কেউ উৎসুক, অথবা আত্মা নেই যার আপন পর তার কাছে কিছু না। সব কথায় বক্তব্যের মিল, অনুভূতিকে লীলায়িত করিয়ে অনুধাবন করতে হয়। এ শিক্ষা বাংলা কবিতার সূত্রে এসেছে। আপনা মাংসে হরিণী বৈরি জগতে, এ কখনও আর বলে দিতে হবে না কাউকে।

শুধু কবিতার ক্ষেত্রে নয় বাংলা ভাষার আধুনিক ব্যাপারটা শুদ্ধরূপ দান করেছেন সিদ্ধাচার্যরা; তাঁরা পথ সৃষ্টি করে প্রমাণ করে গেছেন এ ভাষা যতই নরম মাটি থেকে উদ্ভূত হোক না কেন, গুরুগম্ভীর ভাবসমৃদ্ধ শব্দ রাখার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। মাইকেল মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মহাকাব্য রচনার জন্য বাংলা ভাষার শব্দ ও বাংলার ভেতর থেকে বিষয় খুঁজে প্রথমে পান নি, তাই পুরাণাদি ও সংস্কৃত শব্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে, ভাষার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন যুগে যুগে সংস্কৃত পণ্ডিতরা, তাঁদের টুলো আশ্ফালন এবং রক্ষণশীল চেতনা থেকে বাংলা ভাষাকে বারে বারে সংস্কৃতের চরণ পাতে নিষ্ক্ষেপিত করেছেন। চর্যাপদ থেকে যে গতি সেটা আর রক্ষা হয়নি। এমনকি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকেও আমরা যতই লৌকিক বা জনমানুষের কাছাকাছি বলি, তবু প্রত্যেকটি কবিতা বা পদের মাথার ওপর একটা অথবা সংস্কৃত শ্লোক বসিয়ে দিয়ে বলা হয় যে সংস্কৃত পবিত্র বস্তু মাথায় নিয়ে এ বাংলা। সর্বশেষ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা বাংলা গদ্য যে একেবারে বেঁধে দিলেন সর্বরকম কাঁটাজালে। তাই মাইকেলের পক্ষে খাঁটি বাংলার খাঁটি রূপ বিচার করে ‘তাজমহল’ নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না, তার ওপর তিনি সবে বাংলা শিখেছেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্যরা তেমন সংস্কৃত প্রেমী ছিলেন

না, যদিও চারদিকে সংস্কৃত ভাষা ও কবিতার আবেদন ছিল কিন্তু প্রাণধর্ম তাদের ছিল লৌকিক বাংলা, তাই কবিতার ভাষা ও শব্দ প্রাণের উৎস থেকে আহরণ করেন। চর্যাপদের পরে বাংলার সে ধারা হারিয়ে না গেলে কিংবা অন্ধকার যুগে প্রবেশ না করলে নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার অন্য একটা রূপ থাকত।

মনে হয় অন্য ভাষায়, এমন কি উপমহাদেশীয় ও চর্যাপদের সাদৃশ্য অনন্য পদাবলীর এমন দৃষ্টান্ত নেই। দোহা, গাঁথা কিংবা শ্লোক থাকলেও কাব্যে পদের লক্ষণ প্রাচীন বাংলায় কেবল চর্যাপদে বর্তমান। ধ্রুপদের অধিষ্ঠান এ পদাবলী বিভিন্ন রাগ-রাগিণী যোগে চর্যায় আত্মাদিত এবং গীত। চর্যাপদ একই আচরণে বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপ বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা ধর্ম সাধন করার জন্য একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন, নৃত্যগীত ও তাল সংযোগ করেন রাধাকৃষ্ণের মিথুনরূপ ধর্মীয় চেতনায় নিয়ে আসেন। চর্যাকার যেখানে শবর শবরী কিংবা ডোম্বী নিরামণির রূপ দিয়েছেন কেবল নাম বদলে বলা যায়, ঐ ছাড়া পরিশীলিত সিদ্ধাচার্যরা 'পেঞ্চ' বলে ছেড়ে দিয়েছেন।

তিআ বাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সোজি ছাইলি

সবরো ভুজঙ্গ নিরামণি দায়ী পেঞ্চ রাতি পাহাইলী

অর্থাৎ, তিন ধাতুর খাট পাতা হয়েছে, শবর শবরীসুখের ফুলশয্যা বিছাল, ভুজঙ্গ নাগর (শবর) নিরামণি রমণীর সঙ্গে প্রেমে রাত কাটিয়ে দিল।

কস্তু চিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।

অনুদিন শবরো কিস্তি চিবই মহাসুখে ভেলা।

অর্থাৎ, কস্তু চিনা (একপ্রকার রসালো লাল ফল) পাকল (তা দেখে) শবর শবরী মাতল। ক্রমে শবর এমন হল যে দিনের পর দিন মহাসুখে বিভোর হয়ে থাকল, তাই আর কিছু টের পায় না।

এই চিত্রগুলো থেকে পরবর্তীকালে প্রেমরস বা আদিরসের যত কাব্য বাংলায় অনুপ্রাণিত হয়েছে, তবে ধর্মের পাশে কামাচার উদ্দেশ্য সাধন এর আগে দেখা দেয়নি; মহেনজোদারো হরপ্রার নিদর্শনে নেই, অজ্ঞাত্য নেই, বৌদ্ধ বিহার-মঠে নেই, হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের মূলে এই মিথুন চিত্র দেখা যাচ্ছে, শঙ্করাচার্য যত ব্রহ্মবাদী হোন না কেন ব্রহ্মার নামে নারীদের যজ্ঞ হয়েছে মন্দিরে মন্দিরে, দেবদাসীদের এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে। রাজা ও পুরোহিতদের জন্য স্বতন্ত্র গণিকা অবশ্য আগে থেকে ছিল, মহাভারতের ঋষি শৃঙ্গের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে। তবে মন্দিরে দেবদাসী বা গণিকার ব্যবহার, তাদের নৃত্যগীতের সঙ্গে ধর্মচার পালন করা বাংলা অঞ্চলে আগে থেকে ছিল। কমলা নামে পুণ্ড্রবর্ধনের মন্দিরের দেবদাসী হল তার উৎস, এই কমলা নৃত্যগীতে তো পারদর্শী ছিলেনই, রাজনীতিতেও পারঙ্গম, রাজা রাজপুত্রদের মক্ষীরানি। তার আদলটাকে একেবারে সিদ্ধাচার্যদের ডোম্বী কিংবা শবরী বালিকা বললে অত্যাক্তি হয় না, হয়তোবা কমলা নামী এমন কেউ সিদ্ধাচার্যদের কাব্যলক্ষী সাধন সঙ্গিনী থাকতেও পারেন। তাদেরই রূপকে ডোম্বী স্বনির্মিত রূপ ধরেছে। ~ www.amarboi.com ~

পদের আনুষঙ্গিক যেসব রাগ-রাগিণীর উল্লেখ চর্যাপদে দেখা যায় যেমন— পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুজ্জরি, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী কামোদ, ধানসী, রামাক্রী, বরাড়ী, গঞ্জরী, শবরী, বলাড়ি (ববাড়ি?), মল্লারী, মালসী, মালসী গরুড়া, কফুগঞ্জরী, বঙ্গাল মোট আঠারোটি রাগের উল্লেখ আছে, এর অনেকটাই শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ বা মার্গ সংগীতের রাগ, তবে বঙ্গাল বলে যে রাগের উল্লেখ রয়েছে তা সম্ভবত ভাটিয়ালি হতে পারে, কারণ ভুসুকুর এই রাগে পদ রয়েছে আর তাঁর বাড়ি ভাটি অঞ্চলে। এই রাগের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় সিদ্ধাচার্যরা শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখতেন। তাঁর এ সব রাগ হয়তোবা সবগুলোই লৌকিক বা মার্গ সংগীতে তখনও স্থান পায়নি, আর লৌক্য না হয়ে লৌকিক ভাষায় গান রচনা করে তাকে দেবভাষার যে সুরের সুর তার পোশাক পরাতে সিদ্ধাচার্যরা উৎকর্ষিত ছিলেন না। রাগের ইতিহাসে জানা যায় প্রত্যেক রাগ মূলে লৌক্য পরে উন্নীত হয়ে মার্গে স্থান পেয়েছে। ভাটিয়ালিকে লোকসংগীতের সুর বললেও বর্তমানে ভাটিয়ালি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরে পৌঁছেছে। লৌক্য হলেও যে সুরের বিশুদ্ধতা ও শৃঙ্খলা, মান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ে, সে সুর শাস্ত্র সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, তখন দেবতাদের নৈবেদ্য উপযোগী হয়। তবে যেহেতু চর্যাপদ সাধন সংগীত তা লৌক্য ভাষা-শব্দে গ্রন্থিত হলেও তা মার্গ সুরে গীত, এমনও হতে পারে। সিদ্ধাচার্যরা এমন অনাচার করবেন না যে নগ্ন বাহিরে ডোম্বীর সঙ্গে মার্গ উপায়ে মিলিত হবার জন্য অনুভূতিতে তা সংক্রামিত করে নেবেন। নিতেও পারেন, এমনটিতে করেন নি তা নয়, ভৈরবী রাগ কেবলমাত্র দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, কিন্তু কাহ্ন পা, এই ভৈরবী রাগে

ভব নিক্বানে পড়ই মাদেলা।

মন পবণ বেনি করণ্ডক শালা॥

জঅ জঅ দুন্দহি সাদ উছলি আঁ।

কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥

অর্থাৎ, ভব ও নির্বাণ পটহ ও মাদল, মন পবন দুটি ঢোল ও বাঁশি। দুন্দুভি শব্দে জয় জয় ধ্বনি উছলিয়ে উঠল, কাহ্ন ডোম্বী বিয়ে করতে চললেন।

তাহলে ডোম্বীর বিয়েতে ভৈরবী রাগ বাজছে, অথচ আলাউদ্দিন খান বলেছেন, আজানের ধ্বনিতে নাকি ভৈরবী রাগ ওঠে। যে রাগের প্রভাবে মানুষকে সাংসারিক কাজকর্ম থেকে উঠিয়ে তৎক্ষণাৎ অমর্ত্য লোকে নিয়ে যায়।

চর্যাপদের অতি অপূর্ব এই গৌরব সমিধ বাঙালির শুদ্ধ ও উন্নত সংস্কৃতির রূপ, যেটা আমাদের ঐতিহ্য। নানা কারণে ঐতিহ্য প্রথা ছিন্ন হয়েছে। চর্যার পরে সাহিত্য সংস্কৃতির গতিরোধ অজানিত থাকার জন্য বাঙালি জীবনকে অন্য সাম্প্রদায়িক আবেষ্টনীর ভেতর আবদ্ধ করার দুর্ভোগ রয়েছে। চর্যাপদের আলো থেকে সে আঁধার আচ্ছন্নতা মুক্ত হওয়া সম্ভব।

চর্যাপদের শিল্প ও সাহিত্য চরিত্র

চর্যাপদ বাঙালির আদি পুষ্পিত শিল্প নিদর্শন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি রূপ বলে তা এখনই আমরা গ্রহণ করতে পারি যদি না অন্য কোনও আদি শিল্পাশ্রয় কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তা বের না হওয়া পর্যন্ত। তবে এটা ঠিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাপ্ত আস্ত তরুটি সমূলে পাওয়া যায়নি, যা আছে তা শাখা পত্রপল্লব, কাণ্ডের কিছু অংশ। বাকিটা কোথায় কেউ বলতে পারে না। চর্যাপদ হয়তো কাণ্ড থেকে বের হয়ে একটি অংশ কিন্তু সেটিই প্রক্ষিপ্ত; তার আদ্যপ্রান্ত পরিচয়হীন। মোটামুটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটা বৃক্ষের কিছু প্রাপ্ত কিছু অপ্রাপ্ত দংশিত রূপ। আর চর্যাপদ আবিস্কৃত হবার পর এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে।

চর্যাপদ আবিস্কারের ফলে একট কথ শানিত হয়েছে যে বাংলা ভাষা হয়তোবা একটি বিশাল বৃক্ষরূপ ছিল, অথবা অন্য একটি বিশাল বৃক্ষ ছিল যার থেকে বাংলা ভাষার কাণ্ড শাখা সমেত পৃথক হয়েছে অন্যান্য ভাষাও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। যেমন—অহমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি এমনকি হিন্দি ভাষাও। তাই যখন চর্যাপদ আবিস্কৃত হল বাংলা ভাষা সহ উল্লিখিত ভাষার পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্চে যে চর্যাপদ সে সে ভাষার আদিরূপ। শেষ পর্যন্ত চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদিরূপ বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেল। কিন্তু অন্যান্য ভাষা (হিন্দি, অহমিয়া, উড়িয়া) এর দাবি তুলে নেওয়া হল না। তা হলে অন্যান্য ভাষা স্বীকার করতে পারে যে আদি বৃক্ষটা আসলে বঙ্গই ছিল তার থেকে তাদের বিভাজন। সে কথাও আমরা জোর করে বলতে পারি না, হিন্দি ভাষার সাম্রাজ্য ও সাহিত্যরূপকে গ্রাস করার ক্ষমতা তথাকথিত আদি বঙ্গের ছিল না, যদিওবা অহমিয়া ও উড়িয়া মুঠিবদ্ধ করার ক্ষমতা বাংলার ছিল। সেজন্য হিন্দি ভাষার সম্মানে বলতে পারা যায় যে, বঙ্গ ভাষার আদিরূপ সমৃদ্ধ এমন একটা লৌকিক (প্রাকৃত) ভাষা ছিল, যার থেকে এ ভাষাগুলো নির্গত হয়েছে, হিন্দি তার ভেতর বড়ো একটি ভাষা। আর এটা ঠিক যে হিন্দি সাহিত্যের চাইতে বাংলা সাহিত্য কোনও অংশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী কম নয়, বরং বেশি।

চর্যাপদ ধর্ম সংগীত, সিদ্ধাচার্যদের আধ্যাত্মিক বোধের আচরিত শব্দ ও ধ্বনির রূপ, তা আদি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। কিন্তু এই ধ্বনি ও শব্দ উচ্চারণ তাঁদের পরিবেশ, লৌকিক আচরণ ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে রূপ পেয়েছে, ফলে সিদ্ধাচার্যদের মনোজগৎ প্রতিফলিত হয়েছে এর ভেতর। তাই ধর্মের চাইতে ব্যক্তির জীবনের দুঃখ সুখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পরূপ অধিক পাওয়া যাচ্ছে। তাতে শিল্প বোধ পুষ্পিত হতে সুযোগ

বা সাহিত্য প্রাণিত হতে উৎসাহ পাচ্ছে। ধর্মগুণের ভেতর সাহিত্যিক মূল্য উঁকি দিচ্ছে। কারণ ধর্মও কাব্যাকারে ও সংগীতাকারে ব্যক্ত হয়েছে চর্যাপদে।

এই ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতর আমরা শিল্প ও সাহিত্যগুণ উদ্ধার করতে পারি নানা পদ্ধতির মাধ্যমে, প্রথমত এই ধর্মীয় বোধ ভাষায় কতটা পারঙ্গম, অর্থাৎ লোকের হৃদয়ভেদ্য ছিল কতটা। দ্বিতীয় এ রচয়িতারা এর উৎকৃষ্টতা, গুঞ্জল্য, শিল্পকুশলতা দিয়ে শব্দ নির্বাচনে কতটা আগ্রহী ছিলেন অথবা তাদের অবচেতনে কতটা তা ঘটে গেছে। তৃতীয়ত এর সংক্রমণতা পরবর্তী ভাষা-সাহিত্যে জীবনে কতটা অঙ্গীভূত। প্রাথমিক বিশ্লেষণে অবশ্য আমরা চর্যাপদের ভেতর হৃদয়ভেদ্য ভাষার লক্ষণ দেখতে পাই। ঐতিহাসিক দিক থেকে যদি দেখি তবে ধর্মীয় পরিচর্যা ও আচরণের যে ভাষা ছিল তা সংস্কৃত কিংবা পালি, যা সাধারণ জনজীবনে শ্রদ্ধেয় হলেও অনেকটা দুর্বোধ্য। ধর্মবাণী হয়তো দুর্বোধ্য বলে অবুঝ ও মূর্থ লোকদের কাছে সম্মানিত যত দিন তারা কী বলে প্রার্থনা বা আরাধনা করেছে তার অর্থ উদ্ধার করতে না পারে ততদিন নেশায় আকৃষ্ট থাকে, সরল ভাষায় তা ব্যক্ত থাকলে কিছুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তা আর আকর্ষিত থাকে না। চর্যাপদের গুণ হল লোকগ্রাহ্য ভাষায় প্রকাশিত অথচ বাচ্যার্থ থেকে ব্যাক্যার্থে অধিক আনন্দনীয়, অর্থাৎ শিল্প ও কাব্য মাধুর্য ভরপুর বলে বার বার ব্যবহারেও মূল্য খসে পড়ে না। প্রাত্যহিক জীবনের দাবি মিটিয়েও পরবর্তী সময়ের জন্য হৃদয়ে তুলে রাখার মূল্যবোধ তার আছে।

দ্বিতীয় বিশ্লেষণে আমরা দেখব কবিতা অথবা ধ্বনি হিসেবে কতটা শিল্প উৎকর্ষ চরিত্র পেয়েছে চর্যাপদ। সেহেতু বলা হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি রূপ তাই বর্তমান রূপের নিরিখে সম্ভাব্য আদিরূপের ভাষা ও সাহিত্যের কতকগুলো তুলনামূলক ছবি, বাক্য বিন্যাস, শব্দ ব্যবহারের জটিলতা, সঙ্কীর্ণতা বা ভিন্নতা কিংবা অস্পষ্টতা থাকবে; বর্তমানের কবিতার সঙ্গে উৎকর্ষ বিবর্তিতভাবে একটা সামঞ্জস্য থাকবে। ধ্বনি বিন্যাসের ক্রম রূপটিও ধরা পড়বে এবং কাব্যধ্বনির পরিশীলিত রূপটিও বর্তমানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে। চর্যাপদের ধ্বনি তরঙ্গের ভেতর কোনও অপরিণত রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। কাব্যের ভাবের দিক থেকে শিষ্ট ও সমৃদ্ধির তুলনা নেই। দৃষ্টিগ্রাহ্য ও হৃদয়গ্রাহ্য সব বস্তুর রূপ হয়েছে পরিপূর্ণ শৈল্পিক মাত্রায়। সিদ্ধাচার্যগণ পরিণত জীবনবোধ থেকে, আধ্যাত্মিক গভীর জ্ঞান থেকে চিন্তার আশ্রয় নির্মাণ করেছেন, এখানে মন্ত্রের সাহায্যে প্রবেশ করতে এবং মন্ত্রের দ্বারা বের হতে হয়। তাই ভাব ও ভাষা ব্যবহারের কলাকৌশল ও পরিণতি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মনে হলেও প্রায় তিনশ বছরের ক্রম অনুশীলনের পরিণাম এ চর্যাপদ।

তৃতীয় বিশ্লেষণে পরবর্তী জীবন ও কাব্যের চর্যার প্রভাব অপরিসীম। চর্যার অনেক শব্দ অনেক রূপ কল্প, উপমা, রূপক এবং সংগীত আদর্শ পরবর্তীকালে বাঙালি জীবনে ও সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে এসেছে যেমন,

‘আপনা মাংসে হরিণী বৈরী’

হরিণী নিজের মাংসের জন্য জগতের শত্রু, বার বার বাংলা সাহিত্যে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, এমন কি আধুনিক কবিতায়ও পরিদৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি অনেক ভাবে ব্যবহৃত হয়,

হাতের কঙ্কন দেখার জন্য দর্পণের দরকার পড়ে না,

সুন গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে

দুঠ বলদের চাইতে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো, ইত্যাদি তো রয়েছেই; বাংলা কবিতার গীতিপ্রবণতা বা পদ সৃষ্টি চর্যাপদের অনুকরণে হয়েছে, পদের ও সুরের অপূর্ব অর্থ ও মিলনের ধারা রবীন্দ্র-নজরুল পর্যন্ত প্রসারিত। কবিতার জন্য শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে সংযম তা চর্যাকারদের শিক্ষা থেকে পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সীমিত শব্দের ভেতর সম্পূর্ণ জীবন অনুভূতি অথবা বিন্দুর ভেতর সিদ্ধুর ছবি অবলোকন তাই চর্যাপদের দৃষ্টান্ত। আরেকটি বিষয় হচ্ছে চর্যাপদের ছন্দ; ছন্দ হল কবিতার অন্তর্গত সম্পদ, তাকে প্রাণের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে; প্রাণের স্পন্দন যেমন থাকে কবিতাতেও ছন্দের স্পন্দন অনুরূপ হওয়া চাই। এই স্পন্দনের অনিয়মের ফলে শরীরের ক্ষতি যেমন, চর্যাপদে তেমন কোনও অনিয়ম নেই, ভাব সম্পদ ও শিল্প সম্পদ এক হয়ে শব্দের ধ্বনি সৃষ্টি করেছে, তাই কলাকৌশলতার জন্য বাংলা শব্দের আদি প্রাণস্বরূপ এ চর্যা সজীব এবং সুস্থ বুদ্ধির লীলাখেলা বটে; উপমার উপহার আর রূপকের চমকে পাঠকের রুচিকে মার্জিত উপলব্ধির দিকে টেনে নিয়ে যায়; সে তত্ত্বের কোনও কারসাজি যেন কবিতাকে আঁকড়ে রাখতে পারে না; মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে ছেড়ে দেয় যেমন—

এবংকার দূঢ় বাখোড়, মোড়িঅ।

বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িঅ॥

কাহু বিলসই আসব মাতা।

সহজ নলিনীবণ পইসি নিধিকপ

সহজ ছন্দ এবং শব্দের গতি লঘু পদক্ষেপে যেন এগিয়ে চলেছে; মনে হচ্ছে যেন একটা সুরের ভেতর থেকে বের হয়ে আবার সুরে প্রবেশ করছে।

আলো ডোয়ী তো পুছসি সদভাবে।

অইসসি জাসি ডোয়ী কাহারি ণাবে

অথবা,

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণে বখাণে।

অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরম নিবাণে॥

সমস্ত ধ্বনি তরঙ্গ সুষম এবং সাবলীল। হয়তো আধুনিক ছন্দ পাঠক বাংলা ছন্দের বর্তমান রূপের কথা ভেবে এখানে দৃকপাত করতে চাইবেন। বাংলার চিরদিনের পয়ার ছন্দের জন্য যে এখানে একটু কান সজাগ রাখলেই ৮ + ৬ পেয়েই যাবেন। তাই ছন্দের বিবেচনায়ও চর্যাপদ বাংলা কবিতার আদি প্রাণস্পন্দন।

চর্যার উপমাগুলো কোথাও স্থবির নয়, জীবনবাদি সব উপমা জড় হয়েছে, উপমা তো কেবল দু' একটি নয়; সকল চর্যার উপমার লীলা আছে, এমনকি আধুনিক মনকেও আকৃষ্ট করতে পারে এমনই উপমা কয়েকটি রয়েছে, যেমন

তরঙ্গতে হরিণার খুর ণ দীসঅ

তরঙ্গে তরঙ্গে হরিণের ধাবমানতার জন্য আর খুর দেখা যায় না;

জগপণা মাংস হরিণা বৈরি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা,

ভাবভাব বলাগ ও ছুধ

অর্থাৎ, ভাবে এবং অভাবে কেশের অগ্রভাগ বিচলিত হয় না।

গঅণ দুখোলে সিঞ্চি পানী

অর্থাৎ, গগন সঁউতিতে পানি সঁচ; এই উপমাটি খুবই অর্থবহ, আমাদের চোখে গগন একটি বাটির মত, কবির চোখে সঁউতি, তা দিয়ে পানি সেচ।

সুজ লাউ সশি লাগেলি তান্তী

অর্থাৎ, সূর্য হল লাউ, চাঁদকে তন্তী করে লাগানো হল; এই উপমাটির ভেতরে প্রবেশ একটু দুরূহ হলেও তার দৃশ্যপট মনোহর; বাউল লাউ উচিয়ে গান গায়, তার তারে থাকে সুর; তাও তার হাতের মুঠোতে; সুরের ভেতর শূন্যতাকে ধরার জন্য এ গান।

নানা তরুণের মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী

অর্থাৎ, নানা পত্রপল্লব তরুণের মুকুলিত রে আকাশে তার ভাল ছড়িয়েছে; এখানে উপমার চমৎকারিত্ব হল, তরুণতলে বসে আকাশ দেখলে মনে হয় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে ডালপালা আর যদি তরু পুষ্পিত বা পল্লবিত হয় এমন দৃশ্যের আড়ম্বরতার তো কথাই নেই।

উদক চান্দ জিম সাট ও মিচ্ছা

অর্থাৎ, জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ সত্য কি মিথ্যা (কে বলতে পারে)? এই উপমাটি একটি দর্পণ বটে; রজ্জু দেখে সাপ মিথ্যা, কিন্তু এখানে জলের ভেতর চাঁদ তো মিথ্যা নয়, চীন দেশীয় কবি লি পো হোয়াংহো নদীতে চাঁদকে ধরতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিয়েছেন।

বাও কর'ও সজ্জার জানী

অর্থাৎ, পুরুষাঙ্গ ও অভকোষ যে আছে তা সাঁতার দেবার সময় জানা যায়; আধুনিক ভাষায় অশ্লীল হলেও সত্য উপমাটিও জীবন্ত।

রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং বোড়ে খাই

অর্থাৎ, রজ্জুসাপ দেখে সে চমকে ওঠে তাকে কি বোড়ে সাপে ছোবল দেয়?

দুধ মাঝে লড় চ্ছন্তে ও দেখই

অর্থাৎ, দুধের ভেতর সর রয়েছে দেখা যায় না।

সিদ্ধাচার্যরা যোগী হলেও চর্যাপদ রচনার জন্য মূলত তাঁদের কবি বলতে হবে, কারণ অনেক সিদ্ধাচার্য তো ছিলেন তাঁরা সকলেই কবি নন। এঁরা হলেন 'কেউ কেউ কবি' এ বিশেষণ জ্ঞাপক। কবির স্বকালে খুব বিখ্যাত এবং শক্তিদর তবু তাঁদের পরিবেশে কিন্তু তাঁরা সময়ের রাজপুত্র। তাঁরাই অগ্রিম জীবনকে, পৃথিবীকে, সমাজকে অনুধাবন করতে পারেন-সবার জন্য অগ্রিম অবদান রেখে যেতেও পারেন। তাঁদের দৃষ্টি তাই কেবল সমকালে পড়ে থাকে না, সমকালকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সুন্দর নির্মাণকে শক্তিশালী করেন, সঙ্গে সঙ্গে সমকালকে সে ভবিষ্যৎ নির্মাণে ভিত্তি করে যান। তাই কালের নিরিখে কবির দায়িত্ব জগৎ ও জীবনের জন্য সবচাইতে বড়ো। চর্যাকাররা সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন যদিও বলেছেন তাঁরা ধর্মের দায়িত্ব পালন করছেন। সমগ্র

চর্যাপদ অনুধাবন করলে ধর্ম একেবারে গৌণ মনে হয়। যদি ধর্ম করার মতলব থাকত তবে যতই রূপক যত আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা হোক না কেন চর্যাকার সে সময়ের রুচি ও সমাজ আকাজক্ষাকে এভাবে বর্ণনা না করে পারেন নি,

তিঅড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।

কমল-কুলিশা ঘাটে করহু বিবআলী॥

জোইনি তই বিণু খনহি'ণ জীবমি।

তো মুহ চুষী কমলরস পীবমি॥

অর্থাৎ, যোগিনী তুমি জঘন চেপে আলিঙ্গন দাও, যোনি আর সাধনদন্ত ঘেঁটে সুরতক্রীড়া করি, এসো। যোগিনী তোমাকে ছাড়া ক্ষণকাল বাঁচি না, তোমার মুখ চুষন করে কমল রস পান করি।

এই প্রেমাকাজক্ষা ও সমাজ মানসকে কবি অস্বীকার করতে পারেন নি, কাব্যে রূপ দিতে হয়েছে তাঁকে, কারণ তিনি সময়ের নকীব। আমাদের ব্যাখ্যা যাই থাক, সত্য যা তাই শিল্প এবং তাই সুন্দর। বিদ্যাপতি কি এর চাইতে মসৃণ শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন?

বলি বিলাসিনি জতনে আনলি রমণ করব রাধি।

জৈসে মধুকর কুসুম না তোড় মধু পিব রাধি আখি॥

অর্থাৎ, বিলাসিনী বালিকাকে যত্ন করে এনেছি। মধুকর যেমন কুসুম পাপড়ি ভাঙে না, মুখে মধু রেখে পান করে। সে ভাবে উপভোগ করব।

এখানে শুধু মধুকর উপমাটি উদ্ভূত নইলে তো একই কথা। জীবনের দাবি সিদ্ধাচার্যরাও অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা দেহ তরুকে ফেড়ে বিনাশ করতে বলেছেন, ইন্দ্রিয়কে তফাৎ তফাৎ চিৎকার করেছেন, কিন্তু কীভাবে দেহের সৌন্দর্য এবং ইন্দ্রিয়ের 'পারিপাট্যের' গুণ সাজিয়েছেন সেটা ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে, তা আমার জন্য আর তোমাদের জন্য পড়ে থাক 'তুলাধুনি ধুনি আসু' এর মত শূন্যতা, সে সুখে তোমরা মর।

চর্যাপদ শক্তিদ্বয় একটি বাচনিক প্রতিষ্ঠান, অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক এই দীর্ঘ সময় ধরে লোকজ্ঞান ও লোকভাস কিংবা লোকশিক্ষার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, তা থেকে উৎকীর্ণ জীবন মন্ত্র; শব্দ ওঙ্কার কিংবা প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র সংগ্রহ করা লৌকিক আচার অভিভূত। সিদ্ধাচার্যরা স্বপুজাল ছিঁড়ে দিচ্ছেন না, সে জীবন যন্ত্রণামুক্ত এবং বাসনা সুখ তাকে মহাসুখ জালে আবদ্ধ করার মন্ত্র পড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা একটি কাব্যিক পরিকল্পনা। সে জন্য চর্যাপদ জনজীবন প্রাবিত করে রাজ 'দরবারেও ঠাই করে নিতে সক্ষম হয়েছে'। গভীরভাবে তালাশ করলে মনে হয় চর্যাপদ আগম-নিগম কিংবা একাডেমিক পাঠ্যসূচির অন্তর্গত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের ধারাপাত কিংবা সামরিক প্রশিক্ষণের কঠিন কঠোর বিধিবিধান বটে। তখনই ধরা পড়ে গুরু কালা এবং শিষ্য বোকা শেষ পর্যন্ত, কারণ জীবনকে অথবা গগনে নিষ্কিণ্ড করার যুক্তি একটা পোষা পাখিকে আকাশে ছেড়ে দেওয়ার মত, নিরাপত্তা কোথায়? আবার পাখি খাঁচায় ফিরে আসার সম্ভাবনা অর্থাৎ বাসনা তো মেটে নি, আবার জীবনে ফিরে আসতে পারে সে। এই সংশয়শীলতাকে (চর্যাগুলোকে) কবিতা আক্রান্ত করে তুলেছে। এখানে শিল্পীর জয় হয়েছে, সিদ্ধার হয়েছে পতন।

পরিশিষ্ট

চর্যা ২৩-এর পর, প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রীর রচিত 'চর্যাগীতি কোষ অফ বুদ্ধিস্ট সিদ্ধস' গ্রন্থে তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে ২৩ নং চর্যার শেষাংশ, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং চর্যার অবয়ব নির্মাণ করেছেন এবং তাদের সংস্কৃত টীকাও প্রণয়ন করেন, এখানে তা কৌতূহলার্থে উল্লেখ করা হল,

চর্যা ২৩ বাকি অংশ

কায় ভুসুকু পা আত্মপাত্রং মাতা পৃথিবী জরম অগ্নিচ ভোজনম
কালাকালোভয়ম আলংব্য পবণ মার্গে যোগ প্রমাণারিভ্রোণ চালয় ॥৩॥
জাল শৃঙ্খলারঙ্কুনাযভাবে হারণো দ্রুতং পলায়িতঃ ।
উৎপুতোৎপুত্য দ্রবর্ণ গগণ মধ্যে স্তমিতঃ ভুসুকুপাদরজনী স্তমিতা ভবতি ॥৪॥

চর্যা-২৪

রাগ : ইন্দ্রতাল:

কৃষ্ণাচার্য পাদানাম্

পূর্ণচন্দ্র উদয়তি যদা ।

চিন্তরাজ্যে বিমলো ভবতি তদা ॥১॥

মোহমলং ছিন্নং গুরুপদেগেণ ।

বিষয়েত্তিয়ং গগণমুপেতম ॥২॥

বসম বীজং যৎ বসমং যাতি ।

আত্মবৃক্ষস ত্রিধাতুকু বিতনোতি ছায়াম ॥২॥

যথা উদিতো সূর্যে রাত্রিব্যাপয়তি ।

(তথা) ভব সমুদ্র মোহরজো দূরীভবতি ॥৩॥

রাজহংসো যতা জলং বিবিণক্তি ।

ভবং ভুক্ষু (তথা) ইতি কথয়তি কৃষ্ণপাদঃ ॥৪॥

চর্যা-২৫

তত্ত্বীপাদানাম্ (রাগের নাম পাওয়া যায়নি)

ধর্মোদয় পাদাধিষ্ঠানং বজ্রপদং নাদঃ ।

পঞ্চ ক্রমং বয়িত্বা তন্নিগ্নঃ পটো বিমলঃ ॥১॥

অহমেব তস্তী স্বয়মেব তানম ।

বিতাণং (চ) স্বয়মস্ত্রাত লক্ষণম ॥২॥

সার্থত্রিহস্তং গৃহে বেসমুক্তং লিবৃতম ।

গগণং পূর্ণং স হি তত্ত্ববয়ণম ॥২॥

অন্যহতো বেমবরশদো হি গুরুপদেশে না বিরহিতম ।

দে স্থিতী ছিত্বা সূত্রা নি ব্যাবৃত্য দৃঢ়ং প্রসারিতানি ॥৩॥

মণিং গতঃ শূণ্যতয়া লক্ষণশূণ্যতা সারম ।

বয়ণ (জাল) রসমস্ত্রী মোহজাল মুক্তঃ ॥৪॥

চর্যা-৪৮

রাগ পটহঃ

কুকুরী পাদানাম্

কলিশাজ্যুদ্বং প্রবিশ্য

সমতাযোগস্য সৈনিক সমূহাঃ ॥১॥

বিষয়েন্দ্রিয়গ্রামাণহণ ।

শূন্যতা রাজো মহাসুখ নামা ॥২॥

ত্বর্ষশব্দঃ শব্দধ্বনির অপ্রতিহত পাদং গদতি ।

মোহ ভববলাপি দূরাতীতানি ॥২॥

সুখপুরং শিখরে সংস্থাপ্য সর্বম আকৃষ্টং ।

অঙ্গুলিম উদকং ক্ষিপ্ত্বা কুকুরী পাদো বদতি ॥

অয়ং ত্রৈলোক্য মহাসুখেন জয়ণ্ডি ।

তত্ত্বস্যার্থং শব্দান্তরেণ কুকুরী পাদেণ কণিতম ।

শব্দ নির্ঘণ্ট

(বন্ধনির ভেতর পদ সংখ্যা)

অইস (৪১, ৪৩), এরূপ, ওইরূপ
 অইসন (২), ওইরূপ, এইরূপ
 অইস ভাবে (৪৩), ওই ভাবে, এই ভাবে
 অইসসি (১০), আসিস, দ্র. আইসসি
 অকট (৩১, ৩৯, ৪১), আকর্ষ
 অকাশ (৫০), আকাশ
 অকিলেসে (৯), অক্রেসে
 অগে (১৫), অগ্রে, সামনে
 অঙ্কবালী (৪), আলিঙ্গন
 অঙ্গ (২৭), দেহ
 অচার (২১), আচরণ
 অচারে (১১), (ধর্মীয়) আচারে
 অচিন্ত (২২), অচিন্ত্য
 অচিন্তজোই (২২), অচিন্ত্য (সাধনার) যোগী
 অঙ্ক (৩৭), আঙ্ক
 অঙ্কতে (৪৩), থাকতে
 অঙ্কম (২৯), থাকি
 অঙ্কসি (৪১), থাক
 অঙ্কহ (৬), আঙ্কি
 অঙ্কিলেসু (৩৫), ছিলাম
 অঙ্কিলেস (৩৭), ছিলে
 অঞ্জরামর (৩, ২২), অঞ্জরামর, জরা মৃত্যুহীন
 অট (১৫), অট
 অট (১৩), অট
 অটকুমারী (১৩), অট কুমারী
 অণ (৩৮), অন্য
 অণ উপাএ (৩৮), অন্য উপায়ে
 অণহা (১৭), অনাহত
 অণুঅনা (৪১, ৪৪), অনুৎপন্ন
 অণুদিন (৫০), প্রতিদিন
 অদঅ (৪৯), অদয়
 অদঅভূত, অদঅভূত (৩০, ৩৯), অভূত
 অদশ (৪৬), অ-দৃষ্ট, না দেখা
 অধ (২, ২৭), অর্ধ
 অধরাতি (২, ২৭), অর্ধরাতি
 অধ্যাতা (৪৪), আত্মবোধ, আধ্যাত্মিকতা
 অনহ, অনহা (১১, ১৬), অনাহত
 (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)

অনাবাটা (১৫), অনাবর্ত, পথপ্রান্ত
 অনুদিন (৪৩), প্রতিদিন
 অনুত্তর (৫, ৩৪), অনুত্তর, সর্বশ্রেষ্ঠ
 অনুভব (৩৭), অনুভব কর
 অন্ত (১৫), শেষ
 অন্তউড়ি (২০), অন্তঃপুর, আঁতুড়ঘর
 অন্তরালে (৪৬), আড়ালে, অন্তরে
 অন্তরে (১০), জন্যে, তরে
 অন্তে (১৮), শেষে
 অঙ্ককারা (৩০), অঙ্ককার
 অঙ্কারী (২১, ৫০), আঁধার (স্ত্রী)
 অপইঠাপ (৩৪), অপ্রতিষ্ঠান, অধিকারহীন
 অপপদ (৩, ২৬, ৩৯), আপন, আপনার
 অপপদ (৩, ২২, ৩৭), নিজে, নিজের মধ্যে
 অপদা অপা (৩২), নিজে নিজে
 অপনা (২২), নিজে
 অপা (৩১), আত্মা
 অপা (৩৯), আপনা থেকে
 অপে (৪), অপ, জল
 অগ্না (৩৯), আপনি, নিজে
 অবকাশ (৩৭), অবকাশ, সুযোগ
 অবগাগবগা (২১), আসা-যাওয়া
 অবগাগবগে (৭), আসা-যাওয়ায়
 অবগাগমণ (৩৬), আসা-যাওয়া
 অবগাগমণা (৪৬), আসা-যাওয়া
 অবধূতী (১৭), অবধূতী, সন্ন্যাসিনী
 অবধূতীমাগে (২৭), অবধূতী-মার্গে
 অবর (৩৪), অপর, অন্য
 অবরগা (১০), বর্ণহীন
 অবশ (১২), অবশ
 অবশ্যকরিআ (১২), অবশ করে
 অবসার (৩২), অবসৃত, অদৃশ্য
 অবসরি জাই (৩২), অবসৃত হয়, অদৃশ্য হয়ে যায়
 অভাগে (৩৫), দূর্তাগো, দূর্তাগ্যবশত
 অভাব (২৯), অনন্তিত্ব
 অভিগচারে (৩৪), অভিন্ন আচারের দ্বারা
 অমণ (২১), আমন (ধান)
 অমিঅ (২১), অমৃত

অমিআ (৩৯), অমৃত
 অম্বে (২২), আমরা
 অম্বে (৪), আমি
 অকু (৪), রাগ বিশেষ
 অলকু (১৫), অলক্ষ্য
 অলক্ষ্যচিত্ত (৩৪), যে চিত্ত অলক্ষ্যকে দেখে
 অলো (১৭), ওলো (সম্বোধন)
 অহনিসি (১৯), অহর্নিশি
 অহার (৩৫), আহার
 অহার কএলা (৩৫), আহার করলাম
 অহারিউ (১৯), আহার করেছি
 অহারিউ (২৬), খাওয়ানো হয়েছিল
 অহারিল (৩৫), আহার করলাম
 অহারি (৩৬), খাওয়া হল
 অহেই (২৩), আবেষ্টিক, শিকার
 অহেরি (৬), শিকারী
 আই (৪৩), আদি
 আইএ (৪১), আদিতে
 আইল (৩), এল
 আইলা (৭), এল
 আইলেসি (৪৪), এসেছ
 আইস (২৯, ৪১), এইরূপ
 আইসসি (১০), আসিস
 আকাশে (৪১), আকাশে
 আখি (১৫), আঁখি
 আগম (২৯), হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র-বিশেষ
 আগমপোষী (৪০), দ্র. আগম
 আগলি (১৮), সামনে
 আগি (৪৭), অগ্নি
 আগ্নন (২), অগ্নন
 আহুর্বে (৩৯), থাকতেও
 আহুই (৪৫),
 আজদেব (৩১), আর্ঘদেবপাত (পদকার)
 আজদেবে (৩১), আর্ঘদেবের ঘারা
 আজি (৪৯), আজ
 আণ (৪৫), অন্য
 আদঅ (৫), অদ্য
 আনন্দে (৩০), আনন্দের সঙ্গে
 আনুতু (১৯), অনুত্তর
 আবই (৪২), আসে
 আবয়ি (৪৬), আসে
 আবেরনী (৩৩), অতিথি (আবেশিক)
 আভরণে (১১), অলঙ্কার
 আম্বে (১, ১২), আমি, আমরা
 আর্ঘদেবপাদানাং (৩১), আর্ঘদেবপাদের
 আলাজালা (৪০), আলজাল (সংকল্প-বিকল্প-জাল)
 আলিকালি (১১, ১৭), স্বর-ব্যঞ্জন
 (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 আলিএ কালিএ (৭), দ্র. আলিকালি
 আলে (৪০), অলীক

আলো (১০), ওলো (সম্বোধন)
 আস (১), আশা
 আসব (৯), মদ, আসব
 আসা (৪৬), আশা
 আসু (২৬), আশ, তত্ত্ব
 আহার (২১), আহার
 ইচ্ছা (৩৯), ইন্দ্রিয়ের কামনা
 ইন্দি (৪৫), ইন্দ্রিয়
 ইন্দিঅ পবন (৩১), ইন্দ্রিয়-পবন (ইন্দ্রিয়জ স্বাস-প্রশ্বাস)
 ইন্দিআল (৩০), ইন্দ্রজাল
 ইন্দিজানী (৩৪), দ্র. ইন্দিআল
 ইন্দি-বিসআ (৪৯), ইন্দ্রিয়-বিষয়
 ইষ্টামালা (৪০), ইষ্টামালা, জপের মালা
 উআরি (১২), উপকারিক
 উআস (৭), উদাস
 উইআ (৪৫), উদিত হল
 উইজঅ (৪৪), উজ্জিয়ে চলে (শ্রোতের উল্টো দিকে চলে)
 উইসা (৩০), উদিত
 উএখী (১৬), উপেক্ষা করে
 উএলা (৫৩), উদিত হল
 উএস (৫২), উপদেশ
 উএসু (৪০), উপদেশ দেয়
 উএলিআ (১৯), উচ্ছলিত হয়ে
 উহারা (১৪), উচ্চবেলা, সন্ধ্যাবেলা
 উজাঅ (৩৮), উজ্জিয়ে যাওয়া (শ্রোতের উল্টো দিকে যাওয়া)
 উজু (১৫), ঋজু, সোজা
 উজু বাট (১৫, ৩২), ঋজু পথে, সোজা পথে
 উজু বাটে (১৫), ঋজু পথে, সোজা পথে
 উজু রে উজু (৩২), ঋজু রে ঋজু, সোজা রে সোজা
 উজলি (৩০), উজ্জল হয়
 উজল পাঞ্চল (২১), উজ্জল পাঞ্চল, উথাল পাঞ্চাল, চঞ্চল
 উজা উজা (২৮), উঁচু উঁচু
 উঠি (২১), উঠে
 উঠে গেলা (৪৭), উঠে গেল
 উদকচান্দ (২৯), জলে (প্রতিবিম্বিত) চাঁদ
 উনাকো (১৯), উন্নত
 উপাড়ি, উপাড়ী (৮, ৫০), উপড়ে ফেলে, উপড়ায়
 উবেসে (৮), উদ্দেশ্যে, উপদেশে
 উভিল (৪), ওড়ানো হল, উঁচু করা হল
 উমত (২৮), উন্নত
 উলাস (৩০), উল্লাস
 উল্হসিউ (২৭), উল্লসিত
 উহ (১৫, ২৯), উদ্দেশ, উহাতে
 উহ ৭ দিস (২৯), উদ্দেশ পাওয়া গেল না
 উহ ৭ বাণ (২১), বর্ণ বোঝা গেল না
 এ (৬, ২০, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৫০), এই
 এউ (১), এই
 এক (৩, ১০, ১৫), এক, একক
 এক তিল (১৫), এক মুহূর্ত

একাকারে (১১), এক আকারে
একু (২), একের
এক্ করিআ (৩৪), এক করে
একুমণা (২৩), একমন
একে (২৮), একক
একেলী (২৮), একলা
একেলে (৩৯), একলা
এ জগ (৪১), এই জগৎ
এড়ি (১), এড়িয়ে
এত (৩০), এত, এই
এতকাল (৩৫), এতকাল
এ তিণা (৩৩), এই তিন
এ তৈলোএ (৩০, ৪৩), এই ত্রিলোকে
এধু (১৬, ২০, ২২, ২৭), এথা, এখানে
এ বণ (২৮), এই বন
এবংকার (৯), 'এবং-কার এবং 'ব-কার, চন্দ্র ও সূর্য
(বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
এবে (৩৫), এবে, এখন
এষা (১৫), এখানে
এষু, এসু (৩৭, ৪৩), এরূপ
এহ (৪৪), এই
এহ (২৬), এরূপ

ওড়িআণে (৪), উড্ডীআনে, মহাসূচক্রে
(বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত আসনবিশেষ)

কইসন (২২), কিভাবে
কইসনি (১৮), কিরূপে
কইসা (৪০), কিরূপে
কইসে, কইসে (৮, ২৮, ২৯, ৩৯, ৪০, ৪১) কিরূপে
কংবা (২২, ৩৭), আকাজকা
কসুচিণা, কসুরিনা (৫০), ফল বা শব্দ বিশেষ
কঙ্কণ (৪৪), কঙ্কণপাদ (পদকার)
কট (৪১, ৪৩), আশ্চর্য
কঠ (১৮), কঠ
কঠে (২৮, ৫০), কঠে
কঠে লইআ (২৮), গলা জড়িয়ে ধরে
কণ্ডারা (১৫), কণকধারা
কদিনি (কহিনি) (২৩), কাহিনী
কপালী (১০), কাপালিক
কপাস্ (৫০), কার্পাস (তুলার গাছ)
কবড়ী (১৪), কড়ি (প্রাচীন মুদ্রা বিশেষ)
কবালী (১১), কাপালিক
কমল (৪, ২৭, ৪৭), পদ্মা
কমলিনী (২৭), পদ্মিনী (স্ত্রী)
কমলরস (৪), পদ্মমধু
কমলাধরপাদানাং (৮), কমলাধরপাদের (পদকার)
করঅ (২১), করে
করঅ আহারা (২১), আহার করে
করউ (২২), করুণক (ইচ্ছাসূচক)
করণক (১), করণের, ইন্দ্রিয়ের
করও (১৯), বাদ্যবিশেষ

করহ (১৭), করাসুলি (৭)
করহকলে (১৭), বাদ্যযন্ত্রে (৭)
করহা (১৭), দ্র. করহ
করই (৪), কর (আজ্ঞাসূচক), করি
করিঅ (১), করে
করিঅই (১), করা হয়
করিণা (৯), করী, হস্তী (পু.)
করিণিরে (৯), করিণীকে, হস্তিনীকে
করিব (৭, ৩৭), করবে, করব
করিব নিবাস (৭), বাস করবে
করিবে (১০), করব
করিহ (২১), করো (আজ্ঞা)
করুণ (৩০), করুণা (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
করুণ মেহ (৩০), করুণা মেহ
করুণা (৮, ১২, ১৩, ৩১), করুণা (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
কর্ণকুণ্ডল (২৮), কর্ণকুণ্ডল
কলএল (৪৪), কলকল (শব্দ)
কলিআ (২১), জেনে
কশালা (১৯), বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
কসণ (১৬), কসর
কহণ (২৫), কহর, বলা
কাহি, কাহি (৩১, ৪৯), কোথায়
কাহি গই, কাহি গই (৩১, ৪৯), কোথায় গিয়ে
কাহি (৭), কোথায়
কাহেই (২৭), কাহে
কহুজুরী (৪১), একটি রাগের নাম
কা (২, ৩৯), কি, কোথায়
কাঅ (১৩, ৩৮, ৪০, ৪৬), দেহ, কায়
কাঅবাক্চিঅ (৩৪), কায়-বাক-চিও
কাঅব (৪২), কাঅর
কাআ (১), কায়, দেহ
কাউই (২), কাকের
কাঙ্কণ (৩২), ৮৫, কঙ্কণ
কাঙ্কী (৮, ১৪), ২৭, ৪৩, কাছি (বাঁধবার মোটা দড়ি)
কাজ (১৮), ৫৫, কাজ
কাজ ন কারণ (১৮, ২৬), ৫৫, ৭০ না কাজে না কারণে,
অহেতুক
কাণেট (২), ৮, কর্ণভর (কানবালা বা মাকড়ী)
কান্দশ (৫০), ১২৬, কাঁদছিল
কাঙ্ক (৩), ১১, কঙ্ক, কাঁধ
কাঙ্ক (৪২), ১১১, কঙ্ক শাখা
কাপালি, কাপালী (১০, ১১), ৩২, ৩৫, কাপালিক
কাপুর (২৮), ৭৫, কর্পূর
কাবালী (১৮), ৫৫, কাপালিক
কাম (১৮), সজ্জোগোষ্ঠা, রতি
কাম (২২), ৬৬, কর্ম
কাম চণ্ডালী (১৮), ৫৫, কামার্তা চণ্ডালী
কামরু (২), ৮, কামরূপ, কামের রাজ্য
কামলি (৮), ২৭, কমলাধরপাদ (পদকার)
কামে (২২), ৬৬, কর্মের কারণে
কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭, ৪২), ৪০, ৭২, ৯৭, ১১১, রোগবিশেষ

কারণ (১৮), ৫৫, কারণ
 কাল (১), ২, সময়, সংহারক
 কাল (২১), ৬৩, কৃষ্ণবর্ণ
 কালে (৪০), ১০৬ বধিরকে
 কাসু (২৩), ৬৮, কার
 কাহরি (১০), ৩২, কার
 কাহি (১), ২, কেন
 কাহি (৪৩), ১১৩, কোথায়
 কাহি (৩৭), ৯৭, কিরূপে
 কাহিব (৪০), বলা হবে
 কাহেরি (৩৭), কার
 কাহেরে (২৯), কাকে
 কাহেরি (৬), কাকে
 কাহু, কাহু (৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ৪০, ৪৩, ৪৫),
 কাহুপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ (পদকার)
 কাহুপাদানাং (৭, ৯, ৪০, ৪২), কাহুপাদের, কৃষ্ণাচার্যপাদের
 কাহি (৭), ম্র. কাহু
 কাহিলি (১৩, ৩৬, ৪২), কাহুপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ
 কাহে (১৮), কাহুপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ
 কি (৮, ৩৩, ৩৯, ৪২), কি (প্রশ্নবোধক অব্যয়)
 কি (২২), অথবা
 কিঅ (১৩), করা হয়
 কিঅ (১৯), করলাম, দিলাম
 কিঅত (১৭), করা হল
 কিউ (১১), করা হয়
 কিং তং (৪১), কিরূপে তাকে
 কিংপি (৫০), কিছুই
 কিং (২৬), কেন (প্রশ্ন)
 কিঙ্কো (৩৪), কি হয় (প্রশ্ন)
 কিম্পি (১৬, ২২, ৪৯), কিভাবে (প্রশ্ন) কোনও কিছু
 কির (১৬), রশ্মি
 কিষ (২৯), কি (প্রশ্ন)
 কিষভণি (২৯), কি ব'লে (প্রশ্ন)
 কীস (৬, ৪০), কিভাবে
 কুতুরীপা (২০), কুতুরীপাদ (পদকার)
 কুতুরীপাএ (২), কুতুরীপাদ-কর্তৃক
 কুতুরীপাদানাং (২, ২০), কুতুরীপাদের
 কুঠাব (৪৫), কুড়ুল
 কুঠারৈ (৪৫), কুড়ুল দ্বারা
 কুড়িআ (১০), কুড়ৈঘর
 কুণ্ডল (১১), কর্ণভরণ
 কুণ্ডবা (৩৯), কুটুঘ
 কুন্দুরে (৪), কামকেনিতে
 কুঞ্জীয়ে (২), কুম্বীয়ে
 কুল (৩৮), তীর, উপকূল
 কুলিগজ্ঞ (১৮), কুলীন ব্যক্তি
 কুলিশ (৪, ৪৭), বজ্র
 কুলে কুল, কুলে কুল (১৪, ১৫), কুলের কাছে
 কৃষ্ণপাদানাং (১২, ১৯), কৃষ্ণাচার্যপাদের (পদকার)
 কৃষ্ণাপাদানাং (১৩), কৃষ্ণাচার্যপাদের (পদকার)
 কৃষ্ণবজ্রপাদানাং (১৮), কৃষ্ণবজ্রপাদের (পদকার)

কৃষ্ণাচার্যপাদানাং (১১), কৃষ্ণাচার্যপাদের (পদকার)
 কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ (৩৬), কৃষ্ণাচার্যপাদের (পদকার)
 কেঁ (৮), কেউ
 কেড়আল (৮, ১৩, ১৪), দাঁড়, বৈঠা
 কেলি (৪১), সুরতঞ্জীড়া
 কেলি করই (৪১), কেলি করে (প্রেমের খেলা খেলে)
 কেহো কেহো (১৮), কেউ কেউ
 কো (২৯), কে
 কোই (৪২), কেউ
 কোএ (৪৩), কে
 কোঙ্কণপাদানাং (৪৪), কঙ্কণপাদের (পদকার)
 কোঠা (১২), কামরা
 কোডি (২), কোটি
 কোঙ্কা (৪), চাবি
 কোঙ্কাতাল (৪), চাবি-তাল
 কোবি (১৬), কেউ
 কোহিঅ (৫), কবে শক্ত করে

খ (৫০), শূন্য আকাশ
 খটে (১১), খাটে
 খড় (১৫), খড়, কৃষ্ণাঙ্কুর
 খণ্ড (২), খণ্ড করে
 খণ্ড খণ্ডই (৪, ৬, ১৯), ক্ষণেকের জন্য
 খয়স (২০), ক্ষণিক (বৌদ্ধ শ্রমণ)
 খট্টানা (১৬), বস্ত্র
 খর (১৬), প্রখর
 খরজালা (৪৭), প্রখর জ্বালা
 খরতড়ি (১৫), এবড়ো খুবড়ো (৭)
 খররবি (১৬), প্রখর সূর্য
 খরে সোস্তে (৩৮), বজ্রস্রোতে
 খ-সম (৪৩), শূন্যস্থান
 খ-সমে (৫০), শূন্যসম
 খাঅ (২, ১০), ৮, ৩২, খাস খায়
 খাই (২৮), ৭৫, খায়
 খাই (৪১), ১০৮, খায়, দংশন করে
 খাট (২৮), ৭৫, তক্তপোষ (শয়নের ঢোকা)
 খাণ্ডি (৩৮), দস্যু
 খাণ্ডি (৩৮), খাণ্ডি
 খাইব (৩৯), খাব
 খাল-বিখলা (৩২), খাল-নাল
 খুন্টি (৮), খুন্টি, (নোঙর করবার) খোঁটা
 খুর (৬), খুর
 ছোড়া (৪১), খেলা
 খেলই (৪১), খেলে
 খেপই (৪), ক্ষেপণ থেকে
 খেলই (১২), খেলি

গঅণ (৮, ১৬, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৪৭), গগন
 গঅণ-টাকলি (১৬), গগন-চূড়া
 গঅণত (২৮, ৩৪, ৩৫), গগনে, গগনের
 গঅণত গঅণত (৫০), গগনে গগনে (গগন-কিনারে)
 গঅণ দখোলে (১৪), গগন-সেঁউতিদ্বারা

গজণ-সমুদে (৩৫), গগন-সমুদ্রে

গজগহ (৩০), গগনে

গজগা (৩৯), গগন

গজগান্ধ (১৬), গগনান্ধ

গজগে (২১, ৩৮), গগনে

গজবর (১৭), গজবর

গজবরে (১২), গজবরে (দাবাবেলায়)

গই (২, ৭, ১৬), গিয়ে

গউ (২৭), গিয়েছিল

গউড় (১৮), গৌড় (রাগ)

গঙ্গা (১৪), গঙ্গা (নদী)

গঞ্জিই (৩৫), গজায়, আবিস্কৃত হয়

গড়ই (৫), গড়ে

গন্ধ (১৩), গন্ধ

গন্ধনইরী (৪১), গন্ধর্ব নগরী

গবড়া (২, ৩), গৌড় (১) রাগিনী

গবিসা (৩৩), গাভী

গজীর (৫), গজীর, গভীর

গরাহক (৩), গ্রাহক

গরুআ (২৮), গরু, অত্যধিক

গলপাস (৩৭), গলসী, গলায় দড়ি

গলে (৩৭), গলাতে, কঠে

গহণ (৫), গভীর

গাই (১৮), গান করে, গায়

গাইড় (২), গাইল, গাওয়া হল

গাজই (১৬), গর্জন করে

গাতী (২১), গর্ত

গাছী (১৭), গান করে

গিবত (২৮), গ্রীবাতে, কঠে গিরিবর (৩৩) গরিবর

গিরিবরসিহরসন্ধি (২৮), গিরিবর-শিখর-সন্ধি

গিলেসি (৩৯), গিলিস্

গীত (৩৩), গীত, গান

গুজরী (২২), গুজরী (গুজরী রাগ?)

গুজরী মালী (২৮), গুজা (১) ফুলের মালা

গুডরী (৪), গুডরীপাদ (পদকার)

গুনিআ (১২, ১৭), গণনা করে

গুনিআ লেই (১২), গুণে নিলাম

গুণে (৩৮), গুণ (ব্রহ্ম)-চার

গুডরীপাদানাং (৪), গুডরীপাদের (পদকার)

গুমা (১৫), গুমকরা, লুকোনো

গুরু (১, ৪০, ৪৫), গুরু, আচার্য

গুরুবষণ (৩৯), গুরুবচন, গুরুর উপদেশ

গুরুবাক (২৮), গুরু বাক্য গুরুর উপদেশ

গুজরী (৫), গুজরী

গুহাডা (২৮), দোহাই

গেলা (৭, ১৫), গেল

গেলী (৮), বিগত

গো (২০), গো (সম্বোধন সূচক অব্যয়)

গোহালী (৩৯), গোয়াল

ঘড়িয়ে (৩), ঘড়াতে

ঘড়লি (৩), ঘড়লি

ঘণ (১৬), ঘন মেঘ

ঘন্টা (১১), ঘন্টার শব্দ

ঘন্টা নেউর (১১), ঘন্টারোধা নুপুর

ঘর (২, ৩৩), ঘর, বাড়ি

ঘরনী (২৮), গৃহিনী, ঘরনী

ঘরিনী (৪৯), গৃহিনী ঘরনী

ঘরে (৩, ১১), গৃহে

ঘলিলি (১০), (হারের মালা) পরলাম

ঘাট (১৫), ঘাট

ঘাট (৪), ঘোঁটা, মথন করা

ঘারে পারে (৩৯), ঘরে-বাইরে, ঘরে-পরে

ঘালি (৪), (তাপাচাষ) লাগল

ঘিণিমেলি (৬), গ্রহণ-বর্জন করে

ঘুও (৩৯), ঘুরতে

ঘুমই (৩৬), ঘুমন্ত

ঘোরিঅ (৩৬), ঘুরছে

ঘোলই (১৬), ঘোলায়, মছন করে

ঘোলিউ (১২), ঘায়েল করলাম

চউ (৮), চার

চউকোউ (৪৯), চার কোটি

চউকি (৪৪), চার মুহূর্ত

চউসিসে (৮), চতুর্দিকে

চউসটি (১২), চৌষটি

চউসটি (৩), চৌষটি

চকা (১৪), চাকা

চক্কল (১, ২১), অস্থির

চটারিউ (২৬), চটিয়ে (ডেসে) দিলাম

চড়ি (১০), চড়ে

চড়িলা (১৪), চড়ল

চড়িলে (৫, ৮), চড়লে

চণ্ডালী (৪৬, ৪৯), নিম্ন হিন্দুজাতি বিশেষ (স্ত্রী)

চন্দ-সুজ (১৪), চাঁদ-সূর্য

চমকিই (৪১), চম্কায়ে

চরঅ (২১), চরে

চর্যা (২), চর্যাপান

চলিল (১৩), চলল

চলিলা (১৯), চলল

চাকি (১৭), চাকা

চাঙ্গেড়া (১০), (বাঁশের) চাষাড়ি

চাটিল (৫), চাটিল্পাদ (পদকার)

চাটিল্পাদানাং (৫), চাটিল্পাদের

চান্দ (৪), চাঁদ

চান্দকান্দি (৩১), চাঁদের কিরণ

চান্দরে (৩১), চাঁদের

চন্দে (৩০), চাঁদ

চাপী (৪, ৮), চেপে, এড়িয়ে

চারা (২১), চলাফেরা

চারিবাসে (৫০), চতুর্থ বাসস্থানে

চাল (৩), চালনা কর (নির্দেশক)

চালিউ (২৭), চালিত হল

চাহঅ (৮), দেখা যায়, লক্ষ করা যায়

চাহতে (৪৪), চাইতে
 চাহতে চাহতে (৩১), চাইতে চাইতে, দেখতে দেখতে
 চাহাম (২০), চেয়েছি
 চাহি (২০), চাই, চাইছি
 চিঅ (৩৯, ৪০, ৪২, ৪৬, ৪৯), চিস্ত, মন
 চিঅকগুহার (১৩), চিস্ত-কর্ণধার
 চিঅগঅন্না (১৬), চিস্ত-গজেন্দ্র
 চিঅবিকিরণে (৩১), চিস্তের বিকিরণে
 চিঅবিহনে (৩৫), চিস্তবিহীনভাবে
 চিঅরাঅ (৩২, ৩৫), চিস্তরাজ
 চিখিল (৫), কর্দম
 চিস্ত (১৬), চিস্ত, মন
 চিহ্ন, চিহ্ন (৩, ২৯), চিহ্ন, নিদর্শন
 চীঅ (৩৮), চিস্ত
 চীঅণ (৩), চিকণ, সূক্ষ্ম
 চীএ (১), চিস্তে
 চীরা (৪), বস্ত্র, পুরুষাঙ্গ
 চুড়িলি (১৪), চড়িলি (স্ত্রী)
 চুখী (৪), চুখন করে
 চেঅণ (৩৬), চেতনা
 চেবই (১৪, ৩৪), তাকিয়ে, চেতনা
 চোরে (২), চোরের দ্বারা
 চৌকোড়হি (৩৭), চতুর্কোটি, চার শ্রাঙ্গ
 চৌদীস (৬), চারদিক
 চৌর (৩৩), চোর
 চৌরি (২), চোরের দ্বারা
 চৌসর্গঠি (১০), চৌকরি

ছড়গই (৯), ষট্গতি
 ছন্দা (১৪), স্বচ্ছন্দে
 ছাঅা (৪৬), ছায়া
 ছাইলী (২৮), ছাইল
 ছাড়অ (৬, ১৯), ছাড়ে, ছড়ায়
 ছাড়ি (১০, ৩২), ছাড়ি (উত্তম পু.) ছেড়ে
 ছাড়িঅ (৩১), পরিত্যাগ কর, ছাড়ো (অনুজ্ঞা)
 ছাড়ী (৬, ১৫), ছেড়ে
 ছাড়ু ছাড়ু (৫০), ছাড়ো ছাড়ো (অনুজ্ঞা)
 ছান্দক (১), ছন্দের
 ছার (১১), ছাই
 ছিজঅ (৪৫), ছিন্ন করে
 ছিজই (৪৬), ছিন্ন হয়
 ছিগালী (১৮), অষ্টা নারী
 ছুধ (৯), ক্ষুধ
 ছুণই (৬), ছোঁয়, স্পর্শ করে
 ছেবই (৪৫), ছেদন করে
 ছেব-ভেবউ (৪৫), ছেদ-বিভেদ করে
 ছেবহ (৪৫), ছেদন কর (অনুজ্ঞা)
 ছোই ছোই (১০), ছুঁয়ে ছুঁয়ে

জ (২৬), যার
 জঅ জঅ (১৯), জয় জয়
 জঅনন্দি (৪৬), জয়নন্দীপাদ (পদকার)

জই (৫, ২৩, ৪১, ৪৬), যদি, যখন, যারা
 জইস (৪১), যেরূপ
 জইসনে (৩৭), যেরূপে
 জইসা (৪০, ৪৬), যেরূপে, যেরূপ
 জইসো (১৩, ২২, ৩৭), যেরূপ
 জইসো তইসো (১৩), যেরূপ সেরূপ
 জউগা (১৪), যমুনা (নদী)
 জউতুকে (১৯), যৌতুক
 জগ (৩৯, ৪১), জগৎ
 জগপুগাহি (জাস্ গাহি) (৪৩), যার নেই
 জথা (৪৪), যেখান থেকে
 জবে, জবে (১৭, ২১, ৪৪), যখন
 জয়নন্দীপাদানাং (৪৬), জয়নন্দীপাদের (পদকারের নাম)
 জলবিষাকারে (৩৯), জল-বুদ্বুদের ন্যায়
 জলিঅ (৪৭), জলন্ত, প্রজ্বলিত
 জলে (৪৩), জলেতে
 জসু (৪০), যেখানে
 জহি (৩১), যখন
 জা (২০, ২২, ২৯), যা, যার
 জাঅ (২, ১৯, ৪৫), যায়, অভিবাহিত হয়
 জাঅন্তে (১৫), যেতে
 জাই (৩০, ৪২, ৪৩), যায়
 জাইগ (৪২), যায়না
 জাইট (১৫), যাস্
 জাইব (১৪), যাব
 জাইবে (২৩), যাবে
 জাউ (৩৮), যায়
 জাংতে (১৫), যেতে
 জাগঅ (২), জাগ্রত
 জাগন্তে (৫০), জেগে
 জাগই (৪৫), জানে
 জাগমি (৩১, ৪৯), জানি
 জাগী (৬, ৩৭), জানে, জানা (জ্ঞাত)
 জান (১, ৪৪), জানো
 জানই (২২), জানি
 জাম (৮, ১৯, ২২, ৪৩), জনা
 জামে (২২), জনের জনা
 জায়া (৩৯), পত্নী
 জা লই (২৯), যা নিয়ে
 জালকরীপাত্র (৩৬), জালকরীপাদে (বৌদ্ধ আচার্যের নাম)
 জাসি (১০), যাস্
 জাস্ (৩০, ৪৩), যা, যার
 জাহি (৫), যাও
 জাহ (৩২), যাও
 জাহের (২৯), যার
 জিণ (৪০), জয়
 জিণউর (১৪), জিনপুর (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 জিণরঅণ (৪০), জিনরত্ন (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 জিতা (১২), জিতে নিলাম
 জিভেল (১২), জয় করা হল
 জিনউড়, জিনউব (৭, ১২), জিনপুর (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)

জিম (২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৪৩), যেরূপ

জিম করি (১৩), যেমন করে

জিম জিম (৯), যখন যখন

জীবন্তে (২২, ২৩, ৪৯), জীবিত, যে জীবিত

জীবমি (৪), বাঁচব

জুজুতি (২৬), যুক্তি

জুজুজ (৩৩), যোঁকে, যুদ্ধ করে

জে, জেঁ (৩, ২২), যে

জে. জে (৭, ১৫), যে যে, যারা

জেন (২১), যেন

জেতই (৪০), যত

জো (৭, ১৪, ১৯, ২০, ২৭, ৩২, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৫,

৪৯), যে, যা

জোই (১০), যে

জোই (১৯, ৩০, ৩৭, ৪২), যোগী

জোইআ (২১), যোগী

জোইআরে (৪১), রে যোগী

জোইগীজালে (১৯), যোগিনীর (ইন্দ্র) জালে

জোই নী (৪), যোগিনী

জোই (৩৭), যোগী

জোড়ি (৫), জোড়া লাগিয়ে জুড়ে

জো জো (৩৩), যে সে

জোহ বাড়ী (৫০), জ্যোৎস্না বাড়ী

জৌবন (২০), যৌবন

ঝাণ বঝাণে (৩৪), ধ্যানব্যায়্যানে

টলি (৩১), টলে পড়ে

টলিআ (৪৩), টলে

টলিআ (৩৫), টলে', ভারসাম্য হারিয়ে

টাসী (৫), কুঠার

টাণঅ (৩৮), টানে

টাল (৪০), অসংলগ্ন, টালমাটাল

টালত (৩৩), টালের উপর, টিলাতে

টালিউ (১৮), টলাইলি, স্থলন করলি

টুটি গেলি (৩৭), টুটে গেল

টেক্টপাএর (৩৩), টেক্টপাদের (পদকার)

টেক্টপাদানাং (৩৩), টেক্টপাদের (পদকার)

ঠাকুর (১২), কর্তা

ঠাকুরক (১২), ঠাকুরের, কর্তার

ঠাণা (২৯), স্থানের

ঠাবী (৮), ঠাই

ডমরু (১১), ডমরু (বাদ্যবিশেষ)

ডমরুলি (৩১), ছোট ডমরু

ডরে (২), ডয়ে

ডহি (৪৯), দধি

ডাক (৬), হাঁক, চিৎকার

ডাক পড়অ (৬), হাঁক পড়ল, চিৎকার উঠল

ডাল (১, ৪৫), শাখা

ডালী (২৮), শাখা

ডাহ (৫০), দাহ, দহ

ডাহ কএলা (৫০), দাহ করল

ডোংবিত (১৮), ডোম নারীর চেয়ে

ডোষী, ডোষী (১০, ১৪, ১৮, ১৯, ৪৭), ডোম নারী

ডোষীএর সঙ্গে (১৯), ডোমনারীর সঙ্গে

ডোষীঘরে (৪৭), ডোমনারীর ঘরে

ণ (১৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬,

৪৭), না (নিষেধার্থে)

ণঅণি (২৩), রজনী

ণউ (৪৭), না (নিষেধার্থক)

ণ আই (১৪, ২৯), জানেনা, যায়না

ণ জানসি (৩১, ৪৯), জানিনা

ণ জানী (২৯), জানা নেই

ণঠা (৩১, ৩৫, ৪৯), নষ্ট

ণ থাকিউ (৪৯), কিছু থাকল না

ণ দিস (২৯), দৃষ্ট নয়, দেখা যায়না

ণ দে (৩০), দেয়না

ণ রাহঅ (৩৬), না রয়, থাকেনা

ণ হোই (৪৬), হয়না

ণাবড়হি (৩৮), নৌকা

ণাবী (১৩), নৌকা, নাও

ণাণা (২০), শানা, বহুবিধ

ণাহি (২৯, ৪৩), নয়, নাই

ণিজ (২৩, ৪৯), নিজ

ণিজমণে (২৮), নিজমনে

ণিজমণে বাণে (২৮), নিজমন-রূপ বাণের দ্বারা

ণিংদ (১৩), নিদ্রা

ণিবানা (১৬), নির্বাণ

ণিরবর (২৬), নিরবয়ব, কায়াহীন

ণিরেবণ (৫০), নির্বাণ

ণিলেসি (৩৯), নিয়েছিস

তই (৪, ১৮), তোকে, তোমাকে, তুই

তইলা (৫০), ত্রিতল (বাড়ী)

তইলা বাড়ী (৫০), ত্রিতল বাড়ী

তইলা বাড়ীর (৫০), ত্রিতল বাড়ীর

তইসনে (৩৭), সেই রূপে, সেভাবে

তইসা (৪৬), সরুপ

তইসো (২২, ৩৭), সরুপ

তউষে (২৬), সেই পথে

তড়ি (১৫), ঝাঁদ, গর্ত (৭)

তথতা (৯, ৩৬, ৪৪, ৪৬), সত্যতা (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)

তথতাস্থভাবে (৪৬), সত্যতার স্বভাবে (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)

তথা (৪৪), সেখানে

তথাগত (১৩), বুদ্ধ

তত্তে (৩৪), তত্তে

তব (২১), তখন, তবু

তবেঁ (২১, ৪৪, ৪৬), তখন

তরই (৫), পার হয়

তরংগতেঁ (৬), তরঙ্গতে

তরঙ্গম (১৩), তরঙ্গ, ঢেউ

তরিত্তা (১২), তরল, পার হল

তরু (৪৫), বৃক্ষ
 তরুণ (১, ২৮, ৪৫), সুবৃক্ষ
 তসু (২৭, ৪৫), তার, তাদের
 তহি, তহি, তহি (১০, ১৪, ২৮, ৩১, ৪৩, ৫০), সেখানে,
 তার উপর, সেরূপ
 তা (৭, ১৬, ৩৭, ৪৫, ৫০), তাই
 তাএলা (উএলা) (৫০), উদিত হল
 তাড়ক (৩৭), তাড়কপাদ (পদকার)
 তাড়কপাদানাং (৩৭), তাড়কপাদের (সং)
 তান্তি (১০), তন্ত্রী, তার
 তান্ত্রিখনি (১৭), তন্ত্রীক্ষনি
 তান্ত্রী (১৭), তন্ত্রী, তার
 তাহের (২৯), তার
 তিঅ (২৮), তিন
 তিঅডা (৪), ত্রিবৃতক, তিয়ড়া
 তিঅধাউ (২৮), ত্রিধাতু
 তিঅধাএ (২৯), ত্রিধাতুতে তৈত্রী
 তিঅস (২২), ত্রিদশক, (শৈশব, বাল্যকাল ও যৌবন)
 তিড়িঅ (১৬), তোড়িআ, ছিন্নকরে
 তিণ (৬), তৃণ
 তিণি (১৮), তিন
 তিনি (৭), তিন
 তিনিএ (১৬), তিনেতে
 তিনিহো (৭), তিনিই
 তিম (৪৩), তেমনি
 তিমই (৪৬), প্রাবিত হয়
 তিম তিম (৯), তেমন তেমন
 তিল (১৫), তিল পরিমাণ
 তিসরণ (১৩), ত্রিশরণ (কায়-বাক-চিত্ত)
 তিহরণ, তিহরণ (১৬, ৩৬), ত্রিভুবন
 তু (৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ৩২), তুই
 তুটঅ (২১), টুটে, ছিন্ন হয়
 তুটই, তুটই (৩০, ৪২, ৪৬), টুটে, ছিন্ন হয়
 তুমহে (৫, ২৩), তুমি
 তুলা (২৬), তুলা
 তুসে (১৬), তুম্বায়
 তে (৭, ২২), সে, তারা
 তে তে (৭), তারা সকলে
 তেতবি (৪০), ততটা
 তেত্তলি (২), তেত্তল
 তৈলোএ (৪২), ত্রিলোকে
 তো (৪, ১০, ৪১), তোকে, তোমাকে, তোমার, তোমার
 তোএ সম (১০), তোমার সঙ্গে
 তোড়িআ (১২), ভেঙে (সজোরে)
 তোড়িউ (৯), ভেঙে (সজোরে)
 তোরা (৪১), তোমার
 তোরে (১৮), তোমার
 তোলা (৫০), তুলে
 তোলাআ (১২), তুলে
 তোহোর (১০, ৩৯), তোমার
 তোহোর অন্তরে (১০) তোমার অন্তরে

তোহোরি (১০, ১৮, ৩৯), তোমার
 তোহোরে (১৮), তোমাকে
 থাকিব (৩৯), থাকবি
 থাকী (৪৪), থেকে
 থাকী (২১), হয়
 থাহা (১৫), থাই
 থাহী (৫), ঠাই, তলদেশ
 থিরা (২০), স্থির
 থিরকরি (৩, ৩৮), স্থির করে, মনঃসংযোগ করে
 থোই (৮), রেখে, থুয়ে

দমঙ্ক (৯), দমিত
 দলিআ (৩০), দলে, বিদলিত করে
 দশ দিসে (৯), দশ দিকে
 দশমি (৩), দশমী
 দশবল (৯), দশবল, বুদ্ধ
 দহদিহ (৩৫), দশমিক
 দহদিহে (৫০), দশদিকে
 দাচই (৪৬, ৪৭), দহ, দাহ করে
 দাকী (১৭), দহ, বৌগাংয়ের কাঠ নির্মিত দণ্ড
 দান (১২), দিবা খেলায়) দান
 দাপণ (১৩), দর্পণ
 দাপাফিন (৪১), দর্পণের প্রতিবিম্ব
 দারিক (৩৪), দারিকপাদ (পদকার)
 দারিকপাদানাং (৩৪), দারিকপাদের (পদকার)
 দাহিণ, দাহিন (৫, ৮, ১৪, ১৫, ৩২), দক্ষিণ দিক, ডান দিক
 দাহিণ-বাম (৫), ডান ও বাম দিক
 দিআ (৫০), দিয়ে, সহায়তায়
 দিআ চঙ্কালী (৫০), (বিশের) চট্টারি দিয়ে
 দিঠ, দিঠা (১, ১৬, ৪২), দৃষ্ট, দৃশ্য
 দিঠ নাঠ (৪২), নষ্ট দৃশ্য, ধ্বংসের দৃশ্য
 দিঢ় (১, ১১, ৪১), দৃঢ়
 দিঢ় করিঅ (১), দৃঢ় করে
 দিঢ়ি (৫), দৃঢ়
 দিখলি (৫০), দেওয়া হল
 দিবসই (২), দিনে
 দিবি (২৯), দেওয়া হবে
 দিবি পিরিচ্ছা (২৯), প্রশ্ন (এর উত্তর) দেওয়া হবে
 দিল (৩৫), দিয়েছিল
 দিল ভণিআ (৩৫), বলে দিল
 দিশই (৪৭), দেখা হল
 দিসঅ (৬, ২৬), দেখা হল
 দিসই (১৫, ৩৯), দেখা হল, মনে হল
 দীঢ়া হই (৪৭), দৃষ্ট হয়
 দীস অ (১৫), দৃষ্ট হয়
 দুআ (১২), দৈত
 দুআঙে (৫), দুই প্রান্তে
 দুআরত (৩), দুয়ারেতে
 দুই (৩, ১৪, ২৬), দুই
 দুংদুহি (১৯), দুন্দুভি
 দুবেতে (১), দুবেতে

দুখোলে (১৪), সেইতিতে
 দুচ্ছন (৩২), দুর্জন
 দুঠ, দুঠা (৩৯), দুষ্ট
 দুধ, দুধু (৪২, ৩৩), দুধ
 দুন্দোলি (দুন্দোলি) (৫০), দ্বন্দুকারী
 দুলাব (৩৪), দুলাক
 দুর্বে (৩৪), দুর্গে
 দুর্বে সুখে (৩৪), দুর্গে-সুখে
 দূর (৩১), দূর
 দূর নিবারিউ (৩১), দূরে নিষ্কিণ্ড
 দুর্লক (২৯), দুর্লক
 দুলা (২), কচ্ছপী (ত্রী)
 দুধাধী (৩৩), প্রহরী
 দুহি (২), দোহন করে
 দুহিএ (৩৩), দোহন করা হয় দুহিল (৩৩) দোহনকৃত
 দূর (৫), দূর
 দূঢ় (৩, ৯), দূঢ়
 দূঢ় কাক (৩), দূঢ় কক
 দে (৪), (তুই) দে (আদেশার্থক)
 দেবই (৪২), দেবা যায়
 দেবইআ (৩), দেবিয়া, দেখে
 দেখি (৭), দেখে
 দেখিল (৩৬), দেখলাম
 দেখী (১৬), দেখা যায়
 দেট (৩), প্রদর্শিত
 দেবক্রী (৮), দেবক্রী (রাগ বিশেষ)
 দেবী (১৭), দেবী (নৈরাখা)
 দেশ (১১), দেশ, ঘণা
 দেশ (৪৯), দেশ, ভূমি
 দেশাখ (১০, ৩২), ৮৫, দেশাখ (রাগ বিশেষ)
 দেহ (১১, ১৩), দেহ, শরীর
 দেহ নঅরী (১১), দেহ নগরী
 দেহ (১২), দিয়েছি
 দো (১৫), দুই
 দো বাটা (১৫), দুই বর্ত, দুই পথ
 দোসে (৩৯), দোষের জন্য
 দ্বন্দল (৩০), দ্বন্দু
 দ্বাদশ (৩৪), দ্বাদশ
 ধনসী (১৪), ধানসী (রাগ বিশেষ)
 ধমণ চমণ (১), ধাস-প্রধাস (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 ধর (৩৮), ধর, গ্রহণ কর
 ধরণ (২), ধরানো
 ধরহ (৩৮), (ভূমি) ধর (আদেশার্থক)
 ধরিঅ (১১), ধরে, পরিয়া
 ধাম পাদানাং (৪৭), ধামপাদের (পদকার)
 ধান (২১), ধান
 ধাবই (১৬), ধাবিত হয়
 ধাম (১৯), ধর্ম
 ধাম (২২), ধাম, বাসস্থান
 ধাম (৪৪), গুণ

ধাম (৪৭), ধামাদ (পদকার)
 ধামার্থে (৫), ধর্মের জন্য
 ধুগি ধুগি (২৬), (তুলা) ধুনে ধুনে
 ধুম (৪৭), ধোয়া
 ধ্রু, ধ্রু (১-৫০), ধ্রুবপদ
 ন (২০), নব, নুতন
 ন (৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৬, ৪৫, ৪৬), না
 ন (২৯), অথবা
 ন আর্থে (৩৮), অন্যকে নয়
 নইরামনি (২৮, ৫০), নেরাখা (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 নখলি (২০), খনন করি
 নগর (১০), নগর, শহর
 ন চেবই (৩৬), অচেতন, জ্ঞানত নয়
 নচ্ছংগে (৪২), না আছে, নেই
 ন জাই (৪, ১৫, ২০), যায়না
 ন জাই (২), সম্ভবপর নয়
 ন জাই (৩৮), পৌছায়না
 ন জৌবন (২০), নব যৌবন
 নড় পেড়া (১০), নট-পেটিকা
 ন দিশতা (২০), দৃষ্ট নয়, দেখা যায়না
 ননন্দ (১১), নন্দ
 ন পেরই (৪২), দেখেনা
 ন পুণ (৪৭), নয় প্রকার গুণ
 ন বেঅণ (৩৬), বেদনা নয়
 ন ভুলাহ (১৫), ভুলোনা
 নয় (১২), নয় (সংখ্যা)
 নয় বল (১২), নয়টি বল (দাবা খেলায়)
 নরঅ (৪), নর, পুরুষ
 নলগীবন (২৩), পদ্মবন
 নলিনীবন (৯), পদ্মবন
 ন হোই (১৫, ২৯), হয়না
 ন হোস্তি (২২), হয়না
 নাই (১৪), নৌকা
 নাচঅ (১০), নাচে
 নাচস্তি (১৭), নাচছে
 নাড়ি (১১, ২০), নাড়ী, ধমনী (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 নাড়িআ (১০), নেড়ে, মস্তিস্কমস্তক সাধু
 নাড়ি শক্তি (১১), নাড়িশক্তি (বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার শক্তি বিশেষ)
 নাদ (৩২), নাদ, ধ্বনি (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 নাদে (৪৪), বিশেষ ধ্বনিত
 নাব (১৫), নৌকা
 নাবা (৮), নৌকা
 নাবে (১০), নৌকাতে
 নামে (২৮), নামেতে
 নায়ক (১৬), নেতা
 নারী (৪), নারী, স্ত্রীলোক
 নাল (৩), নল
 নার্নে (৪৭), নলের মধ্য দিয়ে
 নাশক (২১), নাশকারী
 নাসিঅ (৩৯), নাসিত

নাহা (১৫), নাথ, প্রভু
 নাহি (৩৮, ১৮, ২০, ৩৩, ৩৭, ৪২, ৪৯), না, নাই, নেই, নহে
 নাহিক (৮), নেই
 নাহি (৩৭), নেই, নয়
 নাহী (৩৮), নৌকা
 নিঅ (২৮), নিছ
 নিঅড় (১২), নিকটে
 নিঅড়ি (৭), নিকট
 নিঅড়ি (৫), নিকট
 নিঅড়ি (৩২), নিকটেই
 নিঅমন, নিঅমন (৩০, ৩২, ৩৯), নিঅমন
 নিঘিন (১০), নিঘণ, নির্জঙ্ঘ
 নিচ্চল (২১), নিচ্চল
 নিতি (৩৩), নিত্য
 নিতে নিতে (৩৩), নিত্য নিত্য
 নিদ গেলা (২, ৩৬), নিদ্রা গেল
 নিদালু (৩৬), নিদাল
 নিবাণে, নিবাণে (৫, ২৭, ৩৪), নির্বাণ, নির্বাণে (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 নিবারিউ (৩১), নিবারিত হল
 নিবিতা (৯), নিবৃত্ত
 বিবৃদ্ধি (৩৩), নিবৃত্তি, নির্বোধ
 নিভর (৫), নির্ভরতার সঙ্গে
 নিরন্তর (১৬, ৩০), নিরবচ্ছিন্ন
 নিরালে (৩১), নিরালায়
 নিরাসী (২০), নিরাশ, আশাহীন
 নির্বাণে (১৯), নির্বাণেতে (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 নিল (২), গ্রহণ করল
 নিলঅ (৬), নিলয়, বাসস্থান
 নিসারা (৩), নিঃসরণ, বের হওয়া
 নিসি অ (২১), নিশি
 নিহ (৩০), নিভৃত্ত
 নৌ (৪৬), না
 নৌকা (৩৮), নৌকা
 নৌবাহী (৩৮), মাঝি, নৌকাবাহক
 পইঠ (১৬), প্রবেশ করে
 পইঠা (১২, ১৬, ৩১, ৩৫, ৪৪, ৪৯), প্রবেশ করে, প্রবিশ্ত
 পইঠেল (৩), প্রবেশ করল
 পইঠো (১), প্রবিশ্ত
 পইসঅ (২৬), প্রবেশ করে, ঢোকে
 পইসই (৭), প্রবেশ করে
 পইসই (৬), প্রবেশ করে
 পইসন্তে (২৩, ২৮), প্রবেশ করতে, প্রবেশ করে
 পইসহিনি (২৩), প্রবেশ করল
 পইসি (৯), প্রবেশ করে,
 পউআ (৪৯), পদ্মখালে
 পউআ খালে (৪৯), পদ্মখালে
 পখা (৪), পাখা, পক্ষ
 পঞ্চ (১, ১৩, ১৬, ২৩, ৪৯), পাঁচ
 পঞ্চ জনা (২৩), পাঁচজন
 পঞ্চ পাটন (৪৯), পঞ্চপাট (পঞ্চ নগরী)
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চবিষয় (১৬), পঞ্চ বিষয়
 পটমঞ্জরী (১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬),
 পটমঞ্জরী (রাগ বিশেষ)
 পড়ন্তে (১৪), পড়ন্ত অবস্থায়
 পড়বেধী (৩৩), পড়শী, প্রতিবেশী
 পড়হ (১৯), পটহ, ঢাক বিশেষ
 পড়িলা (২৮), পাতা হল
 পড়িহাই (৪১), প্রতিভাত
 পণ (২), দিকে (ঘরের) পানে
 পণিআ (৩৫), পানী, জল
 পণালো (২৭), পদ্মখালে
 পতবাল (৩৮), হাল
 পতিআই (২৯), প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে
 পতিভাসঅ (৩১), প্রতিভাসিত
 পদমা (১০), পদ্ম
 পদ্মবণ (২৩), পদ্মবন
 পবণ (১৯), পবন, স্থাস
 পমাই (৪২), প্রবেশ করে
 পমাই (৩৮), প্রবেশ কর
 পর (৩৯), অন্য অপর
 পরবস (৩৯), পরের বস
 পরম (১১), শ্রেষ্ঠ, চরম
 পরম নির্বাণে (২৮), পরম নির্বাণে (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 পরশ (১৩), স্পর্শ
 পরহিণ (২৮), পরিহিত
 পরাণ (১০), প্রাণ
 পরিচ্ছিন্না (৭), সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন
 পরিণিবিষ্টা (১২), প্রতিনিবৃত্ত, প্রতিহত
 পরিবারে (৪৯), পরিবারে
 পরিমাণ (১), পরিমাপ কর (আদেশার্থক)
 পরিমাণী (৪৫), সাক্ষ্য রেখে
 পর (৩৬), অন্য
 পরে (৩৯), পরবর্তী সময়ে
 পরিউ (২৩), প্রসারিত করে, ছড়িয়ে
 পসার (৩), বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যসম্ভার
 পহারী (৩৬), প্রহারক, আঘাতকারী
 পহিল (২০), প্রথম
 পহিলে (১২), প্রথমে
 পাঅপএ (১৪), পাদপদ্মে
 পাকেল (৫০), পাকল
 পাখ (১), পাখা, ডানা
 পাখি (৩৬), পক্ষে, দিকে
 পাখুড়ী (১০), পানুড়ি
 পাখে (৪৬), পাখায়
 পাগল (২৮), উন্মাদ
 পাঞ্চ (১২, ১৪, ৪৫, ৪৭), পাঁচ
 পাঞ্চজনা (১২), পাঁচজন
 পাঞ্চালো (৪৭), পাঁচটি নলের ভিতর দিয়ে
 পাটি (৫), তক্তা, (কাঠের) পাটা
 পাটে (১৬), পাটেতে
 পাটের (১), পারিপাটের

পাড়া (৪৯), পেড়ে, নামিয়ে
 পানিআ (৪৩), পানী, জল
 পানী (৬, ১৪, ৪৫, ৪৭), পানী, জল
 পাতি (১), পিড়ি
 পাক্তিআচাদে (৩৬), পাক্তিতআচার্যে
 পাতহ (৪৫), পত্রসমূহ, পাতাগুলি
 পাতহবাহা (৪৫), পত্রবাহার
 পাথর (৪১), পাথর
 পানে (১৬), পানের জন্য
 পান্তর (১৫), প্রান্তর
 পাপ (১৬, ৩৫), পাপ
 পাবত (২৮), পর্বত
 পাবিআই (২৬), পাবে
 পার (৫, ১৪, ৩২, ৩৮), (নদীর) তীর
 পারঅ (৮), পারে
 পারউআরে (৩২), অপর পারে
 পার করেই (১৪), পার করে
 পারশামি (৫), (নদীর) অপর তীরে গমনেচ্ছ
 পারশাবী (৫), (নদীর) অপর তীরে গমনেচ্ছ
 পারিমকুলে (৩৪), কুলের প্রান্তে
 পাস (১), পার্শ্ব
 পাসের (৫০), পাশের
 পিচিউ (চিপিউ?) (১৭), চাপা দেওয়া (বন্দী করা) হল
 পিটত (১৪), পিঠেতে
 পিটা (২, ৩৩), দুধ দোহনের পাত্র
 পিথক (৩৭), পৃথক
 পিবই (৪), পান করব
 পিবমি (৪), পান করব
 পিহাড়ি (১২), পিড়ি (দাবাখেলার কার্টের ছক)
 পুঙ্কআ (২৮), ধনুক
 পুঙ্ক (৫, ৪১), জিজ্ঞাসা কর (আদেশার্থক)
 পুঙ্ক তু (৪০), তুই জিজ্ঞাসা কর (আদেশার্থক)
 পুঙ্কী (৮), জিজ্ঞাসা করে
 পুহ্মি (১০), জিজ্ঞাসা করি
 পুহ্মি (১৫), জিজ্ঞাসা করিস
 পুহ্মি (১), জিজ্ঞাসা করে
 পুণ (২৬, ৪৫), পুনরায়
 পুণ্য (১৬), পুণ্য
 পুন্ন (৩৫), পুণ্য
 পুন্ (১৪), পুনরায়
 পুলিহদা (১৪), মাষ্টল
 পূরা (২০), পরিণত, পূর্ণ
 পেখ (৩০, ৪৬), দেখ
 পেখমি (৩৫), দেখি
 পেখু (৪৬), দৃষ্ট
 পেন্স (২৮), প্রেম
 পোইআ (১৪), পুত্রী
 পোহাঅ (১৯), কাটায়
 পোহাই (২৮), অভিবাহিত হয়, কাটে
 পোহাইলী (২৮), পোহাল কাটিল

ফরই (৪২), ক্ষুরিত হয়
 ফরিআ (৩০), বিস্তৃত করে
 ফরিত্তা (৪৩), ক্ষুরিত, বিস্তৃত
 ফাড়িঅ (৫), ফেড়ে
 ফাল (৪), ফেড়ে ফেল (আদেশার্থক)
 ফিটঅ (২১), ঘোচে, কাটে
 ফিটিলি (৫০), ঘুচল
 ফিটেলি (৫০), ঘুচল, দূর হল
 ফীটউ (১২), নষ্ট হল
 ফুটিলা (৫০), ফুটল
 ফুড় (৪৭), ক্ষুট
 ফুড়অণ (৪৬), ক্ষুটন
 ফুলিআ (৫০), প্রফুল্লিত হল
 ফুলিলা (৪১), ফুটল (ফুল)
 ফেটলিউ (২০), ক্ষেচিত হর, ভেঙ্গে বেরিয়ে এল

বঅণে (৪৫), বচনে, উপদেশে
 বইঠা (১), বসে
 বখাণী (২৯, ৩৭), ব্যাখ্যা করা
 বঙ্গাল (৪৩), বঙ্গাল রাগ
 বঙ্গালী (৪৯), বঙ্গালী
 বঙ্গালে (৪৯), বঙ্গালী কর্তৃক
 বঙ্গ (৩৮), বঙ্গদেশে
 বঙ্গধারী (২৮), বঙ্গধারণকারী
 বঙ্ক (৩২), বাঁকা
 বট (২৬), বাট, পথ
 বট (২৯), বটে, প্রকৃত
 বটই (৭), বর্তমান থাকে (বর্ততে)
 বড় (৪৫), শ্রেষ্ঠ
 বড়গুরু (৪৫), শ্রেষ্ঠগুরু
 বড়ারী (২৩), একটি রাগের নাম (দ্র. বরাড়ী, বলাড্ডী)
 বড়িআ (১২), বোড়ে (দাবা খেলায়)
 বড়হিল জাঅ (৩৩), বোড়ে যায়
 বণ (২৮), বন
 বতিস (১৭, ২৭), বত্রিশ
 বন (৬), বন, অরণ্য
 বন্ধাবএ (২২), আবদ্ধ করে
 বপা (৩২), বাপ (বপ্পা)
 বর (৩৯), বরং
 বরগুরু (৪৫), শ্রেষ্ঠগুরু
 বরাড়ী (১১, ৩৪), একটি রাগের নাম (দ্র. বড়ারী)
 বরিসঅ (৯), বর্ষন করে
 বলআ (৩৮), বলবান
 বলদ (৩৩), বলদ (বলীবর্দ)
 বলন্দে (৩৯), বলদের দ্বারা
 বলাগ (৯), বালাগ, চুলের অগ্রভাগ
 বলাডিড (২৮), রাগের নাম (দ্র. বড়ারী)
 বলি বলি (৪৬), বারবার
 বলী (৫০), (দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত) বলি
 বসই (১৪, ২৭, ৪৩), (নদী) বায়ে যায় (বহতি) পারাপার করে

বহল (২৬), বহুল, বিবিধ
 বহিআ (৩), (নিজে) বয়ে', নিজের থেকে
 বমিআ (৪), বেয়ে
 বহুই (৮), ফিরে আসে (ব্যাহুটিত)
 বহুই (২), বধু
 বহুবিহ (৪১), বহুবিধ
 বাক (২৮), বাক্য, কথা
 বাকলঅ (৩), (গাছের) বাকল
 বাকি (চাকি?) (১৭), চাক, চাকা
 বাক্পথাতীত (৩৭), বাক্পথের অতীত (যেখানে কণ্ঠস্বর
 পৌছায় না)
 বাখোড় (৯), শুষ্ক
 বাক (১৫), বাক
 বাজ (৪৯), বজ্র (পারিভাষিক শব্দ)
 বাজঅ (৩১), বাজানো হয়, বাজে
 বাজই (১৭), বাজে
 বাজএ (১১), বাজানো হয়
 বাজপাব (৪৯), বজ্র-নৌকা (পারিভাষিক শব্দ)
 বাজিল (১৭), বজ্রধর (বুদ্ধ নাটকের মুখ্য অভিনেতা)
 বাজুলে (৩৫), বজ্রকূলের দ্বারা
 বাঝই (৪৬), বন্ধ হয়
 বাঝে (৩৩), বন্ধা
 বাট (৭, ২৬), বত, পথ
 বাটঅ (৩৮), পথে
 বাটত (৮, ১৪), পথে
 বাড়ী (৫০), গৃহ
 বাড়ই (৪৫), বাড়ি
 বাড়ি (৫০), বাড়ি, গৃহ
 বাণ (২১), বর্ণ
 বাণত (৪৩), বর্ণেতে
 বাণ-কুরুণ (৩৭), পুরুষাঙ্গ-অণুকোষ
 বাতাবত্তে (৪১), বাতাসের আবর্তে, ঝড়ে
 বাধা (৩৪), আবদ্ধ
 বাধিস্আ (৪১), বন্ধাপুত্র
 বাধেলি (২৩), বন্ধন করল
 বান (২৯), বর্ণ
 বাক (১), বন্ধন
 বাকঅ (৩), (মদ), বাধে, চোলাই করে
 বাকন (৯, ২১), বন্ধন
 বাকী (১৪), বেঁধে
 বাপ (২০), বাপ, বাবা
 বাপুড়া (২০), বেচারী
 বাপুড়ী (১০), বেচারী
 বাম (৫, ৮, ১৪, ১৫, ৩২), বাঁ দিক
 বাম-দাহিনী (৮, ১৪, ১৫, ৩২) বাম ও দক্ষিণ দিক
 বারুণি (৩), মদ
 বাল (১৫), বালক
 বালাগ (২৬), বাল্যগ্র
 বালি (৫০), বালিকা
 বালী (২৮), বালিকা
 বালুআ-তেলে (৪১), চালকায় তেলে (করণ)
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাষণা (৪১), বাসনা
 বাসনাপড় (২০), বাসনাপট
 বাসসি (১৫), বাসিস, অনুভব করিস
 বাসে (৫০), বাসস্থান
 বাহ (১৪), বেয়ে চল (আদেশার্থক)
 বাহঅ (১৩), বেয়ে চল (আদেশার্থক)
 বাহু (১৪), তুই বেয়ে চল (আদেশার্থক)
 বাহবকে (৮), বাইতে
 বাহবা (১৪), বাইতে
 বাহা (৪৫), (পত্র) বাহার
 বাহিঅ (১৮), বাওয়া হয়
 বাহিউ (৪৯), বেয়ে যাই
 বাহিরিবে (১০), বাইরেতে
 বাহী (৫), প্রবাহিত
 বাক (১০, ৪৭), ব্রাহ্মণ
 বি (১, ২২, ৩৮, ৪০), সংযোগার্থক অব্যয়
 বিআএল (৩৩), প্রসব করল
 বিআণ (২০), প্রসব
 বিআতী (২), অবধূতী
 বিআপক (৯), স্নাপক
 বিআরজে (২০), বিচারেতে (বিচারমানে)
 বিআয়েত (৪৫), বিচারেতে
 বিআহি (৪), বেকালিক ক্রীড়া
 বিহুঅ (১০), বিক্রয় করিস
 বিকসউ (২৭), বিকসিত
 বিগোআ (২০), মিলনসুখ
 বিচিরলে (৩৩), বিচার করলে
 বিচুরিল (৪৪), বিচূর্ণ করল
 বিটলিউ (১৮), বিটাল করলি, নষ্ট করলি
 বিণঠা (৪৪), বিনষ্ট
 বিণা (১৭), বীণা (বাদ্যযন্ত্র)
 বিণা (৪৬), বিভিন্ন, নানা
 বিণানা (২৯, ৩৯), বিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান
 বিণাপাদানাং (১৭), বীণাপাদের (পদকার)
 বিণু (৪), বিনা, ব্যতীত
 বিদারম (৩৯), শিথিল কর, খোলো
 বিদুজ্ঞণ, বিদুজন (১৮, ৪৫), বিদ্বজ্জন
 বিদুজন লোঅ (১৮), বিদ্বজ্জন লোকেরা
 বিদুনাদ (৪৪), বিন্দু নাদ (পারিভাষিক শব্দ, কুলিশ-কমল,
 সূর্য-চন্দ্র, শূন্য-করণা-শব্দগুলিও একই অর্থে ব্যবহৃত)
 বিদ্যা (৯), জ্ঞান
 বিদ্যাকরী (৯), জ্ঞানহস্তী
 বিনু (২), বিনা
 বিন্দারঅ (২১), বিদ্ধ করে
 বিন্দু (৩২), (শুক্র) বিন্দু (পারিভাষিক শব্দ)
 বিদ্ধ (২৮), বিদ্ধকর
 বিদ্ধহ বিদ্ধহ (২৮), বিদ্ধকর বিদ্ধকর (দ্রুত বার বার
 বিদ্ধকর' এই আদেশার্থে)
 বিপথ (১৬), বিপক্ষ
 বিবাহিআ (১৯), বিবাহ করে'
 বিবাহে (১৯), বিবাহ করতে

বিবিহ (৯), বিবিধ
 বিমন (৭), অন্যান্য, দুঃখিত
 বিমকা (৩৭), বিমুক্ত
 বিষকারে (৩৯), (জল) বৃদ্ধদের মত
 বিয়োএ (৪২), বিয়োগে
 বিরমানন্দ (২৭), বিরমানন্দ (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 বিরলে (৩৩), নির্জনে (চিত্তা করলে)
 বিরহ (৩৯), দ্র. বিহর
 বিরুআ (৩), বিরুবাপাদ (পদকার)
 বিরুআ (১৮), বিরূপ
 বিরুবাশাদানাং (৩), বিরুবাপাদের (পদকার)
 বিলক্ষণ (২৭), বিশেষরূপে
 বিলসতা (৯), বিলাস করে
 বিলসই (১৭, ২৯, ৪২), বিলাস করে
 বিলসন্তি (৫০), বিলাস করছিল
 বিতচ্ছি (৩০), বিতচ্ছিন্ন
 বিশেষ (৪৯), পার্থক্য
 বিশেসো (২২), পার্থক্য
 বিষম (৫০), বিষম (গুরুতর এই অর্থে)
 বিসারা (৩০), সার (মূলতত্ত্ব)
 বিস (৩৯), বিষ
 বিসম্বিতচ্ছি (৩০), বিষয়-বিতচ্ছিন্ন দ্বারা
 বিসঙ্কা (২২), (মরণে) বিশঙ্কা (মরণেরও আশঙ্কা)
 বিসন্না (৪২), বিসঙ্গ
 বিসমা (১৭), বিষম, বিশিষ্ট সমতাবোধ
 বিহণ (৪৪), বিহীন
 বিহণি (২৩), বিহানবেলা, সকালবেলা
 বিহরএ (১১), বিহার করে, ঘোরে (বিহরতি)
 বিহরিউ (৩১), বিহরিত হল
 বিহরু (৩৯), বিহার করি (কামকেলি করি)
 বিহারে (৩৯), (বৌদ্ধ) বিহারেতে
 বিহণ (৩৬), ব্যতিরেকে
 বিহনে (১৩), বিনা
 বীরনাদে (১১), বীরভূব্যাঞ্জক শব্দে
 বীরা (৪, ২০), বীর
 বুজিঅ (১৫), বুজিয়ে বন্ধ করে
 বুজিঙিলে (৩৯), বুঝলাম
 বুঝ (৩২), বোঝ (অনুজ্ঞা)
 বুঝঅ (৩৩), জ্ঞাত
 বুঝই (২৭, ৩৭), বোঝে
 বুঝএ (২০), বোঝে
 বুঝসি, বুঝসি (১৫, ৪১), বুঝিস্
 বুঝি (২৩), (আমি) বুঝি
 বুঝিঅ (২৭), (আমি) বুঝি
 বুঝিঅ (৩০), (আমি) বুঝি
 বুঝিল (৩৫), বুঝলাম
 বুড়ই (১৪), ডোবে
 বুড়শে (১৬), ডোবাতে, ডুবে যাওয়াতে
 বুড়িলী (১৪), বুড়ী (ডুবুরী জীলোক?)
 বুধ (২৭), বুদ্ধ
 বুধী (৩৩), বুদ্ধিমান

বুদ্ধ নাটক (১৭), বুদ্ধ বিষয়ক নাটক
 বুলখুই (১৫), ঘুরে বেড়ায়
 বেএ (২৯), বেদে (শাস্ত্রগ্রন্থে)
 বেণ (৩৩), দ্রুতবেগে
 বেণে (৫), প্রবাহে
 বেটিল (৬), বেষ্টিত করল, বেড় দিল
 বেণি, বেণী, বেনি (১, ৪, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ৪৬), যুগল
 বেটে (৬), (গরুর) বাটে
 বৈরী (৬), শত্রু
 বোড়ী (১৪), বুড়ি (পাঁচগুণ বা পনের একচতুর্থাংশ, বোড়ী)
 বোড়ো (৪১), বোড়ো সাপ
 বোব (৪০), বোবা
 বোলঅ. বোলই (৬, ১৮), বলে
 বোলখি (২৬), বলেন (সৌরবে বহুবচন)
 বোলবা যায় (৪০), বলা যায়
 বোলি (৪০), বলা যায়
 বোলিআ (৩৮), নিমজ্জিত (৮)
 বোহি, বোহী (৫, ৩২), বোধি
 বোহে, বোহে (১২, ২১, ২৩, ৩৫), বোধে, জ্ঞানে
 ব্যাপিউ (১৭), বসন্ত হল
 ভঅ (৩১, ৩৮), ভয়
 ভঅখি (৩১), ভয়-ঘৃণা
 ভউ (ভউম) (১১, ৪৭), হ'ল
 ভইআ (৪১), হ'য়ে
 ভইল, ভইলা (৭, ১১, ১৪, ১৫, ৫০), হ'ল
 ভইলী (৪৯), (ভুই) হ'লি (জীলিঙ্গ)
 ভইলে (২), হ'লে
 ভইলেসি (২০), হ'লে 'পর
 ভখঅ (২১), ভক্ষণ করে (ভক্ষতি)
 ভণ (৪০, ৪২), বলে (অনুজ্ঞা)
 ভণঅ (২১), বলে
 ভণই (১, ৪, ৬, ৭, ১২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭), বলে
 ভণতি (২২), বলে
 ভণবি (২০), বলে (সৌরবে বহুবচন)
 ভণতি (৩, ১৬, ৩৯), বলে (সৌরবে বহুবচন)
 ভণর (৪৯), ভাড়া, ভাণ্ডার
 ভতারে (২০), ভাতার, ভর্তা (স্বামী)
 ভত্তি (১৫), ভ্রান্তিতে
 ভব (৫, ৭, ১২, ১৩, ১৯, ২০, ২১, ২২, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৫০), ভব, সংসার
 ভবই (৩৯), সৃষ্ট হয়
 ভব-উলোকে (৩৮), ভব-ভরণে
 ভব জলধি (১৩), সংসার সমুদ্র
 ভবণই (৫), ভবনদী
 ভন নির্বাণা (২২), বন্ধন ও মুক্তি, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব
 ভববল (১২), সংসার (বন্ধনের) শক্তি
 ভবমস্তা (৫০), সংসার (বন্ধনের) মস্ততা
 ভবমোহা (৩৯), সংসারের মোহ
 ভমত্তি (২২), ভ্রমণ করে

ভয় (৩১), ভয়, ভীতি
 ভয়ংকর (১৬), ভয়ংকর
 ভর (২৭, ৩৬), ভরা, পূর্ণ
 ভরা (৪৭), ভড়ার (ভট্টারক), একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
 ভরিত্তী (৪), ভর্তি
 ভলি (১২), ভাল
 ভাষ (২), ভীত
 ভাইব (২৯), ভাবব
 ভাইলা (৩২, ৫০), ভাতিল (প্রতিভাত হল), হ'ল
 ভাংতিএঁ (৪১), ভাঙিতে
 ভাগ তরঙ্গে (৪২), তরঙ্গ-ভঙ্গে
 ভাগেল (৩৯), ভাগলো
 ভাগেই (১৬), ভেগে গেল (ভজ্যতে)
 ভাঞ্জাঅ (১০), ভেঙে, ছিন্নভিন্ন করে'
 ভাত (৩৩), ভাত (ভক্ত)
 ভাদে (৩৫), ভাদেপাদ বা ভদ্রপাদ (পদকার)
 ভাদেপাদানাং (৩৫), ভদ্রপাদের (পদকার)
 ভাঙি, ভাঙী (১৫, ৩৭, ৪১), ভাঙি
 ভাঙো (৬), ভাঙ, ভাষ্যমান (ভাঙঃ)
 ভাব (২৯), অস্তিত্ব
 ভাবাভাব (৯, ৩০, ৪৩), অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব
 ভাবিঅই (২৬), ভাবা হয়
 ভাভরিআলী (১৮), ছেনালিপানা
 ভিড়ি, ভিতি? (১), ভর করে, ভিত্তিকরে (?)
 ভিন্না (৭), ভিন্ন
 ভূঅণ (১৮), ভূবন
 ভূঅণে (৩৪), ভূবনে (ভূবনানি)
 ভূজঙ্গ (২৮), সাপ
 ভূজই (৩৪), ভোগ করে
 ভূসুকু (৬, ২১, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯), ভূসুকুপাদের
 (পদকারের নাম)
 ভূসুকুপাদানাং (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯),
 ভূসুকুপাদের (পদকারের নাম)
 ভেউ (৪৩), ভেদ
 ভেউ ন জাঅ (৪৩), ভেদ করা যায় না
 ভেবউ (৪৫), ভেদ
 ভেলা (১৫), (জলে পারাপারের) ভেলা
 ভেলা (২৩, ৫০), হ'ল
 ভৈরবী (১৬, ৩৮), রাগ বিশেষ
 ভো (২), ওহে (সম্বোধন সূচক)
 ভোল (৩৭), ভুলো (অনুজ্ঞা) (মা ভোলরে = না ভুলোরে)
 ম (১০, ৩৯), আমি
 ম (৫), মা (নিষেধার্থক অব্যয়), না
 মঅগল (৯), মদস্রাব (হস্তীর)
 মঅলৈ (২৯), মৃত্যুতে
 মই (১৬, ১৮, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৩৯), আমি, আমা দ্বারা
 মইলৈ (৪৯), মরলে, মৃত্যে
 মএল (২৩), মরল
 মকু (৩৫), আমার
 মঝ (১৩), মাঝে
 মঝে, মঝে (২, ৪) মাঝে

মণ (৭, ১৯, ৩১, ৪০, ৪৩), মন
 মণগোঅর, মণ গোএর (৭, ৪০), মনগোচর
 মণরঅণা (৪৩), মনরত্ন
 মণা (৪৬), মন
 মণিকুলে (মণিমূলে) (৪), মণিকুণ্ডে (বৌদ্ধ তত্ত্ব-সাধনার
 দেহগত বিশেষ পর্যায়ে)
 মণে (২৮), মনে
 মণ্ডল (১৬), চক্র, দল
 মতিএঁ (১২), মন্ত্রী-দ্বারা (দাবা খেলায়)
 মস্তা (৫০), মস্ত
 মনতরু (৪৫), তরু সদৃশ মন
 মন্তে (৩৪), মন্তদ্বারা
 মরণ (২২, ৪৩), মৃত্যু
 মরণে (২২), মৃত্যুতে
 মরাডিইউ (মরদিইউ?) (১২), মেরে দিলাম
 মরিআই (১), মরে
 মরীচি (৪১), মরীচিকা
 মরু (৪১), মরুভূমি
 মরু-মরীচি (৪১), মরুভূমিস্থ মরীচিকা
 মন্ডারী (৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯), মন্ডার (রাগ)
 মহা (১, ৮, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪৯,
 ৪৩), মহা (বড় অর্থে)
 মহাভক্ত (৪৩), বড় গাছ
 মহাশেহে (৪৯), মহা স্নেহে
 মহামুদেয়ী (৩৭), মহামুদ্রার (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 মহারস (১৬), মহারস (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 মহাসিন্ধি (১৫), মহাসফলতা (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 মহাসূহ (১, ৮, ১৩, ১৮, ২৭), মহাসূহ (বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ)
 মহাসূহ লীডে (১৮), দ্র. মহাসূহলীলৈ
 মহাসূহলীণে (৩৪), দ্র. মহাসূহলীলৈ
 মহাসূহলীলৈ (২৭), মহাসূহলীলাতে
 মহাসূহে, মহাসূহে (২৮, ৩৪, ৫০), ১২৬ মহাসূহে
 মহিষ্ঠা (১৬), মহীধরপাদ (পদকার)
 মহীধর পাদানাং (১৬), মহীধরপাদের (পদকার)
 মা (৫, ১৫, ২৮, ৩২, ৩৭, ৪১, ৪২), 'না'-অর্থে (অব্যয়)
 মাঅ (১১), মাতা (কে)
 মাঅ, মাআ (১৩, ১৫, ২৩, ৪৬, ৫০), মায়া মোহ
 মাঅ সুইনা (১৩), মায়াবপ্ত
 মাআজাল (১৩, ২৩), মায়াজাল
 মাআমোহা (১৫, ৫০), মায়া-মোহ
 মাআমোহে (৪৬), মায়া-মোহের দ্বারা
 মাআ-হরিণী (২৩), মায়া-হরিণী
 মাএ (২০), মাতা, মায়ে
 মাংসে, মাংসে (৬, ২৩), মাংসের জন্য
 মা কর (২৮, ৪১), কোরোনা
 মা কর গুলী (২৮), গোল করিস্না
 মাগ (১৪), মার্গ, পথ
 মাগ (২), মাগুছ, চাইছ
 মাগা (৮), মার্গ, পথ
 মাঙ্গত (৮), মার্গেতে
 মাঙ্গ (১৩, ১৪), মার্গে

মাক (৪৪), মধ্যবর্তী
 মার্বে (৫, ১৪, ১৮, ৩০, ৪২, ৪৭), মখে, মাখে
 মাণই (৪৫), মানে (< মান্যতে)
 মানী (৩৪), মানিত, স্বীকৃত
 মাতঙ্গী (১৪), মন্তহস্তিনী (চণালী)
 মাতা (৯), মন্ত
 মাতেল (১৬), মন্ত হল
 মাতেলা (৫০), মন্ত হল
 মাদলা (১৯), মাদল (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)
 মাদেসি (১২), মাত করা (মর্দরসি)
 মাদসিরে (১২), মাত কর রে
 মা ভোলরে (৩৭), ভুলোনা রে
 মার (২১), মারো (অনুজ্ঞা)
 মার (১৬), মার (ধ্বংসের দেবতা)
 মার (২৬), মার্গ
 মারমি (১০), মারি (মারয়ামি)
 মারিঅ, মারিআ (১১), মেরে, হত্যা করে
 মারিল (৫০), মারল
 মারিহসি (২৩), মেরো (মারয়িস্যসি)
 মালশী (৩৯), মালশ্রী (১- রাগ বিশেষ)
 মালী (১০, ২৮), মালা
 মা লেউ (৩২), নিওনা
 মা লেহুরে (৩২), নিওনারে (বেণ্ডনারে)
 মাসং (৪৪), দ্র. মাঝ
 মা হোই (১৫), হ'য়ো না
 মাহোবাস (৩৭), (ভাঙি) পোষণ কোরোনা, (ভুলের) হুহু
 মেকো না
 মা হোহি, মা হোহী (৫, ৪২), হোয়ো না
 মিঅলী (৪৭), মিভালী
 মিছা (২৯), মিছা, মিথ্যা
 মিছে (২২), মিছামিছি, অকারণ
 মিলিতা (৪৪), মিলিত
 মিলি মিলি (৮), মিলে মিলে
 মিলিল (৮), মিলিত হল
 মুকল (৩২), মুকুলিত
 মুকা (৪৩), মুক্ত
 মুস্তিহার (১১), মুক্তাহার
 মুনিআ (১৩), অনুভূত হল
 মুষা (২১), মুখিক
 মুষাএর (২১), মুখিকের
 মুসা (২১), দ্র. মুষা
 মুসা পবনা (২১), মুষারূপ পবন
 মুসার (২১), মুখিকের
 মুহ (৪), মুখ
 মুঢ় মুঢ়া (৬, ১৫, ৪১, ৪২, ৪৫), মুঢ়, মুর্খ
 মূল (২০, ৪৫), (বৃক্ষ) মূল
 মেরি (৫০), আমার
 মেরুশির (৪৭), পর্বত শীর্ষ
 মেলই (১৮), পরিত্যাগ করে
 মোল (৬), পরিত্যাগ করে
 মেলি মেলি (৩৮), দিনের মিলে-রাতের মিলিত হয়ে

মেলিলি (৮), তুলে দিলি
 মেলেন (২৭), মিলনের দ্বারা
 মেহ (৩০), মেঘ
 মেহেলী (১৩, ৫০), মহিলা, দ্র. শূন্য মেহেলী
 মো (৭, ৩৯), আমার
 মোএ (১০), আমি
 মোখ (১১), মোক্ষ
 মোড়িঅ (১৬), মর্দিত করে (মর্দয়িত্তা)
 মোড়িউ (৯), মর্দিত করে (মর্দয়িত্তা)
 মোর (২০, ৩৩, ৪৯), আমার
 মোরজি (২৮), ময়ূর
 মোরঙ্গিপুচ্ছ (২৮), ময়ূরপুচ্ছ
 মোরি (৩৬), আমার
 মোলাণ (১০), (পদ্মের) মৃণাল
 মোহ (৫, ১১, ১৫, ৩৬, ৪৬), মোহ, ভ্রান্তি
 মোহক (৩৫), মোক্ষ
 মোহতক (৫), মোহতক
 মোহ-বিমুক্তা (৪৬), মোহ-বিমুক্ত
 মোহ-ভাগর (৩৬), মোহের ভাগর
 মোহে (৩৫, ৪৬), মোহেতে (অধিকরণ)
 মোহেরা (৩৪), মোহের দ্বারা
 মোহেরি (২০), আমার
 মোহিলা (২৮), মুকুলিত হল
 মোইলী (২৭), যোগিনী
 যোগী (১১), যোগী
 রঅণ (৯), রত্ন
 রঅণহ (২৭), রত্নহেতু
 রএণি (১৯), রজনী
 রচি রচি (২২), রচনা করে
 রস্তো (১৯), রত, সংলগ্ন
 রথে (১৪), রথেতে
 রবি (১১, ১৬, ৩২), রবি, সূর্য
 রস (১৩, ২২), রাস, নির্বাস
 রস রসানেরে (২২), রাসায়নিক পানীয়ের
 রাস, রাআ (৩৪), রাজা
 রাআ রাআ রাআরে (৩৪), রাজা! রাজা! রাজা! রে! (কায়-
 বাক-চিহ্ন-রাজ্য)
 রাউতু (৪১, ৪৩), রাজপুত্র (চর্যাকর্তার উপাধি)
 রাগ (১-২৩, ২৬-৪৭, ৪৯, ৫০), সংগীতের রাগ
 রাগ (১১), অনুরাগ
 রাজই (৩১), বিরাজ করে (রাজতে)
 রাজপথ (১৫), রাজপথ
 রাজ সাপ (৪১), রজ্জুসর্প
 রাতি (২, ২৭, ২৮), রাত্রি
 রামক্ৰী (১৫, ৫০), রাগবিশেষ
 রিসঅ (৯), ঈর্ষা করে (প্রেমজনিত ঈর্ষা)
 রুখের (২), বৃক্ষের
 রুণা (১৭), করুণ (ধ্বনি)
 রুপলা (৭), রূপ হল

রূপা (৮), রূপা, রৌপ্য

রূব (২৯), রূপ, গঠন

রে (১, ১২, ১৪-১৬, ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০), (সম্বোধন সূচক) হে, ওহে

রোষে (২৮), রাগে

লই (২৯, ৩৬, ৩৮, ৪৭), নিয়ে (<গৃহীত্বা)

লইআ (২৬, ২৮, ৩৫, ৪৯, ৫০), লয়ে (<গৃহীত্বা)

লকষণ (১৫), লক্ষণ, লক্ষকরা

লখ (৩৪), লক্ষ্য

লড় (৪২), (দুধের) স্নেহপদার্থ, মাখন

লধা (৩৪), প্রতিষ্ঠিত (লঙ্কা)

লবএ (১১), লাভ করে, প্রাপ্ত হয় (লভতে)

লাইঅ (১১), লেপিয়া

লাউ (১৭), লাউ-এর খোল (অলাব)

লাগিরে (১৬), লাগেয়ে, স্পর্শ করে

লাগেলি (১৬, ১৭, ৪৭), লগ্ন হল, লাগল

লাগেলি আগি (১৭), আগুন লাগল

লাগেলী (২৮), লাগল

লাঙ্ক (৩২), লঙ্কা (দূরদেশ এই অর্থে)

লাঙ্গ, লান্কা (১০, ৩৬), উলঙ্গ, নান্কা

লাহ (১), লও (অনুজ্ঞা)

লুই (১), লুইপাদ (পদকার)

লীড়ে (১৮), লীলায়

লীলে (১৪), লীলাচ্ছলে

লীলে (২৭), দ্র. লীলে

লুড়িউ (৪৯), লুঠ করলাম

লুই (২৯), লুইপাদ (পদকার)

লুইপাঅপএ (৩৪), লুইদপয়ে

লুইপাদানাং (২৯), লুইপাদের

লেই (১৪), লয়

লেপন যায় (৪), লেপা যায়

লেপ (৪), লেপা

লেমি (১০), নেব

লেলী (৪৯), (তুই) নিলি

লেহ (৩২), লও

লেহঁ (১২), নিলাম

লেহ (৪৭), লও

লেহুরে জানী (৪৭), জেনে লও

লো (১০, ১৪, ১৮), ওহে (সম্বোধন)

লোঅ (৫, ১৮, ২২, ৪২), লোক (বহুবচন)

লোআচার (৩১), লোকাচার

লোড়িব (১৮), লড়বে, হুঁজবে

লোহ্লা (৪১), লোনা, ময়লা

শবরপাদানাং (২৮, ৫০), শবরপাদের (পদকার)

শবরা (৫০), শবর (পুং)

শবরী (৫০), শবরী (স্ত্রী)

শবরো (২৮, ৫০), শবর (পুং)

শশী (১২), চন্দ্র (পারিত্যয়িক শব্দ)

শাখি (৩৬), সাক্ষী

শান্তি (২৬), শান্তিপাদ (পদকার)

শান্তি পাদানাং (১৫, ২৬), শান্তিপাদের

শাসনপড়া (৪৭), শাসনপট (ভূমিসংক্রান্ত পাটা)

শিআলী (৫০), শৃগালী

শীবরী (২৬), রাগের নাম (আশাবরী?)

তত্তিনিনী (তত্তিনী) (৩), তঁত্ৰী ত্ত্রী, তঁত্ৰিনী

শূণ (৪২), শূন্য

শূন (১৩, ৩৫), শূন্য

শূন-মেহেলী (১৩), শূন্যরূপ মহিলা

ষঅবি (৩৮), সবই

ষবরালী (৫০), শবরগিরি, শবরের আচার-আচরণ

ষম (৩৩), সম, সহিত

ষলিলই (৪৭), সলিলের দ্বারা

ষষহর (২৭), শশধর (পারিত্যয়িক শব্দ)

ষহজে (২৭), সহজে

ষামাঅ (৩৩), প্রবেশ করে

ষারা (৩০), সার

ষিআলা (৫০), শৃগাল

ষিঙ্কই (৪৯), সিঙ্কন করি, সঁচি

ষিঙ্কই (৩৩), সিংহের সঙ্গে

ষুত্ৰ (৫০), সুন্দর (সুকৃত?)

ষে (৫০), সে

ষোহিঅ (৪৩), শোধিত

স (২৬), সেক্সপ

স (৩৬), স্ব, আশ্রয়

সঅ (১৬), সহ, সহিত

সঅ (১৫), স্ব, আশ্রয়

সঅল (১, ৯, ১৮, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪৪), সকল

সঅলা (৩৬, ৪১, ৪৩), সকল

সঅসংবেদন (১৫), স্বসংবেদন

সএল (১৬, ১৭), সকল

সএসংবেদন (২৬), স্বসংবেদন

সংকেলিউ (১৫), বেলাচ্ছলে (?)

সংকা (২২), ৬৬, ৯৭. শঙ্কা

সংঘারা (২০), সংহার করলাম

সংতাপে (১৬), সন্তাপে

সংপুনা (৪২), সম্পূর্ণ

সংবোহিঅ (৪০), সংশোধিত করে, বোঝায়

সংবোহী (৪৪), সংযোজি, সম্যক জ্ঞান

সংবোহে (২৯), সংবোধে, সম্যক জ্ঞানে

সংসার (৩৩), সংসার, পরিবার

সংসারা (১৫), জাগতিক বিষয়

সংহার (১৪), সংহার, ধ্বংস

সগুণ (৫০), শকুন

সঙ্গ (৮), সঙ্গ

সঙ্গে (১৯), সঙ্গে

সচরাচর (২১), সচরাচর, চরাচরসহিত

সড়িপড়িআ (৪৫), সারে পড়ে' স্থলিত হয়ে'

সজুলি (৩), দ্র. ঘ লি
 সন্তুষ্ক (৮, ১২, ১৪, ২১, ২৩, ৩৫, ৩৮, ৪১), সৎ শুক্ল,
 মহৎ আচার্য
 সন্তুষ্কপাব (৪১), সৎশুক্লর পাদে
 সন্তুষ্কবর্ণাণে (৩৮), সৎশুক্লর বচনে
 সন্তুষ্ক বোহে, সন্তুষ্ক বোহেঁ (১২, ২১, ২৩, ৩৫),
 সন্তুষ্কর বোহে
 সন্তাবে (১০), সৎ ভাবে
 সন্তারে (৩৭), সঁতারের দ্বারা
 সন্ধি (২৮), সংযোগস্থল
 সপ্তবিভাগ (৩৬), আত্ম-পর বিভাগ
 সবরী (২৮), শবরী
 সবরী বালী (২৮), শবরী বালিকা
 সবরো (২৮, ৫০), শবর
 সত্য (৪০), স্বভাব
 সম (১০), সহিত
 সম (১৭, ৪৩, ৫০), সমান
 সমভাজ্ঞা (৪৬), সমভাযোগে
 সমতুল্য (৫০), সমতুল্য
 সমরস (১৭), সমরস (শূন্যতা ও করুণার মিলনজাত
 সমতারস)
 সমরস সন্ধি (১৭), সমরসের মিলন
 সমরসে (৪৩), সমরসেতে (অধিকরণ)
 সমাঅ (৪, ৪০, ৪৩), প্রবেশ করে
 সমাইড় (২), প্রবেশ করে
 সমাণা (৪৬), সমান, একরকম
 সমাহিঅ (১), সমাহিহু
 সমুদা (১৫), সমুদ্র
 সমুদেঁ (৩৫), সমুদ্রে
 সম্বেঅণ (১৫), সংবেদন
 সরবর (১০), সরোবর
 সরসঙ্কানে (২৮), সরসঙ্কানের দ্বারা
 সরহ (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯), সরহপাদ (পদকার)
 সরহপাদানাং (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯), সরহপাদের
 সরুঅ (১৫, ৩০), স্বরূপ
 সরুঅ বিআরেতে (১৫), স্বরূপ বিচারেতে
 সরুই (৩), সরু অগ্রশস্ত
 সর্ব (৪৪), সর্ব, সব
 সর্বই (৩৫), সবই
 সসর (৪১), শশকের
 সসহর (১৮, ৪৭), শশধর (পারিভাষিক শব্দ)
 সসি (১৭, ৩২), (পারিভাষিক শব্দ)
 সসিমণ্ডল (৩২), শশিমণ্ডল
 সহজ (৯, ১৯, ২৮, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৩), সহজ
 (পারিভাষিক শব্দ)
 সহজ উন্মত্তো (১৯), সহজ প্রাপ্তিতে উন্মত্ত
 সহজ নলিনীবর্ণ (৯), নলিনীবনরূপে সহজ
 সহজ নিদালু (৩৬), সহজ-প্রভাবে নিদালু
 সহজ মহাতরু (৪৩), মহাতরুরূপে সহজ
 সহজ সরুআ (৩০), সহজ-স্বরূপ
 সহজ সুন্দারী (১৮), সুন্দারীরূপে সহজ

সহজানন্দ (১৭), সহজরূপে আনন্দ
 সহজে, সহজেঁ (৩, ৩৮, ৩৯, ৪২), সহজে
 সহাব (৪১, ৪৩), স্বভাব
 সহাবে (৯, ৩২, ৪১, ৪৩), স্বভাবে
 সহি (১৭), সবি (সম্বোধনে)
 সা (১৭), স্বরূপের প্রথম ধ্বনি-সা
 সাঅর (৪২), সাগর
 সাক্ষ (৫), সাক্ষো
 সাক্ষম (৫), সাক্ষো
 সাক্ষমত (৫), সাক্ষো-মতো (ঠিকমতো সাক্ষোতে)
 সাক্ষ (১০), সঙ্গ, যৌনমিলন
 সাক্ষে (১৩, ৩২), সহবাসে, সঙ্গ করলে
 সাচ (২৯), সাচ, সত্য (বিশেষ্য)
 সাচে (৪১), সত্যকরে (করণ)
 সাঝে (৩৩), সন্ধ্যাতে
 সাণে (১), ধ্যানে
 সাদেঁ (৪৪), শব্দে
 সাদ্ব (১৯), শব্দ
 সান্তি (১৫, ২৬), শান্তিপাদ (পদকার)
 সাক্ষঅ (৩), সাক্ষি, প্রবেশ করল
 সাক্ষি (১৪), সাক্ষিয়ে, প্রবেশ করে
 সাক্ষে (১৫), সাধায়, পান করে
 সামী (৫), স্বামী
 সাক্ষিঅর (৪২), সাগর
 সারি (১৭), সংগীতের স্বরূপের প্রথম দুটি ধ্বনি : সা-রে
 সালী (১১), শ্যালিকা, শালী
 সাসু (৪), শাণ্ডী
 সাসুঘরে (৪), শাণ্ডীর ঘরে
 সাহা (৪৫), শাখা
 সিংগে (৪১), শৃঙ্গে, শিং-এ
 সিকল (১৬), শিকল
 সিঝএ (১৫), সিদ্ধ হয় (সিদ্ধতি)
 সিদ্ধেঁ (১৪), সঁচন কর (অনুজ্ঞা)
 সিঠি (১৪), সৃষ্টি
 সীস (৪০), শিষ্য
 সুঅণে (৪৬), স্বপ্নে
 সুঅ (৪১), সুত, পুত্র
 সুইণা (১৩), স্বপ্ন
 সুইনা (৩৯), শূন্য, আকাশ
 সুখ (১), সুখ
 সুখ-দুখেতে (১), সুখ ও দুখেতে
 সুখেঁ (৩৪), সুখেতে
 সুচ্ছড়ে (১৪), স্বচ্ছন্দে
 সুজ (৪, ১৭), সূর্য
 সুণ (৬), শোন, (অনুজ্ঞা)
 সুণ (৩১, ৩৬, ৩৯, ৫০), শূন্য (পারিভাষিক শব্দ)
 সুণ (৩৯), খালি, শূন্য
 সুণ মেহেলী (৫০), নারীরূপী শূন্য
 সুণত (১৩), শূন্যতা (পারিভাষিক শব্দ)
 সুণত মাসে (১৩) শূন্যতা মার্গে
 সুণে (২৬), শূন্য (পারিভাষিক শব্দ)

সুণেজা (১৭), শুনে'
 সুনন্তে (৩০), শুনে
 সুতেলা (৩৬), শুয়েছিল
 সুতেলি (১৮), শুলাম
 সুধ (২৭), শুদ্ধ
 সুন (২, ১৭, ২৮, ৩১, ৩৪, ৪৪, ৪৫), শূন্য
 (পারিভাষিক শব্দ)
 সুন করুণারি (৩৪), শূন্য ও করুণা (পারিভাষিক শব্দ)
 সুন তান্ত্রিধনি (১৭), শূন্য-তান্ত্রিধনি
 সুন নিরামণি (২৮), শূন্য ও নেরাআ (পারিভাষিক শব্দ)
 সুন বিআর (৩১), শূন্য বিচার কর
 সুনা (১৫), শূন্য
 সুনাপান্তর (১৫), শূন্য প্রান্তর
 সুনি (১৬), শুনে'
 সুনে (২৬, ৪৪), শূন্য
 সুন্দারী (২৮), সুন্দরী
 সুন্ন-পাখ (১), শূন্য-পাখা
 সুফল (৩৬), সফল
 সুফল করি (৩৬), সফল করে'
 সুভাসুত (৪৫), শুভ-অশুভ
 সুরত (১৯), সুরত, কামকীড়া
 সুরত পসঙ্গে (১৯), সুরত-প্রসঙ্গে
 সুসুরা (২), স্বতর
 সুহে (৩৬), সুখে
 সুজ্ঞ (১৪), সূর্য
 সুধ (৯), শুদ্ধ
 সুন (৩৫), শূন্য
 সে (৩, ৭, ২১, ৪০, ৫০), সেই, সে
 সেজি (২৮), শয্যা
 সেব (২০), সে-ও
 সেস (৪৯), শেষ, সমাপ্ত
 সেস্ (২৬), অবশিষ্ট
 সো (৭, ১০, ২০, ২২, ২৭), সে, তার
 সো (১০, ২০, ২২, ২৯, ৪১, ৪৫) সেই
 সোই, সোই (১৫, ৩২, ৪৬), সে-ও
 সোণ (৪৯), সোনা
 সোণ তরুণ (৪৯), স্বর্ণতরু
 সোনে (৮), সোনাতে, স্বর্ণদ্বারা
 সৌ (৩৩), সে-ও
 সৌধ (৩৩), তারা সকলেই
 স্বপনে (৩৬), স্বপ্নে
 স্বপরাপর (৩৪), নিজে ও অপরে
 স্বপরেলা (৪৩), স্ব ও পর, নিজে ও অপরে
 স্বমোহে (৩৫), আত্মমোহে

হরিআ (৬), পুরুষ হরিণ
 হরিণা (৬), পুরুষ হরিণ
 হরিণার (৬), পুরুষ হরিণের
 হরিণির (৬), স্ত্রী হরিণের
 হাউ, হাঁউ (১০, ১৮, ২০, ৩৫), আমি হই
 হাড়ীত (৩৩), হাড়ীতে
 হাড়েরি (১০), হাড়ের
 হাড়েরি মাধী (১০), হাড়ের মালা (স্ত্রী)
 হাথ (৪১), হাত, হস্ত
 হাথেরে (৩২), হাতের
 হালো (১৮), গুণো (সম্বোধন)
 হিঅ তাঁবোলা (২৮), হৃদয় তাম্বুল
 হি অহি (২, ৬, ৭), হৃদয়ে
 হিএ (৪৪), হিয়াতে, হৃদয়ে
 হিঙই (১৮), ঘোরে, টোড়ে
 হুঁ (৩৯), হুঁং-কার (হুঁং মন্ত্রধনি)
 হেবতই (৩০), ছিন্ন করে
 হের (৫০), দেখ
 হেরি (৭), দেখে
 হেরি (৫০), দেবি
 হেরু (১৭), হেরুক (বৌদ্ধ দেবতা : বজ্রধর)
 হেরু (১৬), হেতু, কারণ
 হেরে (১৮), অনায়াসে, অবহেলায়
 হো (৩১), হয়
 হোই (৩, ১৭, ১১, ১৯, ৩৭, ৪৬), হয়, ঘটে
 হোইব (৫), হবে
 হোঙি (১১), হন
 হোহিসি (১৩), (তুমি) হবে
 হোহ (৬), হও (অনুজ্ঞা)

হই (৪৭), হয়
 হণ বিণ (২৩), হত্যাবিন্দু, হননবিনা
 হণ (৩৯), হাত
 হর (৪৭), হর, শিব
 হরি (৪৭), হরি, কৃষ্ণ
 হরিঅ (৯), হরিত-বা নিয়ে নেওয়া হয়েছে
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি ও বিষয় নির্ঘণ্ট

অতীশ দীপঙ্কর, ২৪, ২৫, ৮২, ৯৪

অব্ধি বসু, ১৯, ২০৪

অম্বোধা, ২১৬

আজদেব, ১৬, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭

আল বেকুনি, ২৬, ৮১

আমির খসরু, ৯৯

ইউড়ী পা, ১৯

ওমর খৈয়াম, ১২৮, ২১২

ওস্তাদ আলাউদ্দিন বান, ২৫১

এসোপস ফেবেল, ২১৬

কমলা, ২৫০

কঙ্কন পা, ১৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ২১২, ২১৩

কমলায়র পা, ১৬, ৬৫, ২১২, ২১৩

করুণাকর কর, ২৩

কাহু পা, ১৪, ১৬, ১৭, ৪৭, ৫৭, ৫৮-৬১, ৬৫-৬৮,
৭১-৭৪, ৭৬, ৭৮-৮০, ৮২, ৮৪-৮৬, ১০৪-

১১০, ১২৫, ১৪৩, ১৬৩-১৬৬, ১৭৭-১৭৯,

১৮৪, ১৮৫, ১৯২, ১৯৩, ২১২, ২১৩, ২৫১

কিরাত, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭

কুকুরী পা, ১৩, ৩৫-৩৯, ১১১-১১৩, ২১২, ২১৩

কলেশ্বর মহাপাত্র, ২৩

গিয়ার্সন, ১৪

গুণ্ডরী পা, ১৬, ৪৪-৪৬, ৪৯, ২১২

গুরু ভট্টারক, ১৯

গোপাল, ১২২

গোরক্ষনাথ, ২১৩, ২১৫

গৌতম বুদ্ধ (বিশেষ ভাবে), ৮৪, ১৬৮, ২২১, ২২৬,
২৩৮

চর্যা পা, ১৬, ১৮, ১৯, ২১৩

চাগম, ১৯

চাটিল পা, ১৬, ৪৯, ৫২, ২১২

চৌরাশি সিদ্ধা, ২৭, ১৬৫, ১৭০, ১৯৭, ২১৩

জয়কান্ত মিশ্র, ২৩

জয়দেব, ৪৮, ২১৯

জালন্ধরি, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬

জয়নন্দী পা, ১৬, ১৯৪, ১৯৬, ২১২

ডোয়ী পা, ১৬, ৭৪, ৮৬, ৮৭, ৯০, ১৫৪, ২১২

ঢেংগু পা, ১৫১, ১৫৩-১৫৬

ডাঙ্গা পা, ১২৫, ২১৩

ডাউক পা, ১৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ২১২, ২১৩

দাবা খেলা, ৮১, ২৩৫

দারিক পা, ১৬, ১৫৬-১৫৯, ১৬৬, ২১২, ২১৩

দেবপাল, ৩৯, ৪৯, ৫৬, ৬১, ৬৫, ৯০, ১৫৬, ১৫৯,
২১৮

ধর্মপাল, ৩৪, ৩৯, ৫৬, ১২২, ১৩৮, ২১৮, ২২০

ধর্মবীর ভারতী, ২৪

ধাম পা, ১৬, ১৯৮-২০১, ২১৩

ধোকড়ী, ১৯

ধৃষ্টিজ্ঞান, ১৯

নজরুল, ৫১, ২২৪

নাগার্জুন, ১৯

নাড় পণ্ডিত, ১৯

নারায়ণ পাল, ৯৮, ২০১

পরীক্ষিত হাজরা, ২৩

পদ্মা, ২২, ৫৬, ৮৭, ২০২, ২০৫, ২১১, ২২৯, ২৩৩

পুলসিরাভ, ৫১

প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ২১৪

ফ্রয়েড, ১৭৮

বড়ু চণ্ডীদাস, ৪৮, ২৩৭

বঙ্গাল, ১৪, ১৫, ২২, ১৭৭, ১৮৬, ২০২-২০৬,
২১১, ২৩৩, ২৫১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬৯, ১০৮, ২৪৮

বাউল, ৫২, ৬০, ৭৭, ৯৯-১০১, ১২০, ১৫০,
২০৫, ২১২, ২১৫, ২২৩, ২২৪, ২৫৫

বাংলা মদ, ২৩০

বিগ্রহ পাল, ১৫৬, ২০১

বিজয় সিংহ, ৮৫, ১৫০, ২০৬

বিদ্যাপতি, ৩৮, ৪৮, ২১০, ২৫৬

বীণা পা, ১৬, ৯৯-১০১, ১০৩, ২১২, ২১৩

বেহুলা, ২৪২,

বৈরোচন, ১৯, ৪১, ৪২

বৌদ্ধজাতক, ২১৬

ভরত, ১৩

ভারতচন্দ্র, ৪৮

ভাদে পা, ১৬, ১৬০-১৬৩, ২১২, ২১৩

ভুসুকু পা, ১৬, ৫৬, ১১৬, ১১৮, ১২৩, ১২৪,
১২৯, ১৩১, ১৪১-১৪৩, ১৮০, ১৮১, ১৮২,
২০২-২০৪, ২১২, ২১৩

মনসুর হাল্লাজ, ১২৯

মসলিন, ১২৯, ২০৯, ২৩০

মহাসুখতা বজ্র পা, ১৯

মহীধর পা, ১৬, ৯৫

মাইকেল, ২৪৯

মাতৃচৈট, ১৯

মার, ৪৬, ৫৪, ৭৫, ৭৮-৮০, ৮৩, ৯৫-৯৮, ১১৬,
১১৮, ১২৪, ১২৬, ১৬৮, ১৭৩, ২১৯,
২৩৬, ২৪১, ২৪৭, ২৪৮

মীননাথ, ১৬, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৪, ২৩, ২৯, ১২৩, ২১৪, ২১৮

মুনিদত্ত (বিশেষভাবে), ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২৪,
২৭, ৩৪, ৪১, ৪৪, ৪৭, ৭৪, ৮৭, ১০২,
১৬০, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৭০, ২১২, ২১৪,
২২৪

রতীবজ্র, ১৬, ১৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৫, ৩২, ৬৩, ১১৯, ২৪৩

রামাই পণ্ডিত, ২৪৬

রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন, ১১৪

লঙ্কা, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ২৪৩

লীলা পা, ১৯, ২১৩

লুই পা, ১৬, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৪, ১৩৮, ১৪০,
১৪১, ১৫৭-১৫৯, ১৯৩, ২১২, ২১৩, ২৩৭

শংকরাচার্য, ২১৬, ২২৬

শান্তি পা, ১৬, ৯১-৯৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯,
২১২, ২১৩, ২৩৭

শূন্যবাদ, ১২৮, ১৭০, ১৮৮

সরহ পা, ১৬, ১৭, ৭৭, ১১৯, ১২১-১২৩, ১৪৮-
১৫০, ১৭১, ১৭৪-১৭৭, ২১৩, ২৪২

সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, ২৩

সুকুমার সেন, ১৩, ২৩, ২৯

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩, ১৯, ২৩, ২১৪,
২১৮

সুফী কাব্য, ২২৩

সূর্যনখা, ১০৫, ১০৮

সৈয়দ মুহম্মদ আলী, ১১৯

সোমেশ্বর, ৪৮

সুপ্ত, ১৯, ২১৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বিশেষ ভাবে), ১৩, ১৯, ২৩, ২৭,
২৯, ৯৯, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২২২-২২৪

হুমায়ুন কবির, ২১৬

হেবজ, ১৬, ১৯, ২১২, ২২১

হেরুক, ১৯, ৯৯-১০৩, ১২৬, ২১৩, ২২১

সহায়ক গ্রন্থাবলী

মুনিদত্ত, চর্যাগীতিকোষবৃত্তি, আনুমানিক দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দ।
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোহা, ২০০০।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বুদ্ধিষ্ট মিষ্টিক সংস, ১৯৬৬।
প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ও শান্তিভিকু শাস্ত্রী, চর্যাগীতিকোষ, ১৯৫৬।
সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, ১৯৬৬।
নীলরতন সেন, চর্যাগীতি কোষ, ১৯৭৮।
সৈয়দ আলী আহসান, চর্যাগীতিকা, ১৯৮৪।

হুমায়ুন কবির, বাংলার কাব্য, ১৯৭২
এ গ্রন্থেণ ওয়েবেল, চৌরাশি সিদ্ধা
কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস: দর্শন সাধন প্রণালী, ১৯৮০।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে
—, বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৩৪
সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৫০
—, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রথম খণ্ড, ১৯৬৩
—, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী, ১৯৪৩
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা ভাষার কথা, ১ম খণ্ড
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব
সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা
আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১৯৮৬
অলকা চট্টোপাধ্যায়, চৌরাশি সিদ্ধার কাহিনী, ১৯৯৮

চর্যাপদ বিষয়ক এ ধারণা প্রকাশিত আলোচনা গ্রন্থ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯১৬
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, The Origin and Development of the Bengali Language and Literature,
1926
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, Buddhist Mystic Songs, 1928
প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, Some Aspects of Buddhist Mysticism in the Caryapades, 1934.
—, Caryagitikaso of Buddhist Siddhas, 1956
সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, ১৯৫৬
মণীন্দ্রমোহন বসু, চর্যাপদ, ১৯৬৪

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ১৯৫৬

—, *Obscure Religions Cults as Background of Bangali Literature*, 1946

নব চর্যাপদ, ১৯৮৯, (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত)

সত্যব্রত দে, চর্যাগীতি পরিচয়, ১৯৬০

অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, ১৯৬০

তারাপদ মুখোপাধ্যায়, চর্যাগীতি, ১৯৬৫

নীলরতন সেন, চর্যাগীতির ছন্দোপরিচয়, ১৯৭৪

—, *CaryagitiKoso*, 1977

নির্মলকুমার দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, ১৯৭২

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, চর্যাগীতির ভূমিকা, ১৯৭৬

সুমঙ্গল রানা, চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা, ১৯৮১

এস.এম লুৎফর রহমান, বৌদ্ধ চর্যাপদ, ১৯৯০

হাসনা জসীমউদ্দীন মণ্ডুদ, *A Thousand year old Bengali Mystic Poetry*, 1993

Per Kværne, *An Anthology of Buddhist Tantric Songs*, 1977

পৃথ্বীন্দ্র মুখার্জী, *Chants Carya du Bengale*, 1981

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *Bengali Buddhist Literature*, *Calcutta Review*, 1917

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঋগ্বেদীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৩৩

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭০

প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, *Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapoders*, *Journal of Calcutta University*, 1938

সৈয়দ মর্তুজা আলী, চর্যাপদের ভাষা, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭০

আনিসুজ্জামান, চর্যাগীতির সমাজ চিত্র, পাণ্ডুলিপি, ১৩৮১

আব্দুল কাদির, চর্যাপদের ছন্দ; ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৮৩